নবনীতা দেবসেন
রূপকথা সমগ্র

কেউ-কেউ বলেন ছোটদের রূপকথার জগৎ হারিয়ে যাচ্ছে। কল্পনার ভাবনায় ভর দিয়ে অপরূপের দুনিয়ায় হারিয়ে যেতে আজকের ছেলেমেয়েরা নাকি চায় না।

ভুল। সেই ভুল বারে-বারে প্রমাণ করেছেন নবনীতা দেবসেন। বাংলার শিশুসাহিত্য যেসব অনন্য রূপকথাশিল্পীর ফুলে-ফুলে বর্ণে-গন্ধে পূর্ণ, সেই উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, যোগীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে রাধারাণী দেবী, সুখলতা রাও, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায় প্রমুখের সার্থক উত্তরসূরি নবনীতা দেবসেন।

তাঁর নিজের কথায়, 'আমি নিজেও রূপকথা খুব ভালোবাসি। ছোটবেলাতে যেমন, এখনও প্রায় তেমনি মুগ্ধ হয়ে রূপকথা পড়ে ফেলি।...আমার রূপকথার গল্পগুলি সেই পড়ুয়াদের জন্য, যাদের বুকের মধ্যে শৈশব অমলিন রয়েছে।...'

নানাসময়ের নানান স্বাদের ৬১টি রূপকথার ডালি নিয়ে সাজানো হয়েছে 'রূপকথা সমগ্র।'
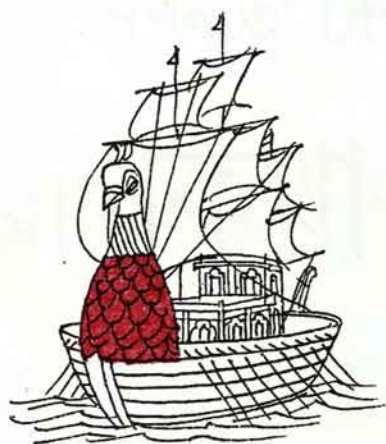
রূপকথা সমগ্র

নবনীতা দেবসেন

রূপকথা সমগ্র

পত্র ভারতী

তোমার ছোট্ট ছোট্ট মা আর তুম্মাকে খাওয়াতে আর ঘুম
পাড়াতে গিয়ে মুখে মুখে এই গল্পগুলো তৈরি শুরু।
আমি জানি, ঠিক তাদের মতো এই বই তুমি
একদিন নিজে নিজেই ঠিক পড়ে ফেলবে।
সেই দিনটির অপেক্ষায় রইলুম।

আমার অতি আদরের এক কুচি রূপকথা
হিয়ামন সোনার দু-বছরের জন্মদিনে
দিয়াম্মার আশীর্বাদ

ভালো-বাসা
১১ অগস্ট ২০১১

পত্র ভারতী প্রকাশিত বই

পাঁচটি উপন্যাস

রূপ ও কথা

ভালোবেসে এই লেখকের রূপকথা সমগ্র বের করছেন কল্যাণীয় ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়। আমি নিজেও খুব রূপকথা ভালোবাসি। ছোটবেলাতে যেমন, এখনও প্রায় তেমনি মুগ্ধ হয়ে রূপকথা পেলেই পড়ে ফেলি। আমার তো মনে হয় আমার মতো আরও অনেকেই আছেন যাঁরা বড় হয়েও সবটুকু শৈশব ফুরিয়ে ফেলেননি, রূপকথা যাঁদের আজও টানে, আনন্দ দেয়, আরাম দেয়।

আমি ছিলুম বাড়িতে একলা শিশু। আমার সব চেয়ে ভালো লাগত মায়ের কোলে বসে মায়ের মুখে রূপকথা শুনতে। বড় সুন্দর করে রূপকথার গল্প বলতেন আমার মা। ঠাকুমার ঝুলির পরেই মায়ের লেখা রূপকথা সবচেয়ে প্রিয় ছিল আমার। একটু বড় হয়ে বই পড়তে শিখে রূপকথার বই পড়তেই আমার আর সব বইয়ের চেয়ে বেশি ভালো লাগত। কী ইংরিজিতে, কী বাংলাতে রূপকথা পড়া আমার আজও ফুরোয়নি। রূপকথা তো চিরকালের জিনিস। আমি রূপকথা পড়তে যত ভালো বাসি, রূপকথা লিখতেও ততই আনন্দ পাই। আমার মা রাধারানি দেবীর রূপকথা লেখা আরম্ভ হয়েছিল যেমন আমার মেয়েদের গল্প শোনাতে গিয়ে। আমি আমার লেখক জীবনে সব চেয়ে শান্তি পেয়েছি কবিতা লিখে, আর সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি শিশুদের জন্যে রূপকথা লিখে। আমার রূপকথার গল্পগুলি সেই পড়ুয়াদের জন্যে, যাদের বুকের মধ্যে শৈশব অমলিন রয়েছে।

দুঃখের সঙ্গে নজর করছি, আজকাল বাংলায় ছোটদের জন্য যেসব বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা বের হয়, তাদের মধ্যে স্বপ্ন কল্পনা থেকে ঝোঁকটা সরে যাচ্ছে বাস্তববাদী গল্পের দিকে; গোয়েন্দা, শিকার ও রহস্য কাহিনি এবং মানবিক সম্পর্কের সামাজিক কাহিনিতে। স্বপ্ন বলতে দুঃস্বপ্নের কাহিনি, অর্থাৎ ভূত এবং পিশাচের। রূপকথার সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। কিন্তু রূপকথাও জীবনেরই গল্প, পোশাকটা হয়তো রাজা-রানির। সেখানেও মানুষী সম্পর্কের সাদা আর কালো, ঈর্ষা আর দ্বেষের ছবি যেমন ফোটে, তেমনি তার মধ্যে দয়া মায়া, আমাদের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার সাত রং, আর ব্যর্থতার ব্যথা-বেদনার অন্ধকার, সবই ধরা থাকে। জটিলতা, কঠোরতা, অবিচারের ছবিও বাদ থাকে না। পরিচয় হয়ে যায় জীবনের সমস্ত দিকগুলোর সঙ্গেই।

কিন্তু সেখানেই শেষ হয়ে যায় না রূপকথা। তার পরেও থাকে উত্তরণের পথ-নির্দেশ। মুক্তির রাস্তা দেখানো থাকে তাতে। রূপকথাতে সৎ মানুষটির জয় নিশ্চিত। সংকট যতই জটিল হোক, নায়ক বা নায়িকা রূপকথায় থাকে অপরাজিত।

আধুনিকতার গুণটি থাকা অতি অবশ্যই জরুরি। বিশেষ করে আজকের দিনে, যখন শৈশবের ছাঁটাই শুরু হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, সাহিত্যের একটি দায়িত্ব আছে ভবিষ্যৎ মানুষদের প্রতি। যে পৃথিবীতে ওরা বড় হবে সেখানে যা দেখার যা দেখার নয়, সবই পাবে। আমি চাইব শিশুদের ভাবনা হোক নির্ভীক আর সদর্থক। তাদের মনের মধ্যে বিশ্বাস থাকুক মমত্ব এবং বুদ্ধি দিয়ে। মঙ্গলসাধনের ইচ্ছে থাকলে সব কঠিন সমস্যার সমাধান হয়।

আর আমার রূপকথায় একটু নারীশক্তির প্রকাশ আছে। রাজা, রাজপুত্তুরেরা আর নায়ক নন, ভুল ভ্রান্তিভরা সাধারণ মানুষ। রানিরা আর রাজকন্যেরা দুর্বল নন, অসহায় নন, তাঁরাই সক্ষম। বিপন্ন হলে উদ্ধারের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তাঁরাই নায়ক। তাঁরা নিজেরা শত্রুজয় করেন, কিন্তু বাহুবলে নয় বুদ্ধিবলে। রাজ্য উদ্ধার করেন, সুবুদ্ধির বলে। নারী-পুরুষের সামাজিক অসাম্য ঘোচাতে, নারীর আত্মনির্ভরতার প্রতি সম্মান জাগাতে এই দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি। আমরা চাইব সমাজে ছেলেমেয়েরা সমান সম্মান, সমান সুযোগ পাক। নতুন যুগের মূল্যবোধগুলি এই নতুন যুগের ভাবনায় গোড়া থেকেই বুনে দেওয়া দরকার। রূপকথার দ্বারা তা সহজেই সম্ভব। আর আমরা, মা-বাবারা চাইব, তারা স্বপ্ন দেখতে শিখুক। রূপকথা সকলের হাতেই এই সোনার কাঠিটি তুলে দিতে পারে, কেউ নেয় কেউ নেয় না।

এই বইতে রইল আমার এ পর্যন্ত প্রকাশিত শতাধিক প্রায় সব রূপকথা। ত্রিদিব, শ্রাবন্তী আর কানাইলাল যা খুঁজে পেয়েছেন। কিছু গল্প খুঁজে পাইনি। নিজের মেয়েদের গল্প শোনানো দিয়ে শুরু, এখন গল্প শোনাচ্ছি নাতনিদের। রিংকু, দুনিয়া, দিঠি, ঋতমা, ইষিকা, ইদা, লাবণ্য আর হিয়ামনেদের। তাদের জীবনে রূপকথা কোনওদিন ফুরিয়ে আসে না যেন, এই আশীর্বাদ।

ভালো-বাসা
১১ অগস্ট ২০১১

নবনীতা দেবসেন

সূচিপত্র

ইচ্ছামতী

এক রাজার ছয় ছেলে। রাজার প্রাণে আহ্লাদ আর ধরে না। রাজা রাজসভায় বসেন, সভা আলো করে সঙ্গে বসেন ছ'খানি সোনার সিংহাসনে ছয় রাজপুত্তুর। রাজা বেরোন মৃগয়া করতে, সঙ্গে বেরোন ছ'খানা তেজি ধবধবে দুধরাজ ঘোড়ায় চড়ে বন-আলো-করা ছয় রাজপুত্তুর। বনের ছ'কোণে ধেয়ে যান টগবগিয়ে—মুহূর্তের মধ্যে ধরে আনেন চিতল হরিণ, মেরে আনেন ডোরাকাটা বাঘ। রাজার মনে যেমন গর্ব, তেমনি ফুর্তি। ছয় ছেলে তাঁর প্রাণ, তাঁর বুকের নিশ্বাস, চোখের চাওয়া।

আর রানিমা একলাটি বসে বসে সাত জোড়া নাগরা রোদে দেন, সাত জোড়া মেরজাইতে দড়ি-বোতাম সেলাই করেন, সাতখানা উত্তরীয় রিপু করেন। আর দীর্ঘনিশ্বেস ফেলেন। ছেলেরা যখন ছোট ছিল, তখন দুধ খাওয়াতেন, চান করাতেন, পোশাক পরাতেন, কত নাড়তেন চাড়তেন! ছেলেরা এখন বড় হয়ে গেছে, কেবল খাবার সময়ে দেখা হয়। আর সকালে একবার করে বেরুবার সময়ে প্রণাম করে বেরোয়, তখন মুখগুলি দেখেন। একা একা এত কাজ করেন, আর রানি ভাবেন আহা আমার যদি একটা মেয়ে থাকত! সে বড় হলেও কাছে কাছে থাকত। রাজসভায় বসত না, মৃগয়ায় বেরুত না। মন্ত্রীপুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাকে কাছে কাছেই রেখে দিতুম! ভাবেন, আর বাগানে বেড়িয়ে বেড়িয়ে সাতসাজি ফুল তোলেন। ছয় ছেলের ছ'টি মালা, আর শিবঠাকুরে জন্যে একটি মালা গাঁথেন অলিন্দ বসে বসে।

সেই বাগানে একদিন রানি দেখেন একটি ফরসা ধবধবে দুধের মতন রং, আর

জুঁইফুলের মতন তুলতুলে ফুরফুরে একটি খরগোশছানা। সবুজ ঘাসের মধ্যে আপনমনে ছুটোছুটি করে খেলছে। রানিমা তখন শিবঠাকুরের মালাটি গাঁথছেন। গাঁথতে গাঁথতে খরগোশছানাটি দেখতে পেলেন। দেখেই ফোঁত করে এতবড় একখানা দীর্ঘনিশ্বেস ফেলে বললেন, 'আহা, ওই খরগোশের মতন আমার যদি একটা ধবধবে, তুলতুলে মেয়ে থাকত!' এখন হয়েচে কী, রোজকার মতন মালাটি পরবার লোভে শিবঠাকুর ঠিক তখনই রানির মন্দিরে এসেছেন। রানি তাঁকে দেখতে না পেলে কী হবে, তিনি রানিকেও দেখলেন, তাঁর ইচ্ছেও শুনলেন। আর শিবঠাকুরের মনটা তো খুব দরাজ, অমনি বর দিয়ে দিলেন, 'তথাস্তু! তাই হোক!'

কিছুদিন পরে রানিমার একটি চাঁদের আলোর মতন সুন্দর, দুধের ফেনার মতো নরম, ধবধবে তুলতুলে মেয়ে হল তার গাল দুটি খরগোশের নাকের মতন গোলাপি, চোখ দুখানি কটা কটা, চুলগুলি সোনালি সোনালি, রেশমের মতন নরম, চকচকে। তার মুখে হাসি লেগেই আছে। রানির আহ্লাদ আর ধরে না। ঠিক যা মনের ইচ্ছে ছিল তাই পেয়েছেন। মেয়ের নাম রাখলেন—ইচ্ছামতী। রাজাও খুব খুশি, রাজপুত্তুররা তো আহ্লাদে আটখানা। এই বোনকে কোলে করছে, এই বোনকে দোল দিচ্ছে, এই খেলা দিচ্ছে, এই ঝিনুকে করে দুধ খাওয়াচ্ছে। যেন জ্যান্ত একটা পুতুল পেয়েছে ছয় ভাই। রানির এখন সবদিক থেকেই মজা। ছেলেরা বোনকে ছেড়ে নড়তেই চায় না। রাজাও ঘুরে ঘুরে অন্তঃপুরে উঁকি দিয়ে ইচ্ছামতীর চাঁদপানা মুখের জ্যোৎস্নার মতন হাসিটুকুনি দেখে যান। মেয়ে এত শান্ত এতই লক্ষ্মী যে একদিনও কাঁদেনি। রাজবাড়িতে যে একটা বাচ্চা হয়েছে, কাকপক্ষীতে টের পাওয়ার উপায় নেই। কন্যে চ্যাঁ-ফোঁ-টি করেনি একদিনও। কেবলই ফিকফিক করে ফোকলা গালের মন ভোলানো হাসি। রানিমা বললেন, 'ও মনভোলানী, ও চোখজুড়োনী, ও বুকভরুনী, তুই একদিনও মা বলচিস না, বাবা বলচিস না—তোর ব্যাপারটা কী বল দিকিনি? তোর দাদারা ক-বে বা-ব্বা-ব্বা, মা-ম্মা-ম্মা, দা-দ্দা-দ্দা, এই সব বড় বড় কথাবার্তা বলতে শিখেছিল। তুই কেবলই ফিকফিক আর ঝিকমিক?'

মেয়ে ইদিকে চাঁদের কলার মতন বাড়ছে। ভুরু গজাল, দাঁত উঠল, পা ছুটল, হাওয়ায় দোলা মাধবীলতার ডালের মতন হেলে-হেলে দুলে-দুলে নুয়ে-নুয়ে মেয়ে ঘুরতে লাগল বাড়িময়, 'ধর-ধর' 'গেল-গেল' রবে রাজবাড়ি মাত হল। মেয়ের চাঁদমুখ ভরতি জ্যোছনাপারা হাসি, কিন্তু রা নেই। এমনকী খিলখিলিয়ে শব্দ করে হাসে না পর্যন্ত। মেয়ে কোনও শব্দই করে না, না কান্নার, না হাসির। কোথাও চোট পেলে ঝরঝর করে চোখ থেকে জল পড়ে, তখন বাড়িসুদ্ধ লোকেরই চোখ ভরে জল আসে, মেয়ের কিন্তু মুখে কোনও আওয়াজ বেরোয় না। যতই লাগুক।

রানিমা এবার রাজবৈদ্যকে ডাকলেন।—'ব্যাপারটা কী?' রাজবৈদ্য কন্যের নাড়ি টিপলেন। চোখ বুজে, মুখ ভেটকে, কান খুঁটতে খুঁটতে অনেকক্ষণ কীসব ভাবলেন। তারপর পেট টিপলেন। তারপর পিঠে টোকা মারলেন। তারপর হাঁ করিয়ে লাল টুকটুকে জিবটুকু টেনে ধরলেন। এপাশ ফিরিয়ে এক কান দেখলেন, ওপাশ ফিরিয়ে অন্য কানটা দেখলেন। বুকের ওপরে কান পেতে ধুকপুকুনি শুনলেন। চোখের পাতা টেনে দেখলেন। নাকের ফুটো

ফাঁক করে দেখলেন। পায়ের তলায় টোকা দিলেন, হাঁটুতে গুঁতো দিলেন। মাথায় গাঁট্টা মারলেন। এবারে রানি বললেন, 'থাক! হয়েচে! আর দেখে কাজ নেই!' রাজবৈদ্য মাথা চুলকোতে চুলকোতে উঠে চলে গেলেন।

রাজা মুখখানা গরম ভাতের হাঁড়ির মতন করে এসে বললেন, 'রানি! বদ্যিমশাই বললেন মেয়ের কোনওই দোষ পাচ্চেন না। মেয়ে বোধ হয় বোবা।' রানি ডুকরে কেঁদে ঠাকুরঘরে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। কিন্তু শিবঠাকুর তখন সে ঘরে ছিলেন না, তাই দেখতে পেলেন না। ইচ্ছামতী রাজকন্যে চাঁপাফুলের মতন সুন্দরী হয়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। তার কটা চোখ ঘন কালো হয়ে এল, ভ্রমর কালো, ঘন পাপড়ির ছায়াতে—তার সোনার বর্ণ কেশ ক্রমে মেঘবর্ণ হয়ে এল তেলে-জলে-রোদে, ধূপের ধোঁয়ায়। তার ঠোঁটদুটি ডালিমের ফুলের মতন লাল,গাল দুখানি যেন ফোটা গোলাপফুল। ইচ্ছামতী খুব কাজের মেয়ে। মার সঙ্গে বসে তিনখানা মেরজাইতে বোতাম লাগায়। তিনটি উত্তরীয় রিপু করে, তিনজোড়া নাগরা রোদে দেয়। মার সব কাজ আধখানা করে মেয়ে করে দেয়। মা কেবল ছয় ছেলের মালা ছ'খানি নিজের হাতেই গাঁথেন, মেয়ে ফুল তুলে দেয় ছ'সাজি। শিবঠাকুরের ফুল রানি নিজে তোলেন, মালা নিজে গাঁথেন। কন্যেও ছোট্ট একটা সোনার সাজি ভরে শিবঠাকুরের জন্যে ফুল তুলে, মালা গেঁথে মার দেখাদেখি ঠাকুরকে পরিয়ে দেয়। রানির মনের সাধ মিটেছে। কাজও কমেছে, মেয়েটি কাছে কাছেও থাকে সারাদিন সারাক্ষণ। কিন্তু রানির দীর্ঘনিশ্বেস আর ফুরোল না। মেয়ে এত কাজ করে, এত হাসে, এত ছুটোছুটি খেলা করে, চিতল হরিণের ছানাদের সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দেয় রাজবাড়ির খিড়কিবাগানের সবুজ মাঠে—কিন্তু একটি শব্দও করে না মুখ দিয়ে। রানি দেখেন, দেখেন, আর তাঁর পাঁজরা ভেদ করে, হাড়মাস কাঁপিয়ে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে। এ-কন্যেকে কার হাতে দেবেন? এত রূপ, এত গুণ, অথচ! বিয়ে তো করতে চাইবে অনেকেই, রাজার মেয়ে বলে, রাজার ধনসম্পদের লোভে। কিন্তু তেমন জামাই তো রানি চান না। রানি চান এমন জামাই যে তাঁর ইচ্ছারানি সোনামণিকেই চাইবে। রাজার টাকা নয়। তেমন সোনার ছেলে কি ভূ-ভারতে আছে? তাঁর অবোলা মেয়ে, শরীর মনের কষ্টের কথা কাউকে বলতে পারে না, শুধু হাপুস নয়নে জল পড়ে। অবোলা প্রাণীর মতন অসহায়। এমন মেয়েকে কার হাতে দেবেন? যদি সে যত্ন না করে? ভালো না বাসে? নাঃ, রানি ঠিক করলেন, তার চেয়ে বিয়ে না দেওয়াই ভালো। ছয় ভাই যক্ষের ধনের মতো প্রাণ দিয়ে আগলে রাখবে তাদের নয়নের মণি বোনটিকে। রানি ভাবলেন, থাক, মেয়ে আমার ঘরেই থাক। শিবের পুজো নিয়ে, মন্দিরের সেবাদাসী হয়েই ও জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারবে। ঘরসংসার কি সকলের জন্যে?

মনকে যাই বোঝান, রানির মনে কিন্তু শান্তি ছিল না। রাজা বুড়ো হয়েছেন, রানিও বুড়ি হচ্ছেন। ছেলেরা যতই বোনকে ভালোবাসুক, বউ এলে কি এতটা বাসবে? কেমন সব বউ আসবে কে জানে? এত ভাবতে ভাবতে রানি খুব অসুখে পড়লেন। রাজবৈদ্য এলেন। কত পাঁচন, কত বড়ি, কত হীরকচূর্ণ, স্বর্ণভস্ম মধু দিয়ে মেড়ে খাওয়ানো হল—রানির রোগ আর সারে না। এদিকে শিবঠাকুর দেখলেন দুটোর বদলে আবার একটা করে

মালা পাচ্ছেন রাজবাড়িতে। 'ব্যাপারখানা কী? জানতে হয়।' শিবঠাকুর তো তড়িঘড়ি রাজবাড়ির মন্দিরে গেলেন। গিয়ে দেখেন কেউ কোথাও নেই। শুধু শ্বেতপাথরের থালায় একটি মালা। কী সুন্দর গাঁমুনি তার। বেলপাতার গায়ে গায়ে আকন্দ ফুল, ধুতরো ফুল, আর কুন্দফুল বসিয়ে গাঁথা রত্নহারের মতন মালাটি শিবঠাকুর গলায় পরে নিলেন। আর মনে মনে মালাকরকে আশীর্বাদ করলেন, 'চিরসুখী হও। সব সাধ-আহ্লাদ মিটুক তোমার।' মালাটি ইচ্ছামতী রাজকন্যে গেঁথেছিল। রানি তো অসুস্থ। আর ফুল তুলতে যেতে পারেন না, মালাও গাঁথা হয় না। রাজকন্যের মনে তখন একটিই প্রধান সাধ ছিল—'হে ঠাকুর, আমার মায়ের অসুখ সারিয়ে দাও।' শিবের বরে অমনি রানির অসুখ সেরে গেল। রানি যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন। সেরে উঠেও রানির মনে কষ্ট যায় না। তিনি তো আর জানেন না শিবঠাকুর ইচ্ছামতীকে 'চিরসুখী হও' বর দিয়েছেন! একদিন ঘোর বর্ষা, প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কড়কড় শব্দে বাজ পড়ছে।

রাজকন্যা ইচ্ছামতীর খুব ভয় করল। সে দৌড়ে এসে মার কোলটি ঘেঁষে বসল। কিন্তু বাজের আওয়াজের মধ্যে রানি যেন শুনতে পেলেন দৈববাণী হল—'মেয়েকে যদি কথা কওয়াতে চাও, তা হলে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো। শিবতীর্থে যাও।' রানিমা তক্ষুনি উঠে পড়লেন। গোছাভরা চুল উঁচু করে তুলে, পঞ্চাশ কাঁটা গুঁজে খোঁপা করে বাঁধলেন। লালপাড় শাড়িখানি তিনপাকে কোমরে জড়ালেন। একটা মুক্তোর বাঁট দেওয়া ইস্পাতের বাঁকানো ছোরা লুকিয়ে গুঁজে নিলেন বুকের মধ্যে। মেয়েকে বললেন, 'ইচ্ছামতী, আমি শিবতীর্থে পুজো দিতে চললুম। তুমি বাবা-দাদাদের দেখো। আমি ঠিক আবার ফিরে আসব। ভয় পেয়ো না। যদি খুব বেশি মন কেমন করে, এই রুপোর বাটিতে জল ভরে, তার মধ্যে তাকিয়ো, আমাকে দেখতে পাবে। কিন্তু যতবার করে দেখবে, ততদিন করে আমার আয়ু কমে যাবে।'

একেই ঝড় জল বজ্রবিদ্যুৎ, তার মা কোথায় চললেন, যে-মা নাকি জীবনেও বাগানের ওপারে পা দেন না; ইচ্ছামতী ভয়ে কেঁদে ফেললে। নিঃশব্দে চোখের জল ঝরতে লাগল। মেয়ের সেই কষ্ট দেখে রানিমার মনের ইচ্ছে আরও জোর পেল। রানিমা আর মুহূর্তমাত্র দেরি করলেন না।

বজ্রবিদ্যুতের মধ্যে রানিমা তো পথে বেরুলেন। পায়ের আলতা ধুয়ে গেল, কপালের কুঙ্কুম ধুয়ে গেল, সিঁথির সিঁদুর লেপটে গেল, রানির ভ্রূক্ষেপ নেই। পায়ে বুঝি কী ফুটল, কাঁটা না কাঁকর, রানি চেয়েও দেখলেন না। তাঁর যে ঝড়জলের মধ্যেই গিয়ে শিবতীর্থে পৌঁছুনো চাই। রাজার বউ, রাজার মেয়ে, তিনি কোনওদিন পথ চলেননি, পথ চেনেন না। কিন্তু ছয় বীরের মা তিনি, তাঁর প্রাণে ভয়-ডর বলে কিছু নেই। রানি রাজপথ বেয়ে নাকের সোজা চললেন। চলতে, চলতে, চলতে, রাজপথ এসে হাটের পথে মিশল। হাটের পথ এসে বনের পথে মিশল। রানি ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। অরণ্যে ঢুকে দেখেন সেখানে বৃষ্টি পড়ছে না! এতই ঘন গাছপালার ছাদ সেখানে, যে নীচটা খটখটে শুকনো। রানি যেন বাঁচলেন। অঙ্গের বসন ভিজে সপসপ, মাথার কেশ ভিজে সপসপ, হাতের আঙুল পায়ের আঙুল ভিজে সাদা হয়ে কেমন চুপসে গেছে।

রানি একটি গাছের নীচে পা ছড়িয়ে বসলেন। পঞ্চাশ কাঁটার খোঁপাটি খুললেন। ভিজে চুল এলোমেলো। নেড়ে নেড়ে শুকোনোর চেষ্টা করছেন, হঠাৎ দেখেন পাশেই দুটো সুন্দর নীলপাথর পড়ে আছে। রানি যেই পাথরদুটো তুলেছেন অমনি ঠোকাঠুকিতে আগুন জ্বলে গেল। রানি বুঝলেন, এগুলো চকমকি পাথর। উনি শুকনো কাঠকুঠো জড়ো করে আগুন জ্বাললেন। হাত সেঁকলেন, পা সেঁকলেন, চুল শুকোলেন, পরনের কাপড়খানি পরনেই শুকোল। রানি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রানি স্বপ্ন দেখলেন একটি স্ফটিকের গাছ। তাতে তিনটি বড় বড় চোখের মতন পাতা—যেন শিবঠাকুরের ত্রিনয়ন! একটি পাতা সোনার, একটি পাতা রুপোর, একটি পাতা তামার। প্রত্যেক পাতার গোড়ায় মণিমাণিক্যের ফল ধরে আছে, আর গাছের ঠিক ডগায় একটি পারিজাত ফুল দুলছে। সেই গাছের পিছনে সোনার থালার মতন লাল সূর্য উঠছেন।—রানির ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চারিদিকে চেয়ে দেখেন গহন বন। স্ফটিকের বৃক্ষটি কোথাও দেখতে পেলেন না। রানি আবার শক্ত করে খোঁপা বাঁধলেন। পরনের কাপড়ে কোমর বাঁধলেন। বুকে ছোরাটি ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়ে ফের চলতে শুরু করলেন। ননীর পা-দুটি ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে। পথ চলা তো অভ্যেস নেই! কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই রানিমার। চলতে চলতে বন ফুরিয়ে গেল। সামনে পড়ল বিরাট এক নদী। রানিমা নদীর পাড় ধরে পুবমুখো চলতে লাগলেন। সূর্যের দিকে মুখ করে। চলতে চলতে রানি দেখেন একটা বটগাছের নীচে একটি চড়াই পাখির ছানা। আহা! বুঝি ঝড়ের মধ্যে বাসা ভেঙে পড়ে গিয়েছে! রানিমা নীচু হয়ে আলতো করে আঁচল জড়িয়ে ছানাটিকে বুকে তুলে নিলেন। এদিক ওদিক চেয়ে বাসা দেখতে পেলেন না। চড়াই মা-বাপেরও টিকির খোঁজ নেই! কী আর করেন। মাটিতে পড়ে থাকলে শেয়ালে খাবে, চিলে নেবে। রানি চড়াইছানা বুকে করেই পথ চলতে লাগলেন। হঠাৎ পথ আটকে সামনে এক বিরাট পাঁচিল পড়ল। রানি কী করেন? তিনি তো পাঁচিল ডিঙুতে জানেন না? তিনি বসে পড়লেন। ভাবতে বসলেন কী করা? এমন সময় দেখেন নদীর ঘাটে সোনার নৌকো বাঁধা, আর একটি পাতার ভেলা ঠেসান দেওয়া। রানি ভাবলেন সোনার নৌকোটি নিলে যার নৌকো সে ভাববে চোরে চুরি করেছে, পাতার ভেলাটি নিলে যার ভেলা সে বুঝবে কেউ পার হয়েছে। সে আরেকটি গড়েও নিতে পারবে।

রানি ভেলায় চড়লেন। পা দেবামাত্র পাতার ভেলা সোনার নৌকো হয়ে শোঁ করে রানিকে ওপারে নিয়ে গেল। পৌঁছেই রানি দেখেন এক প্রাসাদের সিংদরজা। রানি কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে গেল। রানি ঢুকতেই এক ইয়াব্বড় সিংহ এসে বললে : হালুম! রানি অমন কত সিংহ দেখেছেন রাজবাড়িতে। সিংহাসনে সিংহ, সিংহ-দরজায় সিংহ, খাটের পায়াতেও সিংহ। এমনকী তাঁর ছোরার বাঁটেও একটি মুক্তোর সিংহ আছে। রানি হেসে বললেন—'সিংহমশাই, নমস্কার।' সিংহ তো অবাক। তাকে দেখে ভয় না পেয়ে নমস্কার করছে, এ কোন জীব? সে বললে, 'হালুম! তুমি কে?' রানি বললেন, 'আমি রাজার মেয়ে, রাজার বউ, ছয় রাজপুত্তুর আর ইচ্ছামতীর মা।' সিংহ বললে, 'তোমাকে খাব।' রানি বললেন, 'তা খেয়ো'খন, তবে এখন নয়। এখন আমার কাজ আছে। তাছাড়া আমাকেই

বা খাবে কেন? তোমার দেশে কি খাবারদাবার নেই? দুর্ভিক্ষ লেগেছে? অতিথি এলে তাদের ধরে খাবে?' সিংহ এবার লজ্জা পেয়ে বললে, 'তা নয়। তবে আমাদের ধাতই এই, জন্তু-জানোয়ার, মানুষ-টানুষ পেলেই আমরা খাই। তা ঠিক আছে। তোমায় খাব না, তোমার কোলের ওই চড়াইখানাটা দাও। ওকে দিয়েই জলখাবারটা সারি।' রানিমা বললেন, 'ছিঃ! এত বড় সিংহী হয়ে এই তোমার বুদ্ধি? এতটুকুন একরত্তি চড়াইছানা, একদানা মটরও নয় সে তোমার মুখে। ওকে না-খেয়ে তুমি বরং আমাকেই খেয়ো। কিন্তু এখন নয়। মেয়েকে কথা দিয়েছি আমি ফিরে যাব। কথা যদি ভঙ্গ করি সে পাপ কিন্তু তোমাকেই লাগবে বলে দিচ্ছি।' সিংহ বললে, 'আচ্ছা জ্বালালে তো তুমি রাজার বউ? কী চাও, কোন কাজে যাচ্ছ তুমি? তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো দিকি, যাতে তোমাকে খেতে পারি।' রানি বললেন, 'আমি শিবতীর্থে যাচ্ছি।' শুনেই সিংহ সঙ্গে সঙ্গে পাথর হয়ে গেল। তার লোভ হিংসে সব জুড়িয়ে গেল। সে পাথরের কেশর ফুলিয়ে রাজবাগানের শোভা হয়ে গেল।

রানি পথ চললেন। বাগানের মাঝখানে এসে দেখেন একশো আটটি শিবমন্দির। কিন্তু প্রত্যেকটির দরজা বন্ধ। রানিমা কত ঠেললেন। দরজা খুলল না, তখন রানিমা আর কী করেন, ওখানেই শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে অঝোর নয়নে কাঁদতে লাগলেন। রানিমার চোখের জলে একটি ঝিরঝিরে নদী বইল। সেই নদীতে ছোট্ট ছোট্ট লাল সোনালি মাছেরা খেলতে লাগল রাজবাগানের ফোয়ারা থেকে উঠে এসে। রানির কান্না আর থামে না। কত রাত হয়, ভোর হয়, ফের রাত্তির হয়ে যায়। এমন সময়ে রানিমা যেন আধোঘুমে আধো জাগরণে শুনতে পেলেন একটি ছোট্ট লালমাছ কথা কইছে। সে বলছে সোনালি মাছকে, "রানি পারিজাত ফুল আনেননি, দরজা তো খুলবেই না।' সোনালি মাছ বললে, 'অথচ দ্যাখো, এই খিড়কি বাগানেই তো গাছ?' রানিমা উঠে পড়লেন। আঁচলে চোখ মুছলেন, চড়াইছানাকে বুকে নিয়ে খিড়কির দিকে চললেন।

এমন সময়ে এক বিশাল দৈত্য এসে বললে, 'কে যায়?' রানিমা বললেন, 'রানি যান।' দৈত্য বললে, 'কোন রানি?' রানিমা বললেন, 'ছয় রাজপুত্তুর, ইচ্ছামতীর মা, মহারানি।' দৈত্য বললে, 'কোথায় যাও?' 'শিবতীর্থের জন্য পারিজাত ফুল তুলতে।' শুনেই দৈত্য বললে, 'মা, পেন্নাম হই।" বলে যেই নীচু হয়েছে, রানিমা দেখেন একটা তালগাছ। যেন ঝড়ে নুয়ে পড়েছে। ঝাঁকড়া মাথাটি মাটি ছুঁয়ে রয়েছে। দৈত্য তো তালগাছ হয়ে রইল, রানি চললেন। একটু বাদেই দেখেন খিড়কি বাগানের দোর। ছোঁবামাত্র দোর খুলে গেল। ঢুকে দেখেন সবজিখেতের মাঝখানে—ও কী? ওঁর সেই স্বপ্নে দেখা স্ফটিকের বৃক্ষ। তার তিনদিকে ত্রিনয়নের মতো তিনটি পাতা। সোনার, রুপোর, তামার। পাতার নীচে নীচে মণিমাণিক্যের ফল। গাছের ডগায় পারিজাতের ফুলটি হাওয়ায় হেলছে, দুলছে। তার গন্ধে পবন মদির। কিন্তু গাছটি দশতলা বাড়ির সমানে উঁচু। রানি ছোট্টখাট্ট মানুষটি, গাছে চড়তেও জানেন না, মইও নেই। কী করেন? গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসবেন, এমন সময়ে চড়াইছানা বলে উঠল, 'মা, তুমি মিছেই ভাবনা করো, আমি এনে দিচ্ছি পারিজাতের ফুল।' কচি কচি ডানা মেলে চড়াইছানা উড়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ঠোঁটে করে এনে দিলে দেবদুর্লভ পারিজাতের কলি। রানি গাছের দিকে চেয়ে দেখেন, ওমা! আবার একটি কুঁড়ি ফুটেছে

সঙ্গে সঙ্গেই। স্ফটিকবৃক্ষ কখনও ফুল-ছাড়া থাকে না।

রানিমা চড়াইছানাকে বুকে জড়িয়ে কত আদর করলেন, তারপর শূন্যে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি যখন উড়তে শিখেই গেছ, তখন তোমার আর ভয় নেই। তুমি নিজের মনে স্বাধীনভাবে বাঁচো এবার।' চড়াই বললে, 'মা, আমি তোমার ছেলে। মনে মনে আমাকে ডাকলেই আমি তোমার কাছে চলে আসব।' রানি বললেন, 'আচ্ছা।' তারপর পারিজাতপুষ্প নিয়ে মন্দিরে গেলেন। আগে চোখের জলের ঝরনা নদীতে স্নান করে নিলেন, চুল এলিয়ে ভিজে কাপড়ে যেই গিয়ে মন্দিরের দোরের সামনে দাঁড়ানো অমনি একশো আট দরজা একসঙ্গে খুলে গেল। শাঁখ বেজে উঠল, ঘন্টা বেজে উঠল, দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন। রানিমার হাতের এক পারিজাত একশো আট পারিজাত হয়ে গেল। রানিমা চোখের জলে শিবতীর্থের পুজো দিলেন।

ওদিকে রাজবাড়িতে হাহাকার পড়ে গেছে। রানিমা নেই। সবাই বলছে, খোঁজ খোঁজ। ছয় পুত্তুরকে নিয়ে রাজা বেরিয়ে পড়েছেন। ইচ্ছামতী বেচারা সব জানে, অথচ কিছুই বলতে পারছে না, তার যে ভাষা নেই। ভাইদের হাত ধরে যেতে মানা করলে, বাবাকে পায়ে পড়ে যেতে মানা করলে। তাঁরা কেউ তার নীরব কথা শুনলেন না। সাত ঘোড়া ছুটিয়ে সাতজনে ঠিকরে চলে গেলেন ইচ্ছামতীকে একা ফেলে।

ইচ্ছামতী একা একা কাঁদে। বাগানে বেড়ায়। ফুল তোলে। মালা গাঁথে। শিবঠাকুরকে পরায়। আর মনে মনে বলে, 'ঠাকুর, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, বাবাকে ফিরিয়ে দাও, দাদাদের ফিরিয়ে দাও।' একদিন, দুদিন, সাতদিন যায়। কেউই ফেরে না।

রাজার সঙ্গে রাজপুত্তুররা বন পেরিয়ে নদীর ধারে এল। নদীর পাড় দিয়ে পাঁচিলের কিনারে এল। দ্যাখে সোনার নৌকো সাতখানি, পাতার ভেলা সাতটি। তাঁরা রাজা, রাজপুত্তুর, জীবনে পাতার ভেলায় পা দেননি। কিছু না-ভেবেই সোনার নৌকোয় চড়লেন, অমনি সোনার নৌকো পাতার ভেলা হয়ে ঘোড়া-টোড়া সুদ্ধু ভেসে যেতে লাগল স্রোতের টানে। রাজা-রাজপুত্তুররা কী করেন। সাঁতার কেটে পাড়ে এসে উঠলেন। উঠেই দেখেন সাত সিংহ! দেখেই তাঁরা ধনুকে তির জুড়লেন। সাত সিংহ আকাশপাতাল হাঁ করে সাতখানা তির গিলে ফেললে। এমনি করে রাজা আর রাজপুত্তুরদের সব তির নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তরোয়াল ঘুরিয়ে তাঁরা সিংহদের মাথা কাটতে গেলেন। অমনি সাত সিংহের সত্তরটা মাথা গজিয়ে উঠল। রাজা আর রাজপুত্তুররা সত্তর মাথাই কেটে ফেললেন। মাটিতে রক্তগঙ্গা বইতে লাগল। এমনি সময়ে হঠাৎ আবির্ভাব হল এক বিশাল দৈত্যের। দৈত্য এসে রাজাকে বললে, 'তুমি বন্দি। তোমার ছেলেরাও বন্দি। কেন আমার পোষা সিংহের গলা মিছিমিছি কেটেছ? তারা তো তোমাদের কিছুই বলেনি?' রাজা ভাবলেন, 'তাই তো? সিংহরা তো সত্যিই আক্রমণ করেনি? ওদের দেখবামাত্র আমরাই তীর ছুঁড়েছি আগে ভাগে।' রাজা মুখে বললেন, 'আমরা রাজা। মৃগয়া আমাদের স্বভাব, স্বধর্ম। সিংহ মেরে আমরা ধর্মচ্যুত হইনি। তবে একথা সত্যি যে, তোমার সিংহরা আমাদের কিছু বলেনি। কিন্তু আমরা বুঝব কী করে যে তারা আমাদের খেয়ে ফেলবে না?' দৈত্য বললে 'বেশ। আমি দৈত্য। তোমাদের যদি খাই, তা হলে আমিও স্বধর্মচ্যুত হব না। অতএব আমি তোমাদের খাব।' বলেই ছোট

রাজপুত্তুরকে দু'আঙুলে ধরে টপ করে গিলে ফেললে। রাজা তরোয়াল ঘোরালেন। দৈত্যের লোহার শরীরে লেগে তরওয়াল শত টুকরো হয়ে গেল। দৈত্য একে একে ছয় রাজপুত্তুরকে লঞ্জেঞ্চুশের মতন গিলে ফেললে রাজার চোখের সামনে। তারপর রাজাকে বললে, 'যাও, তোমার যেদিকে খুশি।' রাজা যাবেন কি? তাঁর বুকের পাঁজর, চোখের মণি, ধমনির রক্ত ছয় ছেলে দৈত্যের পেটে! রাজা হাহাকার করে মাটিতে আছড়ে পড়লেন। চোখের জলে বুক ভেসে যেতে লাগল। পাথর গলে যেতে লাগল।

ওদিকে রানিও ফেরেন না, রাজাও ফেরেন না। ইচ্ছামতীর খুব মন খারাপ করলেও সে এতদিন রুপোর বাটিতে জল ভরেনি। শেষে যখন খুব কষ্ট হতে লাগল, একদিন শিবঠাকুরের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বাটিতে জল ভরে বললে, 'ঠাকুর, মায়ের একদিনের আয়ু তুমি বাড়িয়ে দিয়ো।' বলে জলের দিকে চাইলে। চেয়ে দ্যাখে, তার মা, এলোচুলে, একশো আট মন্দিরে পুজো দিয়ে হাসি হাসি মুখে বেরুচ্ছেন। দেখেই তার খুব আনন্দ হল, সে ডেকে উঠল, 'মা!'

রাজবাড়ির দাসী সেখানে আপনমনে পুজোর জোগাড় দিচ্ছিল। চমকে উঠল। ইচ্ছামতীর স্বর ফুটেছে! ইচ্ছামতীর মুখ দিয়ে শব্দ বেরিয়েছে—মা! বাঁশির মতন মধুর স্বরে ইচ্ছামতী ডেকে উঠেছে—মা! রাজবাড়িতে কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল, নহবতখানায় শানাই বাজল, সেনাপতি, মন্ত্রী, সেপাই, সান্ত্রী, দাসদাসীরা, প্রজারা সক্কলে আনন্দে নেচে উঠল—রাজকন্যে ইচ্ছামতী কথা কয়েছে—

অথৈ কান্নার মধ্যে রাজা যেন হঠাৎ শুনতে পেলেন, বাঁশির মতো গলায় কে তাঁকে ডাকছে, 'মা! মাগো!'

রানিমার পা ছুটে উঠল, মন নেচে উঠল। তিনি দৌড়ে বেরুলেন। পথে নোয়ানো তালগাছের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'দৈত্য, আমি যাই বাবা, আমায় মেয়ে ডাকছে!' অমনি সটান খাড়া হয়ে জেগে উঠল দৈত্য, বললে, 'পেন্নাম হই রানিমা।' বলে রানির সঙ্গে সঙ্গে সেও চললে। রানি দরজায় এসে পাথরের সিংহের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সিংহীমশাই, আমি চলি। আমার মেয়ে ডাকছে। তুমি আমায় না খেয়ে বরং চলো আমার সঙ্গে রাজভোগ খাবে।' সিংহ অমনি গা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠে, কেশর ফুলিয়ে বললে, 'তাই খাব।' বেরিয়েই রানি দেখেন, কী কাণ্ড! রাজা যে! ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন! পাশে সত্তরটা সিংহের মুণ্ডু। রাজাকে দেখে রানি অমনি তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে ফেললেন—

'ও কী মহারাজ! ওঠো ওঠো।' মহারাজ শুনলেন—রানির গলা। অমনি উঠে পড়লেন। রানির গলা ধরে সবখানি দুঃখের কাহিনি বললেন। রানি তখন মালা গাঁথার ছুঁচসুতো মন্দির থেকে নিয়ে এলেন, সত্তরটি মাথা সাতটি সিংহের শরীরে যত্ন করে সেলাই করে দিলেন। ৩ ।নে সত্তর মাথা সাতটি মাথা হয়ে গেল, সাত সিংহ 'হালুম' বলে বললেন, 'রানিমা, হুকুম করো!' রানি বললেন, 'আমার ছেলেদের এনে দাও।' তখন সিংহরা গিয়ে দৈত্যের কাছ থেকে ছয় রাজপুত্তুরকে চেয়ে নিয়ে এল। দৈত্য তার পোষা সিংহদের ফেরত পেয়ে খুব খুশি। তারা আবার মন্দিরের সিংহের ভাই কিনা। আর এই দৈত্য ছিল মন্দিরে

দৈত্যের দাদা। দুই ভাই দৈত্য তখন চারখানা মুঠোর মধ্যে করে দয়ালু রাজা-রানি, ছয় রাজপুত্তুর আর ভেসে যাওয়া সাত ঘোড়াসুদ্ধু সবাইকে রাজপুরীতে ছেড়ে দিয়ে এল। সাতদিনের পথ এক দিনেই নিমেষেই পার হলেন তাঁরা। পৌঁছে দেখেন নহবতখানায় সানাই বাজছে, সিং-দরজায় কাড়ানাকাড়া, মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা, পথে পথে প্রজারা নৃত্য করছে। কী? না—রাজকন্যের বোল ফুটেছে!

আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে রাজারানি প্রাসাদে ঢুকতেই ইচ্ছামতী ছুটে এসে—'মা! বাবা! দাদা!' বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লে। মহারানি বুক থেকে ছোরাটা বের করে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এসব খুন-খারাপির অস্ত্র মানুষের কোনও কাজে লাগে না। ভালোবাসাই হল আসল অস্ত্র। আর চাই সৎ সাহস। তির-ধনুক-তরোয়াল নিয়ে রাজা, রাজপুত্তুররা কী মুশকিলেই না পড়েছিলেন।

মনের সুখে রাজা-রানি পা ছড়িয়ে বাগানে বসলেন মেয়ে কোলে নিয়ে। মেয়ে কলকলিয়ে কত কথাই বলে। কথা যেন ফুরোয় না। রাজা-রানির মনে হচ্ছে যেন বাঁশি বাজছে।

রাজপুত্তুররা মাঠে খেলতে লাগল। আর কোথা থেকে একটা খুদে ধবধবে তুলতুলে খরগোশ এসে কেবলই ইচ্ছামতীর আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল। রানিমা বললেন, 'ওই দ্যাখো, এই অবোলা খরগোশ, এ হোক তোমার সই-বন্ধু।' এমন সময়ে গাছের ওপর থেকে এক চড়াইপাখি ডেকে উঠল, 'মা, আমার রাজভোগ কই?'

আর সিং-দরজায় 'হালুম' হাঁক শোনা গেল, 'মা, আমার রাজভোগ কই?'

রানি বললেন, 'হবে, হবে, সব হবে।' বলে সিংহকে এক কোলে, চড়াইকে এক কোলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চললেন রাজভোগ রাঁধতে। খরগোশ কোলে করে ইন্দিবিন্দির গান গাইতে গাইতে ইচ্ছামতীও চলল মায়ের পিছু পিছু। রাজা বললেন, 'ওরে আমার গড়গড়াটা দিয়ে যা তো!' রাজপুত্তুররা মাঠে বল খেলতে খেলতে ডেকে উঠল, 'মা, খাবার দিয়ে ডেকো কিন্তু। খুব খিদে পেয়েছে।'

আকাশ থেকে শিব-পার্বতী এদের দিকে চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসলেন।
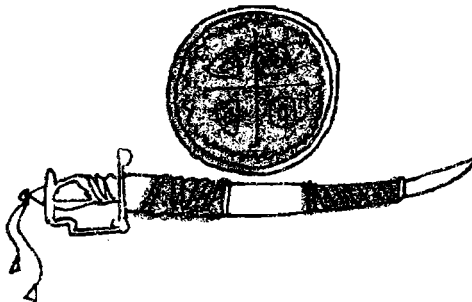
রূপ্সা আর রূপকুমার

রূপ্সাদের গ্রামের শেষ কিনারায় একটা মস্তবড় ইঁদারা ছিল। সেখানে অল্পবয়সি মেয়েরা কেউ যেত না। গেলেই ইঁদারা থেকে ভূত বেরিয়ে তাদের গিলে ফেলবে, এমন একটা ধারণা ছিল। রূপ্সার মা-ঠাকুরদাও কখনও ওদিকে যাননি। নেহাত দরকার হলে ছেলেরা হয়তো গরু-টরু খুঁজতে হলে ওদিকে যেত, নইলে তারাও যেত না, কী দরকার? ইঁদারার ভূতটাতে কেউ কখনও দেখেনি বটে, কিন্তু দশটা গ্রামের লোকে, সক্কলেই বিশ্বাস করত, ওর মধ্যে ভূতের বাসা।

রূপ্সা খুব দস্যি মেয়ে। নানারকম-বইপত্র পড়ে তার ধারণা হয়েছে, ভূত-টুত নেই। সে একদিন ঠিক দুক্কুরবেলা, চুপিচুপি পাঠশালা পালিয়ে, সেই ভূতের ইঁদারার ধারে গিয়ে হাজির হল। একদম একা-একা! কাউকে কিচ্ছুটি না বলে! বললে তো কেউ যেতেই দেবে না। রূপ্সা ইঁদারাতে উঁকি দিল। গোল জলের আয়নায় নিজেরই মুখখানা ভেসে উঠল। টলটল করছে পরিষ্কার জল! ইঁদারার দেয়ালে একটুও শ্যাওলা নেই, একটা আগাছা নেই। রূপ্সা দেখল, বাঃ! ইঁদারার আয়নাতে তাকে কী রূপসীই না দেখাচ্ছে। তাদের বাড়িতে এত বড় আয়নাই নেই।

কিন্তু ভূত কোথায়? ভূত? হঠাৎই রূপ্সার মনে হল জলের মধ্যে তার মুখের ছায়ার পাশে আরেকটা আবছা ভেসে উঠছে। সে চমকে পেছন ফিরে দেখল, কেউ নেই।

একটা গোলাপলতার ডাল ঝুঁকে পড়েছে, তাই ওরকম মনে হয়েছে। কী সাজানো-গোছানো চারধার, যেন কোনও রাজবাড়ির বাগান। শ্বেতপাথরের ইঁদারার চারপাশে বেদি।

যে-ইঁদারার মধ্যে ভূত থাকে, যার ধারেকাছে কেউ যায় না, তবে কেন সে-ইঁদারার চারপাশ এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন? রূপ্সা ভুরু কুঁচকে ভাবে। শুধু কি পরিষ্কার? তার চারদিকে টুকটুকে লাল গোলাপফুলের লতা! গোলাপফুল ঝাড়ে হয়, রূপ্সা দেখেছে। লতানে গোলাপ এই প্রথম। আর কী অপূর্ব তার সুগন্ধ। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনই সুগন্ধী ফুলগুলি। অথচ এটা শীতকাল নয়। গরমকালে গোলাপ ফোটে না। রূপ্সার মাথায় অনেক চুল, ইয়া মোটা তার বিনুনি। সে টুপ করে একটি লাল গোলাপফুল তুলে মাথায় গুঁজেছে।

অমনি যেন ঝম করে সূর্যের ওপরে কেউ একটা ঢাকনা পরিয়ে দিল। দিনদুপুরে যেন শ্রাবণ-মেঘের ছায়া নেমে এল। কোথায় যেন মিষ্টি বাঁশি বেজে উঠল। ফুরফুরে একটা বাতাস দিল, বসন্তকালের সন্ধেবেলার মতন। এপাশ-ওপাশের গাছগুলোয় কোকিল ডেকে উঠল। আর রূপ্সা দেখলে, তার পাশেই একটা ধবধবে সাদাঘোড়া। সোনার জিন পরানো, তার গা থেকে টুপটাপ করে জল ঝড়ে পড়ছে, আর জল থেকে গোলাপফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে কেউ নেই। রূপ্সা একটু ভয় পেয়ে গেল।

এই তবে ভূত!

এই ঘোড়াই তবে ইঁদারার ভূত! হায় রে! এবার? ভূতেই বা কী করবে রূপ্সাকে নিয়ে, আর রূপ্সাই বা কী করবে? সে তো ঘোড়ায় চড়তেও জানে না। ছুটে পালাবে যে, পা দুটোও যেন শ্বেতপাথরের বেঞ্চির মতো গেঁথে গেছে মাটিতে। ভয়ে-কাঁটা রূপসা অন্যমনস্কভাবে মাথা থেকে লাল গোলাপফুলটা খুলে, হাতে করে নাড়াচাড়া করতে লাগল। অমনি কে একজন কথা কয়ে উঠল তার পাশে : 'আমার ফুলে হাত দিয়েছ কেন?'

রূপ্সা ফিরে তাকিয়ে দেখলে, পাশেই অপরূপ সুন্দর একটি ছেলে। তার পরনে নীল রেশমের আর রুপোলি জরির পোশাক, গলায় মুক্তোর মালা। রাজপুত্তুর-টুত্তুর হবে।

'তুমি আবার কোত্থেকে এলে?' ভাবতে-না-ভাবতেই রূপ্সা ভয়ে-কাঁটা। ছেলেটার পোশাক থেকে জল ঝরছে। ঝাঁকড়াচুল ভিজে শপ্‌শপ্‌ করছে। হাতে ঘোড়ার রাশটা ধরা।

ইঁদারার ভূত! তবে ইনিই আসল?

রূপ্সা তো সাহসী মেয়ে? সে ভয় পেলেও ভয় প্রকাশ না করে বললে, 'তোমার ফুল, তা জানব কেমন করে? এ-গ্রামটা আমাদের। এর সব ফুলফল আমাদের। তুমি কে? তোমার দেশ কোথায়?'

'আমি রূপকুমার। এই ইঁদারার মধ্যে আমার বাস। গোলাপালতাটা মোটেই তোমাদের গ্রামের জিনিস নয়। এটা পরিদের ফুলগাছ। এটা আমি নিজে পুঁতেছি। তোমাদের হাতে বাঁচবেই না।'

এত কথাবার্তা ভূতে কইছে, তক্কো করছে, শুনেটুনে তো রূপ্সার ভয় ভেঙে গেল। সে বললে, 'তুমিই ইঁদারার ভূত?'

'ভূত কেন হব? আমি তো পরি-রাজপুত্তুর।'

'তোমায় সবাই ভয় পায় কেন?'

'পরিরা তো ম্যাজিক জানে, তাই।'

'তুমি কি ক্ষতি করো?'

'দ্যাখো রূপ্সা, আমি কোনওদিন কারুর ক্ষতি করিনি। করব কী করে? কারুর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি! গোলাপফুল তুলে তুমি আমাকে ডাকলে, তাই এলুম। আগে কেউ কক্ষনও আমাকে ডাকেনি।'

'তুমি আমার নাম জানো?'

'নইলে পরি কীসের?'

'তুমি কি অঙ্কও জানো?'

'নইলে পরি কীসের?'

'এই খাতার সব অঙ্ক তুমি কষে দিতে পারো?'

'নইলে পরি কীসের?'

'দাও তো দেখি?'

'খুলে দ্যাখো, কষা হয়ে গেছে।'

রূপ্সা খাতা খুলে দ্যাখে, ঠিক তারই নিজের মতন হাতের লেখাতে, সব হোমওয়ার্ক কষা শেষ! রূপ্সা এবার ট্যারা হয়ে গিয়ে বললে, 'বাবাঃ। তোমার নাম তো গুনকুমার হওয়া উচিত। তুমি কি ব্যাখ্যাও লিখতে পারো? আমার বাংলা খাতা...।'

'খুলে দ্যাখো।'

রূপ্সা দ্যাখে, চমৎকার করে ব্যাখ্যা লিখে রেখেছে সে নিজেই। ঠিক বাংলা-স্যারের কথাগুলো।

আহ্লাদে রূপ্সার নাচতে ইচ্ছে করল। 'ওঃ রূপকুমার, তুমি কী ভালো ভূত! খুব ভালো!'

'আমি ভূত নই! পরি-রাজপুত্তুর।'

'পরিরা তো সব মেয়ে হয়। পরি-ছেলে কী করে হবে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাদের রাজপুত্তুররা সব ছেলে।'

'কোথা থেকে পেল পরিরা রাজপুত্তুরদের?'

এবারে রূপকুমারের মুখটা মলিন হয়ে যায়। সে বলে, 'দুষ্টু পরিরা চুরি করে আনে। যে-সব বাচ্চা ছেলে অবাধ্য, মায়ের কথা শোনে না, পরিরা তাদের চুরি করে এনে রাজপুত্তুর বানিয়ে পরির দেশে বন্দি করে রাখে।'

'তোমাকেও চুরি করেছে। তুমি দুষ্টু ছেলে ছিলে?'

'হ্যাঁ। বাগুইআটি থেকে। ভীষণ দুষ্টু ছিলুম তো!'

আস্তে-আস্তে রূপ্সার সঙ্গে রূপকুমারের খুব ভাব হয়ে গেল। রোজই রূপ্সা পালিয়ে এসে, গোলাপফুল তুলে রূপকুমারকে ডাকে। রূপকুমারের সঙ্গে গল্প করে, আর হোমওয়ার্ক আপনি-আপনি হয়ে যায়। এমনি করেই একদিন রূপ্সার ইসকুল পাশ করে কলেজে যাওয়ার বয়েস হয়ে গেল। রূপ্সার বাবা বললেন ওর মাকে ডেকে ঃ 'নাঃ, রুপুর এবার বিয়ে দেব। পাত্র দেখি!'

তখন রূপ্সা বললে, 'কিন্তু বাবা, আমি তো মানুষকে বিয়ে করব না, আমি একজন পরি-রাজপুত্তুরকে বিয়ে করব ঠিক করে ফেলেছি যে! সে আমার হোমওয়ার্ক করে দেয়, কত গল্প বলে!'

বাবা শুনে আঁতকে উঠলেন। পাগল নাকি? রুপুর যে পড়তে পড়তে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে! এই গ্রামে পরি-রাজপুত্তুর বলে কিছু আছে? না ত্রিভুবনেই আছে? বাবা মাকে বললেন। মা দিদিমাকে। দিদিমা ঠাকুমাকে। ঠাকুমা পিসিমাকে। গ্রামসুদ্ধু জেনে গেল, রুপুর মাথা খারাপ হয়েছে, সে বলেছে পরি-রাজপুত্তুরকে ছাড়া বিয়ে করবে না। আহা, বেচারা। ওকে বরং মহাভৃঙ্গরাজতৈল মালিশ করে দেখা যাক।

রূপসা ছুটে গেল ইঁদারার ধারে। একটিমাত্র গোলাপফুল ফুটে আছে। সেটাই ছিঁড়ে নিল। বর্ষাকাল। বর্ষাকাল। ফুল ঝরে যায়।

'কী রূপ্সা?'

'বাবা আমার বিয়ে দেবেন। আমি বলেছি তোমাকে বিয়ে করব। গাঁ-সুদ্ধু লোকই আমাকে পাগল মনে করছে। তুমি চলো, তাদের দেখা দেবে।'

'সে তো হয় না রূপ্সা। যে ফুল তুলেছে, কেবল সেই-ই আমাকে দেখতে পায়।'

'তুমি আমাকে বিয়ে করবে না?'

'নিশ্চয়ই করতুম, যদি আবার মানুষ হতে পারতুম, রূপ্সা। তুমি তো ইঁদারার মধ্যে থাকতে পারবে না, মরে যাবে। আমিও বেশিক্ষণ রোদে-বাতাসে থাকলে মরে যাব। দুজনের আয়ু দু'জাতের যে। মিল হবে কেমন করে?'

'তবে? তুমি কি আর মানুষ হতে পারো না?'

'পারি, একমাত্র উপায় যদি তুমি ঝুলনপূর্ণিমার রাত্রে এখানে আসো। পরশু ঝুলনপূর্ণিমা। এই সব গাছেগাছে ফুলের দোলনা ঝুলবে। পরিরা দুলবে। পরি-রাজপুত্তুরেরাও দুলবে। তুমি আমাকে টেনে যদি দোলনা থেকে নামিয়ে নিতে পারো, তবে আমি আবার মানুষ হয়ে যাব।'

'এ আর এমনকী? কিন্তু তোমাকে চিনবে কেমন করে?'

'আমার দোলনার পাশে আমার সাদা ঘোড়াটা বাঁধা থাকবে। অন্যদের ঘোড়ার অন্য-অন্য রং। কিন্তু নামালেই তো হল না। যেই টেনে নেবে অমনি পরি-রানি টের পেয়ে আমাকে তাঁর ম্যাজিকে নানারকম জীবজন্তুতে বদলে ফেলবেন। ভয়ে যাতে তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু ছেড়ে দিলে হবে না, ছেড়ে দিলেই উনি ধরে ফেলবেন, আর মুক্তি হবে না। কোনওদিনও।'

'না, না, রূপকুমার, আমি কক্ষনও ছাড়ব না।'

'যদি সিংহ করে দেয়? নোখ-দাঁতে তোমায় ছিঁড়ি?'

'ছাড়ব না।'

'যদি আরশোল্লা করে দেয়? কুরকুরিয়ে হাঁটব তোমার মুখের ওপর?'

'ছাড়ব না।'

'যদি লাল-টকটকে গরম লোহা করে দেয়? হাত পুড়িয়ে দিই? মাংস উঠে যায়?'

'ছাড়ব না।'

'বেশ। তা হলে এটা মনে রেখো। সবশেষে এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা করে দেবে। তুমি সেটা ছুঁড়ে ইঁদারায় ফেলে দিয়ো। তা হলেই আমি বেরিয়ে আসব। তখন তোমার আঁচলে আমাকে ঢেকে নিয়ো। যেন পরি-রানি দেখতে না পায়।'

'তাই হবে।'

'তা হলে পরশু ঝুলনপূর্ণিমার রাত্রে রাত দুই প্রহরে?'

'দেখা হবে।'

রূপসা তার পরদিন খুব লক্ষ্মী হয়ে রইল। আর পরি-রাজপুত্তুরের কথাই তুলল না। ঘরের কাজকর্ম করতে লাগল মন দিয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা, মায়ের পুজোর জোগাড়, সবকিছু মন খুলে করে চলল দু'দিন ধরে। ফিসফিস করে গ্রামের লোকেরা বললে, 'যাক বাবা, রুপুর মাথাটা ঠিক হয়ে গেছে! ওর মা কি না সত্যপিরের দরগায় মানত করেছিল! হাতে-হাতে ফল!'

রুপু শোনে, আর হাসে। মনে-মনে হাসে অবিশ্যি।

ঝুলনপূর্ণিমার রাতে, মস্ত গোল সোনার থালার মতন চাঁদটা যখন ঠিক নারকোলগাছের মাথার ওপরে, রুপুর বাড়িতে সবাই অঘোরে ঘুমিয়ে। বাবার জোরসে নাক ডাকছে, মা ভাইটিকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শান্ত হয়ে শুয়ে আছেন। রুপু চুপিচুপি উঠল। শাড়ির ওপর ঠাকুমার বড়সড় গামছাটি জড়িয়ে, সে চলল ইঁদারার দিকে। পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে পৌঁছে, দেখে—আশ্চর্য কাণ্ড! প্রত্যেকটি গাছ থেকে ফুলের দোলনা ঝুলছে, তাতে দুলছে পরমাসুন্দরী পরিরা, আর পরম-রূপবান পরি-রাজপুত্তুররা। একটি গাছ একটু দূরে। তার গায়ে ধবধবে সাদা একটি ঘোড়া বাঁধা, ঘোড়ার পিঠে সোনার জিন থেকে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে। আর, মিষ্টি বাঁশি বাজছে আকাশ-বাতাসে। রূপ্‌সা লুকিয়ে লুকিয়ে ওই গাছটার নীচে গেল, সাদা ঘোড়াটি যেখানে বাঁধা। আর যেই না দোলনাটি কাছে এসেছে, অমনি এক ঝটকায় টেনে নামিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে সে রূপকুমারকে! আর ফেলেই অ্যাইসা জাপটে ধরেছে, যেন সে হামিদাবানু কুস্তিগির! তার পরেই দিদিমার গামছাটি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। যেই না মাটিতে ফেলা, সব দোলনা থমকে থেমে গেল, বাঁশির সুর চমকে থেমে গেল, পরি-রানি আর্তনাদ করে উঠলেন, 'মর্তবাসী এসে পড়েছে!'

রূপসা হঠাৎ দেখে তার দুই হাতের মধ্যে রূপকুমার রোগা হয়ে যাচ্ছে। হতে-হতে একটা গিরগিটি হয়ে গেল। রূপ্‌সা ছাড়ল না। যতই ঘেন্না করুক, ছাড়ল না। তখন গিরগিটি ফুলতে ফুলতে হল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। 'হলুম' করে হাঁক ছাড়ল। তবুও রূপসা ছাড়ল না। যতই ভয় করুক, ছাড়ল না। তখন বাঘ আরও ফুলে হল বীভৎস এক গেরিলা। রূপ্‌সা তাকে ধরে রাখবে কী করে? তবু, গোরিলার গলায় গামছা দিয়ে ধরে রাখল। প্রাণপণ

শক্তিতে। তখন গোরিলা হয়ে গেল জ্বলন্ত একটা লোহার শিক। রূপ্‌সার বুক-হাত পুড়ে ফোসকা হয়ে গেল, তবু সে ছাড়ল না শিকটা। তখন একটা ভয়ঙ্কর মস্ত মাকড়সা, মাকড়সা থেকে একটা বিশ্রী শকুনিপাখি, তারপরে এক-টুকরো ছোট্ট জ্বলন্ত অঙ্গার। যেই না অঙ্গারটি হয়েছে, অমনি মুঠো করে নিয়ে রূপসা তাকে ইঁদারার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অমনি সমস্ত পরিদের মধ্যে মড়াকান্নার রব উঠল। শোক উথলে উঠল। মুহূর্তে সব গাছতলা ফাঁকা। সাদা ঘোড়াও উধাও। দোলনা উধাও। রূপ্‌সার গায়ের ফোসকাও উধাও। ইঁদারার ধারে হঠাৎ একজন ছেলে বলে উঠল, 'ও রূপ্‌সা! আমার গায়ে যে কোনও কাপড় নেই। যাব কেমন করে? এখন তো মর্তের মানুষ!'

রূপকুমারের গলা শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাড়াতাড়ি রূপসা ছুঁড়ে দিল তার দিদিমার লম্বা-চওড়া গামছাটি। সেটি পরে বেরিয়ে এল—কে? রূপের জ্যোতি রূপকুমার, আবার কে? মুখে লাজুক হাসি! রূপসা দৌড়ে গিয়ে দ্যাখে, ইঁদারার ধারে-ধারে শুধু আগাছার ঝোপ, সেই গোলাপলতাটি আর কোথাও নেই।

রূপকুমারকে নিয়ে রূপ্‌সা যখন গ্রামে এল, তখন গ্রামসুদ্ধু অবাক। কী সুন্দর রাজপুত্তুরের মতন জামাই. সব্বাই শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে রূপকুমারকে বরণ করে ঘরে তুলল, তার আগে অবিশ্যি গামছা খুলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে দিতে ভোলেননি রূপ্‌সার মা।*

** স্কটিশ উপকথার আভাস অবলম্বনে*
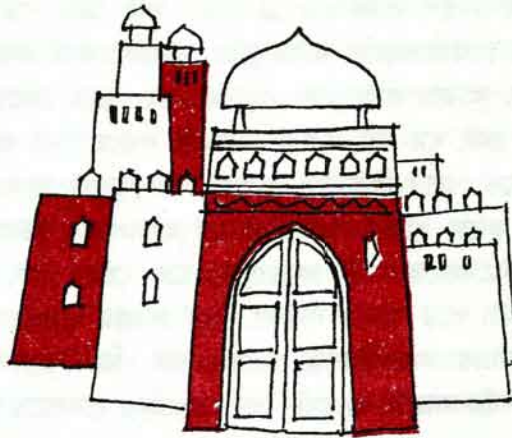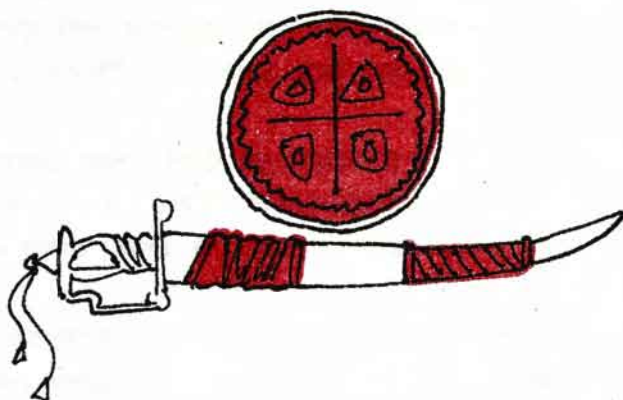
কাটুর-কুটুর, পদ্মমুখী আর কাঠুরে কত্তা

এক বনের ধারে এক সৎ কাঠুরে থাকত। কাঠ কাটতে বনে গিয়ে সে একদিন আর ফিরল না। কাঠুরের এক বউ ছিল, এক মেয়ে ছিল আর ছিল একটা ছোট্ট কাঠবেড়ালির ছানা। তারা খুব ভাবনায় পড়ে গেল। তাই তো? বউ ভাবলে, কত্তা কেন ফেরেন না? তাই তো? কাঠবেড়ালি কাটুর-কুটুর ভাবলে, কত্তা কেন ফেরেন না? তাই তো? পদ্মমুখী ভাবলে, আমার বাবা কেন ফেরেন না? ভেবে ভেবে ভেবে ভেবে তারা অস্থির বিস্থির। খাওয়া নেই ঘুম নেই, কেবল ভাবনাই করছে তারা বাড়িসুদ্ধু সবাই মিলে। তবে কি কাঠুরেকে বাঘে খেল? কিন্তু না! তাহলে তো কুড়ুলটা থাকত বনে পড়ে। গাঁসুদ্ধু লোকে খুঁজে এসেছে, কুড়ুল পায়নি, বাঘের পায়ের ছাপও না। আসলে এই বনে কোনও বাঘ ভাল্লুক নেই-ই! তবে? তবে কি কাঠুরেকে সাপে খেল? বাঃ, তা কী করে হবে? তবে তো কাঠুরের দেহটা পড়ে থাকবে নীলবর্ণ, বিষে জরজর হয়ে, যেমন লখীন্দরের ছিল। তবে হ্যাঁ, সে একটিমাত্তর অজগরমশাই আছেন বটে, যিনি রাজাকে ঘোড়াসুদ্ধু গিলে ফেলেছিলেন ছাব্বিশ বছর আগে। তা সেই ভোজের ঠেলা সামলাতে তিনি সেই যে গুহায় ঢুকে ঘুমুচ্ছেন, এখনও সে ঘুম ভাঙেনি। দুষ্টুলোকে বলে, সে রাজা এতই মন্দ রাজা ছিলেন যে তাঁর পাপের বিষে অতবড় অজগর সর্প পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন ছাব্বিশ বছর। না, কাঠুরেকে অজগরে খায়নি। তবে গেল কোথায় সে? জলেও ডোবেনি নিশ্চয়, কেন

না ওদের বংশের প্রতি জলদেবীর আশীর্বাদ আছে। সেই যে কাঠুরের ঠাকুরদাদার কুড়ুলটা একবার জলে পড়ে গিয়েছিল না, সেই থেকে। জলদেবী ওঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে সোনারুপোর কুড়ুল এনে দেখালেন, কাঠুরে কিন্তু সে সব না ছুঁয়ে নিজের সেই লোহার কুড়ুলের জন্যে কাঁদতে লাগল। তখন জলদেবী তার সততায় খুশি হয়ে তিনটে কুড়ুলই তাকে দিয়ে দিলেন আর বর দিলেন যে তার বংশে কেউ জলে ডুবে মরবে না।

সৎ কাঠুরের বংশের সকলেই সৎ। তাই কাঠুরে হারিয়ে গেছে বলে গাঁ-সুদ্ধু সব্বারই বড় মন খারাপ। তারা কী করবে, কাঠুরের বউকে ডাকে বড়ি দিতে, ধান ভানতে, আর চালটা ডালটা, তেলটা নুনটা দিয়ে দেয় থালা ভরে। যাতে ভালোমানুষ কাঠুরের মেয়ে-বউ, পেট পুরে খেতে পায়। পদ্মমুখী বড় লক্ষ্মী মেয়ে। আর সরস্বতীর মতো রূপগুণ। ছোট্ট ছোট্ট হাতে পায়ে তার এক তিল আলিস্যি নেই। মার সঙ্গে ছুটে ছুটে সারাদিন কত কী কাজ করে। আবার সন্ধেবেলায় প্রদীপের আলোতে দুলে দুলে নামতা পড়ে, বর্ণপরিচয় পড়ে। আর তার সঙ্গে সারাদিন ছুটোছুটি করে ঘরের কাজে বাগড়া দেয় যে, সেটি কে বলো তো? কাটুরকুটুর। সেই খুদে কাঠবেড়ালির ছানা। তারও সঙ্গে আলিস্যি নেই। দিবারাত্তির পাঁইপাঁই দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কাজে তো নয়, অকাজে। অথচ তারই ঠাকুদ্দাদার ঠাকুদ্দা তো রামচন্দ্রকে কত সাহায্য করেছিলেন! এই খুদে কাটুরকুটুর আর ছোট্ট পদ্মমুখী, আর তার মা রোজই ভাবে এই বুঝি কাঠুরে ফিরে এল! মাথায় এক বোঝা কাঠ নিয়ে বনের দিক থেকে দূরের রাস্তা ধরে কোনও মানুষ এলেই, তার ছায়াটুকু দেখতে পেলেই কাঠুরের বউ-মেয়ে একদৌড়ে পথের ধারে গিয়ে হাজির হয়। সবার আগে যায় কাটুরকুটুর। কিন্তু না। লোকেরা আসে, এসে ওদের ঘর পার হয়ে চলে যায়। অন্য লোক। ওদের মন খারাপ হয়ে যায়, মুখের আলো নিবে যায়। আবার ভাবে, এবার না হোক পরের বারে ঠিক আসবে।

পদ্মমুখী বাগান করতে খুব ভালোবাসে। এই গাছের গোড়া খুঁড়ছে, এই জল ঢালছে, এই সার দিচ্ছে মাটিতে, এই কলম লাগাচ্ছে, এই শুকনো ডালপাতা ছিঁড়ে বাদ দিচ্ছে। বাগানের গাছের পাতাগুলি যেন সিল্কের তৈরি এমন মোলায়েম আর চকচকে, ডালপালাগুলি যেন পালিশ করা হয়েছে এত ঝকঝকে, ফুলের মুখে ফলের মুখে হাসি যেন ধরে না। কত আদরের গাছ তারা। কোথাও একটি পোকা লাগে না, কোথাও একটু ময়লা থাকে না। যেন সবসময়ে বাগানসুদ্ধু গাছ নেমন্তন্ন বাড়ি যাওয়ার জন্যে সেজেগুজে তৈরি! কাটুরকুটুরও অবিশ্যি এই কাজে পদ্মমুখীকে খুব সাহায্য করে। সেও গাছেদের ভালোবাসে। লেজ বুলিয়ে ধুলো ঝেড়ে দেয়, ছোট ছোট নোখ দিয়ে গাছের গোড়া খুঁড়ে দেয়, ছাগল ঢুকলে, বাদুড় এলে হইহই করে তাড়িয়ে দেয়।

এই বাগানে পদ্মমুখী আর কাটুরকুটুর ছোট্ট কঞ্চির মাচা বেঁধে লাউ-কুমড়োর লতা তুলেছে। কুমড়োলতায় মস্তমস্ত হলুদফুল। বেড়ার গায়ে ঝিঙেডালটি দোলে, তাতেও কেমন হালকা হলুদ ফুল। কচি কচি ঝিঙে যখন হয় তখন কী যে সুন্দর দেখায়! কুমড়ো-ফুলের তলায় কলসির মতো খুদে খুদে কুমড়ো ধরে—সেও ভারি মজার। ওইটুকু-টুকু কুমড়ো যে ফুলতে ফুলতে কত বড় হবে, এখন তাদের দেখে বুঝবে কে? ওদিকে আছে ছোট্ট

লঙ্কাগাছ ক'টি, লাল সবুজ লঙ্কায় যেন নুয়ে পড়েছে. আর গন্ধলেবুর গাছে যেন বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝিরঝিরে সাদা ফুলের ওড়না পরিয়ে দিয়েছে কেউ—আর কী সুবাস। আঃ! বুকখানা ভরে যায়। আরও আছে, খুদে খুদে বেগুনগাছ। দুটি দিশি, আর দুটি বিলিতি। দিশি বেগুনগাছে চকচকে গা কালোকালো ফুলোফুলো চমৎকার সব বেগুনছানা ঝুলছে। আর বিলিতি বেগুনগাছে নাদুস-নুদুস টাবুস-টুবুস গোলগাল টোমাটোগুলি লাল টুকটুক করছে। ওদের বাগানে সবই ছোট্ট ছোট্ট, কেবল একটি গাছ ছাড়া। সেটি ওদের ঘরের পাশের বিরাট বড় জামগাছটা। জামতলাতেই কাঠুরের বাড়ি। রসে টুসটুসে ঠিক পান্তুয়ার মতো মিষ্টি সেই কালোজাম। আর তার বিচি? যেন বড় এলাচের দানাটি! চোখে দেখাই যায় না। আর কী ফল, কী ফল। ফলের যেন শেষ নেই। পাড়ার বাচ্চারা, কাকপক্ষী, কাঠবেড়ালিতে খেয়ে খেয়ে আর ফুরোতে পারে না। রাত্তিরে আবার বনের ভেতর থেকে যত শেয়ালরা চলে আসে জাম খেতে। ওইজন্যেই তো শেয়ালের নাম জম্বুক। জাম খেতে ভালোবাসে বলে।

একদিন এক কাণ্ড হল। এক ন্যাকশেয়ালনী তার বাচ্চাটিকে নিয়ে জাম খেতে এসেছে। শেয়ালরা তো দুরকমের হয়, ন্যাকশিয়াল আর খ্যাঁকশিয়াল। ন্যাকশিয়ালেরা বড্ড ন্যাকামো করতে ভালোবাসে, মোটামুটি মানুষ তারা কিন্তু মন্দ নয়। খ্যাঁকশিয়ালেরা আবার বড় বেশি খ্যাঁকখ্যাঁক করে—যদিও, তারাও খুব একটা মন্দ প্রাণী নয়। এটা ছিল ন্যাকশিয়ালনী। হয়েছে কী, জেলেখুড়ো পদ্মমুখীদের জন্যে কিছু কুচোমাছ দিয়ে গিয়েছিল জালসুদ্ধ। কাঠুরে বউ সেটি ধুয়ে টুয়ে বাগানে শুকোতে দিয়েছে। রাতে তুলতে গেছে ভুলে। এদিকে ন্যাকশিয়ালনীর নেকু বাচ্চাটা কী করে সেই জালে পা জড়িয়ে ফেলেছে। তারপরে হুলুস্থুল কাণ্ড। হুটোপাটি শুরু হয়ে গেছে। কেঁউ-কেঁউ ভেউ-ভেউ ঝুপ-ঝাপ ধুপ-ধাপ শব্দে কাঠুরে বউয়ের ঘুম ছুটে গেল। ন্যাকশিয়ালনী আর তার ছানা, দুজনেই কেঁদে কেঁদে সারা। শেষে কাঠুরে বউ একটা লণ্ঠন জ্বেলে বাগানে বেরুল। দ্যাখে, মাছের জালে এক শেয়ালছানা ধরা পড়েছে। তার চোখের জলে বাণ ডেকেছে। শেয়ালছানার কান্না দেখে কাঠুরে বউয়ের খুব মায়া হল। 'আহা গো, আমার পদ্মমুখী যদি অমন জালে পড়ত?' এই বলে সে তাড়াতাড়ি গিয়ে জাল থেকে বাচ্চাটাকে ছাড়িয়ে দিলে। ছানা অমনি এক দৌড়ে তার মায়ের ঝুমরো লেজের পেছনে গিয়ে সোজা লুকিয়ে পড়ল। বাচ্চাকে বুকে পেয়ে ন্যাকশিয়ালনীর চোখের জল শুকিয়ে গেল, মুখে একগাদা হাসি ফুটল। সে বললে—'কাঠুরে বউ, কাঠুরে বউ, তোমার ভাই মনটা ভা-রি ভালো। তোমার কখনও কোনও বিপদ-আপদ হলে আমাকে নিশ্চয় ডেকো ভাই। আজ থেকে আমি হলুম তোমার চিরজন্মের প্রাণের বন্ধু। একবার ডাকলেই ছুটে আসব। কেমন ভাই? আজ তবে যাই?' বলে বাচ্চাকে জামটাম খাইয়ে নিয়ে হেলেদুলে সে বনে ফিরে গেল।

মার পেছন পেছন লাফিয়ে লাফিয়ে চলল ন্যাকশিয়ালের ছটফটে ছানা, যেতে যেতে পেছন ফিরে ল্যাজটি নেড়ে নেড়ে 'বাই বাই যাই যাই' করতে করতে।

কাঠুরেদের পাশের বাড়িতে একজোড়া হাড়কেপ্পন বুড়োবুড়ি থাকত। ওরা গাঁয়ের কাউকে দেখতে পারে না। একা একা থাকে, মনের সুখে সারাদিন কেবল দোর বন্ধ করে

টাকা গোনে। আর সোনাদানার বাক্স সামলায়। একদিন ওদের বাড়িতেই ভয়ঙ্কর ডাকাত পড়ল। ডাকাতরা এসে ওদের টাকাকড়ি সোনাদানা বাক্সসুদ্ধু কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল বনের মধ্যে।

কাটুরকুটুর তখন বাগানে খেলছিল। সে সবই দেখল। তারপর সাহস ভরে ডাকাতদের পেছনে পেছনে দৌড়ে চলল।

ডাকাতরা ওকে মোটে দেখলেই না। কাটুর-কুটুর অন্য একটা গাছের ডাল থেকে দেখতে পেলে, ডাকাতরা একটা বিরাট বটগাছতলায় জড়ো হয়ে বলছে—

'শুকসারী শুকসারী বেঁচে আছিস রে?'

ভিতর থেকে উত্তর এল—'আছি—কি না—আছি, বাঁচি কি না বাঁচি!'

—'ছোলা দিব পানি দিব দোরটা খুলে দে!'

তখন গাছের ঠিক মধ্যিখানটায় দুখানা কবাট খুলে গেল আর একজোড়া শুকসারী বেরিয়ে এল। তাদের পায়ে সোনার শিকল বাঁধা, তাদের মুখে হাসি নেই, চোখে জল। ডাকাতরা গয়নার বাক্স সেই কবাটের ফাঁকে গাছের মধ্যে লুকিয়ে রেখে শুকসারীকে একবাটি শুকনো ছোলা, একবাটি ময়লা জল দিয়ে কবাট বন্ধ করে চলে গেল।

কাটুরকুটুর নিশ্বেস বন্ধ করে ছোট্ট কান ভরে সব শুনে নিয়ে, ছোট্ট চোখ ভরে সব দেখে নিলে তারপর ছুটতে ছুটতে বাড়ি এল।

—'ও দিদিভাই, জানো আমি ডাকাতির ধন উদ্ধার করেছি!' শুনে পদ্মমুখীর গালে হাত! সে তার মায়ের কাছে ছুটল।

—'অ মা জানো, কাটুরকুটুর ডাকাতির ধন উদ্ধার করেছে!' শুনে কাঠুরে বউয়ের গালে হাত! তাড়াতাড়ি কাটুরকুটুরকে কোলে নিয়ে বললে—'কই রে, আমার ধনমণিটা? কোথায় রে, আমার সোনামণিটা? কেমন করে ডাকাত ধরলি রে, আমার বুক্‌চুমণিটা?' আদরে গলে গিয়ে সরু গোঁফে তা দিয়ে পুঁতির মতন উজলকাজল চক্ষে আহ্লাদের ফুলঝুরি ছুটিয়ে কাটুরকুটুর বললে—'হুঁ-ই...বনের মধ্যে মস্ত বটগাছের তলায়...' বলে যা দেখেছে সব বললে। তখন পদ্মমুখী বললে, 'চল ভাই, ওদের সোনাদানা ফিরিয়ে আনি গে।' বলতে না বলতেই জোগাড় হয়েছে একবাটি নরম ভিজে কল-ওঠা ছোলা, একবাটি ঠান্ডা নীল কুয়োর জল। অমনি পথে ছুট লাগিয়েছে দু'খানি মলঝুমঝুম পা। কাটুরকুটুর যায় তুরতুরিয়ে আগে আগে, পদ্মমুখী যায় ঝুমঝুমিয়ে, তার পাছে পাছে।

গাছের কাছে পৌঁছে পদ্মমুখী যেই না বলেছে—'শুকদাদা সারীদিদি, বাড়ি আছ গো?' অমনি উত্তর এসেছে—'আচি কি না আছি, বাঁচি কি না বাঁচি।' পদ্মমুখী বললে—'ভিজে নরম ছোলা এনেছি, টলটলে নীল জল এনেছি, দোরটুকুন খোলো না গো?' অমনি দোর খুলে গেল। শুকসারী বললে—'কে গা তুমি? এমন মিষ্টি কথা?'—এদিকে শুকসারীর পায়ে শিকলি দেখেই তো ওদের চোখে জল এসে গেছে! পদ্মমুখী তাড়াতাড়ি শেকল খুলে দিলে। শুকসারী তো আহ্লাদে ডানা তুলে তুলে আশীর্বাদ করে করে আর বাঁচে না! কাটুরকুটুর বললে—'শুকদাদা সারীদিদি, আমরা এসেছি পড়শীদের ধনরত্ন উদ্ধার করতে। ডাকাতরা কাল কেড়ে এনে সব এই গাছের ভেতরে রেখে গেছে।' শুকসারী তক্ষুনি বাক্সটা বের

করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পুঁটলিও বেরিয়ে পড়ল। গামছায় বাঁধা সোনাদানা। গামছাটা দেখেই পদ্মমুখী চেঁচিয়ে উঠল—'এ গামছা তুমি কোথায় পেলে?' কাটুরকুটুর চেঁচিয়ে উঠল—'এ যে আমাদের কাঠুরেকত্তার লাল গামছাটি!'

শুকসারী বললে—'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ, এ গামছা এক কাঠুরের গামছাই বটে। এই ধনযত্নও তারই।' তবে বলি শোনো।

এখানে এক ধনেশপাখির বাসা আছে এই পাশের গাছটায়। একদিন এক কাঠুরে সেই গাছটি কাটছে, ধনেশপাখি বললে—'আজ কেটো না ভাই, আজ আমার বাচ্চারা ডিম ফুটে বেরুচ্ছে। কাল কেটো।' কাটুরে—'বেশ তাই হবে' বলে চলে গেল।

পরদিন যেই এসেছে, ধনেশপাখি বললে—'আজ নয় ভাই, আজ আমার ছানাদের চোখ ফুটবে, কাল কেটো।' কাঠুরে—'বেশ' বলে চলে গেল। পরদিন যেই এসেছে, ধনেশপাখি বললে—'আজ কেটো না ভাই, আমার কচিকচি বাচ্চাদের আজ পালক গজাবে কি না, তুমি বরং কাল কেটো।' তখন কাঠুরে বললে—'একি ভাই, রোজ রোজ ফিরিয়ে দিলে আমার বউবাচ্চারা খাবে কী? আমি গরিব কাঠুরে মানুষ, টাকাপয়সা না নিয়ে গেলে কী আমার চলে?' ধনেশ হেসে উঠে বললে—'ওহো এই কথা? তা আগে বলোনি কেন? এই নাও কত সোনাদানা তোমার দরকার।' বলে একটু ডানাদুটি ঝাড়লে। ওদের ডানা ঝাড়লেই ধনরত্ন ঝরে পড়ে, তাই ওদের নাম ধনের ঈশ, ধনেশ। ডানা থেকে যত ধন পড়ল, কাঠুরে তা কোমর থেকে গামছা খুলে বেঁধে নিচ্ছে, এমন সময় ডাকাতরা ওকে দেখতে পেল। গামছার ধন তো কেড়ে নিলেই, তাকেও বেঁধে নিয়ে গেল। ধনেশপাখিটার বাসা কোন গাছে, কাঠুরে কিছুতেই দেখিয়ে দেয়নি বলে। পাছে ডাকাতরা ধনেশপাখির সংসারের ক্ষতি করে। সেই ধনও আমরা আগলে আছি। আমাদের বন্দি করে রেখেছিল কিনা। এবার আমাদের ছুটি!'

বলতে বলতে শুকসারী দেখে পদ্মমুখী হাপুস নয়নে কাঁদছে,—'কাঁদছ কেন? কাঁদছ কেন? কী হল ? কী হল?' কাটুরকুটুর বললে—'কোনখানে লুকিয়ে রেখেছে কাঠরেকত্তাকে, সেটা কি তোমরা জানো?' শুকসারী বললে—'তা তো জানি না।' পদ্মমুখী তাড়াতাড়ি বলে—'কোনদিকে নিয়ে গেছে তা তো জানো, পুবে, না পশ্চিমে ডাইনে না বাঁয়ে?'

—'হ্যাঁ, তা দেখেছি। সোজা পশ্চিমে নিয়ে গেল তাকে।'

—'কাঠুরের পরনে কি হলদে রঙের ধুতি ছিল?'

'সারী বললে—'তাই তো ছিল।'

—'কাঠুরের গলায় কি কালো সুতোয় বাঁধা তামার মাদুলি ছিল?'

'হ্যাঁ, তাও তো ছিল।'

—'আর তার কোমরে গোঁজা ছিল বাঁশের বাঁশি, হাতে ছিল কুড়ুল, আর কাঁধে লাল গামছা?' শুকসারী বলে—'ছিল ছিল, সব ছিল। এটাই তো সেই গামছা।'

কাটুরকুটুর কেঁদে পড়ল—'হায় কত্তা গো' বলে, পদ্মমুখী কেঁদে পড়ল—'হায় বাবা গো'! বলে। শুকসারী বললে—'হল কী? কী হল? তোমাদের কি ফিটের ব্যামো?'

তখন চোখের জল আঁচলে মুখে নিয়ে পদ্মমুখী উঠল, তখন চোখের জল লেজে

মুছে নিয়ে কাটুরকুটুর উঠল—শুকসারীকে কাঠুরের হারিয়ে যাওয়ার গল্প বললে।

তখন শুকসারী বললে—'দাঁড়াও, জেনে নেব ফন্দি করে কাঠুরেকত্তাকে কোথায় রেখেছে, তোমরা আজ বরং বাক্সটা রেখে যাও, শিকলিগুলো পায়ে পরিয়ে দিয়ে যাও। কাল আবার এসো।' কাটুরকুটুর বললে—'পদ্মদি তুমি যাও, আমি একটু থাকি।'

রাত্তিরে ডাকাতরা যেই এসেছে, শুকসারী বললে—'ডাকাতমশাই, সেই কাঠুরে এসেছিল তার গামছা নিতে। তার ধন তাকে ফিরিয়ে দেব কি?' সর্দার ডাকাত হাঁ হাঁ করে উঠল—'বা রে অমন এলেই হল? সে কাঠুরে কেমন করে আসবে? তাকে তো আমি সাড়ে সাত নদী পার করে মুচকুন্দ বনের মধ্যে ভাঙামন্দিরের পাশে খ্যাঁকশেয়ালের বাসায় বেঁধে রেখেছি। ধনেশপাখির ঠিকানা না পেলে ছাড়বই না।—এ নিশ্চয় অন্য কাঠুরে। তা সে যেই হোক, আমাদের গচ্ছিত ধন কাউকে দিয়েছিস যদি তবে দু-আঙুলে ঘাড় দুটি এমনি করে মটকে দেব'—বলে দুটি আঙুল এইসা সাঁড়াশির মতো বাঁকিয়ে দেখাল। গাছের ওপরে বসে কাটুরকুটুর মনে মনে সব টেপরেকর্ড করে নিয়েছে। তার ফুর্তি আর ধরে না। সে লাফাতে লাফাতে ঘরে চলল—'মা! মা! কত্তার ঠিকানা পাওয়া গেছে।'

কাটুরকুটুরের কথা শুনে কাঠুরে বউ তো ছুটতে আরম্ভ করে আর কী। বউ বেচারি একটু গোলপাল নধর মানুষ, হাঁটে থাবুস থুবুস। পদ্মমুখী বললে—'মাগো, তুমি যেয়ো না, তুমি ঘরে থাকো। ইতিমধ্যে বাবা যদি নিজেই চলে আসেন? ঘরে কেউ না থাকলে কী ভয়ভাবনা করবেন। তা ছাড়া আমাদের কে দেখবে শুনবে যত্ন করবে? গাছেদের যে কষ্ট হবে।'

শুনে বাগানসুদ্ধু গাছপালা সেই কথায় সার দিয়ে হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে অভিমানে পাতা ফুলিয়ে বলে উঠল—'সত্যিই তো! সত্যিই তো! সবাই চলে গেলে আমরা তো মরেই যাব।' তখন কাঠুরেবউ বললে—'বেশ, আমি থাকছি। কিন্তু দুটো জিনিস বলে দিই, মনে রেখো। নদীপুকুর নিয়ে মুশকিলে পড়লেই জলদেবীর কাছে প্রার্থনা জানাবে—

আদ্যিকালের জলদেবী হে ভক্তের কথা শোনে, সৎকাঠুরের বংশধরের বিপদ হয় না যেন। আর বনেজঙ্গলে বিপদে পড়লেই আমার বন্ধু ন্যাকশেয়ালীকে ডেকো'। এই বলে সে মেয়ের আঁচলে উড়কি ধানের মুড়কি আর শালিধানের চিঁড়ে বেঁধে দিলে। কাটুরকুটুরের জন্যে দিয়ে দিলে কিছু বাদাম। মাকে প্রণাম করে পদ্মমুখী বললে—'মা, তবে আসি? বাবাকে সঙ্গে করে বাবার হাত ধরে ফিরব।' কাটুরকুটুর বললে—'মা, তবে আসি। কত্তাকে সঙ্গে করে, কত্তার কাঁধে চড়ে, তবে ফিরব।'

যাওয়ার সময়ে তারা বাগানে গিয়ে প্রত্যেকটা গাছের গায়ে হাত বুলিয়ে একই কথা বলে গেল। জামগাছ বললে—'আমার দুমুঠো জাম নিয়ে যাও, কাজে লাগতে পারে।' কুমড়োলতা দুলে দুলে বললে, 'আমার দুটি বড় বড় পাতা নিয়ে যাও, কাজে লাগতে পারে।' বিলিতি বেগুনগাছ হেলে পড়ে বললে—'আমার দুটি লাল ফল নিয়ে যাও।' লঙ্কাগাছ লুটোপুটি করে বললে—'চারটি লঙ্কা নিয়ে যাও', নেবুগাছ নুয়ে পড়ে বললে, 'একটি নেবু নিয়ে যাও।' পদ্মমুখী কাউকেউ দুঃখ দেবে না, যে যা দিলে, সব নিলে। সব নিয়ে তার কোঁচড় খুব ভারী হল। বেরুবার পথে জবাফুলের গাছটি কানে কানে বললে, 'পদ্মদিদি,

এই দশটি ফুল তুমি সঙ্গে নাও।'

মলঝুমঝুম পায়ে পদ্মমুখী ছুটল বনের দিকে, আগে আগে যায় কাটুরকুটুর, তুড়ুক-তুড়ুক। বনে গিয়ে আগে তারা শুকসারীকে ডাকলে। বললে—'এই নাও, লালটুকটুকে লঙ্কা এনেছি তোমাদের জন্যে। খাও—আমাদের সঙ্গে একটু যাবে তারপরে?' শুকসারীরা খুব লঙ্কা খেতে ভালোবাসে। তারা বললে—'নিশ্চয় যাব, নিশ্চয় যাব।' সোনার শেকল খুলে তারা শুকসারীকে মুক্ত করে নিলে।

তারপর বনপথ ধরে সোজা পশ্চিমে ছুট ছুট। শুকসারী যায় উড়ে উড়ে আকাশে-আকাশে, পদ্মমুখী যায় পথে-পথে ছুটে ছুটে, কাঠবেড়ালি যায় ডালে-ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে।

এমন সময়ে পড়ল নদী। কী বিরাট নদী গো। তার কূলও নেই, তলও নেই। পদ্মমুখী অমনি হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে মন্ত্রটা পড়লে—সেই যেটা মার শিখিয়ে দেওয়া। 'আদ্যিকালের জলদেবী হে ভক্তের কথা শোনো। সৎকাঠুরের নাতনি আমায় কষ্ট দিয়ো না কোনও'—অমনি একটা চমৎকার নৌকো উঠে এল জলের তলা থেকে। নৌকো দেখেই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল পদ্মমুখী। নৌকো বাইছে একজন মৎসকন্যে। সে আদর করে ডাকলে, 'এসো গো, তোমায় পার করে দিই।' কাঁধে শুকসারী, কোলে কাটুরকুটুর, নদী পার হয়ে পদ্মমুখী মৎস্যকন্যেকে একটি প্রণাম করলে, অমনি মৎস্যকন্যের আশীর্বাদে ওর পায়ের রুপোর মলজোড়া সোনার নূপুর হয়ে গেল। পদ্মমুখী তো অবাক!

আবার ছুট ছুট—গাছ মাঠ খেতবন গ্রামগঞ্জ পার হয়ে—ফের সামনে নদী। পদ্মমুখী আবার ভক্তি ভরে মন্ত্র পড়ল! আবার মৎসকন্যা নৌকা বেয়ে তাদের পার করে দিল। এবার যেই প্রণাম করেছে, পদ্মমুখীর গলায় চন্দ্রমণির হার পরিয়ে দিলে মৎস্যকন্যে। এইভাবে সাত নদী পার হতে হতে পদ্মমুখীর সাতখানা গয়না হল। তারপর এল সাড়ে সাত নদীর পালা। এটা ছোট্ট নদী কিন্তু খুব এঁকেবেঁকে যায়, নৌকো বেয়ে পেরুনো যায় না। জলদেবীকে ডাকতে, তিনি এসে লজ্জা লজ্জা মুখে বললেন—'কুমড়োপাতায় বসে এই নদী পেরুতে হয় বাছা, এ নদী আমার নদী নয়—এটা এক যক্ষের জাদু করা নদী—তুমি বরং একটু কুমড়োপাতা খুঁজে আনো গে।' পদ্মমুখীর কোঁচড়ে তো কুমড়োপাতা ছিলই—একটাতে সে নিজে চড়ে বসল, অন্যটাতে কাটুরকুটুরকে বসাল, আর শুকসারী তো উড়েই পার হয়ে গেল সাড়ে সাত নম্বর নদী।—গলায় চন্দ্রমণির হার, কানে মুক্তোর নোলক, কানে হিরের দুল, হাতে পান্নার চুড়ি, বাহুতে নীলকান্তমণির বাজুবন্ধ, কোমরে চুনির মেঘলা, পায়ে সোনার নূপুর—পদ্মমুখী ছুটতেই ছুটছেই, কোঁচড়ভরতি ফুল-ফল, আগে পাছে কাঠবেড়ালি, শুকসারী। কোথায় ভাঙা মন্দির? মুচকুন্দবনটাই বা কোনখানে? যেতে যেতে ওদের খুব খিদে পেয়ে গেল। তখন একটি ঝরনার জলে চিড়েমুড়ি ভিজিয়ে নিয়ে খেতে বসল। মুখে দিয়েই দ্যাখে—আরে, বাঃ! জলদেবীর আশীর্বাদে ঝরনার জল যে ক্ষীর হয়ে গেছে! মনের সুখে খাওয়া হল। শুকসারী আর কাটুরকুটুর বনের ফলমূল তুলে আনল প্রাণটি ভরে। কী রসালো সব আম! কী সুস্বাদু আর সুগন্ধী সব কলা! ওদের ফলারটি সেদিন জমেছিল দারুণ!

একটু ঘুমিয়ে উঠে ওরা পরামর্শ করতে বসল। এবার শেয়ালনীমাসিকে ডাকা উচিত।

এভাবে কত ঘুরব? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। 'শেয়ালনীমাসি ও শেয়ালনীমাসি!' তক্ষুনি বন থেকে নাকী ন্যাকা-ন্যাকা সুরে উত্তর এল ঃ

—'কে রে আমার বুকজুড়ানী ধন আমার প্রাণজুড়ানী সোনা, আমার কোনও বোনঝিটা আমার ডাকিস রে?'

—'আমি তোমার জামতলার কাঠুরেবউ বন্ধুর মেয়ে।' অমনি ঝাঁ করে কোত্থেকে ওদের সামনে এক সোনারঙা ন্যাকশেয়ালনী এসে উপস্থিত। সোনার মতন ঝকঝকে তার গা জরির চামচের মতো ঝুমরো ঝুমরো ল্যাজ, কাজলটানা চক্ষু, গোলাপবর্ণ নাকটি, ন্যাকশেয়ালনী সত্যিই পরমাসুন্দরী। কেবল কথাগুলি বড়ই ন্যাকা-ন্যাকা। সে এসে বললে—'এসো বোনঝি সোনা, বোসো বোনঝি সোনা, কিন্তু কেমন করে আমি জানব তুমিই আমার জামতলার বন্ধুর মেয়ে গো?'

পদ্মমুখী তখন বললে—'এই দ্যাখো, এই তোমার জন্যে কত জাম এনেছি—,' অমনি ন্যাকশেয়ালনী খুশিতে গলে গিয়ে বললে—'ওমা গো! তাই তো? এই তো আমার চিরজন্মের প্রাণের বন্ধু জামতলার বউয়ের বাড়ির প্রাণহরা জাম! তা তোমরা কেন এই গহন বনে এসেছ বাছাধন, দুধের বাচ্ছারা?' তখন পদ্মমুখী সব বললে। কাটুরকুটুরের স্বভাবটাই আহ্লাদে গদগদ। সেধে সেধেই সে ন্যাকশেয়ালনীর পিঠে চড়ে বসল। বসে বলল—'মাসি গো মাসি গো, বলো না মুচকুন্দবনটা কোনদিকে?' শেয়ালনী হেসেই অস্থির। বললে—'এইটেই তো মুচকুন্দবন রে।' কাটুরকুটুর আর পদ্মমুখী কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল—'ওমা! তাই-ই? তবে তো এসেই গেছি। এবারে বলে দাও ভাঙা মন্দিরটা কোথায়?' শুকসারী এক ধমক দেয়।

'ওটা কোনও ব্যাপারই নয়। আমরা এক চক্কর উড়ে এসে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।' কিন্তু ঘুরে এসে মুখটি চুন! বলবামাত্তর নীল আকাশে সবুজ ডানা ভাসিয়ে এক সেকেন্ডের মধ্যে শুক দক্ষিণে আর সারী উত্তরে ঘুরে এল। দুজনেই দুদিকেই পাঁচটা করে ভাঙা মন্দির দেখে এসেছে। এখন শুক বলে দক্ষিণে চলো, সারী বলে উত্তরে।

কাটুরকুটুর দেখলে মহামুশকিল। সে বললে—'শেয়ালনীমাসি, তুমিই বলে দাও, কোন মন্দিরের পাশে খ্যাঁকশেয়ালের বাসা?' শুনে ন্যাকশেয়ালী নাক তুলে বললে—'খ্যাঁক? খ্যাঁকদের কেউ উত্তরবনে ঢুকতেই দেয় না। খ্যাঁকরা যা খ্যাঁকখেঁকে। ওরা দোখ্‌নো, দক্ষিণের লোক।'

অমন দৌড় দৌড় দক্ষিণ বনে।—'শেয়ালনীমাসি তুমিও চলো!' যেমনি বলা অমনি ছোটা। বাতাসে ন্যাকশেয়ালীর লেজ চামরের মতো ঢোলে, পদ্মমুখীর এলোচুল মেঘের মতো ওড়ে, ডুরেশাড়ির আঁচলখানি রাঙাজবার মতো দোলে। কাটুরকুটুরের লেজটি নাচে তুরতুরিয়ে, যেন রাজামশায়ের বর্মাচুরুটের ধোঁয়া, শুকসারীর পাখনা কাঁপে থিরথিরিয়ে, যেন কচি গাছপালার রোঁয়া। পাঁচজন, পাঁচবন্ধু কাঠুরেকত্তার খোঁজে ছুটে চলল।

হেনকালে ওই যে! ওই যে মন্দির! পাঁচটার মাথায় পাঁচটা সোনার কলসি, রুপোর ত্রিশূল ঝকঝক করছে। কারুর ভেতরেই ঠাকুর দেবতা কিছু নেই। সব ফাঁকা খাঁ-খাঁ। চামচিকে লাগা। কেবল শেষ মন্দিরটিতে ছোট্টখাট্ট শ্যামলা মেয়েটি কালোপাথরের তৈরি, একপিঠ কেশ এলিয়ে, গলায় নরমুণ্ডের মালা দুলিয়ে, সোনার খাড়াটি হাতে করে রুপোর শিবঠাকুরের

বুকে পা দিয়ে মণিমাণিক্যের জিবটি মুক্তোর দাঁতে কেটে, একলাটি দাঁড়িয়ে আছে বেদির ওপরে। তার কোমরে কিছুই নেই!

'ওমা! এ মেয়ের কোমরে কিচ্ছু নেই যে?' বলে, পদ্মমুখী লজ্জায় জীব কেটে, তাড়াতাড়ি দশটা জবাফুল দিয়ে একটা মালা গেঁথে মা-কালীর কোমরে ঘাঘরা করে পরিয়ে দিলে। আহ্লাদে মা-কালীর তিনটি চোখেই ঝিলিক খেলে গেল। আর সেই খুশিতে ফুলের সুবাসে মন্দির ভরে গেল। একটি ফুল মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে খসে পড়ল পদ্মমুখীর মাথায়। আশীর্বাদী ভালো করে চুলে গুঁজে নিলে সে।

কাটুরকুটুর—'এর পাশেই খ্যাঁকশেয়ালের বাসা নিশ্চয়। আমি খুঁজে বের করছি।' বলে দৌড়ে গেল। কিন্তু একটু পরে মুখটি কালি করে ফিরে এল। 'খুঁজে পাচ্ছি নে। কেমন দেখতে খ্যাঁকশেয়ালের ঘর?' শুনে ন্যাকশেয়ালী তো হেসেই কুটিপাটি।

'আরে দূর! বোক্‌চন্দর—আমার বোকা সোনাটা—খ্যাঁকরা বুঝি কুটির বেঁধে থাকবে? নাকি বাবুইপাখির মতো গাছ থেকে ঘর ঝুলোবে? ওদের বাস তো গর্ত খুঁড়ে, মাটির তলায়।'

শুনে পদ্মমুখীর গালে হাত।—'ওমা? সেকী?'

শুনে কাটুরকুটুরের গালে থাবা। 'ওমা? কর্তাও কি সেই গর্তের ভেতরে নাকি?'

শুনে শুকসারীর গালে ডানা! 'ওমা! মনিষ্যি প্রাণী মাটির তলায় বাঁচে নাকি?'

শুনে ন্যাকশেয়ালীরও গালে ল্যাজ! 'ওমা আমার চিরজন্মের প্রাণের বন্ধুর কত্তাটি খ্যাঁকদের গর্তে কী করছেন?'

শুনে কাটুরকুটুর পদ্মমুখী আর শুকসারী একসঙ্গে বললে—'করবেন আবার কী? বন্দি হয়ে আছেন।'

—'করবেন আবার কী? চোখের জলের নৌকো গড়ছেন।'

—'করবেন আবার কী? মাটিতে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে দিঘি কাটছেন।'

ন্যাকশেয়ালদের মন খুব নরমসরম হয়। এতটা শুনেই কাঠুরেকত্তার দুঃখে ন্যাকশেয়ালী ফ্যাঁচ্চো ফিঁয়া, ফ্যাঁচ্চো ফিঁয়া করে খানিকটা কেঁদে নিয়ে, তারপর ল্যাজ বুলিয়ে চোখ মুছে বললে—'চল বাছারা, আমি খ্যাঁকের বাসা চিনি।' বলে একটা কাঁটাঝোপের পাশে গিয়ে ডাকলে—'ও ভাই খ্যাঁকগিন্নি, ওগো ভাই খ্যাঁকগিন্নি।' কেউ সাড়া দিলে না। ন্যাকশেয়ালনীর মনে হল, 'লক্ষণ তো ভালো নয়?'

তখন সুরটা নরম করে ডাকলে, 'ও ভাই—খেঁকুসোনা। ও ভাই খেঁকুসোনা!'

অমনি খেঁকিয়ে উঠে সাড়া এল—'কী রে ব্যাটা ন্যাকগিন্নি, বলচিসটা কী?'

—'একটা কথা কইব, একটু বাইরে এসো না ভাই?'

তখন খ্যাঁক খ্যাঁক করে যে বেরিয়ে এল তাকেও দেখতে মন্দ নয় মোটেই। কেবল একটু রাগী রাগী চেহারা। রুপো-রং-এর গা। এসেই বলল—'কী কথা কও, তাড়াতাড়ি কও, এসব বাজে ঝামেলার মোটেই সময় নেই আমার।'

—' তোমার ঘরে অতিথ্‌ এয়েচেন শুনছি ভাই?'

—'তা এয়েচে একটা লোক।'

—'অতিথের কি হাতে কুড়ুল, বুকে জড়ুল, হলুদ কানি, চক্ষে পানি?'

—'ঠিক তাই।'

—অতিথের কি মুখে নেইক হাসি, কোমরে গোঁজা বাঁশি?'

—'ঠিক তাই।'

—'অতিথের কি হাতে বাঁধন, পায়ে বাঁধন, অন্নে রুচি নেই, দিনে রেতে কাঁদন?'

—'তাই, তাই।'

—'তবে সে অতিথ্ আমাদের কাঠুরে কত্তা। তাঁকে ছেড়ে দাও ভাই খেঁকুসোনা।'

—'বদলে কী দিবি আগে বল?'

—'কী চাও ভাই? আমার চিরজন্মের প্রাণের বন্ধুর কত্তা উনি, ওঁকে ছাড়তেই হবে।'

—'তবে দুটো বেগুন এনে দাও, আমার খ্যাঁক খোকাটি বড় বেগুন খেতে ভালোবাসে।'

ন্যাকশেয়ালনী বললে—'ওমা? এই ঘোর বনের মধ্যে বেগুনখেত পাব কোথায় ভাই?'

পদ্মমুখী তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'পাবে, পাবে! এই আঁচল চাপায় বেগুনখেতে বেগুন তুলি আসতে যেতে।'

খ্যাঁকশেয়ালনী তেমনি খুশি তেমনি অবাক। কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেল! তখন চালাকি করে বললে—'ওমা, এই বেগুন নাকি? আমরা বিলিতি বেগুন ছাড়া খাই নে!' বলতে বলতে ছেলের হাতে বেগুনদুটি দিয়েছে, ছেলেও কচকচিয়ে সাবাড়!

পদ্মমুখী আবার একগাল হেসে বলললে—'ওমা, এই কথা? এই আঁচল চাপায় বেগুনের খেতে বিলিতি বেগুন তুলি শয়েতে শয়েতে।' বলেই দুটো টমাটো তার হাতে দিল।

খ্যাঁকগিন্নি এবার এতই অবাক যে আর কিছু বলতে পারলে না।

খ্যাঁকশেয়ালনী আর ন্যাকশেয়ালনীতে যখন এসব কথা হচ্ছে ততক্ষণে কাটুরকুটুর গিয়ে গর্তে ঢুকে পড়েছে। কাঠুরেকত্তার তো কাটুরকুটুরকে দেখেই চক্ষু চড়কগাছ।

—'এ্যাঁ! তুই? এখেনে কোত্থেকে এলি?' কত্তাকে দেখে কাটুরকুটুর হেসে নেচে আনন্দে অষ্টাশিখানা হয়ে তুড়ুক তুক ল্যাজ নাচিয়ে কুটুরকুট ধারালো দাঁতের কাঁচি চালিয়ে হাতের বাঁধন কেটে দিলে। কাঠুরেকত্তা অমনি কুড়ুলটি তুলে নিয়ে পায়ের বাঁধন কেটে ফেললে। তারপর গর্ত থেকে বেরিয়ে এল।

পদ্মমুখী দৌড়ে এসে বাবার বুকের ওপর আছড়ে পড়ল! 'বাবা গো! কোলে নাও!' কাটুরকুটুর টক করে লাফিয়ে কাঁধে চড়ে বসল। 'কত্তা গো! কাঁধে করো!' আর শুকসারী সেই দেখে মনের খুশিতে শিউলিগাছ নেড়ে নেড়ে ফুলের বৃষ্টি ঝরালো ওদের মাথায়। খ্যাঁকগিন্নি খ্যাঁক-খ্যাঁকাতে ভুলে গেল, ন্যাকগিন্নি ন্যাক-ন্যাকাতে ভুলে গেল, তারা আনন্দে ল্যাজ ধরাধরি করে 'আয় তবে সহচরি লেজে লেজে ধরি ধরি' বলে ওদের ঘিরে ঘিরে সখী নাচন নাচতে শুরু করে দিলে। আর তাই না দেখে তাদের গোল-গাল ছানারা আহ্লাদে গলা ছেড়ে—'ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া? নাচ্চা হুয়া। নাচ্চা হুয়া।' বলে গান গাইতে লাগল। বন জুড়ে আনন্দের বান ডেকে গেল।

ফেরবার পথে আবার সেইভাবেই সব ক'টা নদী পার হয়ে যখন শুকসারীর বনে এসে পড়েছে, দ্যাখে মস্ত এক ধনেশপাখি, পেল্লায় ডান ছড়িয়ে কাঁদছে। কাঠুরেকত্তা বললে—'ধনেশ ভাই, কাঁদছ কেন?'

ধনেশ বললে, 'বড্ড বিপদ, গিন্নির খুব অসুখ, মা-কালীর পায়ের ফুল ছোঁয়াতে হবে, তবে সারবে। এই অরণ্যে সে ফুল কোত্থেকে পাই?'

পদ্মমুখী বললে—'ওমা, এই কথা? এই যে মা-কালীর ফুল, নাও না।' বলে চুলে গোঁজা মা-কালীর আশীর্বাদী ফুলটি খুলে দিলে।

ধনেশপাখির মুখখানা আহ্লাদে সূর্যের মতো ঝলমল করে উঠল। সে উড়ে গিয়ে মরোমরো গিন্নির মাথায় ফুলটি যেই ছুঁইয়েছে অমন ধনেশগিন্নি সুস্থ হয়ে উঠে বসে বললে—'ছি ছি! বাসাটা ঝাঁট পড়েনি গো! কী নোংরা—', বলে কাজে লেগে গেল।

ধনেশগিন্নিকে সুস্থ দেখে ধনেশপাখির কী আনন্দ। সে একটি ছোট্ট সোনার চাবি এনে পদ্মমুখীর হাতে দিলে। বললে—'এই চাবি দিয়ে শুকসারীদের গাছের শিকড়ের নীচে একটি ছোট্ট দোর খুলতে পারবে। তার মধ্যে আছে ধনেশপাখির ধনরত্নের ভাণ্ডার। ডানা ঝাড়লেই যে সোনা পড়ে, সেগুলো ওখানে তুলে রাখি। সব তোমাকে দিয়ে দিলাম।'

পদ্মমুখী বললে—'এত ধন দিয়ে আমি কী করব? আমার ওসব চাই নে। তুমি আর কাউকে দিয়ো।' তখন আকাশ দিয়ে মা সরস্বতী যাচ্ছিলেন। তিনি এই নির্লোভ কথায় এত খুশি হলেন যে, পদ্মমুখীকে সর্ববিদ্যার বর দিয়ে গেলেন।

পরের দিন ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে কাঠুরেবউ, আর গাঁসুদ্ধু মানুষ কী দেখলে? দেখলে, আশ্চর্য একটা মিছিল ঢুকেছে গ্রামে। প্রথমে উড়তে উড়তে আসছে দুটি শ্যামবরণ শুকসারী, তারপরে নাচনে নাচতে আসছে দুটি পরম রূপসী খ্যাঁকশেয়ালনী আর ন্যাকশেয়ালনী, তাদের মাঝখানে পথ ঝলমলিয়ে আসছেন ছোট্ট একটি রাজকন্যে, তাঁর পরনে ডুরে শাড়িটি, আর সর্বাঙ্গে হিরে জহরতের গয়না! তার পেছনে? হাতে কুড়ুল, কাঁধে কিপটে বুড়োবুড়ির ডাকাতি হওয়া সেই সোনাদানার বাক্সটা বয়ে নিয়ে—কে আসে? এ গাঁয়ের হারামানিক কাঠুরেকত্তা! আর তাঁর কাঁধে রাজার মতো আসছেন, উনি কে? আছেন আছেন তুড়ুক তুড়ুক ডিগবাজি খাচ্ছেন,আর ফুড়ুক ফুড়ুক লেজ নাচাচ্ছেন?

কাটুরকুটুর *পদ্মমুখী দামাল খোকা দামালখুকি*
কাঠরেকত্তাকে খুঁজে আনল।
কিপটে বুড়োবুড়ি লজ্জা মানল
সোনাদানা যত জমিয়েছিল
গরিবদুঃখীকে বিলিয়ে দিল
কাটুরকুটুর পদ্মমুখীর গ্রামসুদ্ধু সবাই সুখী।

ডাইনিবুড়ি বাবা-য়াগা আর পুঁটুরানি

পুঁটুরানি তার বুড়ো বাবাকে নিয়ে মনের সুখে থাকত। তার মা ছিল না বটে, কিন্তু বাবাই খুব আদর করে নাইয়ে দিত, খাইয়ে দিত। তারা খুব গরিব ছিল তো, তবু খেতে বসে ডাল-রুটি নিয়েই তারা একগাল হাসত দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে চেয়ে। আর কতরকম গল্প করত। দেশবিদেশের গল্প, পুঁটুরানির মরে-যাওয়া মায়ের গল্প।

এমন সময় হল কী, পুঁটুর বড় বাবা একদিন একটা বিয়ে করে বসল। সৎমাবুড়ি যেমন রাগী তেমনি হিংসুটে। সে বাড়িতে এসে পুঁটুকে দেখেই খুব রেগে গেল। আর কেবলই বাবার কাছে পুঁটুর নামে মিছিমিছি নালিশ করতে লাগল। আজ বলে পুঁটু এটা ভেঙেছে, কাল বলে পুঁটু সেটা শোনেনি।

বাবা আবার নতুন বউয়ের সব কথাই বিশ্বাস করে। প্রথম প্রথম বলত বটে, 'না, না, পুঁটু তো আমার তেমন মেয়ে নয়?' কিন্তু আস্তে আস্তে সেও বকতে লাগল পুঁটুকে।

সৎমা খুব খুশি। সে আর পুঁটুকে সঙ্গে নিয়ে খেতেও বসত না, বলত, 'পুঁটু যা অসভ্যতা করে, ওর সঙ্গে বসে খাওয়াই যায় না।'

পুঁটুরানির হাতে একটা শুকনো পোড়া রুটি দিয়ে সৎমা বলত, 'যা বেরিয়ে যা, আর কোথাও বসে খে'গে যা, ঘরদোর নোংরা করিসনি।'

পুঁটুরানি কাঁদতে কাঁদতে চলে যেত গোয়ালঘরে। এখন তাদের গরু নেই, কিন্তু গোয়ালঘরটা পড়ে আছে, নোংরা আবর্জনায় ভরা। সেই খড়ের মধ্যে বসে বসে পুঁটু কেবলই কাঁদে, কেবলই কাঁদে। হাতের শুকনো রুটি চোখের জলে ভিজে ভিজে নরম হয়, নোনতা

হয়, তখন একটু একটু করে খায়, আর মরে-যাওয়া মার জন্যে, মরে যাওয়া ঠাকুরদা-ঠাকুমার জন্যে কাঁদে। আর বলে, 'হে ভগবান, কাল থেকে আমার সৎমাকে খুব লক্ষ্মীবুড়ি করে দাও।'

পুঁটু একদিন অমনি কাঁদছে, কাঁদছে আর হাতের রুটিটা ভিজছে, ভিজছে, এমন সময় কোথায় যেন আওয়াজ হল। খুটখুট করে এই একটুখানি আওয়াজ। পুঁটু পেছনে চেয়ে দ্যাখে কি, এত্তোটুকুনি কড়ে আঙুলের সমান একটি নেংটি ইঁদুর বসে আছে। ওই ঘরেই গর্তের মধ্যে তার বাসা। ছুঁচলো গোলাপি নাকটি তিরতির করে কাঁপছে, সোনালি সোনালি গোঁফগুলো নাচছে। গোল গোল গোলাপফুলের পাপড়ির মতো কানদুটি নড়ছে, কালো কুচকুচে পুঁতির মতন চোখ দু'খানি ঝিকমিক করছে। রেশমের বলের মতন এইটুকুনি চকচকে শরীরের চারপাশে লেজটিকে বেশ করে দু'পাক ঘুরিয়ে নিয়ে সে গুটিসুটি মেরে বাবু হয়ে পুঁটুর পাশে এসে বসল। আর ফরসা ফরসা দুটি মুক্তোকুচির মতন দাঁতের ফাঁকে লাল টুকটুকে জিবটি বের করে ঠোঁটদুটো চেটে নিয়ে হাসি-হাসি লোভী-লোভী মুখে পুটুর দিকে চেয়ে রইল। দেখেশুনে তো কান্নার মধ্যেও হাসি পেয়ে গেছে পুঁটুর।

হেসে ফেলে পুঁটু বললে, 'কী রে দুষ্টু, খাবি একটু আমার সঙ্গে?' বলে যেই না ছুঁড়ে দিয়েছে একটুকরো রুটি, অমনি সেটা কুটুরকুটুর করে খেয়ে ফেলেছে নেংটি। খেয়েটেয়ে আবার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে চকচকে হ্যাংলা হ্যাংলা চোখে।

পুঁটু বললে, 'ও হ্যাংলা, তুমি বুঝি আরও খেতে চাও?' বলে আরেকটু দিলে। পুঁটু যত দেয় নেংটি তত চায়। নেংটি যতই খেয়ে ফ্যালে, পুঁটুরানি ততই খিলখিলিয়ে হাসে আর রুটি ছুঁড়ে দেয়। এমনি করে পুরো রুটিখানাই গেল নেংটি ইঁদুরের পেটে।

রুটি ফুরোতে নেংটি বললে—

'লক্ষ্মী মেয়ে পুঁটুরানি
মনটা তোমার নরম অতি
জানো কি ভাই সৎমা তোমার
ফাঁদ পেতেছে চরম ক্ষতির?
সে যে আপন বোন হয় গা
ডাইনিরানি "বাবা-য়াগা"র!
সৎমা তোমায় চায় পাঠাতে
যদি তোমার মাসির বাড়ি
যাবার আগে আমার কাছে
খবর দিয়ো তাড়াতাড়ি।
পুঁটুরানি লক্ষ্মীসোনা
মনটা তোমার মিষ্টি মধুর
আমি তোমার রুটির কেনা
চিরদিনের বন্ধু ইঁদুর।'

পুঁটু তো অবাক। এদিকে ইঁদুর খেয়েদেয়ে গর্তে সেঁদিয়েছে। পুঁটুর সৎমাও ডাকছে,

'বাসনগুলো মেজে ফেলতে হবে না, ঘরটা মুছতে হবে না, পুঁটুর কোনও কাজেই মন নেই, কেবল আলিস্যি।'

পরদিন সকালে পুঁটুর বাবা যেই হাটে গেছে, সৎমা বললে, 'যাও তো পুঁটু বনের মধ্যে তোমার বড়মাসিমা আছেন, তাঁর কাছ থেকে ছুঁচসুতো চেয়ে আনো গে।'

পুঁটু বললে, 'এই তো ছুঁচ রয়েছে, এই নাও সুতোর গুলি।'

অমনি সৎমা এক ধমকে বললে—'তবে রে? মুখের ওপর কথা? বলেছি না তোকে, বনের মধ্যে তোর মাসি আছে, তার কাছ থেকে ছুঁচসুতো চেয়ে আনতে হবে? যাবি কি না?'

পুঁটু ভয়ে কেঁদে ফেললে। 'বারে, আমি কী করে চিনব মাসির বাড়িটা?'

সৎমা অমনি পুঁটুর নাকটায় এক রামচিমটি দিয়ে বললে, 'কী, এটা চিনতে পারছ?'

'হ্যাঁ—এঁ-এঁ-এঁ,' পুটু বললে, 'এঁটা তোঁ আঁমার নাঁক!'

'ওই নাকের সিধে চলে যাবে। বনের মধ্যে ঢুকে রাস্তা যেই শেষ হবে, দেখবে সেখানে একটা গাছ উলটে পড়ে আছে। অমনি বাঁদিকে ঘুরবে। তারপর—,' আরেকটা রামচিমটি কেটে সৎমা বললে—'এই নাকের সোজা চললেই আমার দিদির বাড়ির দোড়গোড়া!'

পুঁটু নাকে হাত বুলোতে বুলোতে গোয়ালের দিকে যাচ্ছে, সৎমা একটা গামছায় কীসব খাবার বেঁধে এনে বললে—'নে, পথে খিদে পেলে কিছু খেয়ে নিস।'

গোয়ালঘরে আর যাওয়া হল না ইঁদুরভায়ার কাছে। পুঁটুর সৎমা তাকে সদর পার করে দিয়ে এল।

পুঁটু তো কাঁদতে কাঁদতে বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। যেই সেই ঝড়ে পড়ে-যাওয়া গাছের কাছে আসা, অমনি পুঁটু শুনতে পেল ওই নিঃঝুম দুপুরে আলো-আঁধারি ঘোর বনে, থমথমে নিশুনিতে, কোথায় যেন খুটখুট করে একটা আওয়াজ হল। শব্দটা ওর খুব চেনা মনে হল। যেই মনে হওয়া অমনি দেখে বাজ পড়া গাছের গুঁড়ির ওপর দু-পাক লেজ গুটিয়ে বাবু হয়ে বসে গোঁফে তা দিচ্ছেন, কে আবার, ইঁদুরভায়া!

'আরে পুঁটু, তুমি বনের মধ্যে কী করছ? "বাবা-য়াগা"-র বাড়িতে যাচ্ছ না তো?' ইঁদুর বললে।

'তাই তো যাচ্ছি, তোমায় বলব কী করে—সৎমা তোমার কাছে যেতেই দিলে না যে!' পুঁটু বললে।

ইঁদুর বললে, 'কুছ পরোয়া নেই। ঘাবড়াও মৎ। সব ঠিক হো জায়েগা।'

অমনি ফিক করে একগাল হেসে ফেলে পুঁটুরানি বললে—'এসো ইঁদুরভায়া, কিছু খাওয়া যাক। এই দ্যাখো, গামছা ভরে ভরে কত খাবার দিয়েছে আজ আমার সৎমা।'

গাছের ছায়ায় বসে তারা পুঁটলি খুলল—ওমা! পুঁটলির ভেতরে এসব কী? খোলামাত্তর ইটপাটকেল নুড়িপাথর বেরিয়ে পড়ল আর পুঁটু ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেলল। একেই হাঁটতে হাঁটতে খুব খিদে পেয়েছে, তার ওপর ইঁদুরকে নেমন্তন্ন করে ফেলেছে তো, —এতবড় লজ্জা!

ইঁদুর বললে—'পুঁটুরানি পুঁটুরানি! চক্ষু মুছে গামছাখানি আবার দেখো চেয়ে! শেষ করতে পারব কি ভাই আমরা দুজন খেয়ে?'

পুঁটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, কোথায় ইটপাটকেল? মণ্ডামিঠাই সরপুরিয়াতে গামছা ভরতি। আবার এক কুঁজো ঠান্ডা শরবৎও কোত্থেকে জোগাড় করেছে ইঁদুরভায়া। দুজনে মিলে খুব খাওয়াদাওয়া হল।

তারপর ইঁদুর বললে—'তোমার মতো এত নরম, ডাইনিরানি তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। সে কিনা খুব নিষ্ঠুর। তুমি শুধু পথে যা পাবে সব কুড়িয়ে নিয়ো, আর সেগুলো দিয়ে তোমার মন যা চায় তৈরি কোরো। তাহলেই হবে। গামছাটাও সঙ্গে রেখো, কাজে লাগবে।' এই বলেই সুড়ুৎ করে ইঁদুরভায়া হাওয়া।

পুঁটু পথ চলতে লাগল। পথের দিকে নজর রেখে। প্রথমেই দেখল পথের ওপর সুন্দর একটা ফুলকাটা সিল্কের রুমাল পড়ে আছে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বুকের মধ্যে ভরল পুঁটু। তারপর দ্যাখে একশিশি তেল। সেটাও তুলে নিয়ে গামছায় বাঁধল, কে জানে কখন কী কাজে লেগে যায়। আর একটু গিয়ে দ্যাখে একটা বেশ বড়সড় পাঁউরুটি। সেটাও নিয়ে নিলে সঙ্গে। খানিক বাদেই পুঁটু দেখতে পেল পথের ওপরে বড়বড় ক'টা রুইমাছের পেটি। আঁশটে গন্ধ হলেও সেগুলোও পুঁটু বেঁধে ফেললে গামছায়। এতগুলো আশ্চর্য জিনিস পথের মধ্যে পেয়ে পুঁটুর ফুর্তি দ্যাখে কে! সে গান গাইতে গাইতে পথ চলছে, ক্লান্ত হয়নি একটুও। এমন সময় দ্যাখে কী, রাস্তার মাঝখানে একটা কী সুন্দর নীলরঙের রিবন। 'বাঃ!' সেটাও নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখলে পুঁটু।

তার পরেই সামনে পড়ল মস্ত এক লোহার গেট। ডাইনিবুড়ি বাবা-য়াগার বাড়ির সদর দোর। হাত বাড়িয়ে যেই না ঠেলেছে পুঁটু, এমনি ক্যাঁচোর ক্যাঁচ, কোঁওচ কোঁওচ করে গেটদুটোর কী নালিশ! যেন নড়তে চড়তে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে।

পুঁটু বললে, 'ভাগ্যিস সঙ্গে তেলটুকু ছিল! বেচারা গেটদুটোতে কেউ বুঝি তেল দেয় না!' বলে তেলের শিশিটা বের করে গেটের কবজাগুলোয় ভালো করে ঢেলে দিলে। অমনি গেট নিঃশব্দে খুলে গেল।

ঢুকেই দ্যাখে একটা মস্ত কুকুর শুয়ে আছে। কিন্তু সে এত রোগা, হাড় জিরজিরে, যেন ধুঁকছে। পুঁটু বললে 'আহা গো, কেউ বুঝি তোকে খেতে দেয় না?' বলে সেই ফুলো-ফুলো পাঁউরুটি তাকে ছুঁড়ে দিলে।

কুকুর পাঁউরুটিটা খপ্ করে লুফে নিয়ে গবগব করে খেয়ে ফেলে আহ্লাদে লেজ নাড়তে লাগল। তারপর পুঁটু দ্যাখে উঠোনের মাঝখানে একটা কুঁড়েঘর, তার তলায় দুটো মুরগির ঠ্যাং। সেই ঠ্যাং দিয়ে ঘরটা উঠোনময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার ঘরটা একদিকে সরে যেতেই পুঁটু দেখতে পেলে ডাইনিবুড়ির ঝি খুব কাঁদছে। আর ছেঁড়া, নোংরা কাপড়ে চোখ মুছছে, নাক মুছছে। তার খুব সর্দি হয়ে গেছে কেঁদে কেঁদে।

পুঁটু বললে, 'ওগো মেয়ে, তোমার বুঝি রুমাল নেই? এই নাও এতে চোখ মোছো, নাক মোছো।' বলে বুক থেকে বের করে দিলে সুগন্ধি সিল্কের ফুলকাটা রুমালটা।

রুমাল পেয়ে ডাইনির ঝি এত খুশি হল, তার চোখের জল শুকিয়ে গেল, মুখে

হাসি ফুটল, দুঃখিনী মেয়ের হাসিমুখখানি দেখে আকাশের দেবতারা খুশি হলেন। পুঁটুকে আশীর্বাদ করলেন মনে মনে। চলন্ত ঘরখানা কাছে আসতেই পুঁটু ঢুকে পড়ল।

ভেতরে ঢুকে দ্যাখে রোগা লিকলিকে, মাছের কাঁটার মতন চেহারার ছিরি, এক বুড়ি বসে চরকা কাটছে। তাকে দেখেই একগাল হাসলে। বুড়ির হাসি দেখে তো পুঁটুর এদিকে হয়ে গেছে! দাঁতের বদলে সেখানে গনগনে লাল লোহার তৈরি দুপাটি শিকলির মতন ভয়ানক যন্তোর! ওই যন্তোরে পড়লে আর রক্ষে নেই, ধুলো হয়ে যেতে হবে! খিটিমিটি খটাং খটাং খটর খটর শব্দ করে হেসে উঠে বাবা-য়াগা বললে,—'কে গা বাছা তুমি?' বলতে বলতে তার আগুনের ভাটার মতন চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল!

সেই চোখ দেখে আর সেই গলার খোনা আওয়াজ শুনেই পুঁটুর দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার জো! সে অতি কষ্টে বলল,—'ছুঁচ-সুতো চাইতে এসেছি। আমি তোমার বোনঝি হই।'

তখন বুড়ির হাসি দ্যাখে কে! পুলের ওপর দিয়ে দশখানা রেলগাড়ি চলবার মতন ঘটাং ঘটাং শব্দে দাঁত বাজিয়ে অট্টহাস্য করে বললে,—'অঃ। নতুন বোনঝি বুঝি? আয় ধন! বোন ধন! দুটি খাবি তো ধন? তুই বাছা আমার চরকাটাতে সুতো কাট বসে, কেমন? আমি তোর জন্যে ভাত চড়াই গে যাই।'

পুঁটু কাঁদতে কাঁদতে চরকা কাটছে, হঠাৎ দ্যাখে ঘরের কোণে একটা মিনি বেড়াল বসে আছে। পুঁটুকে দেখে সে বললে,—'মিঞাঁও।'

পুঁটু বললে,—'ও পুষি, তুই এত রোগা কেন রে? মাছ খাবি?' বলে গামছা থেকে মাছ ক'খানা খুলে ধরে দিলে।

বেড়াল খুব খুশি হয়ে চেটেপুটে মাছ ক'টি খেয়ে নিয়ে বললে,—'পুঁটুরানি, শিগগির পালিয়ে যাও। বাবা-য়াগা তোমাকে খেয়ে ফেলবে। তোমাকেই সেদ্ধ করতে হাঁড়িতে জল ফোটাতে বলেছে ঝিকে।'

পুঁটু তখন কেঁদে পড়ল—'ও মেয়ে, তুমি ভেজা কাঠে আগুন ধরিয়ো, আগুন যেন জ্বলে না, ও মেয়ে তুমি ফুটো বালতি করে জল এনো, হাঁড়ি যেন ভরে না।' এই বলে কাঁদে আর চরকা কাটে।

ঝি তখন শুকনো কাঠে জল ঢেলে আগুন ধরাতে বসল। আর চালুনি ভরে ভরে জল আনতে লাগল। জানালা দিয়ে একবার উঁকি মেরে গেল বাবা-য়াগা, খন্‌খন্ করে বললে, 'ও বোনঝি, ও ধনমণি, চরকা কাটিস তো? জল হল বলে। ভাত দিলুম বলে।'

পুঁটু বললে, 'হ্যাঁ মাসি, চরকা কাটছি।' ঘরর্ ঘরর্ কটাকট চরকার শব্দ হয়। চরকা ঘোরে।

মিনি বেড়াল বললে, 'ও পুঁটু, এই বেলা পালিয়ে যাও, এই চিরুনিখানা সঙ্গে নাও, আর তোমার গামছাটা। একদম নাক বরাবর, প্রাণপণ ছুটবে। মাঝে মাঝে মাটিতে কান দিয়ে শুনে নিয়ো বাবা-য়াগা আসার শব্দ। সে উদুখলে চেপে যাবে, ঝুলনাড়া দিয়ে পথ ঝাঁট দিতে দিতে। যেই শুনবে ঘটাং ঘটাং উদূখলের আওয়াজ কাছাকাছি, অমনি ওই ভিজে গামছাটা ছুঁড়ে দিয়ো! মস্ত নদী হয়ে সে ডাইনির পথ আটকাবে। তাও যদি বুড়ি পেরুতে

পারে, তাহলে ছুঁড়ে দিয়ো এই জাদুর চিরুনি। এর দাঁতগুলো মস্ত মস্ত গাছ হয়ে এমন ঘন জঙ্গল তৈরি করবে যে ডাইনিরানিও বেরুবার পথ খুঁজে পাবে না। তুমি ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাবে।'

'কিন্তু চরকার কী হবে?' পুঁটু বললে, 'চরকা থামলেই তো ডাইনি জানতে পারবে আমি পালিয়ে গেছি!'

পুষি বললে, 'ও চরকা আমিও চালাতে পারি। বুড়িকে জানতে দেব না।'

পুঁটু তখন উঠোনে নামল। যেই না বেরুবে অমনি সেই মস্ত কুকুর তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে এল, কিন্তু যেই দেখেছে পুঁটু, আর কামড়াল না। বললে, 'আরে এ তো সেই লক্ষ্মী মেয়ে।'

পুঁটু ইয়া বড় লোহার গেটে হাত ছোঁয়ানোমাত্তর তারা হাট হয়ে খুলে গেল—একদম টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে না। ডাইনি জানতেই পারলে না যে পুঁটু পালাচ্ছে।

দোরগোড়াতে ছিল একটা ঝাঁকড়া কাঁটায় ভরা বাবলাগাছ। সে যেই নুয়ে পড়েছে পুঁটুর মুখে ঝাপটা মারবে বলে, পুঁটুর তো নরম মন, সে অমনি ডালটা ধরে ফেলে বললে, 'ও-মা-গো, তুই কাঁটাগাছ বলে কেউ তোকে ভালোবাসে না। বুঝি! তাই তুই এমন রাগী? আয় তোকে সাজিয়ে দিই।' বলে কোমর থেকে নীল রিবনটা নিয়ে গাছের ডালে সুন্দর একটা মস্তবড় ফুল বেঁধে দিলে।

'দ্যাখ তো এবার মুখখানা ওই পুকুরের জলে! কী সুন্দর নীলফুল ফুটেছে তোর ডালে।' বাবলাগাছ জলে মুখ দেখলে। তাই তো? সত্যি তাকে কেউ কোনওদিন আদর করেনি, সে খুশি হয়ে ডাল নেড়ে নেড়ে পুঁটুকে টা-টা করতে লাগল।

পুঁটু এদিকে ছুটছে ছুটছে ছুটছে। পথ যেন আর ফুরোতে চায় না।

বাবা-য়াগা আবার জানলায় গিয়ে ডেকেছে—'ও নতুন বোনঝি ও ধনমণি, চরকা কাটিস তো লো? জল হল বলে, ভাত দিলুম বলে।'

চরকা বলে ঘরর্ ঘরর্, কটাং কট। কেউ সাড়া দেয় না, 'কই রে বোনঝি, কথা কস না কেন?'

বেড়াল বললে, 'এ্যাঁও।' অমনি বুড়ি তেড়ে মেড়ে ঢুকে পড়ে দ্যাখে বেড়াল মনের সুখে সুতোয় জট পাকাচ্ছে, ওঃ, সে কী পেল্লায় জট রে বাবা। সারাজীবন ধরে ডাইনি যত সুতো কেটেছিল সমস্তই পুষি জট পাকিয়ে ফেলেছে। বুড়ি বললে, 'তবে রে ব্যাটা পাজি বেড়াল, তোর এই কাজ?'

বেড়াল বললে, 'কেন করব না? তুমি সারাজীবনে মাছের কাঁটাটি পর্যন্ত খেতে দাওনি। পুঁটুরানি আমাকে কত মাছ খাইয়েছে। তার মন কত নরম, কত ভালো!' বলেই সে জানলা গলে পালিয়ে গেল।

বুড়ি বেরিয়ে বললে, 'ও ঝি! তুই জল ফোটাতে পারলি নে এখনও? তোর দেরির জন্যেই মেয়েটা পালাল।'

ঝি বললে, 'কেন দেরি করব না? তুমি আমাকে সারাজীবনে একটা নতুন সুতি কাপড় দাওনি। আমাকে পুঁটুরানি নতুন ফুলকাটা কী সুন্দর সিল্কের রুমাল দিয়েছে। তার

মন কত নরম, কত ভালো, আমি কেন তাকে সেদ্ধ করব?'

শুনে বুড়ি যেই তাকে একটা ভেজা কাঠ তুলে মারতে গেল, ঝি অমনি উনুনের পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

তখন বাবা-য়াগা তার কুকুরকে তেড়ে গেল। 'বলি বাঘা, এই কি তোর প্রভুভক্তি? পুঁটুর-টুঁটিটা কেন কামড়ে ধরলি না?'

বাঘা বললে, 'কেন ধরব? আমি খেতে পাই না, তুমি সাতদিনে একবার এক টুকরো রুটি খেতে দাও, আমি গায়ে জোর পাব কী করে? পুঁটু আমাকে আস্ত একটা ফুলো-ফুলো পাঁউরুটি খাইয়েছে, তার মন কত নরম, কত ভালো। কেন আমি তাকে কামড়ে দেব?'

যেই বাবা-য়াগা ওকে একটা পাথর তুলে মারছে, বাঘা অমনি ঘ্যাঁক করে তেড়ে গেছে আর ডাইনির হাত থেকে পাথরটা পড়েও গেছে!

ডাইনি তখন গেল গেটকে বকতে। 'কেন ব্যাটারা আওয়াজ করিসনি? পুঁটু যে পালিয়ে গেল। আমি ওকে সেদ্ধ করে পুলি-পিঠে খেতুম!'

গেট বললে, 'তুমি জন্মে আমাদের তেল কেন জলটুকু পর্যন্ত দিতে না, পুঁটু একশিশি তেল মালিশ করে আমাদের শরীর মন ভালো করে দিয়েছে। ওর মন কত নরম, কত ভালো। আমরা তাই আওয়াজ করিনি।'

বুড়ি রেগেমেগে গেটের লোহার গায়ে দুটো কিল মেরে, ব্যথা পেয়ে, নিজেরই বাঁহাত দিয়ে ডানহাতে হাত বুলোতে বুলোতে বাবলাগাছকে ধমক দিলে, 'ব্যাটার যেমন চেহারা, তেমনি স্বভাব। কেন কাঁটা-ঝাপটা মারিসনি পুঁটুর সুন্দর মুখখানাতে? অমন জলখাবারটা আমার ফস্কে দিলি?'

বাবলাগাছ মাথা দুলিয়ে বললে, 'দ্যাখো দিকি, আমার আজ চেহারা কত সুন্দর হয়েছে। পুঁটু আমার কাঁটাঝোপে ফুল ফুটিয়েছে, নীল ফুল! সে আমাকে আদর করেছে। তার মনটা কত নরম, কত ভালো। আমি তাকে মোটেই কাঁটা-ঝাপটা মারতে চাই না।'

ডাইনিবুড়ি আর কী করে। ছুটে গিয়ে তার উদুখলে চড়ে বসল। উদুখলে নোড়া পিষতে পিষতে ঘটাং ঘটাং করে সে চলল মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে মাটি ঝেঁটিয়ে ঝেঁটিয়ে—উদূখল যাতে উলটে না পড়ে—আর বিড়বিড় করে জাদুমন্তর পড়ছে—'চল রে উদূখল বাতাসের আগে। যে পথে পুঁটরানি বাপের বাড়ি ভাগে।' উদূখল তো ছুটছে রাস্তার পিচ ঢালবার গাড়ি যেমন ছোটে, তেমনি করে। গড়িয়ে গড়িয়ে।

ওদিকে পুঁটুরানি মাঝে মাঝে থামে আর মা-ধরণীর বুকে কান পেতে শোনে—বুড়ি আসছে কি না। যেই শুনেছে ঘটাং ঘটাং ঝপ্পর ঝপ্—উদূখল, নোড়া আর ঝাঁটার আওয়াজ—অমনি বুঝেছে; ডাইনি। আর তখ্খুনি সে ভিজে গামছাখানা পেতে দিয়েছে পথের ওপরে, আড়াআড়ি। গামছা কেবলই বাড়ে, কেবলই বাড়ে, আরও ভিজে হয়, আরও জোলো হয়, শেষে সেই গামছা হয়ে গেল এক বিশাল গঙ্গানদী, তার এপার থেকে ওপার দেখা যায় না।

বাবা-য়াগা দেখে—আরে সামনে নদী। উদূখল তো ভাসবে না, ঝপাং করে ডুবে

যাবে। বুড়ি তখন আঁজলা ভরে জল খেতে বসল! বুড়ি তো অগস্ত্যমুনি না, জল খেয়ে-খেয়ে বুড়ি আর শেষ করতে পারে না। তখন বুড়ি তার গাঁয়ে ফিরে গিয়ে যত কাটা গরু, মহিষ, ছাগল পেলে সব ধরে এনে হুকুম করলে, 'নে—জল খা!' সব গরু ভেড়া ছাগল মহিষ জল খেতে খেতে খেতে খেতে যখন নদীটা শুকিয়ে ফেললে, তখন উদুখল চেপে ডাইনি নদী পেরুল।

পুঁটু তো ছুটছে ছুটছে ছুটছে, যেই একবার থেমেছে, মাটিতে কান পাতবার জন্যে, অমনি শোনে ঘটাং ঘটাং ঝপ্পর ঝপ ঝপ্পর খপ্—। 'এই রে বুড়ি তো তবে নদী পেরিয়েছে!' বলে পুঁটু তখন চিরুনিটা ছুঁড়ে দিলে পেছনের রাস্তার ওপরে। অমনি, কী আশ্চর্যি! আজও ভাবতে লোকের গায়ে কাঁটা দেয়, সেই চিরুনির দাঁড় থেকে গজিয়ে উঠল এক গহন অরণ্য, এক ঘন ঘোর জঙ্গল। সেখানে দিন-দুপুরেও অমাবস্যের অন্ধকার ঘুটঘুট করছে এমনই গাঢ় সেই বন। পুঁটু ভাগ্যিস বুদ্ধি করে পেছনদিকেই ছুঁড়েছিল চিরুনিটা, সামনে দিকে ছুঁড়লে সে তো নিজেই হারিয়ে যেত ওই গভীর অরণ্যে। বাবা-য়াগা উদূখল আর ঝাঁটাসুদ্ধু রেগে-মেগে যেই ঢুকেছে বনের মধ্যে অমনি ঘন লতায় পাতায় জড়িয়ে গেল তার ঝাঁটা, তার উদূখল, তার নোড়া, তার লোহার শিকলি দাঁত, তার মাছের কাঁটা, হাত-পা। কে জানে বাবা-য়াগা এখনও সেই জঙ্গল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে যুদ্ধ করছে কি না!

পুঁটুরানি তো ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছুল, তখন ভর সন্ধেবেলা, সে ঘরে না গিয়ে সোজা গেল গোয়ালঘরে। সেখানে তার ইঁদুরভায়া ছিল, সে ছুটে এসে বললে, 'পুঁটুভাই, তোমার বাবা তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান, আর তোমার সৎমাকে খুব বকেছে একলা তোমাকে বনে পাঠাবার জন্যে, তুমি গিয়ে বাবাকে সব কথা বলে দাও। আজকে বুড়ো তোমার কথাই বিশ্বাস করবে।'

পুঁটু তখন ঘরে যেতেই বাবাবুড়ো এসে তাকে কোলে তুলে নিলে। মেয়ের জন্যে কেঁদে কেঁদে তার শুকনো গালদুটি ভিজে গেছে। পুঁটুর ধুলোমাখা পা-দুটি নিজের হাতে ধুইয়ে দিয়ে, মুখখানি ভিজে গামছায় মুছিয়ে দিয়ে, বাবা বললে, 'এখন কোনও কথা নয়, আগে দুটি দুধভাত খেয়ে নাও।'

পুঁটু বাবার হাতে-মাখা দুধ ভাত কলা খেয়ে বাবার কোলে শুয়ে শুয়ে বাবাকে সব কথা বললে। শুনে বাবাও কেঁদে ফেললে, আর ডাইনিবুড়ি সৎমাকে গাঁয়ের লোকেরা লাঠি-পেটা করে গাঁয়ের বাইরে দূর করে দিয়ে এল।

তারপর থেকে পুঁটুরানি আর তার বাবা আবার আগের মতন মনের সুখে থাকে। একগাল হেসে হেসে ডাল-রুটি খায়, আর তাদের সঙ্গে পিঁড়ি পেতে বসে আরেকজন কে খায় বলো তো? দু'পাক লেজ গুটিয়ে, বাবু হয়ে বসে, গোঁফ নেড়ে নেড়ে, হাসি-হাসি মুখ করে? তাকে চেনো কি?*

* [রুশ উপকথা অবলম্বনে]
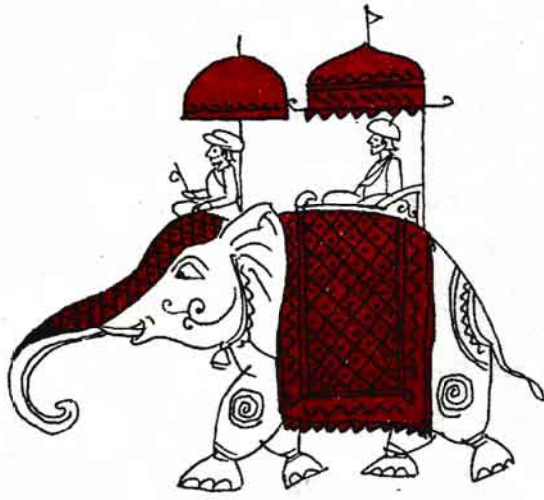
চিকচিক আর রাজহাঁসদাদু

নভেম্বর মাস হতে না হতেই ওরা এসে পড়ে। সেই উলান-বাটোর থেকে উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে আসে আলিপুর চিড়িয়াখানার এই পুকুরে। চিকচিক পুকপিক টুং-টুং লুং-পুং সব্বাই সব্বাই...তাদের বাবা-মা, খুড়ো-জেঠা, মামা-মাসি, মেসো-পিসে, দাদু-ঠাকুরদা সক্কলে মিলে...উড়ে যায়—তাদের যে শীতকালে দক্ষিণে বাতাসে চেঞ্জে যাওয়ার সময় হয়েছে। মঙ্গোলিয়া থেকে সাইবেরিয়ার বরফ পার হয়ে চিন—তারপর মাঞ্চুরিয়া পেরিয়ে, সোভিয়েত রুশিয়ার ওপর দিয়ে জর্জিয়া, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান সমস্ত পেরিয়ে ওরা উড়ে আসে, কাবুলের মেওয়া খেতের ওপর দিয়ে, তিব্বতের লামাদের মঠের ওপর দিয়ে, হিমালয় পাহাড় পেরিয়ে, এভারেস্ট চুড়োর ওপর দিয়ে, ওরা উড়ে আসে। এমনকী ওই যে একবছরি খুকু খুক-খিক, সেও এসেছে।

চিকচিকও এসেছিল একবছর বয়সে। এখন তার দু-বছর। এর মধ্যেই সে তিনবার এভারেস্টের মাথার ওপর দিয়ে এপার-ওপার ডিঙিয়েছে। লক্ষ লক্ষ পাখির কলরবে আলিপুর চিড়িয়াখানার দিঘির বাতাসে যেন সেতার বাজছে। জলটল প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। খুদে খুদে বিদেশি পাখিতে পাখিতে দিঘির রুপোলি গাটা ভরতি হয়ে গেছে, ঠিক যেন একটা হাজারবুটি সাদা টাঙ্গাইল রুপোলি গাটা ভরতি হয়ে গেছে, ঠিক যেন একটা হাজারবুটি সাদা টাঙ্গাইল শাড়ি। চিক-চিকদের পাড়াসুদ্ধু, গাঁসুদ্ধুই কেবল নয়, ওদের দেশসুদ্ধু—মানে উলান-বাটোরের উত্তরে যে জলাটায় ওরা থাকে, সেই জঙ্গলের সব ক'টা পাখি এখন এই দিঘিতে। অন্তত একশো বছর ধরেই ওরা উড়ে আছে এইখানে। একবারও পথ ভোলে

না। যেমন আসে তেমনি আবার ফিরে যায় ঠিক—লক্ষ লক্ষ যোজন পথ পেরিয়ে, নিজেদের জলে, নিজেদের জঙ্গলে।

চিকচিক দেখলে একটা সুন্দর মতন পোকা তিড়িং করে জলের ওপরে লাফালে, তার পরই জলের মধ্যে দিলে ডুব! চিকচিকও ডাইভ দিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে—উ-হু-হু-হু-হু!! গেছি!! গেছি!! চিকচিকের মাথাটা কার মাথার সঙ্গে জানি ঠুকে গেল! অমনি চিকচিক শুনতে পেল ভারী গলায় কে যেন বললেন—'আহা-হা! ষাট! ষাট! লাগল বুঝি? আমি দেখতে পাইনি বাছা।'

চিকচিক মুখ তুলে চেয়ে দ্যাখে ইয়া লম্বা চওড়া বিশালবপু শালপ্রাংশু, মহাগ্রীবা এক রাজহাঁস। রেশমের মতো কুচকুচে কালো তাঁর গায়ের রং, টুকটুকে লাল তাঁর ঠোঁট। ওই পোকাটার জন্যে ডুব দিয়েছিলেন রাজহাঁসও।

রাজহাঁস বললেন—'তোমার মাথায় কি খুব বেশি লেগেছে?'

চিকচিক বললে, 'না-না।'

রাজহাঁস তখন তাকে একটি রস টুসটুসে কচি পোকা খেতে দিলেন—'না-না' বলতে বলতে চিকচিক সেটা খেয়ে ফেললে। এমনি করে দুজনে বেশ ভাব হয়ে গেল।

রাজহাঁস ওর ঘরবাড়ির কথা শুনতে চাইলেন,—ওর নাম ঠিকানা জিগ্যেস করলেন। চিকচিকের বয়েস মাত্র দু-বছর, এরই মধ্যে সে এত এত দেশবিদেশের নতুন নতুন আকাশ চষে বেড়িয়েছে, কত কী আশ্চর্য সব জিনিস দেখেছে, শুনতে শুনতে রাজহাঁসের চোখ উদাস হয়ে যায়। তিনি জিগ্যেস করেন—'আঙুর খেতের ওপর দিয়ে কখনও তুমি উড়ে এসেছ?'

চিকচিক বলে—হ্যাঁ...।'

'এভারেস্টের চুড়ো ডিঙিয়ে তোমরা উড়ে এসেছ?'

চিকচিক ঘাড় দুলিয়ে বললে—'হ্যাঁ।'

'গঙ্গানদীর উৎপত্তি যে গুহায়, সেই গুহার পাশ দিয়ে উড়ে এসেছ?'

চিকচিক আবার ঘাড় দোলায়—'হ্যাঁ।'

এবারে রাজহাঁসদাদুর চোখদুটো ছলছল করে উঠল। তিনি বললেন, 'জানো চিকচিক, আমার বয়েস সাত অথচ আমি এই আলিপুর চিড়িয়াখানার দেওয়ালের বাইরে কিছু দেখিনি।'

—'গঙ্গানদীও দ্যাখোনি?'

'নাঃ।'

'হাওড়ার ব্রিজও নয়?'—চিকচিক অবাক হয়ে যায়।—'সে কী? এসব তো ঠিক পাশেই, একদম কাছে। আমি তোমাকে এক্ষুনি দেখিয়ে আনতে পারি!'

রাজহাঁসদাদু বললেন—'কী করে দেখব? আমি জন্মেছি তো এইখানে এই চিড়িয়াখানাতে! আমার বাবা-মা কিন্তু অন্য দেশ দেখেছেন। তাঁরা জন্মেছিলেন সাতসাগরের ওপারে জেনিভা বলে একটা শহরে, লাক লেমান বলে একটা মস্ত নীল হ্রদের মধ্যে। তার নীল কাচের মতন জলে চারপাশের সাদা-সাদা বরফ-ঢাকা পাহাড়ের ছায়া কাঁপে—সে জল এরকম গরম

নয়, বরফগলা নদীরা এসে তাকে ঠান্ডা করে রাখে। আর তার নীচে সবুজ সবুজ শ্যাওলার ঝোপঝাড়, দামের বন—তাতেও কত রং-বেরঙের ফুল ফোটে, যেন মণিমুক্তোর গয়না! ঝলমল করে তোলে জলের নীচের রাজ্যটাকে। আমার মা-বাবা দাদু-দিদিরা সবাই মিলে সেই হ্রদে বাস করতেন। একবার সেই দেশের সরকার কলকাতার বাচ্চাদের জন্যে উপহার পাঠালেন আমার বাবা আর মাকে। তোমাদের মতো নিজের খুশিতে উড়ে উড়ে নয়, বাবা-মা এসেছিলেন খাঁচার মধ্যে, এরোপ্লেনে চড়ে। সেই থেকে আমাদের আর অন্য দেশ দেখা হয়নি।'

মন দিয়ে চিকচিক সব শুনছিল। শুনেটুনে সে বললে—'লাক লেমান তো আমি চিনি না তবে তোমাকে ঠিক ওইরকম আরেকটা লেকে নিয়ে যেতে পারি! তার নাম মানস সরোবর। সেখানেও অনেক রাজহাঁসেদের বাস। আমি দেখেছি। তারও নীল জলে সাদা বরফে ঢাকা পাহাড়ের ছায়া পড়েছে, তারও গভীরে মণিমাণিক্যের মতো দামের ফুল ফুটে জল আলো করে আছে। তুমি যাবে দাদু? আমি পথ চিনি। তোমাকে নিয়ে যাব।'

রাজহাঁসের চোখদুটো এবার ঝকঝক করে উঠল, যেন হিরের কুচি থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে—'নিয়ে যাবি ভাই? নিয়ে যাবি তোর সঙ্গে? আমি যাব।'

'বেশ তো, মার্চ মাসে আমরা যখন বাড়ি ফিরব, তখন তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব। মানস সরোবর তো বেশি দূরে নয়। উলান বাটোরের মতো নয়। তৈরি থেকো। তোমার ডানাটায় জং ধরে যায়নি তো? একটু ওড়াটা প্র্যাকটিস করে রেখো দাদু।'

মার্চ মাসে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অতিথি পাখির ঝাঁক ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আবার বাড়ির পথ ধরতে শুরু করল। চিড়িয়াখানার দিঘির বুক যখন খালি হয়ে আসছে, বাতাসে পাখিদের রিনিঝিনি গান যখন ঝিমিয়ে আসছে, তখন একদিন অবাক হয়ে চিড়িয়াখানার বাসিন্দা যত জন্তুরা আর বেড়াতে আসা সব মানুষরা দেখতে পেল, খুদে খুদে পাখির ঝাঁকের, দু'খানি বিশাল কালো ডানা মেলে আকাশে উড়ে গেল একটা মস্ত কালো রাজহাঁস। রাজার মতনই সেই ওড়া—ব্ল্যাক সোয়ান না তো ব্ল্যাক প্রিন্স যেন।

চিড়িয়াখানার কর্তাব্যক্তিরা হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। এ কী অলুক্ষুনে কাণ্ড? রাজহাঁস আবার মাইগ্রেটরি বার্ডদের সঙ্গে ওড়ে নাকি? একজাতের পাখিরা দলবেঁধে একসঙ্গে ওড়ে—প্রকৃতির এই নিয়ম তারা জীবনেও বেজাতের পাখিদের দলে নেয় না। জীবজগতে তো অনিয়ম বলে কিছু নেই? এ তবে কী কাণ্ড? যাযাবর পাখিদের ডানায় কত জোর, তাদের বুকে কত সাহস, তাদের দেহ কত হালকা—তারা মেঘ ছাড়িয়ে উড়ে যায়, তারা একটানা লক্ষ লক্ষ যোজন পথ পার হয়ে দূর বিদেশের গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। আর রাজহাঁস? চিড়িয়াখানায় যার জন্ম, সে বড়জোর হাপুস হুপুস করে একটু আধটু উড়তে পারে—তার পক্ষে কখনও সম্ভব অত উঁচুতে ওড়া? ও যে হাঁপ ধরলেই পড়ে যাবে? ওকে যে জন্তুজানোয়ারে কিংবা লোভী মানুষে ধরে খেয়ে ফেলবে। বোকা রাজহাঁসটা কী নিজেকে যাযাবর পাখি ভেবেছে? পাখিদেরও কি মাথার গোলমাল হয়? সবাই হায় হায় করতে লাগল—মাথা চাপড়াতে লাগল।

রাজহাঁসদাদু এদিকে উড়তে উড়তে নিজেই বুঝতে পারলেন—এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

ওড়া তাঁর কম্মো নয়। তিনি বললেন—'বাছা চিকচিক, আমি তো বুড়ো হয়েছি, আমার শরীরও অনেক ভারী তোমাদের চেয়ে, তা ছাড়া আমার অনেকদিন ওড়া অভ্যেস নেই ডানায় জং ধরেছে, আমি বোধহয় পারলুম না ভাই! আমার বুক ধড়ফড় করছে, হার্টের কষ্ট হচ্ছে, ব্লাড প্রেশারটাও যেন বড্ড হাই হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে, আমি আর পারছিনে ভাই, এ-জন্মে আমার আর মানস সরোবরে যাওয়া হল না। আমি বরং ফিরে যাই, তোমার সঙ্গে সামনের বছরে দেখা হবে।'

চিকচিকের মনে খুব কষ্ট হল, কিন্তু সেও বুঝতে পারছিল যে এটা সম্ভব নয়। দাদুকে আলিপুরে ছেড়ে দিয়ে আসাই ভালো। ততক্ষণে নীচে, খিদিরপুরের সোনালি রঙের গঙ্গা নদী ঝলমল করে উঠেছে প্রথম সূর্যের আলোয়। চিকচিক বললে—'দাদু, ওই দেখে নাও নীচেই গঙ্গ নদী—একটা তবু তো নতুন জিনিস দেখা হল তোমার?'

রাজহাঁস খুব খুশি হয়ে উঠলেন, 'বাঃ, এই তবে গঙ্গা? আরেকটু উড়ে গেলে সমুদ্দুর?'

কিন্তু না। ফেরাই ভালো। একটু বাদে চিড়িয়াখানার লোকেরা দেখলে মস্ত ডানা ছড়িয়ে কালো রাজহাঁস আবার ফিরে আসছে, তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে, ছোট্ট একটি যাযাবর পাখি, বড় জাহাজকে যেমন সমুদ্র থেকে পথ দেখিয়ে নদীতে নিয়ে আসে খুদে পাইলট নৌকো—গভর্নরের গাড়ির সামনে যেমন যায় এডিসির খুদে মোটরবাইক। রাজহাঁসদাদুকে দিঘির কাছে পৌঁছে দিয়ে ডানা নেড় নেড়ে টা-টা বাই-বাই বলতে বলতে চিকচিক ফিরে গেল তার দলের কাছে। আর রাজহাঁস? ক্লান্ত, অতি ক্লান্ত হয়ে জলের এক কোণে নেমে, ডানার মধ্যে ঘাড় গলা ঠোঁট গুঁজে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলেন—নীল জলের এক হ্রদ, তাতে সাদা ধবধবে পাহাড়ের ছায়া পড়েছে, জলের মধ্যে চুন্নীপান্নার তৈরি ফুল ফুটে আছে, সেখানে ঝাঁক ঝাঁক কালো আর সাদা রাজহাঁস খেলা করছে।

পরের বছর নভেম্বর মাসে চিকচিকরা আবার যখন আলিপুরে এল, চিকচিক রাজহাঁসদাদুকে খুঁজতে লাগল, কিন্তু দিঘিতে কোথাও তাঁকে দেখা গেল না। অনেক বয়েস হয়েছিল, কী জানি, হয়তো বা স্বর্গেই গেছেন—ভেবে চিকচিকের মন খারাপ হয়ে গেল। এমন সময়ে দ্যাখে হেলতে দুলতে হেলতে দুলতে ডাঙা দিয়ে হেঁটে হেঁটে রাজহাঁসদাদু আসছেন। দেখে চিকচিকের প্রাণে বেজায় উল্লাস হল।—'কোথায় গেছলে দাদু, আমি যে তোমাকে খুঁজেই পাই না।' বলেই টুক করে একটা পেন্নাম করলে চিকচিক।

দাদু বললেন—'থাক-থাক। আমি গিয়েছিলুম ওদিকে পুকুরে আমার নাতিটাকে দেখতে।'

হইহই করে চিকচিক বললে, 'চলো চলো, তোমার নাতি দেখে আসি। সে কি উড়তে শিখেছে?'

রাজহাঁসদাদু বললেন—'এই তো সবে ডানায় পালক গজিয়েছে, এবার শেখালেই শিখবে। তবে ওকে এখানে শেখাবে কে? ওর বাবা-মা তো উড়তে জানেই না—আমি তবু একটু একটু জানতুম।'

চিকচিক বললে, 'কুছ পরোয়া নেই দাদু, আমি ওকে উড়তে শেখাব। এখন তো

ছোট আছে, এখন থেকে শিখলে ওর ঠিক আমার মতন ডানার জোর হবে। ওকে তুমি দেখো দাদু, আমি ঠিক মানস সরোবরে নিয়ে যাব!'

চিকচিকের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ রাজহাঁসদাদুর চোখ থেকে টুপ করে একফোঁটা জল পড়ল দিঘির জলে। 'চিকচিক তুমি খুব ভালো ছেলে, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।' বলে তিনি ডানা তুলে আশীর্বাদ করলেন।

সেদিন থেকেই শুরু হল তালিম দেওয়া। চিকচিকের সঙ্গে রাজহাঁসদাদুর কালো কুচ্ছিত নাতিটা রোজ ওড়াউড়ি প্র্যাকটিস করে। রোজ একটু একটু করে ওপর দিকে ওড়ে। আস্তে আস্তে সে বড় হল—সুন্দর, তেজি, গরগরে-চকচকে একটা রাজহাঁস হয়ে উঠল সেও। চিকচিকের চেয়ে তিনগুণ বড় বটে তার শরীর, কিন্তু খুব মন দিয়ে সে চিকচিকের কাছে ওড়া শেখে। চিড়িয়াখানাতে যারা বেড়াতে আসে তারা অবাক হয়ে দ্যাখে একটা কচি রাজহাঁস আর একটা খুদে যাযাবর পাখিতে খুব ভাব—সবসময়ে তারা একসঙ্গে ওড়ে।

একদিন রাজহাঁসের নাতি মেঘ ছাড়িয়ে উড়ে গেল। রাজহাঁসদাদু জলে বসে দেখতে পেলেন নাতিকে আর দেখা যাচ্ছে না। অনেক—অনেকক্ষণ পরে নাতি যখন সন্ধেবেলা ফিরল, দাদুর কাছে কত গল্প করল। সে অনেক দূরে, পুবদেশে গিয়েছিল—পদ্মানদীর চর দেখেছে, জয়ন্তীয়া পাহাড় দেখেছে, মণিপুরের সোনার বরণ আনারসবন দেখেছে। রাজহাঁসদাদুর মনে ফুর্তি আর ধরে না। তিনি চিকচিককে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করলেন।—হবে, এবার হয়তো হবে। তাঁর যা হয়নি নাতিবাবুর তাই হবে। সেবার মার্চ মাসে যাযাবর পাখিরা যখন উড়ে গেল, আবার একটা কালো রাজহাঁস বিশাল ডানা মেলে তাদের সঙ্গে আকাশে ফিরল। চিড়িয়াখানার কর্তারা এবারে আর উদ্বেগ করলেন না। ও আবার ঠিক ফিরে আসবে'খন। কত দূরেই বা যাবে? গতবারের মতন ফিরে আসবে এখুনি।

উড়তে উড়তে যাযাবর পাখির ঝাঁক দূর আকাশে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটি কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু সেটিও আর দেখা গেল না।—এবার কিন্তু কালো রাজহাঁসটি আর ফিরে এল না। চিড়িয়াখানার লোকেরা ভেবে ভেবে অস্থির। তারা ধরেই নিল রাজহাঁসটা কোথাও ঝুপ করে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজহাঁসদাদুর সে ভয় করল না। ঝুপ করে কখনও পড়বে না তাঁর নাতি। দু'দিন তিনদিন চারদিন রাজহাঁসদাদু দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি মনে মনে জানলেন—চিকচিক তার কথা রেখেছে। তাঁর নাতি এখন মানস সরোবরের ঘন নীল জলে, মানিকের ফুল, মুক্তোর পাতায় বরফঢাকা চুড়োর আলো-ছায়াতে গা ভাসিয়ে নীলপদ্মের মধু খাচ্ছে।
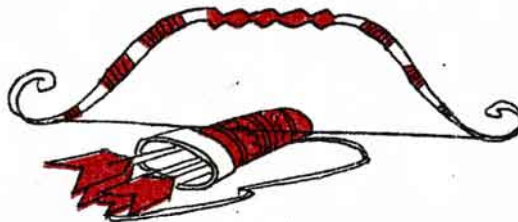
গুগলিরানি আর শামুককুমার

এক গ্রামে দুই ভাইবোন থাকত। তারা রোজ সকালে বেরোয়, পাঠশালায় পড়তে যায়। পথে একটা মস্ত পুকুর। তাতে কত পদ্মফুল, আহা, পথ যেন আলো করে থাকে। বোনের রোজই ইচ্ছে করে দুটি-একটি ফুল তুলতে। কিন্তু ভাই বলে—'যাসনে বোনটি, আমি শুনেছি এই পুকুরে এক জলদস্যির বাস। কে জানে কখন ধরে নেবে? তাই তো কেউ এর ফুল তোলে না।' শুনে, বোন আর ফুল তোলে না। কিন্তু একদিন তার খুব লোভ হল। একটি ফুল যেন বাতাসে হেলেদুলে, রোদ্দুরে হেসে হেসে, তাকেই ডাকছে! ভাই একটু এগিয়ে গেছে দেখে বোন ভাবলে—'যাই, দাদা তো দেখছে না, ফুলটা তুলে নিই!' এই ভেবে যেই সে ডাঙা থেকে হাত বাড়িয়ে ফুলের ডাঁটাটি ছুঁয়েছে, ফুল অমনি মস্ত জলদত্যি হয়ে দুহাত বাড়িয়ে তাকে জলের ভেতর টেনে নিলে। বোন 'দাদা গো! দাদা গো!' বলে কাঁদতে কাঁদতে জলের মধ্যে ডুবে গেল। ভাই আপন মনে যেতে যেতে বোনের কান্না শুনে শেলেট-পেনসিল ফেলে দিয়ে দৌড়ল। যেই না সে পুকুরপাড়ে কাদার মধ্যে পা ফেলেছে, অমনি জলদত্যি, কাদার ভেতর চোরাকাদা হয়ে, তাকে দুই পা ধরে মারলে হ্যাঁচকা টান! 'হে ভগবান, রক্ষে করো' বলতে বলতে ভাইটি চোরাকাদায় তলিয়ে গেল। কিন্তু ভগবান তার ডাক শুনতে পেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ভাইকে শামুক আর বোনকে গুগলি বানিয়ে দিলেন—জলদত্যি যাতে তাদের আর খেয়ে ফেলত না পারে। গুগলিও একমুহূর্তেই শক্ত খোলসের বর্মের মধ্যে আশ্রয় পেয়ে গেল, শামুকও ঠিক তাই। বুড়ো জলদত্যি নরম সরম জিনিস ছাড়া খেতে পারে না—কাদায় তাই কতই শামুক, পুকুরে

কতই গুগলি নির্ভয়ে ঘরকন্না করছে। এই দুই ভাইবোনও যেই গুগলি-শামুক হয়ে গেল, জলদত্যিও তাদের উগড়ে বের করে দিলে।

'বোনটি আমার জলের মাঝে শুনতে কি পাও?
শামুককুমার দাদা তোমার, সাড়াটি দাও।'

তখন জলের ভেতর থেকে সাড়া এল—

'শামুককুমার দাদা আমার লক্ষ্মী
তোমার কথা না-শুনে এই ঝক্কি—
গুগলিরানি বোনটি
চিনতে পারো, কোনটি?'

শামুককুমার বললে, 'গোলাপফুলের মতন গালদুটি আর কালোজামের মতন চোখের মণি সেই আমার বোন।'

অমনি একটি গোলাপি রঙের সুন্দরী গুগলি, তার কালোজামের মতন চোখদুটি নিয়ে ভেসে উঠল। তারপর থেকে ডাঙায় ভাই আর জলে বোন দুজনে মিলে খুব গল্প হয়, খেলাও করে, কিন্তু তাদের পাঠশালার বন্ধুদের জন্যে মন কেমন করে। পণ্ডিতমশাইয়ের জন্যে মন কেমন করে। কোনওদিনই কি আর তাদের সঙ্গে এ জন্মে দেখা হবে? এই শামুক আর গুগলি হয়েই জীবন কাটাবে। শামুক থাকে তার পুরো বাড়িটা মাথায় নিয়ে, গুগলিও তাই। তারা তাই একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকতেও পারে না। ওই খোলসর্বস্বই তাদের দুষ্টু জলদত্যির মুখ থেকে রক্ষা করেছে। তাই তারা খোলার ভেতর থেকে বেরুতেও পারে না। কী করে? দুই ভাইবোন কেবল ভাবে, আর ভাবে।

একদিন পুকুরপাড় দিয়ে ওদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই যাচ্ছেন খড়ম পায়ে, ছাতা মাথায় দিয়ে। তাঁকে দেখে শামুককুমারের মনে হল, তাই তো? পণ্ডিতমশাই তো খুব জ্ঞানী মানুষ, ওঁকেই গিয়ে ধরি। উনি যদি উদ্ধারের কোনও উপায় জানেন। কিন্তু শামুক কখনও হেঁটে গিয়ে মানুষকে ধরতে পারে? পণ্ডিতমশাই চলে গেলেন। শামুককুমার ঠিক করলে সে আস্তে আস্তে পাঠশালাতেই চলে যাবে। একদিন না একদিন তো পৌঁছবেই? গুগলিরানি ভয় পেয়ে বললে—'দাদা, তুমি ঠিক যেতে পারবে তো? যদি কেউ ধরে নেয়? যদি গাড়ি চাপা দেয়? তার চেয়ে যেয়ে কাজ নেই। যেমনি আছি তেমনি থাকি।'

শামুককুমার বললে, 'বোনটি তুমি থাক, আমি রওনা হই।' বলে সে রওনা দিলে। পূর্ণিমা গেল, অমাবস্যে গেল, ফের পূর্ণিমা এসেছে—রাত-দিন, দিন-রাত রাত-দিন চলতে, চলতে, চলতে, চলতে, শামুককুমার পাঠশালা পৌঁছল। পণ্ডিতমশাই তখন পড়ানো শেষ করে উঠতে যাচ্ছেন। হঠাৎ শুনলেন পায়ের কাছে গুনগুন শব্দ করে কে যেন বলছে :

'পেন্নাম হই পণ্ডিতমশাই, চিনতে পারেন কি?
ছাত্র ছিলুম, বিধির দোষে শামুক হয়েছি!'

পণ্ডিতমশাই দেখলেন শ্যামলা সবুজ একটি শামুক পায়ের কাছে শিং নেড়ে প্রণাম করছে। আশীর্বাদ করে তিনি বললেন—'আহা, বাছা আমার! কী করে তোর এমন দশা হল?'

শামুককুমার তখন সব গল্পটা বললে।

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'ও হো, এই ব্যাপার, এ যে লোভের পাপের শাস্তি! তা এখন তো তুই কাদায় নেই, এখন খোলসটা ভেঙে দিলেই হয়? তা হলেই নিশ্চয়ই তোর আসল মানুষমূর্তিটা বেরিয়ে পড়বে। আয়, ভেঙে দিই।'

বলেই পণ্ডিতমশাই শামুকের খোলাটা ভেঙে দিলেন।

অমনি তাঁর ছাত্রও হাতজোড় করে সোজা হয়ে হাসিমুখে সামনে খাড়া! আর নীচু হয়ে টুক করে আবার পেন্নাম! শামুককুমার বললে—'তবে যাই, আমার বোনকে নিয়ে আসি?'

পণ্ডিতমশাই বললেন—'আবার যেন কাদায় পা দিসনি, পুকুরটার উত্তরদিকে দেখবি বাঁধানো ঘাট আছে, তার শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। সেখানে দাঁড়িয়ে তোর বোনকে ডাকবি। যেই ঘাটে আসবে অমনি তুলে নিয়ে খুব সাবধানে খোসাটা ভেঙে দিবি। যা, দুগগা, দুগগা!'

শামুককুমার ছুটতে ছুটতে ফিরে গেল। উত্তরদিকে খুব বনজঙ্গল, পথঘাট নেই, জলে ফুলও নেই, ঘাটে লোকজনও আসে না। সেইখানে গিয়ে শামুককুমার ডাক দিলে—

'গুগলিরানি বোনটি আমার
ঘাটের কাছে আয়
পাঠশালাতে যেতে হবে
সময় বয়ে যায়!'

এতদিন গুগলিরানি তো উদ্‌বেগে অস্থির ছিল। দাদার মানুষ-গলার ডাক শুনে আজ আহ্লাদে আঠারোখানা হয়ে সাঁতার কেটে মুহূর্তের মধ্যে ঘাটের কাছে হাজির। শামুককুমার তখন তাকে মুঠোয় তুলে নিয়ে সাবধানে ঘাটে আছড়ে খোলাট ভেঙে ফেললে। অমনি তার কালোজামের মতন চোখের মণি আর গোলাপফুলের মতন গাল নিয়ে আদুরী বোনটি ঘাটে উঠে দাঁড়াল। ব্যস, দুই ভাইবোনে গলাগলি করে গ্রামের দিকে ছুটল।

শামুককুমার-গুগলিরানির এইখানে শেষ গল্পখানি।
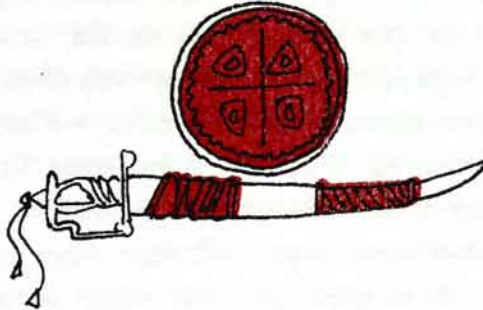
মৌরলাপ্রসাদ

এক চাষি আর তার বউয়ের মনে বড় দুঃখু।

কেন?

না তাদের ছেলেপুলে হয় না।

রাজা-রানিদের ছেলেপুলে না হলে তো কত সাধু-সন্ন্যাসী চলে আসে, কত মন্ত্রতন্ত্র পড়ে, কিংবা শেকড়বাকড় দেয়, না হয় যজ্ঞটজ্ঞ করে, দৈব চরু পায়েস খেতে দেয়। চাষির ঘরে তো এসব কিছুই হয় না। চাষির বউ রাঁধে আর কাঁদে। চাষি লাঙল চালায় আর চোখ মোছে। এমন সময় হল কী, চাষি-বউ তো রোজ চানের সময়ে গামছা দিয়ে মাছ ধরে, একদিন একটি মাছ কথা কয়ে উঠল।

মাছ বললে,

"চাষি বউমা, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে তুমি যা বর চাইবে, তাই দেব।"

"তুই তো এইটুকুন একটা মৌরলামাছ—তুই আবার বর দিবি কী রে? হ্যাঁ, যদি হতিস রুই, কাতলা, কালবোষ, তাও বুঝতুম।" চাষি-বউ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে উঠল।

মাছ বললে, "চাষি-বউ আমাকে মেরো না, আমি জাদু জানি, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার মঙ্গল হবে।"

"মঙ্গল?" চাষি-বউ এবার হাসি ছেড়ে কেঁদেই মরে। "আমার আবার মঙ্গল কী হবে রে, মৌরলা? আমি তো বড় দুঃখী।"

মাছ বললে, "তোমার দুঃখ দূর হবে। আমি বলছি, এই কার্তিকপুজোর সময়ে তোমার কার্তিক ঠাকুরের মতন ছেলে হবে।'

শুনে তো চাষি-বউ অবাক। মাছ জানলে কেমন করে, তার কীসের দুঃখ? সত্যি তো জাদু জানে তা হলে? তখন সে গামছা আড় করে মৌরলাকে জলে ছেড়ে দিলে। মৌরলা জল থেকে মাথা তুলে বললে, 'থ্যাংকিউ।'

কার্তিকপুজোর সময়ে সত্যি সত্যি চাষি-বউয়ের কুটির আলো করে ছেলে হল। চাষিদের সকলের মনে আনন্দ। ছেলের মান হল শ্রীমৌরলাপ্রসাদ মণ্ডল। সবাই ডাকে মৌর বলে। মৌর যত বড় হচ্ছে, তত দেখা যাচ্ছে তার যেমন রূপ তেমনি গুণ! সাহসী, বলবান, বুদ্ধিমান, দয়ালু, পরিশ্রমী, বাধ্য, মানে সবরকমের গুণেই তার স্বভাবটি আলো হয়ে আছে। তার বন্ধু হচ্ছে ভুলু নামে এক কুকুরছানা। দুজনে মিলে খেলে বেড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে মৌর আর ভুলু একদিন বনটুংরির জাদু জঙ্গলে গিয়ে পড়েছে। মৌরের হাতে সেদিন ছিল কুড়ুলখানা। কাঠ কাটতে গিয়েছিল কি না? জঙ্গলে ঢুকে মৌর একটা অদ্ভুত কান্নার শব্দ শুনতে পেল। এগিয়ে গিয়ে দ্যাখে একটা বিশাল অজগর সাপ, সেই সাপের গলায় একটা শিংওয়ালা মরা হরিণ আটকে আছে। হরিণ বেচারি ভয়েই মরে গেছে বোধহয়। সাপ হিস হিস করে বললে ঃ

"ভাই মৌর, শিংগুলো কেটে দাও লক্ষ্মীটি, নইলে আমি মরেই যাব—"

মৌর বললে—"বাঃ! শিং কেটে দিই, আর তুমি আমায় গিলে খাও।"

"না না কক্ষনও নয়" সাপ বললে, "আমি এই বনটুংরির রাজা, আমার একটা মানসম্মান নেই? তুমি আমাকে বাঁচালে, আমিও তোমাকে বাঁচাব।"

"আমি তো বেঁচেই আছি।"

—"কিন্তু কখনও বিপদে তো পড়তে পারো? তখন আমি তোমাকে বাঁচাব, ঠিক, দেখো!"

ভুলু কুকুর সবার মনের কথা বুঝতে পারে। সে বললে—"মৌর, সাপ সত্যিকথাই বলছে। ওকে বাঁচিয়ে দাও।"

তখন মৌর হরিণের শিং কুড়ুল দিয়ে কেটে দিলে। সাপও মুক্তি পেয়ে আনন্দে দু'পাক নেচে নিল। সেই নাচের চোটে দুখানা আমগাছ জামগাছ ভেঙে মড়মড়িয়ে ডালপালা সমেত উপড়ে পড়ল। মৌরেরও সুবিধে হয়ে গেল কাঠ কাটার।

সাপরাজা বললে—"ভাই মৌর, আমি তোমাকে আমার মাথার এই মণিটা খুলে দিলুম। বিপদে পড়লে মণিকে যা বলবে, সে তাই করবে। তবে অকারণে মণিকে খাটিও না।" বলে একগাদা ফলমূল উপহার দিয়ে সাপরাজা হেলেদুলে গভীর বনে ঢুকে গেল। সন্ধে হয়ে এসেছে, বন থেকে ভয়ঙ্কর সব জীবজন্তুর গর্জন শোনা যাচ্ছে। মৌর কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে সাপের মণিটা হাতে করে বাড়ি এল। ভুলু এল আগে আগে নাচতে নাচতে। চাষি-বউ রাত হয়েছে দেখে ভাবনায় অস্থির হয়ে পথে দাঁড়িয়ে ছিল লণ্ঠন হাতে নিয়ে। দ্যাখে ছেলে আসছে পথ আলো করে, অথচ, লণ্ঠন নেই। ছেলের হাতে ওটা কী? এত আলো ছিটকাচ্ছে? টর্চ নাকি?

—'না মা, সাপের মণি।'

—'দূর! সাপের মণি কোনও মানুষ পায় কখনও? কী যে বলিস।'

—'পায় তো। অজগর সাপ মাথা থেকে খুলে দিলে যে।'

মৌরের গলা শুনে চাষি-চাষিবউ বললে—'বাপধন, আর কখনও ও-বনে যাসনি, ওখানে জাদুজন্তুরা আছে। আজ কপাল জোরে বেঁচেছিস।' চাষি-বউ সাপের মণিটা কুটিরের চালের বাতায় গুঁজে রেখে দিলে যাতে কেউ জানতে না পারে।

এ বছর গাঁয়ে গাঁয়ে বড় দুঃসময়। একদিন গভীর রাত্রে পাশের গ্রামের ডাকাতরা এসে এ গ্রামের গোলা মরাই লুটপাট শুরু করে দিলে। ছোট মৌরও তিরধনুক নিয়ে খুব লড়ছে, কিন্তু সে ছোট ছেলে, বড় বড় ডাকাতদের সঙ্গে একা একাই করে কতক্ষণ পারবে? ডাকাতরা তাকে বেঁধে ফেললে। মৌর তখন জোরে জোরে বললে ঃ

—'সাপের মণি, সাপের মণি, চালের বাতায় বাস
আমার এবার বাঁচাও মণি, শিরে সর্বনাশ।'

অমনি পটাপট করে দড়িদড়া খসে পড়ল। আর কোত্থেকে মোটা মোটা লাঠি এসে দুষ্টু ডাকাতদের পিঠে মাথায় দমাদম পড়তে লাগল। ডাকাতরা বাপরে মারে করে পালিয়ে বাঁচল। এ গ্রামের ধানচালও বেঁচে গেল। চাষিরা রক্ষা পেল। সবাই দুহাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগল, 'বেঁচে থাকো বাবা, সুখে থাকো' বলে।

এদিকে গ্রামের জমিদারের কানে খবরটা পৌঁছতেই তার ভারি হিংসে হল।—এমন চমৎকার জাদুর জিনিসটা থাকবে কিনা চাষির ঘরে? ওসব জিনিস কেবল জমিদারের প্রাসাদই মানায়। সে পাইক বরকন্দাজ পাঠালে সাপের মণি বাজেয়াপ্ত করতে। বেচারি মৌর তখন বাড়ি নেই। সে গেছে অনেক দূরের এক নদীর পাড়ে। ভুলুকে নিয়ে দূরের নদী থেকে বাঁকে করে জল আনতে। দেশে দারুণ খরার কাল পড়েছে কিনা, জলের জন্যে হাহাকার। সেইজন্যেই এত খামার মরাইতে ডাকাত পড়ছে। মৌর তো গেছে জল আনতে, ইতিমধ্যে পাইক বরকন্দাজেরা এসে চাষির কুঁড়েঘর ভেঙে ফেলে সাপের মণিটি লুট করে নিয়ে গিয়ে জমিদারকে দিলে। জমিদার খুশি হয়ে বললে, 'যা তো সাপের মণি, দেখি তুই কেমন সাপের মণি, মৌরকে মেরে ফ্যাল দেখি!'

এখন সাপের মণিকে শুধু শুধু খাটাতে নেই, বিপদে পড়লে স্মরণ করতে হয়। জমিদার শুধু শুধু যেই খাটাতে গেছে অমনি সেই মণি থেকে বিশাল এক ভয়ঙ্কর অজগর সাপ বেরিয়ে এসে কপাত করে জমিদারকে গিলে ফেলল। তারপর এঁকেবেঁকে বনটুংরির জঙ্গলের দিকে চলে গেল। গ্রামসুদ্ধ লোক ভয়ে কাঁটা হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলে কেবল। কেউ কিছুই করতে পারল না। সাপের মণিটিও সাপের মাথায় চড়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মৌর ফিরে আসতে গ্রামের লোকেরা বললে—'লোভী জমিদারকে সাপে গিলে ফেলেছে, এবারে তুমিই গ্রামের দেখাশুনা করো, মৌর।'

মৌর বললে, 'বেশ।' প্রথমেই সে গিয়ে জমিদারের ভাঁড়ারঘর খুলে ধানচালের আড়ত থেকে সব ধানচাল নিয়ে গরিবদের বিলিয়ে দিল। তারপর নিজের ভাঙা কুটিরে ফিরে গিয়ে

মাদুরে শুয়ে শুয়ে আপনমনে দুঃখু করতে লাগল—এ ধানচাল আর ক'দিন? তার পরেই দুর্ভিক্ষ শুরু হবে দেশে।

'সাপের মণি সাপের মণি
সাপের মাথায় বাস
একটু বিষ্টি দিতে মণি
শিরে সর্বনাশ।'

বলে কখন মৌর আপনমনেই ছড়া কেটে ফেলেছে। আর অমনি, কী আশ্চর্য! ম্যাজিক নাকি?

কড় কড় কড়াৎ করে বাজ ডাকল, ঘন কালো মেঘে খরায় শুকনো খটখটে আকাশ ঢেকে গেল, আর ঝরঝর ঝরাস করে বৃষ্টি নামল। গ্রামসুদ্ধ আহ্লাদের বান ডাকল, কেন না সাপের মণি যদিও বনটুংরি জাদুজঙ্গলে ফিরে গেছে, তবু সে তার উপকারী বন্ধুকে ভোলেনি। চাষিরা চাষি-বউরা বৃষ্টি পেয়ে মনের আনন্দে নাচতে লাগল, বৃষ্টিতে নেমে ভিজে-ভিজে।

মরিচকলি

এক বনে দুই বুলবুল পাখি ছিল। তারা সারাদিন গান গাইত, আর নাচত, আনন্দে সারা বন ভরে রাখত। একদিন বুলবুল-বউ বললে, 'ওগো, আমার বড্ড কাঁচালঙ্কা খেতে ইচ্ছে করছে। কোথায় ভালো কাঁচালংকা পাওয়া যায় বলো তো?' (টিয়া, চন্দনা, বুলবুল—এরা খুব লংকা খেতে ভালোবাসে জানো বোধহয়? ওদের জিবে ঝাল লাগে না।) বুলবুল-বর তো তক্ষুনি উড়ে চলল কাঁচালংকার খোঁজে। উড়তে, উড়তে, উড়তে—লংকাবাগান, আর খুঁজেই পায় না। সারা জঙ্গলে একটা লংকাগাছও নেই। কাছাকাছি গাঁয়ে কেউই লংকা-খেত করেনি, তারা মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। যদি বা কোথাও উটকো একটা লংকাগাছ দেখতে পায়, হয় সব লংকা পেকে লাল টুকটুক করছে, নয় মোটে ফলই ধরেনি; ছোট সাদা সাদা তারাফুল ধরেছে। শেষে ক্লান্ত হয়ে বুলবুল-বর একটা খুব উঁচু পাঁচিল দেখতে পেয়ে তার উপর বসল। পাঁচিলের ভেতর চেয়ে দেখে, আরে! কী সুন্দর বাগান। কত ফল, কত ফুল, কী সুন্দর পাহাড়, তাতে নীল ঝরনা বইছে আর ফুলের গন্ধে ম-ম করছে বাতাস। কিন্তু জনপ্রাণী নেই। পাখি ডাকছে না, প্রজাপতি উড়ছে না। মৌমাছি গুনগুন করছে না। এমনকী একটা পিঁপড়ের পর্যন্ত দেখা নেই। এ কী রকম বাগান রে বাবা? বুলবুল তো অবাক! এটা করেছেই বা কে? সেই মানুষজনরাই বা গেল কোথায়? ভাবছে, ভাবছে, এমন সময়ে হঠাৎ দেখে, বাগানের মধ্যিখানে, বাঃ কী চমৎকার একটা লংকাচারা, ঝলমল করছে রোদে! কী সুন্দর পাতা তার। আর একটি মস্তবড় কচি সবুজ কাঁচালংকা বাতাসে দুলছে, সবচেয়ে ওপরের ডাল থেকে। তার গা-টি যেমন চকচকে তেমন

মোটাসোটা। তেমনই তাজা-টাটকা। কাঁচালংকাটি এমন নিখুঁত, কেউ যেন তাকে ধুয়ে-মুছে পালিশ করে সাজিয়ে রেখেছে। ওটা দেখেই বুলবুলের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। সে একমিনিটেই বউয়ের কাছে পৌঁছে গিয়ে বউকে সঙ্গে করে নিয়ে এল বাগানে। দুজনে মিলে পেট পুরে খেয়েও লংকাটি ফুরোল না। ওরা প্রায়ই উড়ে আসে, আর কাঁচালংকাটি একটু একটু করে খেয়ে যায়। কেউ কিছু বলে না। খেয়ে-দেয়ে বুলবুল-বউ খুব খুশি। গাছকে ধন্যবাদ জানাতে একটি অপূর্ব সবুজ পান্নার মতো দেখতে ডিম পেড়ে, লংকাগাছের নীচে রেখে দিয়ে দুই বুলবুল উড়ে ফিরে গেল নিজেদের বনে।

এদিকে হয়েছে কী, বাগানটা ছিল একজন জিন-এর। জিনদের কথা জানো তো? দানো, আর কী। ঠিক ভূতও নয়, আবার ঠিক দৈত্যও নয়। মাঝামাঝি মতন। এই জিন ঠিক বারো বছর ঘুমোয় আর বারো বছর জেগে থাকে। যখন জেগে থাকে তখন সে মন দিয়ে বাগান করে। কিন্তু কোনও জ্যান্ত প্রাণী ভয়ে তার বাগানে ঢোকে না। জিন তো জীবজন্তু খায়? তা ছাড়া জাদুর খেলা জানে, যদি কোনও ক্ষতি করে দেয়? বুলবুলরা না জেনে ঢুকেছিল। বুলবুলরা তো লংকা খেয়ে ডিম পেড়ে চলে গেছে, এমন সময়ে জিন-দানোর ঘুম ভেঙেছে। সে বিরাট হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে তার বাগানের খবরদারিতে বার হল। অত আহ্লাদের পোষা লংকাগাছের কাছে গিয়ে দ্যাখে লংকাফলটি ছিন্নভিন্ন, কে তাকে খেয়ে গেছে। জিনের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কে খেল? কে খেল? কেউ তো নেই। কেউ তো আসে না? হঠাৎ দেখে গাছের তলায় ঠিক হিরে-পান্নার মতো একটা পাখির ডিম ঝলমল করছে। কী সুন্দর! জিন ডিমটা দেখে মুগ্ধ। তাড়াতাড়ি তুলে, যত্ন করে তুলোয় মুড়ে কুলুঙ্গিতে রাখল। ডিমটা পেয়ে সে তার লংকার দুঃখু ভুলে গেল। রোজ সে ডিমটার দেখাশোনা করে।

একদিন সকালে দ্যাখে কী, ডিম ফেটে দুখানা হয়েছে, আর কুলুঙ্গির মধ্যে বসে আছে জগতের সবচেয়ে রূপসী ছোট্ট মেয়েটি। কী রূপ, কী রূপ। সারা গায়ে সবুজ পান্নার গয়না, পরনে রেশমি সবুজ ঘাঘরা। সবুজ ওড়না, সবুজ চোখের তারা। আর তার তলায় একটি মস্ত পান্নার লকেট, ঠিক সেই কাঁচালংকাটির মতন দেখতে। মানুষখেকো হলে হবে কী, জিন আসলে বাচ্চাদের খুব ভালোবাসত। খুদে এই মেয়েটাকে দেখে তার আর আনন্দ ধরে না। সে তার নাম রাখল মরিচকলি। কাঁচালংকার নামে তার নাম।

মরিচকলির যখন বারো বছর বয়েস হয় হয়, জিনের মনে খুব ভাবনা হল, এবার তো সে ঘুমিয়ে পড়বে, তার আদরের মরিচকলিকে কে দেখবে? বারো বছর ধরে কী করে বাঁচবে সে।

এখন হয়েছে কী, ঠিক সেইদিনেই সে-দেশের রাজা আর মন্ত্রীমশাই বনে এসেছেন মৃগয়া করতে। উঁচু-পাঁচিল ঘেরা বাগান দেখে এত কৌতূহল হল তাঁদের যে, ঘোড়া বাইরে রেখে পাঁচিল ডিঙিয়ে তাঁরা ভিতরে ঢুকলেন। ঢুকেই দেখেন লংকাগাছের পাশে মরিচকলি বসে বসে মালা গাঁথছে।

রাজা বললেন, 'মন্ত্রী একেই তো রানি করতে হবে।'

মন্ত্রী বললেন, 'বেশ, বেশ।'

মনের আনন্দে তখন মরিচকলিকে সেই কথা গিয়ে জানালেন তাঁরা। এদিকে মরিচকলি

তো কখনও মানুষ দেখেনি। সেও রাজার রূপ দেখে মোহিত, মুগ্ধ। কিন্তু সে বলল, 'আমি তো কিছু বলতে পারব না, আমার বাবা জিন যাকে বলবেন আমি তাকেই বিয়ে করব।' এমন সময়ে জিনের পায়ের ধুপধাপ শব্দ পেয়ে মরিচকলি তাড়াতাড়ি রাজামশাইদের ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে ফেলল। জিনমশাই এসেই বললেন, 'হাঁউমাঁউখাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ?'

মরিচকলি বললে, 'তা হলে আমাকেই খাও।'

জিন বললে, 'তা কখনও পারি মামণি? তোমাকে খেয়ে ফেললে তো চুকেই যেত আমার ভাবনা। এই যে আমি ঘুমিয়ে পড়ব, বারো বছর ধরে কে তোমাকে দেখবে?'

মরিচকলি বললেন, 'এক কাজ করো না, বাবা, আমার বরং একটা বিয়ে দাও। তা হলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা দেখবে!'

জিন বললে, 'দেব তো বিয়ে, কিন্তু পাত্র পাই কোথা? তোমার যোগ্য পাত্র কি রাজবাড়িতে ছাড়া মিলবে?'

তখন মরিচকলি বললে, 'যদি তোমার কাছে রাজবাড়ির পাত্র এনে দিই, তুমি তার সঙ্গে ঠিক আমার বিয়ে দেবে তো? কথা দিচ্ছ?' ঘটাং করে ঘাড় নেড়ে জিন কথা দিয়ে দিলে তক্ষুনি। মরিচকলি হেসে উঠে অমনি হাততালি দিল, আর ঝোড়ঝাড় থেকে রাজামশাই বেরিয়ে এলেন। মাথায় মুকুট, গলায় গজমোতির মালা, কোমরে তলোয়ার। সঙ্গে মন্ত্রী। জিন তো মনের মতো পাত্র দেখে মহা খুশি। তক্ষুনি হইহই করে সম্প্রদান করে ফেলল। আনন্দে সে কী তার হেঁড়ে গলায় গান! মেয়ের বিয়ে-টিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে জিন তার গাছতলায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। আ-হ্। বারো বছরের মতন এখন একটানা ঘুমোনোর কথা তার। কিন্তু হল কী? মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাচ্ছে, এই দুঃখে মানুষখেকো জিনেরও বুকের মধ্যেটা কেমন তোলপাড় করছে। জিন তো কই ঘুমোচ্ছে না? শুয়ে শুয়ে কত কোটি কোটি ভেড়া, কত হাতি ভল্লুক গণ্ডার গুনে ফেললে, তবু ঘুমই আসছে না চোখে। মেয়ের জন্য ভেবে ভেবে মন এতই অস্থির হয়ে পড়ল যে, শেষটায় 'ধুত্তোর' বলে জিন উঠেই পড়ল। আর থাকতে না পেরে, একটা সাদা পায়রা সেজে উঠেই গেল মেয়ের পিছনে-পিছনে। কেঁদে কেঁদে তখন তার চোখদুটি ফুলে লাল! অত উঁচু থেকে মেয়ের মুখখানি আর দেখতেই পায় না! দেখতেই পায় না। কী করে? তখন জিন বুদ্ধি করে পায়রা থেকে নিজেকে ঈগল পাখিতে বদলে নিলে। কেন না চিল, ঈগল, এদের চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ, অনেক দূর থেকে দেখতে পায়। এবার সে দেখতে পেল, মেয়ে হেসে হেসে রাজার সঙ্গে গল্প করতে করতে ঘোড়ায় চড়ে মস্ত এক প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পাশে পাশে মন্ত্রীমশাই। এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসে বারো বছরের মতন ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে রাজার বাড়িতে একগাদা হিংসুটে বুড়ি থাকত। তারা মরিচকলিকে একদম পছন্দ করত না। কেমন করে ওকে তাড়ানো যায় তাই ভাবতে লাগল তারা। একদিন মরিচকলির কোলে খুব সুন্দর ফুটফুটে সাদা নোটন-পায়রার মতন একটি রাজপুত্র জন্মাল। তার রূপে রাজপুরীতে যেন হাজার-হাজার বাতি জ্বলে উঠল, রাজপুত্তুর এমনই রূপবান। রাজামশাই খুব খুশি। মরিচকলিকে আরও আদরযত্ন করতে লাগলেন।

দেশসুদ্ধু লোক আনন্দ করছে—কেবল রাজবাড়ির হিংসুটে বুড়িরা ছাড়া। তারা মা-ছেলে দুজনকেই হিংসে করতে শুরু করে দিলে। হিংসে করলে হবে কী, মরিচকলির গলায়

যে মরিচমানিক রক্ষাকবচ ঝোলে, তারই জন্যে ওরা মরিচকলির কিছুতেই কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। কাঁচালংকার মতন দেখতে সেই যে ওর গলার পান্নার লকেট, সেইটেই হচ্ছে মরিচমানিক রক্ষাকবচ। একদিন হল কী, মরিচকলি স্নান করতে গিয়ে গলার হারটা খুলে কলঘরে ফেলে এসেছে। হিংসুটে বুড়িরা তক্ষুনি সেটা চুরি করে নিয়ে নিল। তারপর গভীর রাত্তিরে মরিচকলির শোবার ঘরের মধ্যে একটা মস্ত বঁটি হাতে করে পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল। ঢুকে দ্যাখে কী, সোনার প্রদীপে ঘিয়ের সলতেটি নিবু নিবু, ছোট্ট রাজপুত্তরটিকে কোলের কাছে নিয়ে ছোট্ট মরিচকলি ঘুমিয়ে কাদা। কোনও আড় নেই, সাড় নেই। বুড়িরা তখন রাজপুত্তুরকে বঁটি দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে, মরিচকলির কচি ঠোঁটে অনেকটা আলতা মাখিয়ে দিয়ে কেটে কুচি কুচি করে, মরিচকলির কচি ঠোঁটে অনেকটা আলতা মাখিয়ে দিয়ে যেমন চুপি চুপি এসেছিল, তেমনি চুপি চুপি পালিয়ে গেল।

পরদিন সূয্যি ওঠার আগেই তারা গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজামশাইকে ঠেলে তুলল।—'ও রাজামশাই, উঠুন উঠুন সব্বোনাশ হয়েছে!' হাঁউ-মাঁউ কান্না শুনে রাজা বললেন, 'কী হয়েছে? কী হয়েছে?'

'আর কী হয়েছে? দানো-জিনের চেয়ে কখনও মানুষ হয়? সেও জিন-দানো। দেখুনগে যান নিজের চোখে। নিজের ছেলেকে নিজেই খেয়ে ফেলেছে—মাঝরাত্তিরে ঘুমের মধ্যে, কচমচিয়ে। ঠোঁটে রক্ত এখনও লেগে আছে।'

রাজা তো শুনেই দৌড়ে গেলেন। মরিচকলি তখনও অঘোরে ঘুমুচ্ছে। কাক ডাকেনি, আলো ফোটেনি। রাজা ঘরের দৃশ্য দেখেই মনের দুঃখে কেঁদে ফেললেন। একেই তো অমন সুন্দর রাজপুত্তুরের এই দশা। তার ওপরে অমন যে মিষ্টি মেয়ে মরিচকলি, আসলে তার এই রূপ? হায় দৈব! সোজা সভায় এসে রাজা বললেন, 'কোটাল, রানিকে এক্ষুনি বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কোতল করে ফ্যালো। কী সর্বনাশ! জিন-দানো নিয়ে তো রাজ্য চলবে না! প্রজাদের ক্ষতি হবে।'

রাজা যতই বউকে ভালোবাসুক, সে তো মানুষ নয়। মানুষখেকো! কোটালমশাই আর কী করেন? ব্যাপারটা তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না, তবু রাজার আদেশ বলে কথা। চোখের জল চাপতে চাপতে কোটালমশাই মরিচকলিকে শেকল পরিয়ে সেই বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কোতল করে ফেললেন। ছেলের দুঃখে মরিচকলি এতই কাঁদছিল যে, সে কিছুই বলল না। মরিচকলির কোনও কথা কেউ শুনল না। তার মরিচমানিক রক্ষাকবচটা তো বুড়িরা বিশ বাঁও জলের তলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কে আর তাকে রক্ষা করবে? মরিচকলিকে যেই না কোতল করা, অমনি আশ্চর্য সব ঘটনা ঘটতে লাগল বনের মধ্যে। মরিচকলির ফরসা শরীরটুকু একটা উঁচু শ্বেতপাথরে পাঁচিল হয়ে গেল, তার জলভরা সবুজ চোখদুটি হল টলমলে সরোবর, তার সবুজ ঘাঘরা হল সবুজ ঘাস, সবুজ ওড়না হল নরম লতাপাতা, তার লাল টুকটুকে ঠোঁটদুটি হল গোলাপফুল, তার দাঁতগলি ধবধবে জুঁইফুল। এই অপূর্ব বাগানটিতে মরিচকলির প্রাণ একজোড়া বুলবুল পাখি হয়ে বাসা বেঁধে রইল। এই বুলবুল পাখিরা সারাদিনই মরিচকলির দুঃখের কাহিনি গাইত, ছোট্ট রাজপুত্রের শোকে কাঁদত। আর রাজার নাম ধরে ডাকত।

রাজামশাই এদিকে মরিচকলিকে শাস্তি দিলেও, তারই শোকে পাগলের মতো হয়ে

বনে-বনে ফেরেন। একদিন বনের মধ্যে এই উঁচু শ্বেতপাথরের দেওয়ালটা দেখতে পেলেন। তাঁর মনে পড়ল, এমনি একদিন এক পাঁচিল ডিঙিয়েই তিনি মরিচকলিকে পেয়েছিলেন। এটাও কী ভেবে ডিঙিয়ে তিনি বাগানের মধ্যে ঢুকলেন। না, এখানে কোনও লংকাগাছ নেই। কিন্তু নরম সবুজ ঘাস, ঝলমলে লতাপাতা, রংচঙে, গোলাপ, গন্ধভরা, জুঁই, জলটলটলে সরোবরের ঠান্ডা বাতাস—রাজার শরীর মন সব জুড়িয়ে দিলে। বাগানের বাতাস যেন রাজারই নাম ধরে আদর করে ডাকছে। তারপর তিনি বুলবুলপাখির গান শুনতে পেলেন। ছোট্ট রাজপুত্রের শোকে তার মা আকুল হয়ে কাঁদছে। শুনতে পেলেন একটি বুলবুলপাখি বলছে, 'রাজা কি অন্ধ? রাজা কি কালা? রাজার কি মন নেই? এ কেমন রাজা? হায় মরিচকলি, তোমার রাজা তোমাকে পেয়েও পেল না।' তার উত্তরে বুলবুল-বউ বলছে, "রাজা যে খুব অন্যায় করে ফেলেছেন। এখন তিনি যদি বিশ-বাঁও জলের নীচে ডুব দিয়ে, মরিচমানিক উদ্ধার করে এনে আমাদের দুজনের বুকে ঠেকিয়ে দিতে পারেন, তা হলেই ছেলে-বউ ফিরে পাবেন। হিংসুটে বুড়িরা ওর ছেলেকে মারবার আগে সেটা চুরি করে রাজবাড়ির দিঘিতে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

বুলবুলিদের কথা শুনে সব বুঝতে পারলেন রাজামশাই, তাঁর দুঃখও দুগুন বেড়ে গেল। তিনি তক্ষুনি ছুটে গিয়ে রাজবাড়ির দিঘিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বিশ বাঁও জলের নীচে থেকে মরিচমানিকটি তুলে আনলেন। তারপরে ছুটতে-ছুটতে সেই বাগানে ফিরে গেলেন।

এবার রাজাকে দেখেই বুলবুলপাখিরা উড়ে এসে তাঁর হাতে বসল। তাদের বুকে মরিচমানিক ঠেকিয়ে দিতেই রাজা দেখেন জ্যান্ত রাজপুত্তুর কোলে করে জ্যান্ত মরিচকলি কন্যে তাঁর সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। রূপ যেন ফেটে পড়ছে। সুখ যেন উপছে পড়ছে। বাগানের সব কুঁড়িগুলো ফুল হয়ে ফুটে উঠল, সব ডালপালা দুলে-দুলে হেসে উঠল খুশিতে।

রাজামশাই মরিচকলির পায়ে পড়ে বললেন, 'মাপ করো রানি, না-বুঝে তোমাকে শাস্তি দিয়েছি।' মরিচকলি রাজাকে প্রণাম করে হাত ধরে তুলল, বলল, 'এখন ওসব কথা থাক।'

এমন সময়ে জিনমশায়ের ঘুম ভাঙল। ঠিক বারো বছর কেটেছে। সে তক্ষুনি ঈগল-পাখি সেজে মেয়ের খোঁজে আকাশে ডানা মেলল। রাজবাড়ির কাছে এসে দেখে বনের মধ্যে নতুন একটি বাগিচা, তার মধ্যে রাজার কোলে মরিচকলি, মরিচকলির কোলে রাজপুত্তুর, তিনজনের মুখেই হাসি ধরে না। আর পাঁচিলের বাইরে একগাদা হিংসুটে বুড়ি জড়ো হয়ে গুজগুজ ফুসফুস ষড়যন্ত্র করছে। অমনি 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ—হিংসুটের গন্ধ পাঁউ' বলে জিন স্বমূর্তি ধরে সবক'টা বুড়িকে কপকপ করে পেঁয়াজি-ফুলুরির মতন খেয়ে ফেললে। তারপর বিরাট এক ঢেকুর তুলে, পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকল মেয়ে-জামাই-নাতিকে আশীর্বাদ করতে।

এতবড় ঘটনাটা যে ঘটে গেল, ছোট্ট রাজপুত্তুর কিন্তু কিছুই জানতে পারলে না। সে যেমনটি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তেমনি মায়ের কোলে জেগে উঠেছে, এত কাণ্ড সে বেচারি আর জানবে কেমন করে?

নীলমণিয়া

এক যে ছিল গভীর বন। বনের মধ্যে এক গর্ত। গর্তের মধ্যে থাকে এক খরগোশ, আর তার ছটফটে বউ। খরগোশনি এদিক সেদিক লাফিয়ে বেড়ায়। খরগোশ বড্ড কুঁড়ে, গর্ত ছেড়ে নড়ে না। একদিন খুব বৃষ্টি পড়ছে।

লাফাতে লাফাতে খরগোশনি বেশ দূরে গিয়ে পড়েছে। কী করে, সে তাড়াতাড়ি এক মস্ত অশথ গাছের তলায় একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। ফুলো লোম ভিজে যাবে যে! এই গর্তে ঢুকে খরগোশনি দ্যাখে, চমৎকার একটা নীল রঙের পাথর থেকে আলোর ছটা বেরিয়ে গর্তটাকে স্বপ্নের মতো করে রেখেছে। খরগোশনি তো অবাক। বৃষ্টি থামতে সে পাথরটাকে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল, খরগোশকে দেখাতে।

সেই গর্তটা আসলে ছিল এক শঙ্খিনী সর্পকুমারীর। ওটা তারই মাথার মণি। সাপের মাথার মণির গুণ হল, তার সামনে মনে মনে যে যা চাইবে, সে তাই পাবে। স্বর্ণকুমারী তার মণিটা খুলে গর্তে রেখে দিয়ে মানুষী সেজে শহরে বেড়াতে যেত। সেদিন বাড়ি এসে আর মণি খুঁজে পায় না। ও-কি? কে নিলে? কী হল? খুঁজে, খুঁজে, পায় না! শেষকালে অশথ গাছের নীচে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল। এমন সময়ে সেখান দিয়ে এক নেউল যাচ্ছিল। নেউল বললে, 'কে গো মেয়ে তুমি? কাঁদছে কেন? কী হয়েছে? এই গহন বনে তুমি কী করছ?' সর্পকুমারী তো আর নেউলকে বলতে পারে না যে সে আসলে শঙ্খিনী সাপ? সাপে-নেউলে জন্ম জন্মান্তরের শত্রুতা কিনা। সর্পকুমারী বললে—'আমি রাজকন্যে—বনের ওপারে থাকি। খেলতে খেলতে এখানে এসে পড়েছি—আমার সুন্দর নীলমণি পাথরটা

কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে, খুঁজে পাচ্ছি না, তাই কাঁদছি।' নেউল বললে, 'আচ্ছা, আমি যদি খুঁজে দিই, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? আগে কথা দাও?' সর্পকুমারী তখন মণির শোকে কাতর, বললে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় বিয়ে করব। কথা দিলাম।'

একটু আগেই পথে আসতে নেউল দেখেছিল খরগোশনিকে একটা ঝলমলে নীলমণি পাথর মুখে করে গর্তের মধ্যে ঢুকতে। সে তক্ষুনি খরগোশদের কাছে গিয়ে বললে—'তুমি রাজকন্যের নীলমণি পাথর তুলে নিয়ে এসেছ। আমি রাজার বরকন্দাজ। শিগগির বের করে দাও নইলে তোমাদের এক্ষুনি ধরে নিয়ে যাব! খরগোশনির মোটে ইচ্ছে ছিল না দিতে, কিন্তু খরগোশ ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি মণিটা বের করে দিলে। নাচতে নাচতে নেউল তখন নীলমণিটা নিয়ে অশথ গাছের তলায় ফিরে এল, সর্পকুমারী যেখানে রাজকন্যে সেজে বসে বসে কাঁদছে। নেউলের কাছে মণিটা দেখেই তো সে মেয়ে আনন্দে অস্থির। নেউল বললে, 'উহুঁ! আগে চলো, পুরুত ডেকে আমাকে বিয়ে করবে, তবে মণি পাবে।' তখন কী আর করে? দুজনে মিলে পাশের গ্রামের পুরুতকে গিয়ে বললে—'পুরুতমশাই, আমাদের বিয়ে দাও।'

'নেউলের সঙ্গে মানুষের বিয়ে? তাও কখনও হয়?' পুরুত ঘটঘট করে ঘাড় নেড়ে 'না' বললে। তখনও নেউলের হাতে মণিটা ছিল। মনে মনে যেই মনের দুঃখে বলে ফেলেছে—'আজ যদি মানুষ বর হতাম, তাহলে তো তুমি ঠিকই আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে?' বলতে না বলতেই অমনি নেউল মানুষ হয়ে গেল। মাথায় টোপর, পরনে চেলি, কপালে চন্দনতিলক, একেবারে চমৎকার গোড়ের মালা পরা রেডিমেড বর।

পুরুত তখন আর কী করে? ঘণ্টা নেড়ে শাঁখ বাজিয়ে মন্তর পড়ে যাগযজ্ঞি করে, সাপে-নেউলে বিয়ে দিয়ে দিলে। এবারে নেউল বলল—'রাজকন্যে, চলো তবে তোমার রাজপ্রাসাদে যাই?' সর্পকুমারী তো এখন তার নীলমণি পাথর ফিরে পেয়েছে, সে মণির কাছে মনে মনে ইচ্ছে করলে বনের ওপারে যেন খুব সুন্দর একটা বাগান ঘেরা রাজপ্রসাদ তৈরি হয়ে থাকে। নেউল বর আর শঙ্খিনী কনে বন পেরিয়ে সেইখানে গেল। দুজনে হেসে-খেলে মানুষ সেজে আনন্দে ঘর সংসার করতে লাগল।

কিন্তু হয়েছে কী, পুর্ণিমার রাত্রে সব সর্পকুমারীরা একসঙ্গে সর্পরাজপুরীতে গিয়ে চড়ুইভাতি করে। সর্পকুমারীর খুব ভয়। নেউল তো নেউল, যেই সাপ দেখবে অমনি ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই সে লুকিয়ে বাপের বাড়ি যায়। অন্য মেয়েরা জামাই নিয়ে আসে, এ মেয়ে যায় একা একা। পুর্ণিমার রাত্তির হলেই সর্পকুমারী করে কী, চমৎকার পায়েস রান্না করে, তার সঙ্গে একটা ঘুমপাড়ানি ফুলের মধু মিশিয়ে দেয়। নেউল ঘুমিয়ে পড়লে, সে সর্পকুমারীর রূপ ধরে সর্পরাজ্যে চলে যায়। ভোর হতে না হতে ফের ফিরে এসে রাজকন্যের রূপ নিয়ে খাটে ঘুমিয়ে থাকে।

এদিকে প্রত্যেক পুর্ণিমার পরদিনেই নেউলের যেন কেমন কেমন লাগে। নেউলের মনে হয় তার বউয়ের গায়ের চামড়াটা কেমন তেলা-তেলা, পিছল-পিছল লাগছে, তার চলনে বলনে কেমন একটা ঢেউ খেলানো ঢং, তার গায়ে কেমন একটা গন্ধ। নেউলের কেমন যেন মনে হয় রাজকন্যেকে প্রত্যেক পূর্ণিমার পরদিনে। এমনি এক দিনে নেউল

বললে,—'কন্যে, তোমার গায়ে কেমন চকচকে ভাব, যেন সাপের আঁশ? তোমার চলায় কেমন আঁকাবাঁকা ঢেউখেলানো ছাঁদ, যেন সাপের চলন? তোমার চক্ষে কেমনধারা পলকহীন চাউনি, যেন সাপের চোখ? আর তোমার খোঁপার ওই নীলমণি পাথরের আলোটা পুর্ণিমার দিনে বড় বেশি ঝলসায়, ঠিক যেন সাপের মাথায় মণি। আর তোমার গায়ে কেমন বিকট গন্ধ, চাঁপাফুলের মতন অথচ সাপের গায়ের গন্ধ ঠিক যেমন হয়—ব্যাপারটা কী?'

সাপ-রাজকন্যে বললে, 'দূর! তুমি তো অনেকদিন সাপ মারোনি, তাই তোমার আমাকেই সাপ বলে মনে হচ্ছে। যাও, বরং বনে গিয়ে দুটো সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে এসো দিকিনি?'—কথাটা নেউলের পছন্দ হল। সে বউয়ের নীলমণি পাথরকে বললে—'আমাকে নেউল করে দাও, আমি যাই, সাপ মেরে আসি।' বনে গিয়ে অনেক সাপ-টাপ মেরে মনের আনন্দে লেজ উঁচিয়ে নেউল তো ঘরে ফিরে এল। শঙ্খিনী সর্পকুমারীর এদিকে খুব মন খারাপ। তারই ভাইবোনদের মেরেছে তো? কিন্তু কী করবে? স্বামী বলে কথা। শঙ্খিনী তো জানেই যে ও নেউল। নেউলের নেউল-স্বভাব, কিন্তু নেউল তো আর জানে না তার বউ সর্পিনী। জানতে পারলে যদি মেরে ফেলে? ভয়ে শঙ্খিনীর আর বলা হয় না কিছু। কিন্তু তার মনে বড় কষ্ট।

এক পূর্ণিমার রাত্রে নেউলের শরীরটা তত ভালো নেই। সে বেশি পায়েস খায়নি। কিন্তু সর্পকুমারী অত লক্ষ করেনি। নেউল ঘুমোচ্ছে ভেবে সে খাট থেমে নেমে দোর খুলে বেরিয়ে গেল। নেউল ভালো করে তখনও ঘুমিয়ে পড়েনি, দরজা খোলার শব্দে জেগে তো অবাক, এত রাতে বউ কোথায় গেল তাকে না বলে? বারান্দায় বেরিয়ে দেখে বউ দিঘিতে নাইতে নামল। তারপর উঠে এল এক তন্বী শঙ্খিনী নাগিনী, মাথায় নীলমণি পাথরটি পূর্ণচন্দ্রের মতো জ্বলছে। সর্পকুমারী আপন মনে নাচতে নাচতে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সেই দৃশ্য দেখে নেউলের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। হায় রে! এত যাকে ভালোবাসে, সে কিনা আসলে একটা সাপ তার চিরকেলে জাত শত্রু? সাপের হাতের রান্না খেয়ে সে বেঁচে আছে, সাপের সঙ্গে ঘরকন্না করে? এত বড় প্রতারণা?

ভোরবেলা সর্পকুমারী ফিরতেই নেউল বললে,—'কন্যে, তুমি তো সাপ। কোথায় গিয়েছিলে, বলো। চরায়-বরায় বেরিয়েছিলে বুঝি? আজ তোমাকে আমি মেরেই ফেলব, তার আগে বলো তো, কেন আমায় ঠকালে?'

সর্পকুমারী তখন নীলমণিকে বলে—'ওকে একটা ব্যাং করে দাও।' নেউল অমনি দেখতে দেখতে ব্যাং হয়ে গেল।

তখন সর্পকুমারী তাকে আঁচলে বেঁধে নিশ্চিন্ত হয়ে বললে—'এবারে শোনো। নিজে থেকে আমি তো তোমাকে বিয়ে করতে চাইনি, তুমিই জোর করে আমাকে বিয়ে করেছ। আমি তখন যদি তোমাকে বলতুম যে আমি শঙ্খিনী সর্পকন্যা, তুমি তাহলে আমার নীলমণিও খুঁজে দিতে না, আমাকে মেরে ফেলতে। অন্তত যুদ্ধ করতে। আপন প্রাণরক্ষার অধিকার সব জীবেরই আছে। তাই আমি মিথ্যা বলেছিলাম। কিন্তু তুমি তো আমাকে বিয়ে করার শর্ত করিয়ে নিয়ে তবে মণি খুঁজে দিলে সেটাও কি ঠিক? পরোপকার যদি শর্ত বেঁধে করা হয় তবে আমারই নীলমণির কল্যাণে মানুষ হয়েছিলে, তাতে যদি দোষ না হয় তবে

আমারও রাজকন্যে সাজায় দোষ নেই। আমি তো সত্যিই রাজকন্যে। সর্পরাজ্যের কন্যা। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আমি আমার বাপের বাড়িতে মা-বাবা-ভাই-বোনদের সঙ্গে চড়ুইভাতি করতে যাই। কালও তাই গিয়েছিলাম, যাই হোক, এখন তুমি ব্যাং। আমি এবার সাপ হয়ে গিয়ে তোমাকে খেয়ে ফেলব। কেন না নইলে তুমি নেউল হয়ে আমাকে মেরে ফেলবে। তুমিই তো আগে আমাকে মারতে চেয়েছিলে, কাজেই এতে কোনও দোষ নেই।'

নেউল-ব্যাং তখন বললে—'কন্যে, আমারই দোষ হয়েছে, আমাকে মেরো না। আমি তোমাকে প্রাণের সমান ভালোবাসি কিন্তু জাতে আমি নেউল। আর জাতে তুমি সাপ। তাই স্বাভাবিক শত্রু ভাবটাই আমার মনে জেগেছিল। এসো আমরা আবার মানুষরূপ ধারণ করে একসঙ্গে সংসার করি। আমি ভুলে যাব যে আমি স্বভাবে নেউল, কিন্তু তোমাকেও ভুলতে হবে যে তুমি সাপ। নইলে মিলন হবে না।'

'বেশ তাই হবে।' বলে সর্পকুমারী নেউলকে ব্যাং থেকে আবার মানুষ করে দিলে। নিজে তো পরমাসুন্দরী রাজকন্যে হয়েই বসে আছে। নেউল বললে—'কন্যে, ওই তোমার মাথার মণিটাই যত নষ্টের গোড়া। ওটা আমরা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসি চলো। যাতে তুমিও আর কখনও সাপ না হয়ে যাও, আমিও আর কখনও নেউল হয়ে যেতে না পারি! এসো আমরা সাজা-মানুষ না হয়ে, সত্যি সত্যি মানুষ হয়ে যাই।'

এ কথাটা কন্যেরও খুব পছন্দ হল। এই দুরকম জীবন তার সহ্য হচ্ছিল না। এবার তারা দুজনে চলল সমুদ্রের ধারে সাধের নীলমণি পাথরটি বিসর্জন দিতে। নীলমণি পাথর নীল সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দিয়ে যখন ওরা ফিরে অশথ গাছটির তলায় এলে, সর্পকুমারীর একটি ফুটফুটে মেয়ে জন্মাল। কী সুন্দর মেয়ে, মা-বাবা দুজনের চেয়ে বেশি সুন্দর, কোলজোড়া, বন আলো করা মেয়ে। তার চামড়ায় সাপের চিহ্ন নেই, মুখে নেউলের চিহ্ন নেই, তার গায়ে বনের গন্ধ নেই। সে একদম মানুষ বাচ্চা। মাথায় ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে কোথাও নীলমণি পাথর গোঁজা নেই তার। নকুলকুমার আর শঙ্খিনী কন্যে মুগ্ধ নয়নে একবার মেয়ের মুখের দিকে চায়, আর একবার চায় পরস্পরের মুখের দিকে। শেষকালে একসঙ্গে দুজনেই হাঁফ-ছাড়া হাসি হাসল। যাক এবার থেকে তবে নকল মানুষ সাজা শেষ! সত্যিকারের মানুষের বাবা-মা হয়েছে তারা! মেয়ের নামটি কী বলো তো?

—নীলমণিয়া?

নীলমণিয়া কোনওদিন জানতেই পারেনি তার বাবা নকুলবাবু যিনি সদাগিরি নৌকা নিয়ে সমুদ্রে যাতায়াত করেন, তিনি কে ছিলেন, আর তার মা শঙ্খিনী দেবী, যিনি দিনরাত চমৎকার সব কাঁথা সেলাই করেন, তিনিই বা কে ছিলেন। সারা জীবন সুখে শান্তিতে কাটাচ্ছে তারা। সাপে নেউলে ভীষণ ভাব। একদিনও ঝগড়া হননি তাদের। হবে কেন? সাপও সাপ নেই, নেউলও নেই নেউল। তারা যে এখন সত্যি সত্যিই মানুষ। আর মানুষে-মানুষে তো জাত বন্ধু। জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধুতা এখন তাদের মধ্যে।

টুলটুল, ফুলফুল আর বুলবুল

গল্প বলো না, মা একটা গল্প বলো? ভালো গল্প।

—আগে চোখ বন্ধ কর, বলছি। এক বনে দুই ভাইবোন ছিল। একজনের নাম টুলটুল, আর একজনের নাম ফুলফুল।

'দুই ভাইবোন বনে থাকে কেন মা? ওদের বাড়ি নেই?'

—বাড়িটাই তো বনের মধ্যে। মস্ত বড় বাড়ি। কিন্তু বাড়িতে জনপ্রাণী নেই। কত খাট পালঙ্ক। তাতে বিছানা নেই। কত দোর জানলা, পরদা টাঙানো নেই, ভারী ভারী কত সিন্দুক, তাদের তালার চাবি নেই।

—চাবি কী হল মা?

—সেই তো মজা। চাবি হারিয়ে গেছে।

—আর বিছানা? পরদা? সব ছিঁড়ে গেছে বুঝি?

—স-ব ছিঁড়ে গেছে।

—ভাইবোন একলা একলা থাকে। বাড়িতে কেউ নেই?—টিকটিকি?—চড়াইপাখিও নেই? কেউ না? মাকড়সা?—পিঁপড়ে?

—উহুঁ—চড়াইপাখি নেই, টিকটিকিও নেই, মাকড়সাও নেই, পিঁপড়েও না। কিন্তু একটা বিরাট পাহারাদার কুকুর আছে। মোটাসোটা কালো চকচকে, ভেলভেটের মতন তার গায়ের লোম। কেবল মাথার ওপরটা সোনালি ছোপ ছোপ—আর খুব তেজি। আর আছে একটা পুষি বেড়াল নরম তুলতুলে, সাদা ধবধবে, গোলগাল, আর খুবই আহ্লাদি। মোটা

লেজটি কমলা রঙের। টুলটুল যেখানে যায় পেছু পেছু কুকুরটা ঘোরে, আর ফুলফুল যেখানে যায় পেছু পেছু ঘোরে মিনিবেড়াল।

—ওদের নাম নেই?

—হ্যাঁ—কৃষ্ণচন্দ্র, আর কমলিকা।

—কুকুরের নাম কৃষ্ণচন্দ্র, আর পুষির নামটা কমলিকা না মা, ওদের আর কী ছিল, পাখি ছিল? টিয়া? চিনিয়া মুনিয়া?

—নাঃ। পাখি ছিল না। পাখির খাঁচাটা খালি ছিল।

—লালমাছ ছিল না?

—নাঃ, শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চা শূন্য পড়ে ছিল। লালমাছ ছিল না।

—ওদের গরু ছিল না, মা?

—গোয়াল ছিল, গরু ছিল না—তকতকে নিকোন শূন্য গোয়াল।

—কিন্তু ভাইবোনেরা তো ছোট ছেলেমেয়ে, ওরা দুধ খেত না?

—তা খেত। গরুর নয়, ওরা খেত বাঘের দুধ। বনটাই যে ছিল বাঘের বন। এক বাঘিনী মাসি রোজ এসে ওদের চারজনকেই দুই খাইয়ে যেত আদর করে। সেই দুধটুকু খেয়েই ওরা বেঁচেবর্তে বড় হয়ে উঠছিল।

—বাঘের দুধ বলে কথা! খুব গায়ে জোর ছিল নিশ্চই ভাইবোন দুজনেরই?—

—হ্যাঁ, তা ছিল।

—টারজানের মতন? না, রাজার মতন?

—ওই হল। একই রকম। তবে অরণ্যদেবের মতন অতটা নয়। ওরা তো ছোট?

—বাঘেরা ওদের কেন খেয়ে ফেলত না মা?

—বাঃ, ওদের বুকে বজ্রমানিকের মালা দুলছে, বজ্রমানিকের মালা যার গলায় থাকে জগতে কেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারে না।

—তাকে বাঘে খায় না?

—তাকে বাঘে খায় না, হাতিতে পিষে ফেলে না, বাইসনে গুঁতিয়ে দেয় না, সাপে কামড়ায় না, ঈগলে ছোঁ মারে না।

—তাদের মশায় কামড়ায় না? বোলতা? মৌমাছি? কাঠ পিঁপড়ে?

—তা অবিশ্যি কামড়াতে পারে। ছোটখাটো লোকসান আটকায় না। কেবল বড় বড় লোকসান আটকায়। যেমন ওরা জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, ওদের মাথায় বাজ পড়ে না, ওদের—

—ওরা গাছে চড়তে পারে?

—তা পারবে না? বনের মধ্যে বাস তাদের। গাছই তাদের সঙ্গী।

—গাছ থেকে পড়ে গেলে হাত-পা ভাঙবে না?

—নাঃ। ছড়েটড়ে যেতে পারে অবশ্য।

—মা, আমাকে একটা বজ্রমানিকের মালা এনে দেবে?

—পারলে কি আর দিতুম না ধন? কিন্তু সে-মালা কেবল বিধাতার কাছে থাকে।

জন্মের সময়েই কারুর গলায় তিনি পরিয়ে দেন। ভগবানের আশীর্বাদ।

—মা, ভগবান আমাদের কেন আশীর্বাদ করেননি?

—ছি, ছি, বাবা, ওকথা বলতে নেই। কে বললে ভগবান আশীর্বাদ করেননি? না করলে কি এমন করে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে কেউ?

—তা বটে। ঠিক কথা।

—তবে? বজ্রমানিক নাই বা হল, তোমাদের বুকে অন্য একটা তাবিজ আছে, সেটাও খুব শক্তিমান।

—কী মা? কী তাবিজ? কই, দেখিনি তো একদিনও?

—দেখা যায় না বাবা, অদৃশ্য তাবিজ। আর নামটা উচ্চারণ করলেই তার সব ম্যাজিক নষ্ট হয়ে যায়—

—থাক, থাক, বলতে হবে না। অদৃশ্য তাবিজটা কে দিয়েছিল আমাকে মা? তুমি দিয়েছ?

—ভগবানই দিয়েছেন বাবা। তাঁর আশীর্বাদ, কিন্তু তুমি এত প্রশ্ন করলে আমি আর গল্প বলব না।

—স্যরি মা, স্যরি। বলো, গল্পটা বলো। আচ্ছা, ফুলফুল নিশ্চয়ই বোনের নাম? টুলটুল হচ্ছে ভাই? না? কে বড়, কে ছোট, মা?

—ঠিক তাই। ওরা কেউ বড়-ছোট নয়, ওরা যমজ।

—মা, ওদের বাবা-মা কই?

—সেই তো মজা। ওদের মনেও ওই একই প্রশ্ন। একদিন ফুলফুল টুলটুল দুজনে মিলে পরামর্শ করল ঃ

—'চলো, আমরা বরং বনদেবতাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের কি মা-বাবা নেই?'

—বনদেবতা কোথায় থাকতেন মা? মন্দিরে?

—বনের লতায়-পাতায়-ঘাসে। প্রশ্ন শুনে বনদেবতা ঝোড়ো বাতাসের শন শন শব্দে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ! তোমাদের বাবা-মা আছেন। তোমাদের বাবা-মা আছেন!'

—'কোথায়? কোথায়?'

—'কাছাকাছিই! কাছাকাছিই!' এইটুকুনি বলেই বনদেবতা চুপ করে গেলেন। আর উত্তর নেই, ঝড় থেমে গেল। বন নিস্তব্ধ।

—তা হোক, তবু তো কিছুটা জানা গেল?

তা গেল। তাতেই খুশি হয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে দুই ভাইবোনে নদীতে নাইতে গেল। গিয়ে দেখে নদীর স্রোতে চমৎকার একটা চন্দনকাঠের নৌকা ভেসে যাচ্ছে। আহা, কী তার সুরভি, আর কী চমৎকার কারুকার্য তাতে! হাতির দাঁতে, রুবিপান্নায়, সোনারুপোয় মিলিয়ে। দেখে দেখে চোখ ফেরে না। ওরা সাঁতরে গিয়ে নৌকোটাকে ধরল।

—জলে কুমির নেই!

—নাঃ। থাকলেও ওদের কিছু বলত না তো।

—তা বটে। নৌকোতে মাঝিটাঝি কেউ ছিল না। খালি নৌকো।

ঘড়া ঘড়া ঘি, বৈয়াম বৈয়াম মধু, থলি থলি মোহর, থালা থালা মেঠাই-মণ্ডা, ঝুড়ি ঝুড়ি বাদামপেস্তা, ধামা ধামা খই মুড়কি, চমৎকার খেলনাপাতি, গাঁঠরি গাঁঠরি রেশমি কাপড়—ওঃ! সে সাত রাজার ধনসম্পদ! আর, এক কোণে একটা সোনার খাঁচা। তার ভেতরে কী! না একটা ছোট্ট বুলবুলপাখি। বসে বসে কী সুন্দর করুণ সুরেই না গান গাইছে! মাথায় ভেলভেট-লাল ঝুঁটি, কিন্তু পায়ে শক্ত সোনার শেকল। বুলবুলপাখি বললে—

ভাই ফুলফুল, যদি আমাকে তুমি মুক্ত করে দাও, নৌকোসুদ্ধু এইসব জিনিসপত্তর আমি তোমাকে দিয়ে দেব।

শুনে ফুলফুল মাথা নেড়ে বললে—জিনিসপত্তর আমার চাই নে বাছা, এসো, তোমাকে খুলে দিচ্ছি।

তারপর যেই না খাঁচাটা খুলে দিয়েছে—অমনি বুলবুল পাখিটা হিরের গয়নায় আর বালুচরি শাড়িতে ঝলমল করতে করতে পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যা হয়ে বেরিয়ে এল। টুলটুলকে ডেকে সেই কন্যা বললে, 'পায়ের শিকলিটা যদি খুলে দাও টুলটুলবাবু, তা হলেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি—'

'ওমা! বিয়ে করবে কী? ওরা না ছোট?'

ছোটই তো। টুলটুল শিকলি খুলে দিয়ে তাই জন্যে বললে, 'আমি কাউকে বিয়ে-টিয়ে করতে পারব না বাপু, তুমি তোমার নৌকায় চড়ে যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে চলে যাও।' সেই শুনে কী হল বলো তো? সেই সুন্দরী মেয়েটা না, আকাশপাতাল জুড়ে অ্যাত্তো বড় এক হাঁ করে টুলটুল আর ফুলফুলকে খেয়ে ফেলতে তেড়ে এল। কী বড় বড় দাঁত তার! মনুমেন্টের মতন লম্বা লম্বা! আর কী লাল জিভ! ওই যে লালঝান্ডা নিয়ে মিছিল যায়, সেইরকম টকটকে লাল—

—অ্যাঁ? সে কী কথা? ওটা যে তবে ডাইনি বুড়ি গো? ওদের খেয়ে ফেললে?

—আরে শোনোই না। বুকে বজ্রমানিক থাকতে খাবে কী? নদী যেই দেখলে এ তো বিষম বিপদ। বাচ্চাদের রক্ষে করতে সে তক্ষুনি ডাইনির পায়ের নীচের বালিটুকুকে গভীর চোরাবালি বানিয়ে দিলে, আর ডাইনিও ভুস করে চোরাবালির মধ্যে হাত-পা সুদ্ধু গলা পর্যন্ত ডুবে গেল। বাইরে জেগে রইল কেবল অ্যাত্তোবড় হাঁ করা তার মুণ্ডুখানা। টুলটুল-ফুলফুলের প্রহরী কুকুর সেই কৃষ্ণচন্দ্র তখন তেড়ে এসে ঘ্যাঁক করে ডাইনির নাক আর কান দিল কামড়ে। আর সেই মিষ্টি পুষিবেড়াল কমলিকা এসে ডাইনির জ্বলন্ত লোহার ভাটা চোখ দু-খানা নোখ দিয়ে আঁচড়ে দিলে। 'বাপ রে গেলুম রে' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দুষ্টু ডাইনিবুড়িটা যেই মরল অমনি দেবতারা আনন্দে শঙ্খধ্বনি করলেন। আকাশ বাতাসে কাড়া-নাকাড়া ভেরি তূর্য বীণা-স্বরোদ কত কী বাজনা বেজে উঠল—সারাটা বনই যেন উৎসবে মেতে উঠল। আর বাঘেরা সবাই বন থেকে বেরিয়ে দলে দলে নদীর তীরে এসে ঝপাঝপ জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আর জল থেকে উঠে আসতে লাগল নতুন পোশাকপরা একের পর এক হাসিখুশি মানুষজন, সেপাই সান্ত্রী, চাষিমজুর, কোটাল-মন্ত্রী, বণিক-পুরুত।

—সে কী? বাঘেরা আসলে মন্ত্রপড়া মানুষ ছিল বুঝি! ওই ডাইনি তাদের গুণ

করেছিলে? কেন করেছিল মা!

—ডাইনি যে ওদের দেশের সব ধনসম্পত্তি নিজে নিয়ে নিয়ে, ওদের সব জীবজন্তু করে দিয়েছিল। কিন্তু ওখানে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি উলটে মন্ত্র পড়ে ডাইনিকেই বুলবুলপাখি করে, করলেন কি পায়ে শিকলি বেঁধে খাঁচায় পুরে ভাসিয়ে দিলেন। অন্যের জিনিস সে যাতে কিছুই ভোগ করতে না পারে। কিন্তু সন্ন্যাসী তো বুড়ো মানুষ। দেশসুদ্ধু লোকের এই দুঃখু সইতে না পেরে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন, ডাইনিও উদ্ধার পায়নি, দেশও আর উদ্ধার হয়নি। এতদিনে এল মুক্তি।

—টুলটুল-ফুলফুলের জন্যই ডাইনির ফুসমন্তর ঘুচে গেল, না মা?

—হ্যাঁ বাবা, টুলটুল-ফুলফুলের পুণ্যবলে দেশের লোক উদ্ধার পেল।

—তারপরে কী হল?

—তারপরে? বিরাট গাছগুলো সব হয়ে গেল বিশাল যত অট্টালিকা—মুহূর্তের মধ্যে বন-জঙ্গলের অন্ধকার উবে গিয়ে ঝলমল করে উঠল সূর্যের আলো—দেখা দিল সুন্দর এক শহর। বাগান ঘেরা এক প্রাসাদ নগরী।—বড় বড় চওড়া রাস্তার মাঝে মাঝে সবুজ গোল চত্তর, চারদিকে বাগানভরা রং-বেরঙের ফুল, আর গোলাপজলের ফোয়ারা। টুলটুল আর ফুলফুল তো এক্কেবারে অবাক।—একেবারে হাঁ!

—এ কী কাণ্ড রে বাবা! এত লোকজন দেখে ওরা তো ভয়েই কাঁটা।

ঠিক এমন সময়ে কে যেন ওদের পিঠে নরম করে হাত রাখলে আর মিষ্টি গলায় মিহি সুরে ওদের ডেকে বললে, 'ভয় কী বাছারা, চলো বাড়িতে যাবে চলো', তাকিয়ে দেখে, ওমা ইনি আবার কে! ফরসা ধবধবে, নরম তুলতুলে মিষ্টি আর পরনে কমলা রঙের ঢাকাই শাড়িটি আর আঁচলে এক গোছা চাবি বাঁধা। —মুখখানা যেন ওদের খুব চেনা চেনা!

—আমি তোমাদের মা, রানি কমলিকা—

—আর আমি হলুম তোমাদের বাবা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র—গমগম শব্দে বলে উঠলেন কে যেন পিছন থেকে। তাঁর পরনে কালো ঝলমলে জরির কাজ করা রাজপোশাক, ইয়া পাকানো গোঁপ, ইয়া কোঁকড়ানো জুলপি, বাবরি চুলের ওপরে সোনার মুকুটখানি ঝলমল করছে।

—আর আমি কে বলো তো! আমার দুধের বাছারা, দেখি তো আমাকে চিনতে পারো কিনা! বলে একটা রুপোর থালায় সোনার বাটিতে ভরতি চার বাটি সুগন্ধী ক্ষীর আর স্ফটিকের গেলাসে চার গেলাস গোলাপি শরবত নিয়ে এগিয়ে এলেন যিনি, তাঁর চোখের মিষ্টি হাসিটা ঠিক বাঘিনী মাসির মমতামাখা চোখের মতন। ওরা বললে—'তুমি আমাদের বাঘিনী মাসি!'—তিনি হেসে বললেন, হ্যাঁ গো, আসলে কিন্তু তোমাদের ধাই-মা হই!

—সে তো বুঝলাম! কিন্তু ডাইনিটা টুলটুলকে বিয়ে করতে চাইছিল কেন মা? আমি বুঝতে পারলুম না ঠিক।

—দুর, দুর, সত্যি সত্যি বিয়ে করতে চাইছিল, না হাতি! লোভে পড়লেই

বজ্রমানিকের মালার সব গুণ নষ্ট হয়ে যায় কিনা? তাই এত ভালো ভালো খেলনাপাতি, পোশাক পত্তর, খাবার-দাবার, সোনাদানা, রূপবতী রাজকন্যেটন্যের ফাঁদ পেতে ওদের মনে লোভ জাগাচ্ছিল দুষ্টু ডাইনিবুড়ি; যাতে ভগবানের আশীর্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

—কিন্তু ওরা তো লোভে পড়েনি, না মা? ওরা তো একটুও লোভী ছিল না? তাই না? ওরা তো ভালো। খুব ভালো।

—হ্যাঁ বাবা। একটুও লোভী ছিল না ওরা। তাই তো ওদের রাজ্যসুদ্ধু রাজা, প্রজা, মা-বাবা, ধনরত্ন—সবই ফেরত পেল। যে লোভকে জয় করতে পারে, সে জীবনের সব ব্যাপারেই জয় হয় বাবা।

'আমি একটুও লোভী নই, না মা?'

'হ্যাঁ বাবা। তুমি মোটেই লোভী নও।'

—মা, তা হলে আমার ওপরেও ভগবানের আশীর্বাদ থাকবে তো?

—নিশ্চয়ই থাকবে, বাবা। তুমিও যে ভালো, খুব ভালো।

—মাগো, তুমি আমার কাছেই থেকো কিন্তু? কোথাও উঠে চলে যেয়ো না যেন। হ্যাঁ মা? আমি তাহলে একটু ঘুমিয়ে পড়ি এইবার?

—ঘুমোও সোনা, আমি এখানেই আছি, তোমার পাশে কোথাও চলে যাচ্ছি না। এই তোমার পিঠের ওপরে আমার হাত রইল।

ডিম্ববতী

এক বুড়ো আর বুড়ি। তারা বনের ধারে থাকে, আর মনের দুঃখে থাকে। কেন? মনে কেন দুঃখ? তাদের যে ছেলে নেই পুলে নেই নাতি নেই নাতনি নেই। তারা কাউকে আদর করতে পারে না, কোলে করে দোলাতে পায় না। দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়াতে পায় না, ঘুম পাড়াতে পাড়াতে গল্প শোনাতে পায় না। তাদের কেবল আছে রান্না আর খাওয়া। বন থেকে বুড়ি শাকসবজি তুলে আনে, নদী থেকে বুড়ো মাছটাছ ধরে আনে, কখনও বা কচ্ছপ-কাছিমের ডিম, কখনও হাঁস-মুরগির ডিম, কখনও দোয়েল-কোয়েলের ডিম। যখন যা পায়। আনে আর খায়।

একদিন বুড়ো একটা ঝোপের মধ্যে একটা ভারি সুন্দর গোল বলের মতন ডিম দেখতে পেলে। সোনা হলুদ রঙের ডিমটি, তাতে সবুজ আর সাদা রঙের আলপনা। বুড়ো ডিমটি এনে বুড়িকে রান্না করতে দিলে। বুড়ি বললে—'আহা, এত সুন্দর ডিমটা? এটাকে ভেঙে ফেলব? থাক না। আজ বরং শাকসবজিই খাও।' বুড়ো বললে, 'তা বেশ, তা বেশ।' বুড়ি তো ডিমটাকে রান্নাঘরে যত্ন করে তার শাকসবজির ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছে। সবসময়ে দ্যাখে। কখনও মনে হয় ডিমটা যেন একটা গজমোতি, কখনও মনে হয় যেন ঝলমলে সোনালি স্ফটিকের তৈরি বল, তাতে মুক্তোপান্নার কারুকাজ করা—দেখে দেখে বুড়ির চোখ ফেরে না, আশ মেটে না। আহা ঈশ্বরের সৃষ্টি, কী সুন্দর! চোখ মেলে দেখতে দেখতে মন ভরে যায়। বুড়োবুড়ি তো গরিব মানুষ, তাদের ঘরে মণিমুক্তো দামি পাথর কিছু নেই। সুন্দর ডিমটাই ওদের ধনসম্পত্তি হয়ে উঠল। এদিকে যত দিন যায় সেই ডিমও

ততই সুন্দর হয় আর ঝলমল করে। ক্রমশ বুড়ি দেখলে রাত্তিরবেলা ডিমটার গা থেকে রীতি-মতন আলো বেরুচ্ছে, ঘরে ভরে যাচ্ছে তারই আলোতে। আর প্রদীপ জ্বালতে হয় না তাদের? বুড়ো তারপর অনেকবার সেই ঝোপটাতে ফিরে গেছে। বাসাটা কীসের? কোনও পাখির না কোনও গোসাপের। না আর কিছুর? কীসের ডিম ওটা জানতে হবে তো? কিন্তু নাঃ, যতই খুঁজুক, কোনও হদিস নেই। বাসাটা খালিই পড়ে থাকে।

একদিন ডিম-টিম না পেয়ে বুড়ো ওই বাসাটাকেই তুলে নিয়ে এল। এসে বুড়িকে বলল—'বাসাটাই আজ রান্না করা হোক। চিন-জাপানে শুনেছি পাখির বাসা রান্না করে খায়।' বুড়ি বললে—'ধ্যাত। পাখির বাসা আবার কেউ খায়? তায় এটা কীসের না কীসের বাসা তাই জানি না। তোমার জন্যে আজ ঝিঙে পোস্ত করেছি। পাটশাকের ঝোল করেছি। পাখির না কীসের যেন বাসাটা তো দেখছি ভারি সুন্দর দেখতে। ঠিক যেন বেতের বোনা একটা চুপড়ি। দাও, আমার ডিমটা ওরই ভেতর রেখে দিই। যেখানকার জিনিস সেখানে থাকুক। খুব মানাবে।' এই বলে সে পাখির বাসাটা রান্নাঘরের তাকের ওপর তুলে রাখলে। তার মধ্যে মণিমুক্তোর মতন ঝলমলে ডিমটা বসিয়ে দিলে। আর যেই না ডিমটা বসানো, অমনি বিদ্যুৎ ঝলসানোর মতো ঘরে আলোর চমক দিয়ে, বাসাটা হঠাৎ সোনার তৈরি পাখির বাসা হয়ে গেল। বুড়ি তো অবাক। তাড়াতাড়ি বুড়োকে ডেকে আনলে। 'ও বুড়োমশাই? এ যেন সোনার তৈরি বাসা? এবার তো কুঁড়েঘরে ডাকাত পড়বে গো? কী জ্বালা!' বুড়ো বললে, 'তাই তো? কাউকে বোলো না যেন তোমার ঘরে সোনার তৈরি পাখির বাসা আছে, তা হলেই ডাকাতরা এ কথা জানতে পারবে না।' বুড়ি খুবই লক্ষ্মী। সে কাউকে কিছু বললে না। কিন্তু বুড়ো? সে নিজেই একদিন সন্ধেবেলা গাঁয়ের পাঁচবুড়োর আড্ডাতে বুড়োদের সঙ্গে তামাক খেতে খেতে অহংকার করে বলে ফেললে—'তোমাদের আর এক বৃদ্ধ বয়সে কীই বা দেখা হয়েছে? সোনার তৈরি পাখির বাসা দেখেছ কেউ? আমি দেখেছি।' অন্য বুড়োরা বললে—'যা! বাজে কথা! তামাক খাচ্ছ, নাকি গাঁজা খাচ্ছ?' বুড়োর কথা তারা কেউ বিশ্বাসই করলে না। তখন বুড়ো রেগেমেগে বললে—'বেশ। তোমাদের আমি যদি সোনার তৈরি পাখির বাসা দেখাতে পারি, তোমরা আমাকে কে কী দেবে?' তখন একজন বুড়ো বললে, 'একটা সোনার আংটি দেব।' একজন বললে, 'একটা কাশ্মীরি শাল দেব'; আরেকজন বললে, 'একটা শ্বেতপাথরের থালা দেব', আর যে বুড়ো গাঁয়ের মোড়ল, সে বললে—'আমার একটা নাতিকেই না হয় তোমাকে দিয়ে দেব। সোনার পাখির বাসাটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে।' বুড়ো তখন বাড়িতে গিয়ে বুড়ির কাছে বাসাটা চাইলে। বুড়ি বললে—'ও বুড়োমশাই, অহংকার করতে গিয়ে কী সর্বনাশ করলে, এবার তো ঘরে ডাকাত পড়বেই!' বলে কাঁদতে কাঁদতে ডিমটাকে তুলে নিয়ে সবজির ঝুড়িতে রেখে সোনার বাসাটি বুড়োর হাতে দিলে। বুড়ো সোনার বাসাটি হাতে নিয়ে পাঁচবুড়োর সভায় হাজির হল। চার বুড়ো তো হতভম্ব! মোড়ল গম্ভীর হয়ে বললে, 'বাসাটা নিয়ে স্যাকরার দোকানে চলো, আগে কষ্টিপাথরে ঘষে দেখতে হবে, সত্যি সত্যি সোনা কিনা।' স্যাকরা তো কষ্টিপাথরে ঘষে অবাক। আরে, এ যে এক্কেবারে খাঁটি সোনা! এমন সোনা যেন এ-গাঁয়ে পাওয়াই যায় না। মোড়ল তখন বুড়োকে বললে—'বাসাটা আমাকে দাও। তার বদলে এই একশো

টাকা তুমি নাও। তার দেখাদেখি অন্য বুড়োরাও তখন কেউই তাদের কথা রাখলে না। একজন একটা রুপোর আংটি দিলে, একজন একটা সুতির চাদর দিলে, একজন একটা কাঁসার থালা দিলে। বুড়ো অবাক হয়ে বললে, 'সে কী? তোমরা কেউ কথা দিয়ে কথা রাখলে না?' বেশ, আমিও তবে বাসা মোড়লকে দেব না।' তখন মোড়ল বললে—'পাঁচশো টাকা।'—বুড়ো বললে, 'বাসা আমি দেব না।' তখন মোড়ল বললে 'হাজার।' এমনি করে মোড়ল এক লাখ টাকাতে উঠল; কিন্তু বুড়ো তখনও লোভে পড়ে সোনার বাসা না বেচে রাগ করে দুপদাপ পা ফেলে বাড়ি চলে এল। বুড়োরা কেউ কথা রাখেনি বলে তার খুব রাগ। বুড়ি সব শুনে বললে, 'ঠিক করেছ।'

মোড়লের বউ এদিকে ভারি লোভী। সে বললে, 'আমাদের তো চোদ্দোটা নাতি! একটা যদি বুড়োবুড়ি নেয়, তো নিক না? একটা নাতি আছে না, রোগা-রুগ্ন, কানা-খোঁড়া, চোখে দ্যাখে না, পায়ে হাঁটে না? ওইটেকেই দিয়ে দাও।' খুশি হয়ে মোড়ল তখন বুড়োর বাড়ি গেল। রোগা-রুগ্ন, কানা-খোঁড়া নাতিকে কোলে নিয়ে। বললে—'এই নাও। আমার নাতি এনেছি, সোনার বাসাটা আমাকে দাও।' বুড়োবুড়ি তো জলজ্যান্ত নাতিটি পেয়ে মহা খুশি। সোনার বাসাটা তক্ষুনি দিয়ে দিলে। সুতির চাদরটি পেতে আদর করে নাতিকে বসিয়ে তার কচি হাতে রুপোর আংটিটি পরিয়ে দিলে, আর কাঁসার থালাতে গরম গরম অন্নব্যঞ্জন বেড়ে এনে বুড়ি যত্ন করে তাকে খাইয়ে দিতে লাগল। বুড়োবুড়ির প্রাণে আনন্দ আর ধরে না—এতদিনে তাদের কোলে করে আদর করবার মতন একজন নাতি হয়েছে। তাকে দোল দোল দুলুনি করে ঘুম পাড়ানো যাবে, তাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে গল্প শোনানো যাবে, তাকে নদীতে নাইয়ে ধুইয়ে ফরসা ধুতিটি পরিয়ে চুলটি আঁচড়ে অন্নব্যঞ্জন রেঁধে গরাস করে করে খাওয়ানো যাবে—আঃ! কতকালের সাধ এবার পূর্ণ হবে। আহ্লাদে বুড়োবুড়ির বয়েস যেন কমে গেল। তারা নাতি নিয়ে মেতে উঠল।

বুড়ো বন থেকে খুঁজে খুঁজে নানারকমের শেকড়বাকড় ওষুধবিষুধ তুলে আনে, বুড়ি বেটে ঘেঁটে খাওয়ায়। যদি চোখটা মেলে চায়। যদি পা-টা শক্ত হয়। যত্নে যত্নে রোগারুগ্ণ নাতি দিব্যি নাদুস-নুদুস নধর নাতিটি হয়ে উঠল। কে বলবে সে যে কোনওকালে মোড়লের ঘরে রুগ্ণ ছিল? গরিব দাদুদিদার কচুঘেঁচু কলমি শুসনি খেয়েই তার রং ফেটে পড়েছে, চামড়ায় আলো যেন পিছলে পড়ে। হলে কী হবে? নাতি চোখেও দেখে না, পায়েও হাঁটে না। অথচ কী সুন্দর পদ্মফুলের পাপড়ির মতন টানাটানা তার চোখদুটি। কিন্তু সে চোখের পাতা খোলে না। আর পা দুটি? সেও তো ভারি সুন্দর গড়নের, ভাঙা নয়, বাঁকা নয়া, সুঁটকো নয়, মুটকো নয়, আঙুলগুলি সমান, হাঁটুটি গোল, অথচ সেই পায়ে জোর নেই। দাঁড়াতেই পারে না। জোর থাকবে কী করে? মোড়লের বাড়িতে কেউ তাকে যত্ন করত কি? পর পর ষণ্ডাগুণ্ডা তেরোজন নাতির পর রোগা-রুগ্ণ ওই চোদ্দো নম্বরটির দিকে আর কেউ নজর দেয়নি। সে খেতে খেতে দুধ ফুরিয়ে যেত, তাকে দুধের বাটি ধুয়ে জল খাইয়ে দিত। বল পাবে কোত্থেকে? সে যে কাঁথার ওপর পড়েই থাকত দিনরাত! বাড়িসুদ্ধ

লোক তো দুষ্টু দস্যি তেরোটা দুরন্ত দুর্দান্ত নাতির পেছনে 'ধর ধর!' 'গেল গেল!' 'ফেললে বুঝি! ভাঙলে বুঝি!' করে। সে হাঁটতে শিখবে কেমন করে? কিন্তু এখন? বুড়োবুড়ি রোজ ঝিনুক বাটি নিয়ে তাকে মধু গোলা দুধ খাওয়ায়। হাত ধরে ধরে হাঁটি হাঁটি 'পা-পা' করে হাঁটতে শেখায়। খুব যত্নে, খুব সাবধানে, আহা, পড়ে না যায়, যেন ব্যথা না পায়। সে যে বুড়োবুড়ির খেলার পুতুল তাই নয়, সে তাদের চক্ষের মণি বক্ষের পাঁজর। এখন তাই নাতির মনে খুব আনন্দ। কত হাসে, কত কথা বলে। কান্নাকাটি জানে না।

হঠাৎ একদিন নাতি ভীষণ কেঁদে উঠল। বুড়োবুড়ি তো ভয়েই সারা। হল কী নাতির? কী হয়েছে? কী হয়েছে? না—একা-একা, নিজে-নিজে, হাঁটতে গিয়ে পাথরে হোঁচট লেগে নাতিবাবু আছড়ে পড়েছে! আহা রে, বড্ড লেগেছে। পাথরের কোণে লেগে পা-টা কেটেও গেছে খানিক, ঝরঝরিয়ে রক্ত ঝরছে। বুড়োবুড়ি—'আহা। উহু। ষাট ষাট। বাছা আমার। এক্ষুনি সেরে যাবে!' এইসব বলতে বলতে কচি কচি গাঁদাফুলের পাতা চিবিয়ে যেই না পায়ে প্রলেপ লাগিয়েছে অমনি রক্ত ঝরা বন্ধ। রক্ত বন্ধ হলে কী হবে? কান্না আর বন্ধ হয় না। নাতি কাঁদছে তো কাঁদছেই। কত ভোলায় কত দোলায়, নাতির কান্না থামে না। খেলনা নাও, মিঠাই নাও, ফুল নাও, ফলটি নাও, থালাবাটি ঘটি নাও, আর কেঁদো না, রেহাই দাও, মাথা খাও। অস্থির হয়ে বুড়ি শেষকালে তাক থেকে তার সাতরাজার ধন মানিক সেই আদরের ডিমটি এনে নাতির হাতে তুলে দিলে। 'এই নাও সোনার নাতিবাবু, এর চেয়ে ভালো জিনিস এই বাড়িতে আর একটাও নেই। এটা একটা স্ফটিকের তৈরি খেলনা, কিংবা এটা গজমোতি, কেউ তা জানে না। আসলে যে-বস্তুই হোক, এটা খুব সুন্দর দেখতে একটা ডিম। আজ থেকে এটা তোমার জিনিস। এবার খেলা করো—কান্না থামাও।' ডিমটিকে যেই নাতি হাতের মুঠোয় পেল, অমনি চক্ষের পলকে যেন ম্যাজিকের পর ম্যাজিক হতে লাগল।

প্রথমে তো সত্যি সত্যিই নাতির কান্না থেমে গেল! আর যা যা হল—ওঃ কী বলব! ডিমটার ছোঁয়া লেগে সুতির চাদরটা কাশ্মীরি শাল হয়ে গেল, রুপোর আংটি সোনার হয়ে গেল, কাঁসার থালা শ্বেতপাথর হয়ে গেল, আর? আর—আর নাতির বন্ধ চোখের পাতাদুটি সেই স্ফটিকের জ্যোতির ছটা লেগে আপনা আপনি খুলে গেল, ভোরবেলা ঠিক যেমন পদ্মফুলের পাপড়িগুলি খোলে।

চোখ মেলেই হাতে সুন্দর ডিমটা দেখতে পেয়ে নাতি খিলখিল করে হেসে উঠল। 'কী সুন্দর খেলনা!' আর বুড়োবুড়ি? কাশ্মীরি শালে, সোনার আংটিতে, শ্বেতপাথরের থালায় পদ্মপলাশ নয়ন নাতিকে মিঠাই খেতে দেখে, বুড়োবুড়ি তো আহ্লাদে আত্মহারা।

'হায় হায় এত সৌভাগ্যও আমাদের কপালে ছিল? কোলভরা নাতি এল, শ্বেতপাথরের থালায় খেল, কাশ্মীরি শাল পায়ে জড়াল, সোনার আংটি হাতে পরাল—এ সৌভাগ্য কে এনে দিল? ভাগ্যিস ডিম ঘরে ছিল! ডিম আমার ধন, ডিম আমার লক্ষ্মী!' বুড়োবুড়ির আহ্লাদের আর সীমা নেই। বুড়ি তো আদর করে ডিমের গায়ে একটা মস্ত চুমুই খেয়ে ফেললে—'ওরে আমার লক্ষ্মী ডিম, আমার সোনার ডিম, তোর দয়াতেই আজ আমার সব হল!' যেই না চুমু খাওয়া, অমনি পুটুস করে ডিম ফুটে একটা ছোট্ট মিষ্টি,

টুকটুকে পুতুলের মতন মেয়ে বেরুল। তার গা ভরতি মুক্তো-পান্নার গয়না, মাথাভরতি রেশমি চুল, ফুরফুরে সোনালি শাড়িটি পরনে। সে বেরিয়েই বুড়ির কোলে উঠল। বুড়োবুড়ির আনন্দের সীমা নেই। নাতনির নাম দিলে ডিম্ববতী; নাতির নাম চক্ষুষ্মান। রোজ ডিম্ববতীর সঙ্গে খেলতে খেলতে চক্ষুষ্মান হাঁটতে কেন, ছুটতেও শিখে গেল। তারপর?

বুড়োবুড়ি দুজনে এখন কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে বসে তাস খেলে, আর গল্প করে। কখনও বুড়ি কাঁথা সেলাই করে, বুড়ো তামাক খায়। নাতি বড় হয়ে গেছে, নাতনি বড় হয়ে গেছে, তাদের আর ভাবনা কী? দুজনেই এখন খেটেখুটে রোজগার করে আনে। ঘরে কোনও জিনিসের অভাব নেই। চক্ষুষ্মান আর ডিম্ববতীই এখন বুড়োবুড়িকে দ্যাখে, ঘরে-বাইরে কাজকর্ম সব করে। ভাত বেড়ে খেতে দেয়, বিছানা পেতে শুতে দেয়। দাদু-দিদুকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে।

আর ওদিকে সেই লোভী মোড়ল-মোড়লনীর কী হল? সোনার লোভে রোগা-রুগ্ণ নাতিটাকে যারা বিলিয়ে দিয়েছিল? তাদের দুর্দশার আর শেষ রইল না। লোকের মুখে মুখে রটে গেল নানান উলটোপালটা গুজব।

‘গাঁওবুড়োদের ঘরে
সোনা ঝলমল করে
লক্ষ টাকার সোনা
যায় না হাতে গোনা
সোনার বাসায় সোনার পাখি
কোথায় ঢাকি, কোথায় রাখি—’

সেই না শুনে চম্বল থেকে দলে দলে মান সিং, দান সিং, ধ্যান সিং, ডাকাতরা ওদের গাঁয়ে এসে পড়ল। বুড়োদের বাড়ি বাড়ি।

চড়াও হয়ে যথাসর্বস্ব লুটপাট করে নিলে। সবচেয়ে বেশি গেল মোড়লের, কেন না তারই ছিল সবচেয়ে বেশি। ধান-চাল, পোশাক-আশাক, বাসন-কোসন, গয়নাগাঁটি, ধনরত্ন কিছুই আর রইল না মোড়লের ঘরে। সব সিন্দুক হাহা, সব আলমারি খাঁখাঁ, সব গোলাঘর ফাঁকা, তখন মোড়লের তেরোজন নাতি আর কী করে? কাজের খোঁজে বিশ্বভুবনের তেরোদিকে ছিটকে পড়ল তারা। যার যার নিজের রুজি-রোজগার করতে হবে তো? লোভী মোড়লবুড়ো আর লোভী মোড়লনীকে দেখাশুনো করাবার জন্যে কেউই রইল না। তাদের দুর্দশা দেখে কাক-চিলেও চোখের জল ফেলতে লাগল। গাঁয়ের বুড়োরা তখন নিজেরাই বুঝলে—‘বুড়োকে কথা দিয়ে সেই যে আমরা কথা রাখিনি, এখন সেই অন্যায়েরই শাস্তি পাচ্ছি।’ তারা তখন মোড়লকে সুদ্ধু সঙ্গে নিয়ে বুড়োবুড়ির কাছে গিয়ে সবাই মিলে হাতজোড় করে মাপ চাইলে। বুড়োবুড়ির তো এখন আনন্দের দিনে সেসব দুঃখের কথা কিছুই মনেই নেই! তারাও তক্ষুনি খুশি মনে মাপ করে দিলে। গাঁয়ের বুড়োরা এবার কী নিশ্চিন্ত হল।

এদিকে হয়েছে কী, বুড়োবুড়ির বাড়িতে, সোনার ডিম-ফুটে বেরুনো কন্যে ডিম্ববতীর পাশাপাশি ছুটে ছুটে কাজকর্ম করছে যে সুন্দর মতন ছেলেটি—ও কে? মোড়ল-মোড়লনী কেবলই ভাবছে আর ভাবছে। মোড়লনী শেষকালে তো বলেই ফেললে—‘আরে আরে

আরে?...এটাই আমাদের সেই রোগা-রুগ্ণ চোখে দ্যাখে না, পায়ে চলে না, পেঁচোয় পাওয়া সে-ই।' শুনে সত্যি সত্যি মোড়ল-মোড়লনীর খুবই আনন্দ হল। দুঃখে-কষ্টে, জ্বালায়-যন্ত্রণায়, তাদের মন্দ স্বভাব কবে যে শুধরে সৎ স্বভাব হয়ে গেছে, তারা নিজেরাই জানে না। তাদের দুঃখু দেখে চক্ষুষ্মানের মনেও মায়া হল। সে বলল, 'ঠাকুমা, এরপর থেকে দাদুদিদার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও আমি দেখতে পারব। কেউ ভেবো না।'

তারপর থেকে গ্রামসুদ্ধু সবাই শান্তিতে বেঁচেবর্তে রইল। সোনাদানা তো ডাকাতেই সব নিয়ে গেছে, বাঁচা গেছে, কারু ঘরেই জমানো ধন কিছু নেই। সবাই এখন খেটে খায়। তারা খেতের ধানেই তুষ্ট, গাছের ফলেই খুশি।

দাদুদিদাদের আর একটু খুশি দেখবে বলে ডিম্ববতী আর চক্ষুষ্মান মাঝে-মাঝেই সব গাঁয়ের বুড়োদের নেমন্তন্ন করে খিচুড়ি, ডিমভাজা, দই-সন্দেশ খাওয়ায়। বুড়োরাও খুব বেশি হয়ে আশীর্বাদ করতে করতে ফেরে।

একজন ডিম্বতী, আর চক্ষুষ্মান।
গুণের ওজনে তারা সমান সমান।।

চুমকির মা পদ্মমণি

এক দিঘিতে এক যক্ষিবুড়োর বাস ছিল। সে বুড়ো যখন-তখন মানুষ ধরে যক্ষপুরীতে নিয়ে যেত। আর যক্ষপুরীতে গিয়ে কি মানুষ বাঁচে? মানুষ ভয়েই মরে যায়। যক্ষিবুড়ো তখন তাকে ফেলে দেয়, সে আবার পুকুরের জলে ভেসে ওঠে, পদ্মফুল হয়ে। পুকুরটাকে সবাই খুব ভয় পেত। যদিও সেই পুকুরে খুব সুন্দর সুন্দর পদ্মফুল ফুটত, পদ্মবন হয়েছিল সারা পুকুর ঢেকে, তবু কেউ নামত না জলে। তারই নীচে লুকিয়ে থাকত যে যক্ষিবুড়ো!

একবার এক অন্য গাঁয়ের কচি বউ, পদ্মমণি, জল আনতে গেছে। সঙ্গে তার ছোট্ট মেয়েটি চুমকিও যাচ্ছে। পথে দ্যাখে, পদ্মবনে লাল সাদা কত পদ্ম ফুটে আছে। চুমকি তো ছোট, সে যক্ষিবুড়োর কথা জানে না। আর পদ্মমণিও একে নতুন বউ, তায় অন্য গাঁয়ের লোক, সে-ও যক্ষিবুড়োর কথা শোনেনি। এই পথে সে আগে কখনও যায়নি, পদ্মবনও চোখে পড়েনি তার। ফুলের শোভায় মুগ্ধ হয়ে চুমকি বললে, 'মা, আমাকে একটা পদ্মফুল দেবে?'

পদ্মমণি বললে, 'দাঁড়া, দিচ্ছি।'

এই বলে, কাঁখের কলসিটি ঘাটে নামিয়ে রেখে, পদ্মমণি-বউ জলে দু-পা নেমেছে, আর যেই পদ্মফুলের ডাঁটিটি ছুঁয়েছে, অমনি জলের ভেতরে যক্ষিবুড়ো বললে, 'কে আমার ফুলে হাত দেয়? তবে রে!! বলে এক হ্যাঁচকা টানে চুমকির মাকে সেই সাতাশ বাঁও জলের তলায় নীলপাথরের দেওয়াল ঘেরা শুক্তি-শামুকের মেঝের তৈরি যক্ষপ্রসাদে টেনে,

নিয়ে গেল। চুমকি দেখলে, তার মা জলের পদ্মফুলের মধ্যে যেন আর একটি পদ্মফুল হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল।

কিন্তু পদ্মমণি-মোটেই ভিতু মেয়ে ছিল না। সে যক্ষিবুড়োর প্রাসাদে গিয়েও ভয় পেল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, চুমকি ঘাটে বসে আছে, আমাকে যেমন করে হোক ফিরে যেতেই হবে। ভয় না পেয়ে মনে মনে সে দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তিকে প্রার্থনা জানাল। 'হে মা শক্তি, আমাকে শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও, আমি যেন যক্ষকে জব্দ করে গাঁয়ে ফিরতে পারি। আমার চুমকি নিশ্চয়ই কত কাঁদছে।'

যক্ষ তো এদিকে একটা মানুষকে তখনও জ্যান্ত থাকতে দেখে খুবই খুশি। এতদিনে একটা কাজের লোক মিলেছে বটে! পদ্মমণিকে যক্ষিবুড়োর সব কাজ করে দিতে হয়। তার অতবড় প্রাসাদটা কে গুছোয়, কে পরিষ্কার করে! অত ধনরত্ন কে ঝাড়ে, কে মোছে, কে তোলে, কে-ই বা রাখে। তার ওই লম্বা দাড়ি, কে-ই বা তার জট ছাড়ায়, কে-ই বা তাতে তেল আতর মাখায়?

পদ্মমণি-বউকে রাঁধতে হয়, বাড়তে হয়, ঝাড়তে হয়, মুছতে হয়, কাচতে হয়, কুচতে হয়। বউ ঘুরে ঘুরে সব করে, আর মনে মনে কাঁদে, আর শক্তি-মায়ের কাছে শক্তি চেয়ে সাহসে বুক বাঁধে।

যক্ষিবুড়ো মোটে লোক ভালো নয়। সেই দিঘিতে যত মাছ, সবই যক্ষিবুড়ো একাই ধরে ধরে খায়। মাছেরা তার ভয় নীচের দিকে নামেই না! আর পদ্মমণিকে কেবল গুগলি-শামুক আর পদ্মডাটার চচ্চড়ি ছাড়া কিছুই খেতে দেয় না। কিন্তু পদ্মমণি আস্ত জ্যান্ত গোলগাল নড়ন্তচড়ন্ত গুগলি-শামুকগুলোকে মেরে খেতে পারে না। তার মনে খুব মমতা কিনা! সে তাদের আবার চুপি চুপি জলে ছেড়ে দিয়ে, রোজ-রোজ কেবলই পদ্মডাঁটার চচ্চড়ি দিয়ে পদ্মবীজের ভাত খায়! গুগলি-শামুকেরা সবাই তাই পদ্মণিকে খুব ভালোবাসে।

পদ্মমণি একদিন খুব কাঁদছে। সাহস করে বেঁচে থাকলে কী হবে, পালাবার তো কোনও পথ নেই। যক্ষিবুড়ো নীলপাথরের দুর্গে আগল আটকে বেরোয় রোজ। যক্ষিবুড়ো কক্ষনও ঘুমোয় না। কী হবে? মানুষের সাত বচ্ছরে যক্ষদের এক দিন, আবার সাত বচ্ছরে এক রাত। কাল থেকে শুরু হবে সেই রাত্তির। বুড়ো ঘুমিয়ে পড়বে। দুর্গের দরজা খুলে, তুমি তখন ডাঙায় পালিয়ে যেয়ো। সাঁতার কেটে ভেসে উঠো, আমরাই তোমায় ঘাটে পৌঁছে দেব, পদ্মবনের ডালপালা সরিয়ে, পথ কেটে দেব।'

পদ্মমণির কী আনন্দ। সময় আর কাটে না। কালকেই সে বাড়ি যাবে। তখন এল সবচেয়ে বুড়ো শামুকটি—যে গুগলি-শামুকদের রাজা। সে এসে বললে, 'বউমা, তুমি যাবার সময়ে যক্ষিবুড়োর প্রাণপুঁটুলিটা আছড়ে ভেঙে দিয়ে যেয়ো কিন্তু নইলে সাত বচ্ছর পরেই সে জেগে উঠে খপখপ করে আবার মানুষ ধরবে!'

পদ্মমণি জিগ্যেস করলে, 'যক্ষিবুড়োর প্রাণ-পুঁটুলি কোথায় থাকে?'

'একটা শঙ্খের মধ্যে। তাতে ফুঁ দিলেই সেটা বেরিয়ে পড়ে ভেঙে যাবে, আর যক্ষের ঘুমও ভেঙে যাবে। কিন্তু ঘুম ভাঙলেও আর তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না সে।'

পদ্মমণি বললে, 'তা না হয় ভাঙলুম, কিন্তু যদি যক্ষিবুড়ো উঠে এসে ফের আমাকে ধরে ফেলে?'

'উঠবে কেমন করে? তার প্রাণশক্তি থাকবে না তো। এরপর সে আস্তে আস্তে বিছানার সঙ্গে মিশে শৈবাল হয়ে যাবে, আর জেগে উঠে পৃথিবীর ক্ষতি করতে পারবে না।'

শামুকবুড়োর কথা শুনে এবারে পদ্মমণির বিশ্বাস হল। মহাশক্তি-ঠাকরুনকে মনে মনে নমস্কার করে সে চলল যক্ষিবুড়োর প্রাণপুঁটুলির খোঁজে। দ্যাখে, তাকের ওপর এই বড় এক পঞ্চমুখী শঙ্খ। তুলে নিয়ে শক্ত পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে যেই না ফুঁ দেওয়া, প্রবল শব্দে অমনি শাঁখ বেজে উঠল, আর টুক করে কী একটা জিনিস বেরিয়ে পাথরে পড়ে গিয়ে শতটুকরো হয়ে গেল। সেই শব্দে যক্ষিবুড়ো আধখানা উঠে বসে, আবার ধুপ করে বিছানায় পড়ে চোখ বুজে ফেলল। ব্যাস! তখন মনের আনন্দে শামুক-গুগলি শাঁখ-ঝিনুকরা সবাই লেজ ধরাধরি করে গোঁফ নেড়ে-নেড়ে শুড় নাচিয়ে নাচিয়ে গান ধরল—

'পদ্মমণি লক্ষ্মী
মরল বুড়ো যক্ষি।'

দিঘির তলার দেশে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

ওদিকে চুমকির বড় দুঃখ। তার মা নেই। চুমকি যখন খুব ছোট মেয়ে, আরও ছোট্ট, এই অ্যাত্তোটুকুনি, তখন চুমকির মা পদ্মপুকুরে ফুল তুলতে গিয়ে আর ফেরেননি। গাঁয়ের লোক বলে, নিশ্চয় ওই জলের মধ্যে দুষ্টু যক্ষ আছে। নইলে চুমকির মাকে ধরে নিয়ে গেল কে? সে গেল কোথায়? গাঁসুদ্ধু মানুষেরই মনে দুঃখু। একা কি চুমকির?

এখন চুমকি বড় হয়েছে। এই তো আশ্বিন মাসে পুজোর সময়ে যখন পুকুরভরতি পদ্মফুল, তখনই চুমকির জন্ম। সেদিন চুমকির জন্মদিন। দুপুরবেলায় বাবা খেতে, ঠাকুরদাদা খেতে, ঠাম্মা দাওয়ায় বসে কাঁথা সেলাই করতে করতে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। চুমকি তার ছাগলছানা ছুটকির সঙ্গে খেলতে খেলতে আস্তে আস্তে অনেক দূরে, সেই পদ্মপুকুরের পাড়ে চলে এল। তার মার জন্যে মন কেমন করছে। জন্মদিন কিনা!

ঝাঁ-ঝাঁ করছে ভরদুপুরে সাদাটে রোদ্দুর। ছুটকির চকচকে কালো গা থেকে যেন গলা-মোম ছিটকে পড়ছে। চুমকি এগিয়ে গিয়ে পুকুরঘাটে বসল। কেউ তো আসে না এই ঘাটে, তবু ঘাটলা কী পরিষ্কার। একটু শ্যাওলা নেই। একটু ধুলো নেই, কাদা নেই, যেন কেউ ধুয়েমুছে রেখেছে। চুমকি বসল বড় বটগাছের দাওয়ায়। একটি বটফল পড়ে নেই, একটা বটপাতা ঝরে নেই। এইপাশে কী সুন্দর চকচকে সবুজ ঘাস হয়ে রয়েছে। ঠিক যেন ছুটকির জন্যেই ভগবান তৈরি করে রেখেছেন। ছুটকি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচেকুঁদে মনের আনন্দে ঘাস খাচ্ছে।

জলটাও কী পরিষ্কার। ঘাটের কাছে টলটলে কালো জলের নীচে রং-বেরঙের গুগলি-শামুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, কাদা নেই। পদ্ম তো জন্মায় কাদায়, তার নাম তো তাই পঙ্কজ। চুমকি অবাক হয়ে ভাবল, এত পরিষ্কার জলে পদ্ম হল কেমন করে! এর মধ্যে আমার

মা হারিয়েই বা গেলেন কেমন করে? এত পরিষ্কার জলে? ভাবতে ভাবতে চুমকি জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে অন্যমনে একটা শামুকের খোল তুলে আনলে। রামধনু রঙের শামুকের খোলটি, এমন নরম গোলাপিঙের ছোপ। কী সুন্দর! শামুক নেই ভেতরে? কী মনে হল, যেমন শঙ্খ কানে ধরলে সমুদ্রের আওয়াজ শোনা যায়, তেমনি শামুক কানে ধরলে পুকুরের মনের কথা শোনা যায় কিনা কে জানে! যেমন মনে হওয়া, তেমনি কাজ। চুমকি কানে চেপে ধরল শামুকের খোলটা। আর ওমা, শামুকের খোলের ভেতরে কার যেন গলা! আরে, শামুক কথা কইছে যে! খুব মিষ্টি গলাতে শামুক তাকেই বলছে ঃ 'চুমকিরানি মা কোথায় জানে না!'

চুমকি তো অবাক! সে বলে ওঠে ঃ '—ওমা! এ শামুক যে কথা বলে! ও ছুটকি, দেখে যা! শামুক কী বলছে শোন!'' বলে, আর শামুকটা ছুটকির কানে চেপে ধরে। কিন্তু ছুটকি দেখতে যত সুন্দর, তার মাথায় তত বুদ্ধি নেই। সে কিছুই শুনলও না, দেখলও না, মনের আনন্দে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ঘাস খেতেই লাগল, ঘাস খেতেই থাকল।

তখন চুমকি কী করে? আবার কানে লাগাতেই শুনতে পেল শামুক বলছে ঃ 'পদ্মবনের মধ্যমণি, চুমকির মা পদ্মমণি!'

চুমকি বলে উঠল, 'কই? কই? কোথায় আমার মা? আমি একটু দেখব। আমাকে একবারটি দেখাও না শামুকভাই। আমার মাকে যে অনেকদিন দেখিনি আমি!'

শামুক বলে,

'সাত বচ্ছর ভরল,
যক্কিবুড়ো মরল!'

—জলের ধারে, পদ্মাসনে,
'মা' জপবে একটি মনে।

অমনি চুমকি এক পায়ের ভেতর দিয়ে অন্য পা গলিয়ে বাবু হয়ে পদ্মাসনে বসে পড়ল, যেমন করে তার দাদু বসেন পুজো করতে। আর চোখ বুজে 'মা, মা, মা, মা,' নাম জপ করতে লাগল। জপ করতে করতে তার মনে হল যেন সামনে এক পরমা সুন্দরী এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর গায়ের কাপড়টি জল-শপশপ ভিজে, সর্বাঙ্গে পদ্মফুলের সুবাস, আর পদ্মপাপড়ির আভা।

'কে গো তুমি? আমার মা?' চুমকি চোখ খুলে ফেলে। দ্যাখে, সত্যিই তো! সামনে ঠিক মার মতনই দেখতে একজন বউ।

পদ্মমণি দুহাত বাড়িয়ে বললে, 'চুমকিসোনা, কেমন আছিস ধন? তোর বাবা কেমন আছেন?'

চুমকি তো অমনি মাকে জড়িয়ে ধরেছে। 'মাগো, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?'

'সাত বচ্ছর আমি জলের তলায় যক্ষপুরীতে শুধু মনের বলে বেঁচে ছিলুম।'

'আমার জন্যে মনে কেমন করত না?'

পদ্মমণি-মা তখন চুমকিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'করত বই কী সোনা, তাই তো আমি ফিরে এসেছি। আমাকে যক্কিবুড়ো ধরে নিয়ে গিয়েছিল যক্ষপুরীতে। মানুষের

সাত বছরে যক্ষের একদিন। সে আমাকে এতদিন চক্ষের আড়াল করত না। এতক্ষণে তাদের দিন ফুরিয়ে রাত হয়েছে। জন্মের শোধ সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও অমনি পালিয়ে এলুম তোমার কাছে!'

চুমকি ভয়ে ভয়ে বলল, 'তা ঘুমোক। মা, তুমি এবার আমার সঙ্গে বাড়ি যাবে তো?'

মা বললে, 'নিশ্চয়ই। ভিজে কাপড়টা ছাড়তে হবে না?'

চুমকি তখন ঠিক ছুটকির মতন লাফাতে লাফাতে বাড়ি গিয়ে ঠাম্মাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে দিলে। দিয়ে বললে, 'বা-বব্বাঃ, দেখালে বটে ঠাম্মা! চশমা-চোখে, ছুঁচ হাতে ঘুম? ওঠো, ওঠো, দ্যাখো আমার সঙ্গে কে এসেছে। একটা শুকনো শাড়ি দাও দিকিনি।'

চুমকির ঠাম্মা সেই শুনে মেঝেয় কাঁথা-সেলাই নামিয়ে রেখে, ডানহাতে চালশে-চশমাটি খুলে, বাঁহাত দিয়ে চোখের ওপর ছায়া করে যেই উঠোনের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে চুমকির খোঁজে তাকিয়েছেন, অমনি—আঃ হা, চোখটি যেন জুড়িয়ে গেল। এমন সাত রাজার ধন মানিকটিকে চুমকি কোথায় কুড়িয়ে পেল?

'এই বউটিকে অবিকল আমার হারানো বউমা পদ্মমণির মতন দেখতে। এসো মাগো, বোসো মাগো, তোমাকে দেখে চক্ষু দুটি জুড়োই মাগো।'

'আরে, এই তো তোমার বউমা পদ্মমণি। এক্ষুনি মাকে পদ্মপুকুরের ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

পদ্মমণি তখন ভিজে কাপড়েই ঘোমটা টেনে, 'মা, ভালো আছ তো?' বলে পেন্নাম করলে।

ঠাম্মার তো আনন্দে গেঁটে বাত-টাত সেরে গেছে। তিনি বউ কোলে করে নাচতে লেগেছেন।

হারানো বউ ফিরে এল।
চুমকিরানি মা পেল।।
আসুক ঘরের লক্ষ্মী।
ঘুমোক বুড়ো যক্ষি।।
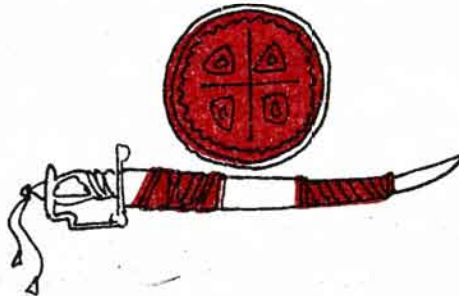
তিনপরির দুষ্টুমি

এক যে ছিল সন্ধ্যাপরি। হালকা বেগুনি গোলাপি তার পাখার রং, তার মাথায় সোনালি তারার মুকুট, গায়ে পাতলা ফুরফুরে নীলাম্বরী শাড়ি। সে আকাশ দিয়ে উড়তে উড়তে যায়। পৃথিবীর মাথার ওপরে তার বাস। পরিদের তো কোনও কাজকর্ম থাকে না, তাদের রান্না করতে হয় না, বাজার করতে হয় না, কাপড় কাচতে হয় না, এমনকী দাঁত মাজতে, চান করতেও হয় না। তাদের কাপড়গুলি প্রত্যেকদিন আপনি নতুন হয়ে যায়, দাঁতগুলি রোজ সকালে ঝকঝক করে ওঠে, তাদের গায়ে এককণা ধুলোও বসে না। তাদের পেট ভরে যায় ফুলের মধুতে, আর ঘাসের শিশিরে তেষ্টা মেটে। এ কথা কে না জানে?

তাদের ডাক্তার লাগে না, কোনওদিন অসুখবিসুখ করে না তো? তাদের ইস্কুল নেই, লেখাপড়া শিখতে হয় না তো? টিকে নেওয়া নেই, ইঞ্জেকশন নেওয়া নেই, ওষুধ খাওয়া নেই। অবিশ্যি তারা হজমি, আইসক্রিম, ফুচকা এসবও খেতে হয় না। কেবল বাতাসে গা ভাসিয়ে পাখনা মেলে দিলেই হল। পাখাদুটি আপনিই নড়বে, যেদিকে পরির মন চাইবে সেদিকেই বাতাস তাকে নিয়ে যাবে। সন্ধ্যাপরির একজন বন্ধু আছে, তার নাম আঁধারপরি। সন্ধ্যাপরি রোজ উড়তে উড়তে তার খোঁজেই যায়। পরিদের অবিশ্যি বাড়িঘর নেই। তারা যেমন খুশি একটা নরম দেখে মেঘ খুঁজে নিয়ে গা এলিয়ে দেয়, ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যাপরির বন্ধু আঁধারপরি থাকে মধ্যাকাশে, সন্ধ্যাপরির মতন পশ্চিমে নয়। আঁধারপরির সর্বাঙ্গ ঢেকে গাঢ় কালো ওড়নার আঁচল টানা, তাতে কত চাঁদ, কত

তারা, কত গ্রহ, কত উপগ্রহের ঝিলিমিলি চুমকি বসানো। আর পাখনা দুটি? ঠিক মেঘনা নদীর গভীর জলের মতো স্বচ্ছ, হালকা ঝিরঝিরে, মাথাময় আঁধার ঘন রঙের, তাতেও ঝিকমিক করছে লক্ষ তারার ঝিলিক জরি। আঁধারপরি গায়ের রং মেঘে ঢাকা চাপা জোছনার মতো। আঁধারপরির ওড়নার বাইরে শুধু কপালটুকু আর চোখ দুখানিই জেগে থাকে। দুটি নয়নতারা। সন্ধ্যাপরি রোজ আঁধারপরির সঙ্গে খেলা করে, গান করে, গল্প করে, তারপর দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে। তখন আসেন চাঁদবুড়ি। তিনি এসে পরিদের মাথায় মেঘ বালিশটি ঠিক করে দেন, গায়ে কুয়াশার চাদরটা টেনে দেন, আদর করে গালে চুমি খেয়ে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে যান। ভোরবেলায় হইহই রইরই করে সূয্যিঠাকুর এসে পড়লেই সন্ধ্যাপরি-আঁধারপরিরা ভয় পেয়ে গিয়ে চাঁদবুড়ির আঁচলের নীচে লুকোয়, আর চাঁদবুড়ি, 'কী ঠাকুর ভালো আছ তো?' বলতে বলতে ভোরের আলোর দেশে মিলিয়ে যান। ভোরের আলোর দেশে থাকে আর একজন, আলোপরি। তার গায়ের রংটি থেকে ভোরের আলো ঠিকরে পড়ছে, তার পাখনা থেকে কচি রোদ্দুর ছিটিয়ে যাচ্ছে, তার পরনের শাড়িটি ঠিক জবাফুলের মতন টুকটুকে। তার গলায় দোলে শিশিরের মালা, পায়ে পাখির ডাকের নূপুর বাজে। হন্তদন্ত আলোপরি এসে পেন্নাম করে সূয্যিঠাকুরকে উদয়াচলের সিংহাসনে বসায়, পাখনা দিয়ে বাতাস করে। সূয্যিঠাকুর তাকে খুশি হয়ে আশীর্বাদ করে যখন বলেন, 'যা তো পাগলি, রোদ-ঘোড়াগুলোকে এবার জুড়ে দে তো আমার রথে, যাই, রোঁদে বেরুই।'—তখনই আলোপরির কাজ ফুরোয়। সে নাচতে নাচতে দু-পায়ে কাকলি কূজনের নূপুর বাজাতে বাজাতে পুব আকাশে তার ভোরের আলোর দেশে ফিরে আসে। সেখানে চাঁদবুড়ির কোলে সন্ধ্যাপরি আর আঁধারপরি বসে বসে আদর খাচ্ছে। আলোপরি এসে পড়লেই চাঁদবুড়ি বলেন, 'এবার তোমরা খেলাধুলো করো, আমি চরকা কাটি গে যাই।' চাঁদবুড়ি বসে চাঁদিনীর সুতো কাটেন, তাই দিয়ে জোছনার চাদর বুনে নিয়ে যাবেন, রাত্তিরবেলায় পৃথিবীর গায়ে জড়িয়ে দিতে হবে না? রোজই সুতো কাটেন, সেই সুতোয় চাদরটিকে বোনে বলো দেখি? আবার কারা? তিনবন্ধু, বন্ধু তিন পরি। ওদের তো কোনও কাজকম্মো নেই, হোমটাস্ক নেই, ঘর গুছোনো নেই, নাচের ইস্কুল, গানের মাস্টারমশাই সাঁতারের ক্লাস, কিচ্ছুটি নেই। অথচ নাচও জানে, গানও জানে, অকূল শূন্যে ডুবসাঁতারও জানে। ওদের তো অসীম সময়। চাঁদবুড়ি সুতো কাটেন, তাই দিয়ে ওরা জোছনার চাদরটি বোনে। তারপর পূর্ণিমার দিনে সেই উত্তরীয়টি আলো বিছিয়ে সারা পৃথিবী ঢেকে ফেলে, আর চাঁদবুড়িরও মুখে হাসির ফুলঝুরি খেলে।

তারপর? তার পরেই শুরু হয় তিনপরির দুষ্টুমি। পূর্ণিমার চাদরখানি বুনে চাঁদবুড়ি তো খুব খুশি। আর তিনি সুতো কাটেন না, মেঘের নরম তাকিয়া ঠেস দিয়ে ঘুম লাগান। আর সেই ফাঁকে তিনপরি একটু একটু করে চাদরটার সুতো খুলে ফেলে। রোজই একটু একটু করে চাদর ছোট হচ্ছে, আর ভাবনায় ভাবনায় চাঁদবুড়ির মুখের হাসিটি একটু একটু করে শুকিয়ে যাচ্ছে। শেষে একদিন সবটুকুই খুলে যায়। আর চাঁদবুড়ির মুখের শেষ হাসির ফালিটুকুন দপ করে নিবে যায়। মনের দুঃখে চাঁদবুড়ি আর আসেই

না আকাশে বাগানের চত্বরে। সন্ধ্যাপরি, আঁধারপরি, খেলতে খেলতে, ক্লান্ত হয়ে কারুর কোল খুঁজে পায় না। তখন টের পায় বড্ডই অন্যায় হয়ে গেছে। ছুটে যায় আলোপরির কাছে। 'কী করি বলো তো ভাই?' আলোপরি তাদের ধমক দিয়ে বলে 'যাও শিগগির চাঁদবুড়ির কাছে—আবার বলো গে আর একটা চাদরের সুতো কাটতে বসতে।'—চাঁদবুড়ির রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। নাতনিদের কথায় আবার উঠে এসে চরকা ঘোরাতে বসেন, আবার রাতের আকাশে ঝলসে ওঠে একফালি চাঁদের হাসি, সন্ধ্যাপরি আর আঁধারপরির হাত ধরে ওদের ঠিক মাঝখানটিতে। তোমরা দেখো, নজর করে।

নেই-বুড়োর দেশ

এক যে ছিল যুবক রাজার দেশ। যুবক রাজা নিয়ম করে দিলেন, যেই কেউ বুড়ো হবে, তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ধারে অতল নিতল খাদে বিসর্জন দিয়ে আসতে হবে। তা হলে দেখো খাদ্য কম খরচ হবে, জায়গা বেশি বাড়বে আর চাকরি-বাকরির অভাব হবে না। বুড়ো মানুষগুলো না পারে ভালো করে কাজকর্ম করতে, না পারে রাজ্যের উন্নতি করতে, কেবল অন্ন ধ্বংস করে আর অন্যের সময় ধ্বংস করে সেবা শুশ্রূষা এইসব নিয়ে। যুবক রাজা প্রথমেই তো নিজের বুড়ো ঠাকুরদাকে ফেলে দিয়ে এলেন। সেই দেখে ভয়েই তাঁর বাবা বুড়ো রাজা হার্ট ফেল করলেন। হার্ট ফেল করলে কী হবে, যুবক রাজা নিয়মটিয়ম পালটালেন না। যেই যে-কোনও বাড়িতে বুড়ো বা বুড়ির সত্তর বছর হবে অমনি তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে বিসর্জনের ঢাক বাজাতে বাজাতে মিছিল করে নিয়ে গিয়ে খাদে বিসর্জন দিয়ে আসা হবে। তা, অনেকেরই এতে মন খারাপ হত, তারা ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং বাদ্যি বাজাত না, চুপচাপ চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বুড়ো মা-বাবাকে খাদে ফিলে দিয়ে আসত।

একটা বাচ্চা ছেলে দেবদত্ত, তার বাবা-মা কেউ নেই, সে বেচারা দাদুর কাছেই মানুষ। তার দাদুর সত্তর বছর হয়ে গেল। নাতি কী করে? রাজ্যের আইন তো ভাঙতে পারে না? চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দাদুকে পিঠে করে খাদের দিকে চলল। খাদটা এদিকে অনেক দূরে ওদের গ্রাম থেকে। নাতি হঠাৎ দ্যাখে দাদু গাছগুলোর ডাল ভাঙতে ভাঙতে চলেছেন। 'দাদুভাই তুমি গাছের ডাল ভেঙে কীসের চিহ্ন দিচ্ছ? বাড়ি ফিরে

আসতে পারো যাতে?'

'পাগল? খাদ থেকে উঠে কেউ কি বাড়িতে ফিরতে পারে রে? খাদ যে দু-হাজার ফিট গভীর। পড়লেই ধুলো ধুলো হয়ে যাব।'

'তবে? কার জন্যে চিহ্ন দিচ্ছ?'

'তোর জন্যে। তুই তো বাচ্চা ছেলে, জীবনে কোনওদিন এ পথে আসিসনি। যদি ফিরতে গিয়ে হারিয়ে যাস? তখন তো আমি আর সঙ্গে থাকব না?'

কথাটা শুনেই দেবদত্ত বুঝতে পারলে সে কত বড় ভুল করতে যাচ্ছে।—যে দাদু আমাকে এত ভালোবাসেন, আইনের ভয়ে তাঁকেই কিনা আমি খাদের মধ্যে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছি? ছি ছি ছি—নাতি আর গেল না। সে সোজা পেছু ফিরে, ভাঙা ডালপালার চিহ্ন দেখে দেখে নিজের বাড়ি ফিরে এল। দাদুকে সে চুপিচুপি চিলেকোঠার কামরাতে লুকিয়ে রেখে দিলে। রোজ রাত্তিরে গিয়ে দাদুর সঙ্গে গল্প করে। দিনের বেলা লুকিয়ে ভাত খাইয়ে আসে। দাদু সারাদিন বইপত্তর পড়েন। ভগবানের নাম করেন। একা একা থাকেন।

এমন সময়ে সে দেশের রাজকন্যের, যুবক রাজার আদুরে বোনের খুব জ্বর হল। কত ডাক্তারবদ্যি, কত হাকিম, কত বিলেত-ফেরত বদ্যি, সবাই দেখে যাচ্ছে, কেউ ধরতে পারছে না কী অসুখ। একদিন দুপুরে রাজার সিংদরজায় এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে হাজির। এসে বললেন, 'জয় হোক মহারাজের!' মহারাজ তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে বরণ করে বসিয়ে বললেন, 'সন্ন্যাসীঠাকুর, আমার বড্ড দুঃসময় চলছে, একমাত্র বোনটি জ্বরে মরো মরো।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'তাতে কী হয়েছে, সেরে যাবে'খন। জামাইও জুটে যাবে। যে ওর অসুখ সারাবে, তারই সঙ্গে বিয়ে দেবে, তাকে আদ্দেক রাজত্বও দিতে হবে।' যুবক রাজামশায় মহা আনন্দে বললেন, 'নিশ্চয় দেব।' সন্ন্যাসী তখন বললেন,—'শোন তাহলে, যে লোক ছাই দিয়ে একটা দড়ি তৈরি করতে পারবে আর এই শাঁখের মুখে লাল সুতো পরিয়ে তোমার বোনের কোমরে বেঁধে দিতে পারবে, সেই অসুখ সারিয়ে দেবে।' এই বলে একটি গোলাপি রঙের শাঁখ রাজাকে দিয়ে, হর-হর বোম-বোম বলতে বলতে, দুটি চাল ভিক্ষে নিয়ে সন্ন্যাসী হিমালয়ের পথে রওনা দিলেন।

যুবক রাজার রাজ্যে তো সবাই যুবা। রাজা ট্যাঁড়া পিটিয়ে দিলেন, যে ছাই দিয়ে দড়ি তৈরি করে আনতে পারবে, আর সন্ন্যাসীর দেওয়া শাঁখের মুখে লাল সুতো পরিয়ে রাজকন্যের কোমরে বাঁধবার মতন তৈরি করে দিতে পারবে, তার সঙ্গে রাজকন্যের বিয়ে দেওয়া হবে আর আধখানা রাজত্ব, যা কিনা রাজকন্যের হকের পাওনা, সেটাও দেওয়া হবে।

ট্যাঁড়া শুনে সব মানুষের লোভ হয়ে গেল। সবাই খুব চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু এক নম্বরটাই কেউ পারলে না। ছাই দিয়ে দড়ি তৈরি হবে কেমন করে? এক নম্বর হবে তার তো দু-নম্বর? শাঁখে সুতো পরানো? রাজ্যি জুড়ে হইচই, কিন্তু কেউ কিছু

পারছে না। দেখেশুনে যুবক রাজার খুব মন খারাপ। তার বোনের জ্বর আর সারছেই না। অত মিষ্টি দোপাটি ফুলের মতন মেয়েটা শুকিয়ে যেন কেমনটি হয়ে গেল। তাদের মা তো কবেই ছোটবেলাতে মারা গেছেন। দাদু নেই, বাবা নেই, ঠাকুমাকেও তার দাদা বিরাট ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে মশাল নিয়ে শোভাযাত্রা করে খাদে ফেলে দিয়ে এসেছেন। রাজকন্যেকে আদর করবার ভালোবাসবার কেউ নেই। জ্বরও ছাড়ছে না। কন্যে চুপটি করে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন। আকাশে মেঘের খেলা দেখেন, গাছের পাতায় আলোর খেলা দেখেন, পাখির গান শোনেন, সামনেই রাজবাড়ির হ্রদের জলে সারাদিন আলোর রং বদল হয়, সেই রঙের খেলা দেখেন। আর ভাবেন, সত্তর বছর হলে তো দাদাকেও ফেলে দিতে হবে! ও বাবা সে আমি পারব না! ওই ভয়েই তার জ্বর আর ছাড়ে না। মুখে হাসিও ফোটে না। একটাও কথা বলেন না রাজকন্যা মণিদীপা।

এদিকে হয়েছে কী আমাদের সেই বাচ্চা ছেলে দেবদত্ত এতদিনে একুশ বছরেরটি হয়েছে। নিশুত রাতে যেমন তারা গল্প করে দাদুতে-নাতিতে, সে একদিন দাদুকে বলেন, 'দ্যাখো তে দাদুভাই, এমন সুন্দর রাজকন্যেটি আমাদের জ্বরে জ্বরে শুকিয়ে গেল, কেউ সারাতে পারছে না। সন্ন্যাসীঠাকুর ওষুধ দিয়ে গেছেন, কিন্তু কেউ সেটা তৈরি করতে পারছে না। কী করা যায় বলো তো দাদুভাই?' দাদু ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন—'ওরে, ওরা যে উলটোদিক থেকে চেষ্টা করছে। ছাই নিয়ে কি দড়ি বোনা যায়? যায় না। তুই বরং এক কাজ কর। খুব শক্ত করে, টাইট করে একটা মোটা দড়ি বোন। তারপর খুব সাবধানে সেটা পোড়াতে হবে যাতে দড়ির আকৃতি বজায় থাকে, অথচ সেটা ছাই হয়ে যায়। সে আমিই পুড়িয়ে দেব, তুই দড়িটা তো বুনে ফ্যাল।'

দেবদত্ত খুব যত্ন করে একটা শক্ত-পোক্ত দড়ি বুনে দাদুর কাছে নিয়ে এল। একটি থালার ওপর সেটা গোল করে গুটিয়ে রেখে দাদু এমন কায়দা করে সেটা পোড়ালেন যাতে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেটা একটা গোটানো দড়ি। কিন্তু ছাইয়ের তৈরি। দাদু বললেন—'যাও দাদাভাই, এইবার তুমি থালাটা নিয়ে রাজবাড়িতে যাও।'

দেবদত্ত তো ছাইয়ের দড়ি নিয়ে রাজসভাতে হাজির। সভাসুদ্ধু তালি বাজিয়ে দেবদত্তকে সভাসদরা সবাই ধন্য ধন্য করে উঠলেন। যুবক রাজা তো ছাইয়ের তৈরি দড়ি দেখে অবাক। আর তেমনি খুশি। তিনি এবারে ওকে সন্ন্যাসীর দেওয়া গোলাপি শাঁখটি দিয়ে বললেন,ঠ'এই নাও, এতে লাল সুতো পরিয়ে নিয়ে এসো।' দেবদত্ত বাড়ি এসে যত চেষ্টা করে, সরু ছুঁচ, মোটা ছুঁচ, মুক্তো গাঁথবার বাঁকা ছুঁচ, হাত-পা কেটে গেলে বদ্যি যে ছুঁচে মানুষের চামড়া সেলাই করে সেই কাস্তের মতন ছুঁচ—উঁহু! শাঁখের মুখে কোনও ছুঁচই গলবে না। তখন সুতোয় মোম লাগিয়ে শক্ত করে ঢোকাতে চেষ্টা করলে, উঁহুঁ! সেও গলে না। দেবদত্ত আবার গেল চিলেকোঠায় দাদুর কাছে। দাদু তখন একটা বই পড়ছিলেন।

'দাদুভাই, এই শাঁখের ভেতরে এই লাল সুতোটা কেমন করে পরাই বলো তো?

কত চেষ্টা করলুম, কিছুতে পারছি না।'

দাদু কিছুক্ষণ টাক চুলকে ভাবলেন। তাই তো? এটা তো বেশ ঘোরালো সমস্যা? তারপর দাদু দেখলেন দেওয়াল দিয়ে এক সারি পিঁপড়ে যাচ্ছে। অমনি তাঁর পাকা মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি এসে গেল। তিনি বললেন—'এক কাজ করো। এই শাঁখের ভেতরে কিছু চিনি ভরে দে। আর একটা সরু চালের ভাত রসে ডুবিয়ে তাতে লাল সুতোটা আটকে দে! সেই ভাতটা এই পিঁপড়েটাকে দে। আর তারপর পিঁপড়েটাকে শাঁখের মধ্যে ঢুকিয়ে দে। ও চিনির লোভে ভাত নিয়ে ঢুকে যাবে, সুতোটাও ঢুকে যাবে। চেষ্টা করে দেখতে তো ক্ষতি নেই?' দেবদত্ত খুশি হয়ে ঠিক দাদু যেমন যেমন বলেছিলেন তেমন তেমন কাজ করলে। আর ওমা! কী কাণ্ড! ওরে আয় রে আয়, রাজ্যের লোক দেখবি আয়, কী কাণ্ড। শাঁখের ভেতর লাল সুতো গলে গেছে। পিঁপড়ে ঠিক ও-মুখটি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

দেবদত্ত দৌড়ে গিয়ে দাদুভাইটিকে জড়িয়ে ধরে দু-গালে দু-খানা, চুমু খেলে। 'ভাগ্যিস তুমি আছ দাদুভাই, তাই তো সন্ন্যাসীর ওষুধ ফলল? এবার রাজকন্যে আমাদের ঠিক সেরে যাবেন।'

গোলাপি শাঁখে লাল সুতো পরিয়ে দেবদত্ত আর একবার রাজসভায় হাজির হতেই যুবক রাজা দৌড়ে রাজসিংহাসন থেকে নেমে এসে দেবদত্তকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। আর বললেন, 'তুমিই আমার বোনের প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমিই ভাই ওকে বিয়ে করবে, আর আদ্দেক রাজত্ব পাবে।' সভাসুদ্ধু হাততালি দিয়ে জয়ধ্বনি করে উঠল। সখিরা গিয়ে রাজকন্যের কোমরে শাঁখটি পরিয়ে দিল। মাথার কাছে ছাইয়ের দড়ি আগেই রেখেছিল। রাজকন্যে উঠে বসলেন। জানলার বাইরে কদমগাছে দুটো শালিকপাখি ঝগড়া করছিল, তাদের বললেন, 'ওরে তোরা থাম। সকালবেলায় ঝগড়া করতে আছে?' রাজকন্যে কথা বলেছেন শুনে সখিরা খুব খুশি। দেশ জুড়ে আনন্দের ঢেউ বইল।

রাজামশাই এবারে দেবদত্তকে জিগ্যেস করলেন, 'বিয়ে করবে তো? রাজপুরোহিত তো বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলেছেন, বিয়ের মানে কন্যা আর রাজ্য সম্প্রদান হবে কিন্তু।' দেবদত্ত বললে,—'একবার দাদুভাইকে জিগ্যেস করে আসি।' রাজা বললেন,—'সে কী? তোমার দাদুভাই আছে।' দেবদত্ত বললে,—'হ্যাঁ, মহারাজ। আমি আমার দাদুকে খাদে ফেলতে পারিনি। নিয়ে গিয়েও ফেরত এনেছি। আর চিলেকোঠাতে লুকিয়ে রেখেছি। আমার দাদুভাই-ই তো ছাইয়ের দড়ি তৈরি করবার বুদ্ধি দিয়েছেন, আমার দাদুভাই-ই তো শাঁখে সুতো পরানোর বুদ্ধি দিয়েছেন। পাকা মাথা ছাড়া এসব কখনও পাওয়া যায়?'

রাজামশাই তখন বললেন, 'তাই তো? তবে তো তোমার দাদুই আমার বোনের প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলতে হবে। তা হলে তো বুড়োরা আবর্জনা নয়? নাঃ, দেশের আইন বদলে দিলুম। আর বুড়োবুড়িদের খাদে ফেলে দেওয়া হবে না। তাদের সবাইকে যত্ন করে চিলেকোঠাতে তুলে রাখা হোক!' দেবদত্ত হেসে ফেললে! বললে,—'মহারাজ,

চিলেকোঠার জীবন কষ্টকর। বুড়োবুড়িদের আর সকলের সঙ্গেই সংসারে বাঁচতে দিন। আজ আপনার বাবা-ঠাকুরদা থাকলে, আজ রাজকন্যা মণিদীপাকে এতদিন ভুগতেই হত না।' রাজামশাই বললেন, 'ঠিক কথা!'

রাজ্যে আবার ঢ্যাঁড়া পড়ল, 'সব দাদু-দিদারা যিনি যেমন সংসার করেছেন, তেমনই করবেন। খাদে বিসর্জন দেওয়া বেআইনি হয়ে গেল।'

আর অন্তঃপুরে বসে সেই খবর শুনে রাজকন্যে মণিদীপা আহ্লাদে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন। ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ বইল।

তারপর এক শুভলগ্নে দেবদত্ত আর মণিদীপার বিয়ে হয়ে গেল। দাদুভাইয়ের আনন্দ দেখে কে? তিনি এখন রাজার দাদু!
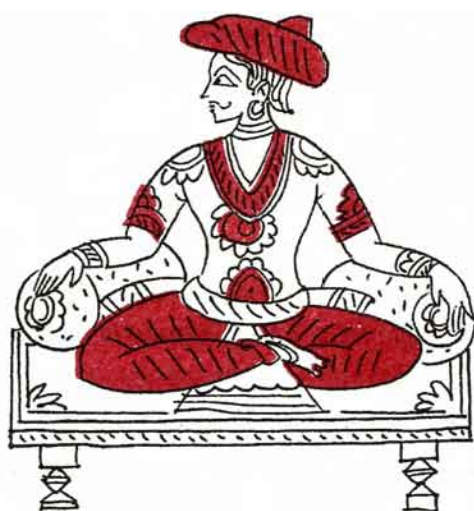
ভালো রাজার দেশ

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর মতো ভালো রাজা আর কোনও দেশেই নেই। রাজার বিদ্যেবুদ্ধি, জ্ঞানগম্যি, ন্যায়বিচার আর মায়ামমতার প্রশংসা জগৎ জুড়ে। ভালো রাজার দেশে কোনও দুঃখ নেই কারও। সবাই যার যা আছে তা-ই নিয়ে সুখেশান্তিতে ঘরকন্না করে। সে-দেশে ঠগ নেই, জোচ্চোর নেই, চোর নেই, ডাকাত নেই। এমনকী, থানা নেই, পুলিশ নেই, জল্লাদ নেই। এমনকী সৈন্যসামন্ত সেনাপতি-টতি কিছুই নেই। রাজা যুদ্ধ করেন না। রাজার রাজ্যে কেউ কখনও মাছ-মাংস খায় না। পশুপাখিদের শিকার করা কঠোর আইন করে নিষেধ। রাজা কোনওদিন মৃগয়ায় পর্যন্ত যাননি। ফলে, সেই দেশে বাঘসিংগির সঙ্গে মানুষের কোনও শত্রুতা নেই। বনের বাঘ বনেই থাকে, তারও সেখানে খাবারদাবারের অভাব নেই, সে মানুষ ধরে খায় না। মানুষও তাই ফলমূল, কাঠ, মধু আনতে বনে যেতে ভয় পায় না।

একদিন এক কাঠুরের বউ বনে গেছে কাঠ কুড়োতে। কাঠ কুড়িয়ে বোঝা বেঁধে সে যখন বাড়ি ফিরছে, হঠাৎ প্যাঁট করে তার পায়ে মস্ত এক কাঁটা ফুটে গেল। এদিকে সেই কাঠুরে-বউটির পেটের মধ্যে তখন ছোট্ট বাচ্চা আছে, তার ওপর মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে পথ চলতে এমনিতেই কত কষ্ট। এখন আবার পায়ে কিনা কাঁটা ফুটল! 'উঃ, মাগো!' বলে বোঝা ফেলে বউটি ঝরনার ধারে একটা পাথরের ওপরে বসে পড়ল। পা থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে। আর বউটি কষ্টে কাঁদছে। মাটিতে পা ফেলতেই যে ব্যথা! বাড়ি যাবে কেমন করে?

এমন সময়ে এক নাদুসনুদুস বাঘিনি সেখানে সেই ঝরনায় জল খেতে এল। কাঠুরে-বউকে কাঁদতে দেখে তার খুব মায়া হল। কাঠুরে-বউয়ের কাছে গিয়ে বাঘিনি বললে, 'কাঁদছ কেন ভাই? তোমার কীসের কষ্ট?' কাঠুরে-বউ বললে ঃ

'আমার পায়ে বিঁধছে কাঁটা
আমার কঠিন হল হাঁটা।
তায় মাথায় কাঠের বোঝা,
আমার পিঠ হয় না সোজা।
দিদি, বল তো কেমন করে
আমি ফিরব আপন ঘরে?'

বাঘিনি বললে, 'ওঃ! মাত্র এই? তা, দাও দাও, তোমার বোঝাটা আমাকে দাও, তোমার ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি। তুমিও আমার পিঠে বোসো, তা হলে তোমার পায়ে আর লাগবে না।' কাঠুরে-বউ তো অবাক। সে বাঘিনির পিঠে বোঝাটোঝাসমেত উঠে বসল, বাঘিনি তাকে যত্ন করে বনের ধারে তাদের পাতার-কুটিরে পৌঁছে দিলে। কাঠুরে-বউ খুশি হয়ে বললে ঃ

'লক্ষ্মীসোনা বাঘিনি-দিদি
নেইকো তোমার তুলনা,
কীসে তোমার তুষ্ট করি
আমায় তুমি বলো না?'

বাঘিনি বললে ঃ

'চাইব, যখন সময় হবে
তখন কিন্তু ভুলো না!'

কাঠুরে-বউ বললে, 'ভুলব? কক্ষনও না! আজ থেকে আমরা দুটি বোন!'

কিছুদিন পরে কাঠুরে-বউয়ের যমজ ছেলে হল। কী সুন্দর ছেলে, যেন চাঁদসুয্যি! আর বাঘিনিও এসে আতুঁড়-ঘরের দরজায় ডাকলে, 'দিদি, আমি এসেছি।'

কাঠুরে-বউ তো ভয়েই সারা।

'কী দিদি? কী চাও?'

'তোমার তো যমজ ছেলে হয়েছে, আমার মোটে একটিও ছেলেপুলে নেই। একটি ছেলে তোমার থাক, একটি ছেলে আমাকে দাও, আমি পুষ্যি নেব।'

কাঠুরে-বউয়ের খুব মন খারাপ হল। কিন্তু কথা দিয়ে তো কথা ফেরত নেওয়া যায় না। সে বললে, 'বেশ, কাকে নেবে, নাও।'

বাঘিনি বললে, 'ওমা, এতটুকুনি বাচ্চাকে আমি কি বড় করতে পারি? আরেকটু বড় হোক, তারপরে এসে নিয়ে যাব। কেমন?'

তাই কথা রইল। কাঠুরে-বউ খুব যত্ন করে ছেলেদের মানুষ করে। আর মাঝে-মাঝেই চোখের জল ফেলে। রামুর আর শামুর যখন তিন বছর বয়স হল, তখন তারা মাকে জিগ্যেস করলে, 'মাগো, তুমি এত কাঁদো কেন মা? আমাদের তো কোনও

দুঃখু নেই?'

তখন কাঠুরের বউ বললে, 'বাছা রে, তোদের একজনকে একদিন বাঘিনিদিদি এসে নিয়ে যাবে এমনিই কথা আছে। আমি তাই কাঁদি।'

বাচ্চারা বললে, 'বাঘিনিমাসি বুঝি আমাদের খাবে?'

'না-না, খাবে কেন, খাবে না, পুষ্যিপুত্তুর করবে। তার কিনা ছেলে নেই।'

'তা হলে কান্নার কী আছে?'

কাঠুরে-বউ বললে, 'তাই তো।'

কাঠুরে এসব কথা কিছুই জানত না। সে তো শুনেটুনে খেপে লাল। 'অ্যাঁ? আমার ছেলে আমি বাঘিনিকে দেব কেন? মোটেই দেব না! তুমি যা-তা কথা দিয়ে দিলেই হল, কেন, তোমার কি একার ছেলে? আসুক বাঘিনি ছেলে চাইতে, কুড়ুলের এক কোপে তার মুণ্ডুটা উড়িয়ে দেব!'

বউ বললে, 'ও কী কথা? ছি ছি! সে আমার কত উপকারী বন্ধু। আমরা দুজনে বোন পাতিয়েছি। খবরদার, বাঘিনিদিদিকে তুমি মারধোর করতে পারবে না। আর আমার প্রতিজ্ঞা আমাকে রাখতে হবেই।'

কাঠুরে খুব গোঁয়ারগোবিন্দ, সে বউয়ের কথায় কানই দিলে না।

ছেলেদের যখন পাঁচ বছরের জন্মদিন, হঠাৎ কাঠুরের দরজায়, 'হালুম!'

'কে এল? কে এল? বাঘিনিমাসি নাকি?' দুই ছেলেই দৌড় দরজায় এসে হাজির। বাঘিনির তো ছেলে দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। দুই ছেলেই বাঘিনিমাসিকে হাত ধরে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল। কাঠুরে-বউ তাকে অন্নব্যঞ্জন বেড়ে এনে দিলে। বাঘিনি খেয়ে-দেয়ে তুষ্ট হয়ে বললে, 'এবারে দিদি, আমার ছেলে দাও।'

কাঠুকরে-বউ কাঁদতে কাঁদতে বললে,—'তোমার যাকে খুশি তাকে নিয়ে যাও দিদি, দুজনেই আমার দুই নয়নের মণি। তবে তাড়াতাড়ি যাও, কাঠুরে এসে পড়লে গোলমাল বাধাবে। সে ছেলে ছাড়বে না।'

বাঘিনি তখন রামুকে পিঠে বসিয়ে নিয়ে বনে চলে গেল, যাবার সময়ে বলে গেল, 'দিদি, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল যেখানে, সেইখানে গিয়ে আমাকে ডাকলেই আমি ছুটে আসব। ছেলেকেও দেখতে পাবে তোমার যখন যেমন খুশি। কেঁদো না। রামু এখন তোমার আমার দুজনেরই ছেলে।'

এদিকে রামু আর শামু ফন্দি এঁটেছিল, তারা পালা করে বাঘিনিমাসির কাছে থাকবে। এক মাস পুরলেই শামু গিয়ে ঝরনার ধারে দাঁড়িয়ে 'রামুভাই' বলে ডাকবে, রামু তখন বাড়ি চলে যাবে। আর শামু থাকবে বাঘের বাসায়। তা হলে দুজনেই মা-র কাছে থাকতে পারবে। কিন্তু মাকে তারা কিছু বললে না।

বাঘিনি সত্যিই খুব ভালোমানুষ বাঘ। সে মায়ের মতোই রামুকে প্রাণপণে যত্ন করে। এদিকে বাঘের ছেলে তো মানুষের মতন পাঠশালে যায় না। বাঘিনি তাই রামুকে বনের হরিণ-টরিন, খরগোশ-টরগোশ মারতে শেখাতে চেষ্টা করে! রামু একদিন বললে,—'মাসি, আমি তো পাঁচ বছর মানুষের বাসায় থেকেছি। এখন আমি আর তো বাঘের ছানার মতো

হয়ে বাঁচতে পারব না, বরং আমাকে পাঠশালেই পাঠাও। আমি তোমার মানুষ-ছেলে হয়েই তোমার দেখাশুনা করব।'

বাঘিনি ভাবলে, তাই তো। রামুকে সে শেয়ালপণ্ডিতমশাইয়ের কাছে নিয়ে গেল।

বাঘিনিমাসি বনের ছাগল মেরে আনে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নুন, হলুদ, আদা, পেঁয়াজ, লংকা, রসুন সব কিনে আনে, রামুকে ভাত-মাংস রেঁধে দেন। বাঘিনির কাছে রামু-শামু সুখেই থাকে। শামু একমাস, রামু একমাস।

কাঠুরে-বউ কিন্তু বুঝতেই পারে না যে, তার দুই ছেলেই তার বুকের কাছে। গোঁয়ারগোবিন্দ কাঠুরে রোজই তাকে ধমক দেয়, 'মা হয়ে একটা ছেলেকে বাঘের হাতে তুলে দিলে?' আর কাঠুরে-বউ কাঁদে। একদিন কাঠুরে যখন বকছে, রামু তখন মা'র কাছে আছে। রামু বললে, 'মা, রামুর সঙ্গে শামুকে তুমি তফাত করতে কেমন করে?' মা বললে, 'রামুর বাঁ হাঁটুর নীচে একটা লাল জড়ুল আছে, শামুর নেই।'

তখন রামু বললে,—'মা বাঘিনিমাসির কাছে কাকে পাঠিয়েছ?'

'রামুকে, বাছা! কেন এই প্রশ্ন করছ, তুমি কি জানো না তুমি কে?'

রামু তখন হাঁটু তুলে লাল জড়ুলটা দেখিয়ে মা'র সব কথা খুলে বললে। শুনে কাঠুরে-বউ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঠুরেকে ডেকে দেখিয়ে নিয়ে এল। দুই ছেলেই ঘরে আছে, একমাস-একমাস করে এ-বাড়ি ও-বাড়ি থাকে, একথা শুনে কাঠুরেও নিশ্চিন্ত। একগাল হেসে সে বললে,—'বউ, ভাত দে।'

এদিকে রামু-শামু বড় হয়েছে। দুজনেই বড় হয়েছে। বনেই বাস করে তো, বাঘিনিমাসির ছেলের পক্ষেও তাই কাঠ কাটাই সবচেয়ে সোজা কাজ। কাঠুরে-বউ মাঝে-মাঝেই ঝরনার ধারে গিয়ে বাঘিনিদিদির সঙ্গে গল্প করে আসে। সুখেই আছে সবাই।

একদিন হল কী, ভালোরাজার রাজ্যে এক মন্দরাজা সৈন্যসামন্ত নিয়ে আক্রমণ করল। এ-রাজ্যের সৈন্যসামন্ত নেই। অস্ত্র-শস্ত্র নেই। রাজা মৃগয়া করেন না। রাজা যুদ্ধ করেন না। প্রজারাও কেউ যুদ্ধ করতে জানে না। কাঠুরে-বউ দৌড়ে এলে বাঘিনীর কাছে। 'কী হবে দিদি? মন্দরাজা যে রাজ্য কেড়ে নেবে? আমাদের এই শান্তির জীবন আর তো থাকবে না? দ্যাখো গে, আমাদের রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে সে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে সিংহাসনে বসেছে। রাজামশাই রানিমা-র হাত ধরে রাজকন্যাদের কোলে নিয়ে এই বনের দিকেই আসছেন!'

বাঘিনি বললে,—'অ্যাঁ! এ তো বড় অন্যায়! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা!' বলেই সে হালুম-হুলুম করে বনের সব বাঘ সিংগি নেকড়ে ভাল্লুকদের সভা ডেকে বললে,—'এক্ষুনি চলো, আমরা ভালোরাজার রাজ্য উদ্ধার করে দিই গে, মন্দরাজাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।'

শুনে জন্তুরা সবাই বললে,—'ঠিক, ঠিক। নিশ্চয়, নিশ্চয়। শিক্ষা দিতেই হবে।' বনের জন্তুরা তো নিশাচর। যেই না রাত্রি নামল অমনি বন থেকে হাজার-হাজার বাঘ-ভাল্লুক সাপ সিংগি চিতা নেকড়ে সব ভীষণ ভীষণ জন্তু-জানোয়ার বেরিয়ে ভয়ানক ডাকতে

মন্দরাজার সৈন্যসামন্তের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মন্দরাজা তো বেশ করে রাজভোগ খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। বাঘিনিমাসি তার নাকটা কামড়ে দিয়ে বললে,—'এক্ষুনি পালাও। জীবনে এদিকে আসবে না। নইলে নাকের মতন মুণ্ডুটাই চিবিয়ে খেয়ে ফেলব।'

নাককাটা রাজা তখন কাঁদতে কাঁদতে পালাতে পথ পায় না। তার সৈন্য-সামন্তরা সব চারিদিকে ছুটোছুটি করছে, হুটোপাটি করছে। সুয্যি ওঠার আগেই প্রাসাদ পরিষ্কার, রাজ্য ফাঁকা।

কাঠুরে-বউ তখন রাজামশাইদের বন থেকে ডেকে আনলে, বললে,—'আমার বাঘিনিদিদিই আমাদের শত্রু নিধন করে রাজ্য রক্ষা করেছে। বাঘিনিমাসির তুলনা হয় না।'

রাজামশাই বাঘিনিমাসিকে একটা সোনার মোহরের তৈরি মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বলুন, আপনাকে কি দিয়ে পুরস্কৃত করতে পারি?'

বাঘিনিমাসি তার হলদে চোখে একঝলক দুষ্টু হাসি হেসে দুই থাবা জুড়ে সবিনয়ে বললে, 'রাজামশাই আমার দুই ছেলে আছে। আপনার মেয়েদুটির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে রাজার জামাই করতে হবে তাদের। এই আমার পুরস্কার।'

রাজা বললেন, 'বেশ। তাই হবে।' কিন্তু তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ফুলের মতো দুই রাজকন্যে, তারা কিনা যাবে বাঘের ঘর করতে? কিন্তু কথা যখন দিয়েছেন, তার নড়চড় নেই।

বিয়েবাড়ি সাজানো হল। সানাই বাজল। বাড়ি পুড়ল। দেশবিদেশ থেকে রাজারাজড়ারা নেমন্তন্ন খেতে এলেন। রাস্তায়-রাস্তায় তোরণ, তোরণে-তোরণে ফুলের মালা, ময়রারা মিষ্টির পাহাড় তৈরি করছে, আর বাবুর্চিরা চপ কাটলেটের। গন্ধে রাজ্য মৌ-মৌ!

কিন্তু হলে কী হবে? ভালোরাজার দেশের লোকের মুখে হাসি নেই। মনে খুশি নেই। করতে হয়, তাই আনন্দ করছে। সাজতে হয়, তাই সাজগোজ করছে। রাজকন্যে দুজন বাঘের ঘরে যাবে, এতে রাজ্যসুদ্ধু সক্কলের মন খারাপ। কিন্তু উপায় কী, কথা যখন দেওয়া হয়েছে? বাঘিনিমাসির জন্যেই তো আজ রাজাপ্রজা সবাই প্রাণে বেঁচে আছে।

লগ্ন হল। যথাসময়ে ব্যান্ড বাজিয়ে আটটি সাদা ঘোড়ায় টানা সাতরঙের ফুল দিয়ে সাজানো সোনার রথ গেল বনের দিকে বাঘের গুহা থেকে বাঘ-বরদের ডেকে আনতে। অগুরু-চন্দন, মালা-টোপর, ধুতি-চাদর, মিষ্টিটিষ্টি তত্ত্বতাবাস নিয়ে। যেতে তো হবেই।

তারপরে? ও মা, এ কী হল? বাঘিনীর গুহা থেকে চাঁদসুয্যির মতন দুই রূপকুমার বেরিয়ে এল। যেমন তাদের স্বাস্থ্য, তেমনি মিষ্টি তাদের কচি মুখ দুখানি। মুখেই তাদের স্বভাবের ভালোমানুষি ফুটে রয়েছে ঠিক যেন পদ্মফুলের মতন। আর পেছনে-পেছনে কারা এল? বাঘিনিমাসির দুপাশে? কাঠুরে, আর কাঠুরে-বউ। তাদের মুখে হাসি আর ধরে না। জামাই দেখে রাজ্যসুদ্ধ মানুষ মহাখুশি। আহা, কী সুন্দর ছেলে দুটি গো। বাঘিনিমাসির যে মানুষ-ছেলে, কে জানত!

ভালোরাজার দেশে আনন্দের বান ডাকল। হ্যাঁ, রাজার যোগ্য জামাই হয়েছে বটে। রাজারও আনন্দ ধরে না। তিনি কেবলই ধনরত্ন বিলোচ্ছেন প্রজাদের। কাঠুরে-বউকে আর পায় কে? সে কাঠুরেকে বললে ঃ

'ভাগ্যি কথা রেখেছিলুম?
বাঘিনিদিদিকে ছেলে দিলুম,
তাই না রাজার মেয়ে পেলুম?'

কাঠুরের মুখে আর কথাটি নেই! কাঠুরে-বউয়ের ধর্মজ্ঞানের ফল হয়েছে। রাজামশাইয়েরও তাই। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

রামু-শামু দুই ভাই রাজার দুপাশে বসে খুব সুন্দর করে রাজ্য চালনা করতে লাগল। আর সেই ঝরনার ধারে বাঘিনিদিদি আর কাঠুরে-বউয়ের গালগল্পও চলতেই লাগল।

ভালো রাজার ভালো প্রজা
কেবল হাসি, কেবল মজা।
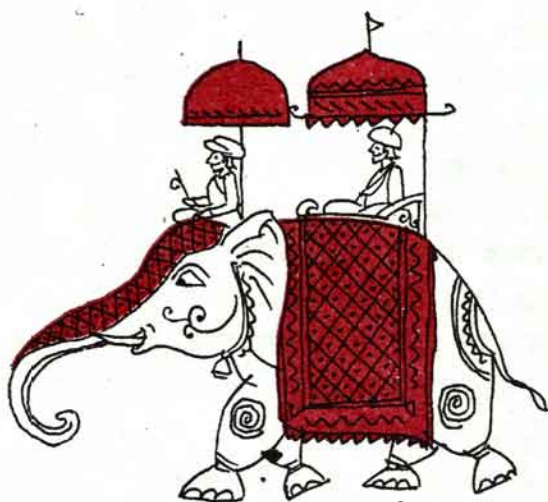
রাজকুমার বৃষস্কন্ধ আর শ্রীময়ী

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল একটিমাত্র ছেলে। ছোটবেলায় রানিমা মারা গেছেন। রাজার আদরে আদরে ছেলেটি এক্কেবারে বাঁদর হয়ে উঠেছে। ছেলের নাম বৃষস্কন্ধ। সত্যিই তো বিশাল চেহারা। গায়ে জোরও খুব। বৃষস্কন্ধের স্বভাবটি কিন্তু মোটেই ভালো নয়। কেবলই মারামারি করতে পছন্দ করে সে। দুমদাম একে ঘুঁষি মারলে, চটাপট ওকে থাপ্পড় কষালে, ক্যাঁৎ করে এক পদাঘাত করে দিলে কারুর পশ্চাদ্দেশে—এটাতেই তার আনন্দ, ছেলেবেলা থেকে এটাই তার খেলা। এবং সে রাজার ছেলে বলে কেউ তাকে উলটে মারতেও পারে না। মনের সুখে রাজপুত্তুর রাজার কুপুত্তুর হয়ে উঠল। দেশের লোকের মনে মহা উদ্বেগ। এই ছেলে যখন রাজা হবে, তখন দেশ তো উচ্ছন্নে যাবে। দেশসুদ্ধু সবাইকে জ্বালাবে। রাজার মনে একটুও সুখ নেই। এমন সময়ে রাজার শরীরটাও খারাপ হল, রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু বৃষস্কন্ধকে মেয়ে দেবে কে? কোনও বাবা-মা-ই চায় না তার মেয়েকে ধরে ধরে জামাই পিটুনি দিক!

যতই রাজভোগের লোভ দেখানো হোক না কেন, আশপাশের সব রাজ্য, দেশবিদেশ খুঁজে, সওদাগর, কোটাল, মন্ত্রী, উজির, নাজির, সভাকবি, কুলপুরোহিত, রাজবৈদ্য, সেনাপতি—মানে রাজসভায় যে যেখান আছেন, কেউই বৃষস্কন্ধের জন্যে কন্যে জোগাড় করতে পারলেন না। রাজা তো মনের দুঃখে প্রায় মরেই যান বুঝি বা! ছেলের আর বিয়ে হল না। বংশ আর রক্ষা হল না। এমন সময়ে রাজার মালি এসে হাতজোড় করে বললে, 'রাজামশাই, আমার ছোট মেয়েটি রাজকুমারকে বিয়ে করতে রাজি। কিন্তু তাকে একশো

নিজস্ব দাসদাসী, আর এক হাজার নিজস্ব সৈন্যসামন্ত দিতে হবে।'

রাজা শুনে বললেন, 'বেশ, তোমার মেয়ে যা বলেছে তাই হবে। বৃষস্কন্ধের বিয়ে না দিলেই নয়। আর ছেলের যা সুনাম, এদিকে ওদিকে সাতখানা দেশ থেকে কেউই তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি!'

মালির মেয়ের নাম শ্রীময়ী। যেমন নাম, তেমনি তার রূপ। সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। সে দিব্যি বৃষস্কন্ধের গলায় মালা পরিয়ে দিলে, মালিনী থেকে যুবরানি হয়ে গেল। এদিকে বৃষস্কন্ধ তাকে সকালে উঠে খানিক পেটায়, তারপর ঘুরতে বেরিয়ে যায়, ফের রাত্রে ফিরে খানিক পেটায়। শ্রীময়ী সহ্য করে, আর মনে মনে ফন্দি আঁটে। কিছুদ্দিন মারধোর খাবার পরে, শ্রীময়ীর শুকপাখিটি একদিন বৃষস্কন্ধকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—'গরুটাও দুধ দেয় বলেই তাকে জাবনা দেওয়া হয়, কুকুরটাও পাহারা দেয় বলেই তাকে হাড় দেওয়া হয়, বেড়ালটাও ইঁদুর ধরে বলে তাকে দুধ দেওয়া হয়, কিন্তু দ্যাখ তো শারি, রাজকুমার কিচ্ছুই না-করে, বসে বসে রাজভোগ খায়। তুই আমি তো তবু দুবেলা রামনামের বুলি পড়ি বলেই ছোলাজল পাই, কিন্তু বৃষস্কন্ধ? সে কেবল সব্বাইকে পেটায় বলে রাজভোগ খায়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জার কথা!' শারি অমনি বললে—'ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জার কথা! মরে যাই! আমি যদি বৃষস্কন্ধ হতুম তাহলে এখুনি রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যেতুম যে-কোনও কাজকর্মের খোঁজে। বউকে খাওয়ায় না, আবার বউকে ধরে মারে? ছিঃ, লজ্জাও করে না যুবরাজের?'

বৃষস্কন্ধ শুকশারির কথা শুনে খুব রেগে গেল। ইতিমধ্যে তার বাবার অসুখ সেরে গেছে। তিনিই আবার রাজ্যচালনা করছেন। বৃষস্কন্ধ সত্যিই কিছু করে না। সে রেগেমেগে শুক আর শারির ঘাড় মটকে ভেঙেই দিলে। তারপরে রাগ কমলে ভেবে দেখল, ওরা তো ঠিক কথাই বলেছে। নাঃ, উপার্জন না করলেই নয়। বৃষস্কন্ধ তখন বাজার থেকে অনেক কিছু ভালো ভালো মালপত্র নিয়ে, পাশের বড় রাজ্যের সওদাগর রাজার কাছে বাণিজ্য করতে গেল। সওদাগর রাজা দারুণ চালাক। সে বৃষস্কন্ধকে দেখেই বুঝেছে তার মাথায় বুদ্ধি নেই। সে বললে,—'দ্যাখো, তোমার গায়ে যদি আমার বেড়ালটা লাফিয়ে পড়ে, তবেই তোমার মালপত্র আমি ন্যায্য দামে কিনে নেব। আর যদি তা না পড়ে, তবে সে মালপত্র আমি অমনি কেড়ে নেব। রাজি তো? কী?'

একটু ভেবে বৃষস্কন্ধ বললে, "রাজি!" কিন্তু সওদাগরের বেড়াল তার গায়ে লাফাবে কেন? অত মোটা লম্বা লোক—ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস ফেলছে ঠিক ষাঁড়েরই মতন, যতই 'আয় আয় তু তু' করে ডাকুক না কেন, তাকে দেখেই বেড়ালটা লেজ তুলে লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল। সওদাগর তখন তার মালপত্র কেড়ে নিয়ে বৃষস্কন্ধকে তাড়িয়ে দিলে। বৃষস্কন্ধ যেই ভীষণ রেগে উঠে সওদাগর রাজাকে মারতে গেছে, অমনি তার যত পাইক বরকন্দাজ সব এসে বৃষস্কন্ধকেই মেরে ধরে তার রাজপোশাক খুলে নিয়ে, শুধু একটা কৌপীন পরিয়ে মাথা নেড়া করে নদীর পারে এক চাষির কাছে ছেড়ে দিয়ে এল। বলল,—'সব টাকা রোজগার করে, তবে তোর সওদা ফেরত নিবি। ততদিন খাটতে থাক।'

রাজপুত্র বৃষস্কন্ধ এতদিন নিজেই শুধু অন্যকে মেরেছে, অন্যের হাতে মার তো

কোনওদিন খায়নি, কাজেই আত্মরক্ষার কায়দাও কিছুই জানে না। সে মার খেয়ে খুব ঘাবড়ে গেল। কী আর করবে, চাষির খেতেই মজুরের কাজটা মন দিয়ে করতে লাগল। টাকা রোজগার করে হারানো সওদা উদ্ধার করে তবে তো নিজের রাজ্যে ফিরবে? টাকা হওয়া দূরের কথা, অত সওদা হারিয়ে সে মুখ দেখাবে কেমন করে রাজসভাতে? চাষির খেতে কাজ করতে করতে বৃষস্কন্ধের কৌপীনটা ছিঁড়ে গেল, চাষি তখন তাকে নতুন একটা কৌপীন কিনে দিলে। চাষির কাছে তার হিসেব জমা হচ্ছে, এক বছর হয়েছে মাত্র। আরও ন'বছর কাজ করার পরে সওদাগর দাম শোধ হবে। বৃষস্কন্ধ প্রচুর খাটতে পারে, তবুও তার রোজগার বাড়ে না। পুরস্কার নেই।

এদিকে শ্রীময়ী তার একশো অনুচরকে সর্বক্ষণ লাগিয়ে রেখেছে রাজপুত্রের খবর সংগ্রহের কাজে। তারা সব খুঁটিনাটি খবর দেয়। রাজপুত্র কবে কী দিয়ে ভাত খাচ্ছে, সেটা পর্যন্ত শ্রীময়ী জানে। কৌপীন বদলের খবর শুনেই শ্রীময়ী বললে,—'ওই ছেঁড়া কৌপীনটা আমার চাই।' অনুচরেরা চটপট ছেঁড়া-কৌপীনটা আস্তাকুঁড় থেকে তুলে নিয়ে এল।

শ্রীময়ী এবার বেরুল সওদা নিয়ে, পুরুষের সাজে পাশের রাজ্যের সওদাগর রাজার সভায় গিয়ে হাজির হল। সঙ্গের এক হাজার সৈন্যসামন্ত একটু দূরে বনের মধ্যে লুকিয়ে রইল।

শ্রীময়ীর গায়ে শাল জড়ানো, তার মধ্যে একটা ইলিশমাছ লুকিয়ে রেখেছে। সওদাগর রাজা তাকে বৃষস্কন্ধের মতোই বললে, 'যদি আমাল বেড়াল তোমার কাছে যায়, তবেই তোমার সব সওদা আমি কিনে নেব। নইলে তোমার সব সওদা অমনি-অমনিই নিয়ে নেব।'

শ্রীময়ী বললে,—'অমন একপেশে শর্তে তো হবে না মশাই? যদি আপনার পোষা বেড়াল আমার দিকে আসে, তবে আমার সব সওদা আপনি কিনে নেবেন আপনার সিংহাসনের বদলে। ওটাই আমার সওদার দাম। আর যদি না আসে, তবে আমাকে সুদ্ধু ক্রীতদাস করে রাখবেন সওদা সমেত।'

সদাগর রাজা তো জানেন, বেড়ালটা কারুর কাছেই যায় না। তিনি তক্ষুনি রাজি। বেড়াল কাছাকাছি আসতেই টুক করে ইলিশমাছটা দেখাল। আর যাবে কোথায়? 'মিয়াঁও' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল হুলোমশাই শ্রীময়ীর কোলের ওপর, ইলিশমাছের গন্ধে গন্ধে! কিন্তু দুষ্টু সওদাগর তো মাছটা দেখতে পায়নি, সে একেবারে অবাক! শর্তে হেরে সওদাগর রাজা আর কী করে? শ্রীময়ীর সওদার বদলে নিজের সিংহাসন ছেড়েই দিলে। যেমন, তাঁর প্যাঁচালো বুদ্ধি, কেবল লোক ঠকানের কায়দা, তেমনি তার শাস্তি হল।

শ্রীময়ী রাজসিংহাসনে বসে সওদাগরকে ডেকে পাঠালে। বললে, 'দ্যাখো, তোমার সিংহাসন আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারি।। কিন্তু তিনটে শর্ত আছে। এক নম্বর, আমাকে তুমি প্রতি বছর খাজনা দেবে। দু-নম্বর, আমাকে এক্ষুনি এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য উপহার দিতে হবে। আর তিন নম্বর, আমি চলে যাওয়ার দুদিন পরে তুমি রাজকুমার বৃষস্কন্ধকে উদ্ধার করবে, তার সমস্ত সওদা তাকে ফেরত দেবে, এবং এতদিন তাকে কষ্ট দিয়েছ বলে ঠিক দশ গুণ বেশি সওদা তার সঙ্গে দিয়ে রাজকুমারকে তার নিজের রাজ্যে পাঠিয়ে দেবে লোকজন সমেত। দেখো, এর যেন নড়চড় হয় না। তা হলে'—শ্রীময়ীর ইঙ্গিতে

তার এক হাজার সৈন্য একনিমেষেই খাপ থেকে এক হাজার ঝকঝকে ইস্পাতের তরওয়াল বের করলে—ঝনাৎ করে ভয়ঙ্কর এক শব্দ হল, আর রাজসভায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল অত ইস্পাতের ওপর এমন আলো ঝলসে উঠল একসঙ্গে। সওদাগর ভয় পেয়ে বললে, 'দেব, দেব, নিশ্চয় দেব। সব শর্ত মানলুম। নড়চড় হবে না।'

শ্রীময়ী তখন নিজের রাজ্যে ফিরে গেল সৈন্যসামন্ত নিয়ে। এক হাজার নতুন অশ্বারোহী সৈন্য ঘোড়ার ক্ষুরে ধুলো উড়িয়ে চলল তাদের সঙ্গে।

এদিকে বৃষস্কন্ধ তো অবাক! সে এসব কিছুই জানে না। হঠাৎ সওদাগরের হল কী? এত উদারতা কেন রে বাবা? তবু যাই হোক, মুক্তি পেয়ে সে কেবল খুশিই হল না, এত সওদা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরে তার খুব গর্বও হল। বাড়িতে গিয়ে স্নান করে খেয়েই সে শ্রীময়ীকে বিরাশি সিক্কার এক থাপ্পড় লাগিয়ে দিলে। বললে,—'কী? খুব যে তোমার শুকশাড়ি বলেছিল বৃষস্কন্ধ কিছুই করতে পারে না? এইবার? এত ধনদৌলত কে এনেছে?'

শ্রীময়ী একটু হেসে ও-ঘর থেকে ছেঁড়া সেই কৌপীনটা নিয়ে এল।—'ধনদৌলত সব কে এনেছে? এই কৌপীনটা, এটা চিনতে পারো?' বলে বৃষস্কন্ধের হাতে দিলে। শ্রীময়ীর কাছে নিজের কৌপীন দেখে বৃষস্কন্ধের যেমন লজ্জা, সে তেমনি অবাক। এ কি ম্যাজিক নাকি? তবে তো বউ সবই জানে? এ মা! সে লজ্জায় মাথা নীচু করে ফেললে।

তখন শ্রীময়ী তাকে বললে,—'দ্যাখো রাজকুমার, অতিকষ্টে তোমাকে উদ্ধার করেছি। ফের যদি কোনও মানুষের গায়ে হাত তুলেছ, তবে আমার দু-হাজার সৈন্যসামন্ত তোমাকে ফের নির্বাসনে দিয়ে আসবে। তোমাকে আমিই কিনে এনেছি সওদাগরের কাছ থেকে। এখন থেকে যদি লক্ষ্মী ছেলে হয়ে চলো, তবেই রাজপ্রাসাদে থাকতে পাবে। তোমার বাবাও আমার সঙ্গে একমত।'

বৃষস্কন্ধ তো লজ্জায় অধোবদন হয়েই ছিল। সে এবার হাত জোড় করে বললে,—'শ্রীময়ী, তোমার গুণপনার অবধি নেই। আমাকে মাপ করো। আমি যখন তোমার ক্রীতদাস, তখন আমি আর কোন মুখে অন্যের গায়ে হাত তুলব? কেবল তুমি কৌপীনের কথাটা যেন কাউকে বোলো না।'

সেই থেকে রাজকুমার বৃষস্কন্ধ খুব ভালো ছেলে হয়ে গেছে। প্রতিদিন খেতে গিয়ে চাষবাস করে। দেশে এখন প্রচুর ধান, প্রচুর ধন, প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর ধরে না। সকলেই শ্রীময়ী যুবরানির সুবুদ্ধিকে ধন্য ধন্য করে। রাজামশাই নিশ্চিন্ত। শ্রীময়ীকেই তিনি প্রধানমন্ত্রী করে নিলেন। বৃষস্কন্ধ তাতে খুশি।
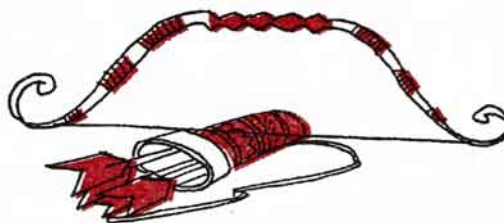
জ্যোচ্ছনাবুড়ি আর বুবাই

মা সেদিন বাড়িতে ছিলেন না। অফিসের কাজে তাঁকে যেতে হয়েছিল দিল্লি দুদিনের জন্যে। বাবার কাছে ছিল বুবাই। বাবাও শোবার সময়ে গল্প বলেন খুব ভালো ভালো, তবে মা-র মতো নয়। অন্যরকম। বাবার ছেলেবেলার কথা। মা বলেন, কতরকম রাজা রানি রাক্ষসের গল্প। বাবা বলেন, ইস্কুলের দুষ্টুমির গল্প, খেলার মাঠে মজা হওয়ার গল্প। গান্ধীজির মিটিংয়ে যাওয়ার গল্প। বুবাই সবরকম গল্পই ভালোবাসে।

বাবার একটাই দোষ কেবল। বুবাই ঘুমোবার আগেই বাবার নাক ডাকতে শুরু করে। মা যেমন বুবাই না ঘুমোনো পর্যন্ত গল্প বলে যান, কক্ষনও আগে আগে নিজে নিজে ঘুমিয়ে পড়েন না, বাবার সেটা নয়। বাবা বলেন, 'আমি বিছানায় পড়লেই ঘুম! টেবিল-চেয়ারে বসিয়ে রাখো না—যতক্ষণ খুশি জেগে থাকতে পারি।'

বুবাই তো বলে, 'বাবা, তুমি চেয়ার-টেবিলে বসে বসেই গল্প বলো আমাকে!'

হেসে বাবা বলেন, 'ধুর! তাই কখনও হয়?' বিছানায় শুয়ে বুবাইয়ের পিঠে হাত রেখে ঠিক মার মতো করেই গল্প বলা চাই বাবার। যেন, মা কেমন করে পারেন, বাবাও তেমনই এক্সপার্ট! কিন্তু কাজের বেলায় নাকডাকানি। তখন বুবাই-ই উঠে বাবার গায়ে চাদর টেনে দেয়। আর মনে মনে হাসে। দেখতেই বাবা যা অতবড়। আসলে বাবা বুবাইয়ের মতোই।

'আমাকে একদিন রাতে ভূতে ধরেছিল,' বাবা বললেন বিছানায় শুয়েই, 'তোকে কী সে গল্পটা বলেছি?'

'কই না তো! ভূতের গল্প তো একটাও বলোনি? তোমাকেই ভূতে ধরেছিল? তবে যে মা বলেন ভূত-পেতনি বলে কিছু নেই? শুধু গল্পের বইতেই থাকে?'

'হুঃ, নেই আবার! নেই, তবে আমাকে ধরলে কেমন করে? তোর মা কি তখন জন্মেছে? সে জানবে কীভাবে? আমার তখন চার বছর বয়েস। শান্তিনিকেতনে থাকি।'

'আমার চেয়েও ছোট।' বুবাই হিসেব করে বললে। বুবাইয়ের পূর্ণ ছয় বছর বয়েস।

'ভূতটা কী করল বাবা? কেমন করে ধরলে তোমাকে? তাদের তো হাত-পা কিছু নেই।'

'আহা, ভূতে কি জাপটে ধরে এমনি করে?' বাবা বুবাইকে আচ্ছা করে জাপটে ধরে আদর করে ছেড়ে দিলেন। বুবাইয়ের ঘুম পাবে কি কাতুকুতু লেগে খিলখিল করে হেসেই উঠল সে।

'ভূতে-ধরা অন্যরকম। সে তুই নিজেও জানতে পারবি না। আমি ভূতের প্যাঁচে পড়ে সেই কোপাইনদীর ওপারে সোনাঝুরি বনের মধ্যে চলে গিয়েছিলুম। শেষে সাঁওতালরা আমাকে খুঁজে পেয়ে ধরে এনে বাবা-মা-র কাছে পৌঁছে দিল।'

'কিন্তু চার বছরের বাচ্চা ছেলে কেমন করে যে অতদূর হেঁটে গেলুম, সেটাই কেউ বুঝতে পারলে না। সাঁওতালরাই বললে, ওই সোনাঝুরি বনের ভূতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ওরা দূর দূর থেকে বাচ্চাদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়, তারপর গাছ করে দেয়। অমনি করে করেই অতবড় বনটা হয়েছে। আমিও ছোট্ট একটা সোনাঝুরি গাছ হয়ে যেতুম, যদি সময়মতো ধরা না পড়তুম সাঁওতাল মেঝেনদের হাতে। ভেবে দ্যাখ বুবাই, একটা মস্ত লম্বা সোনাঝুরি গাছ হয়ে বনের মধ্যে মিশে আছি। তোর বাবা?'

এতটা শুনেও মোটে ভালো লাগল না বুবাইয়ের। সে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বলল,—'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো বাবা, আমাকে আর গল্প বলতে হবে না। ভূতের গল্প শুনতে আমার ভয় করছে। এতেই আমার ঘুম পেয়ে গেছে, আর গল্প শুনতে চাই না।'

'ব্যস? এতেই ভয়?' বাবা বললেন।

'আর কেমন করে আমাকে ভূত ভুলিয়েছিল, সেটা শুনবি না? সেটাই তো...।'

'না!' বুবাই স্থির নিশ্চিত। এটা তার মোটেই শুনতে ইচ্ছে নেই। কিন্তু বাবার বলতে ইচ্ছে। বাবা বলবেনই।

'পাখির ডাক ডেকে ডেকে। বুঝলি না! পাখির শিস দিতে দিতে। আমি মুগ্ধ। কী সুন্দর সেই শিস, তোকে কী বলব বুবাই? পাখিটাকে দেখব বলে ছুটে ছুটে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। খুঁজতে খুঁজতে, কেবলই এই ঝোপ থেকে ওই ঝোপ, এমনি করে সেই কোপাইনদীর ধারে। যেখানে শ্মশান!'

'বাবা!' বুবাই এবার রেগে গেছে। 'বলছি আমি ওসব গপ্‌পো শুনতে চাই না, আমার ভয় করে, তবু তুমি বলবেই?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলব না। কিন্তু গল্পটা কেন মনে পড়ল, জানিস বুবাই?

আজ ঠিক অমনি পাখির শিস শুনতে পেলুম। ঠিক এক্কেবারে সেইরকম। সেই দিনটার কথা ছবির মতো মনে পড়ে গেল। যেন সেদিন। অথচ তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর আগের কথা তো?'

'কেমন শিস, বাবা?' বুবাই হঠাৎ বলে।

'ঠিক বোঝাতে পারব না, খানিকটা যেন হঠাৎ একটুকরো বাঁশি বেজে ওঠার মতো। না শুনলে বুঝবি না। আজই সেই শিসটা আমি শুনতে পেয়েছি। খুব মিষ্টি সুর।'

'এ-বাড়িতে? এইখানে শুনলে?'

'হ্যাঁ, এ-বাড়িতেই তো। সেদিন, যেদিন প্রথম শুনেছিলুম, রাতটা ছিল পূর্ণিমার। মস্তবড় একটা চাঁদ উঠেছিল। ফুটফুটে জ্যোচ্ছনা।'

'তুমি রাত্তিরবেলায় হারিয়ে গিয়েছিলে?'

'নইলে আর ভূত বলছি কেন?'

'কেন, ঠিক দুক্কুরবেলাতেও তো ভূতেরা আসে।'

'তা বটে! এটা কিন্তু ছিল জ্যোচ্ছনারাত। ঠিক আজকেরই মতো। দ্যাখ, দ্যাখ, বুবাই কেমন চাঁদের আলো এসে মেঝেটা ভাসিয়ে দিচ্ছে? যেন দুধ পড়েছে। না রে?'

'হুঁ। দুধের মতো, কিন্তু তাতে গ্রিলের ছায়াটা থাকত না।'

'তুই বড্ড সায়েন্টিফিক্যালি চিন্তা করিস বুবাই। তোকে সায়েন্স পড়াব।'

'সে তো অনেক বড় হওয়ার পরে পড়তে হয়, না বাবা? সায়েন্স?'

'অনেক বড় আর কি? এই ক্লাস সেভেন-এইটে শুরু হবে বোধহয়। তোর এখন যেন কোন ক্লাস?'

'ওয়ান।' খুব অহঙ্কারের সঙ্গেই বুবাই বলে। আর নার্সারি টু নয়। এবার ওয়ান। সত্যি সত্যি ক্লাস ওয়ান।'

'ওয়ান! মাত্তর?' বাবার গলার স্বরে হতাশা আর তাচ্ছিল্য যেন ছিটকে পড়ে। বুবাইয়ের প্রাণে রীতিমতো ধাক্কা লাগে। সে রাগ করে ওপাশ ফিরে শোয়। বাবাও কিছু বলেন না।'

একটু পরেই বাবার নাক ডাকে। বুবাই চুপ করে জানলার বাইরে তাকিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে থাকে। জানলার ওধারে কদমগাছটা যেন দুধে-ধোওয়া বলে মনে হচ্ছে। সত্যি খুব সাদা রং আজকের জ্যোৎস্নাটার। কেমন অন্যরকম সাদা। সত্যিই তো। এমন ধবধবে জ্যোচ্ছনা খুব কম দেখেছে, কখনও কি দেখেছে, বুবাই? সব জ্যোৎস্না একরকমের হয় না কেন? সব রোদ্দুরেও অবশ্য একরকমের রং হয় না। কোনওটা কড়া, কোনওটা মিষ্টি। শীতকালে একরকম, গরমকালে আর একরকম, আবার বর্ষাকালে অন্যরকম। পুজোর সময়ে তো একেবারে অন্য রং। সত্যি, কী আশ্চর্য। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শিসটা শুনতে পেল বুবাই।

একটা বাঁশি যেন বেজে উঠেই থেমে গেল। হ্যাঁ, এই শিসের কথাই বাবা বলেছিলেন। এই সেই শিস। তীব্র নয়। ভয় পাওয়ার মতো মোটেই নয়। খুব মিষ্টি। একটা বাঁশের বাঁশিতে কেউ যেন দু-একটা সুর বাজিয়েই হঠাৎ থেমে যাচ্ছে। একই, দু-তিনটে স্বর। সেটা

নিশ্চয়ই কোনও পাখির ডাক। 'বুবাই বাবাকে আস্তে ঠেলে, 'বাবা? পাখিটা কেমন দেখতে ছিল?'

বাবা ঘুমোতেই থাকেন।

'ও বাবা! বাবা? ওঠো না? ওই যে, সেই পাখির শিস! বলো না পাখিটা কেমন দেখতে ছিল? কী রং? ঝুঁটি ছিল কি? গায়ে ফুটকি ছিল? ল্যাজ ঝোলা, না ছোট ল্যাজ? বড় পাখি? না ছোট? ময়ূরের মতন? না চড়ুই?' মনে মনে বুবাই বাবার সঙ্গে কথা কয়। বাবার নাক ডাকতেই থাকে। ওই যে! আবার শিস। বুবাই অস্থির হয়ে ওঠে। কদমগাছে কী? বুবাই খাট থেকে নেমে বারান্দায় যায়। বারান্দায় গিয়েই অবাক!

এটা কোন দেশ? কোথাকার বারান্দায় সে দাঁড়িয়ে আছে? সামনে ট্রামলাইন কই? দোকানগুলো কোথায় গেল? অত বড় বড় সব বাড়িঘর? গোটা রাসবিহারী অ্যাভিনিউটাই কোথায় উড়ে গেছে। তার বদলে বুবাই দেখল, সামনে মস্ত একটা মাঠ। উঁচু-নীচু, পাথুরে মাটির ওপর জ্যোৎস্নার যেন ধারা বইছে। এই মাঠটা শান্তিনিকেতনের খোয়াই, বুবাই ঠিক চিনতে পারল। এখানে এল কেমন করে? আবার সেই বাঁশির সুরের শিস। হ্যাঁ, কদমগাছ থেকেই তো। কদমগাছটা রয়েছে ঠিকই বারান্দার গায়ে ডালপালা ঝামরিয়ে। বড় বড় পাতাগুলো যেন রুপোর তৈরি বলে মনে হচ্ছে চাঁদের আলো লেগেই। যেন এটাই সেই রূপকথার সোনা-রুপোর গাছ। ওরই ফাঁকে কোথাও লুকিয়ে আছে পাখিটা।

এটা দোতলার বারান্দা। বুবাই গাছের দিকে খুব ঝুঁকে পড়ে পাখিটাকে খুঁজতে থাকে। যদি দেখা যায়। হঠাৎ আবার শিস। ঠিক বুবাইয়ের মাথার ওপরে। বুবাই মাথা তুলেই অবাক। আরে? এটা তো মোটেই সত্যিকারের পাখিই নয়। রবারের দড়িতে ঝুলনো, সবুজ রঙের সেই কাপড়ের টিয়াপাখিটা! তার চোখে লাল পুঁতি, গলায় কালো-হলুদ ব্যান্ড পরানো, ঠোঁট লাল টুকটুকে ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি। খেলতে খেলতে, হঠাৎ একদিন বুবাইয়ের হাত থেকেই ওটাকে ফুটকি কামড়ে ধরেছিল, আর পেট ফুটো করে ফেলেছিল। পেটের মধ্যে কেবল কাঠের গুঁড়ো ভরতি। সুশীলাদি আবার যত্ন করে সেলাই করে দিয়েছিল ফুটোটা। বুবাই দেখতে পেলে, পেটের কাছে সেই এবড়ো-খেবড়ো সেলাইটাও আছে। সেই রথের মেলায় কেনা পাখিটা এমনি শিস দিতে পারছে? তখন তো পারত না? একেবারে অবাক হয়ে গেল বুবাই।

'তুমি ভাবছ আমি শিস দিচ্ছি কেমন করে? না বুবাই?'

বাঁশির মতো মিষ্টি গলায় টিয়াপাখি বললে, বুবাইকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে।

'তুমি কথাও বলতে পারো?'

'পারি তো! উড়তেও পারি। দেখবে?' বলেই পাখি হুশ করে উড়ে এসে বুবাইয়ের হাতের ওপরে বসল।

'তোমার তো ডানা ছিল না?'

'ছিল গো ছিল, লুকোনো ছিল, দেখা যেত না। ডানা না থাকলে উড়লুম কেমন করে? তোমারও তো ডানা আছে। দেখা কি যায়?'

'ডানা! আমার? তুমি কি পাগল? আমার আবার ডানা থাকবে কেমন করে? তুমি

না হয় পাখি, আমি তো মানুষ।'

'উড়বে? বুবাই? উড়তে চেষ্টা করে দ্যাখো, দেখবে তোমার কী সুন্দর ডানা আছে।'

'উড়ব? উড়ে কোথায় যাব?'

'কেন? কদমগাছে?'

টিয়ার কথা শুনে বুবাই হাতদুটোকে ডানার মতন নাড়ে। নাড়তেই সে দ্যাখে তার পা শূন্যে উঠে গেছে। বুবাই কী সুন্দর উড়তে পারছে, ঠিক যেন বাতাসে সাঁতার কাটবার মতো। বুবাই উড়তে-উড়তে গিয়ে কদমগাছে বসল। সাঁতার ক্লাবে যায় সে রোজ বিকেলে, ঠিক পুলের মধ্যে যেভাবে সাঁতার কেটে গিয়ে ওপারের রেলিংটা ধরে, প্রায় তেমনই, আরও সোজা। কোনও পরিশ্রমই হয় না হাত-পা নাড়তে।

'বাঃ! কী চমৎকার উড়তে পারো তুমি, বুবাই!' টিয়াপাখি বলল,—'চলো, আমরা উড়ে উড়ে নদীর ধারে যাই। যাবে, বুবাই?'

'নদী? কোথায় নদী?'

'ওই—যে? ওই তো নদী! দেখতে পাচ্ছে না?' বুবাই দূরের দিকে তাকিয়ে দেখল, তাই তো? দুধে-ধোওয়া মাঠ যেখানে ঢালু হয়ে আকাশে মিশছে—সেখানে ঝকঝক করছে দারুণ জ্যোচ্ছনা, রুপোর পাতের মতো নদী বয়ে চলেছে। ওই তো কোপাইনদী। বাবার ছেলেবেলাকার নদী। বুবাই ঠিক চিনতে পেরেছে। বাতাসে পাখা ভাসিয়ে বুবাই নেমে পড়ল শূন্যে—টিয়াপাখি আগে আগে উড়তে লাগল পথ দেখিয়ে। গভর্নরের গাড়ির আগে আগে যেমন যায় বাঁশিবাজানো মোটরবাইক। বুবাই দেখল একটুও কষ্ট হচ্ছে না উড়তে। মাঠে যেমন ছুটতে মজা লাগে, তেমনই, আকাশে যেন দৌড়ে যাওয়া এটা। নীচের মাঠের দিকে তাকাতে একটুও ভয় করছে না, কিন্তু কী তাড়াতাড়ি এসে গেল নদীটা! হাঁটতে হলে অনেক অনেক অনেক বেশি সময় লাগত। নিশ্চয়।

নদীর পাড়ে এসেই বুবাই ঝুপ করে ডানা বন্ধ করে নেমে পড়ল। কী সুন্দর জল! কী চিকনবালি চিকচিক পাড়। কোপাই, না অজয়? বুবাই বেশ সাঁতার শিখে গেছে। জল দেখলে একটুও ভয় করে না তার। জলে পা ডুবিয়ে খেলা করতে শুরু করে দিল বুবাই। টিয়াপাখি চারধারে উড়ছে। আর সেই মিষ্টি মিষ্টি বাঁশির সুরে শিসটা দিচ্ছে। আর গল্প করছে।

'কী সুন্দর এই পূর্ণিমার রাত্তিরটা না বুবাই? ঠিক এমনই রাত্তিরে জ্যোচ্ছাবুড়ি চাঁদ থেকে নেমে আসে—কে জানে আজও এসেছে কি না?'

'জ্যোচ্ছনাবুড়ি? সে কে?'

'বাঃ! চাঁদের বুড়ি? চাঁদে বসে চরকা কাটে; দ্যাখোনি?'

'সে আবার মাটিতে নামতেও পারে নাকি?'

'পারে না? জ্যোচ্ছনার পাখায় ভর করে বুড়ি নেমে আসে, যখন খুশি—ফের ফিরে যায় চাঁদ ঢলে পড়বার আগেই—যা খুশি তাই পারে চাঁদের বুড়ি। ম্যাজিক জানে কি না?'

'সেই জ্যোচ্ছনাবুড়ি? কী ম্যাজিক জানে?'

'কত্ত ম্যাজিক? এই তো আমি! কাপড়ের তৈরি পুতুল! আমাকে কথা বলবার, শিস দেওয়ার, ডানা মেলবার, ম্যাজিক কে আমাকে শেখালে? এই জ্যোচ্ছনাবুড়িই তো!'

'আর আমাকে? আমাকে? আমি তো মানুষ, আমার ডানাই নেই; আমাকে উড়তে শেখালে কে? সেটাও কি চাঁদের বুড়ির ম্যাজিক, টিয়াপাখি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এইবার বুঝতে পেরেছে তো? সবই এই জ্যোচ্ছনাবুড়ির গুণে!'

'ওই চাঁদে বসে বসেই বুড়ি সবরকম ম্যাজিক করতে পারে?'

'তাই তো করে। ওই দ্যাখো না নদীটাকে সত্যি সত্যি রুপোর নদী করে দিয়েছে, এখন তুমি হেঁটেই পার হতে পারবে। উড়তেও হবে না, সাঁতার দিতেও হবে না। কাপড়-জামা ভিজবে না।'

'সে কী! দেখি দেখি!' তাড়াতাড়ি দৌড়ে নদীতে নেমে পড়ল বুবাই। সত্যি তো। পায়ের তলায় তো জল নেই, লোহার মতন শক্ত কিছু। রুপো। রুপোর তৈরি নদী। স্রোত সব থমকে আছে। বুবাই ছুটে ছুটে নদী পার হয়ে গেল, টিয়ার সঙ্গে। এক মিনিটে। ওপারে পৌঁছেই দ্যাখে, আরে! এ কী? এখানে তো মাঠ নেই! এ যেন বন! সুন্দর ঝিরঝিরে পাতার ফাঁক দিয়ে ঝিরঝিরে জ্যোচ্ছনা ছড়িয়ে আছে সারা মাটিতে। ছায়া আর আলো মিশিয়ে কী সুন্দর ডিজাইন তৈরি হয়েছে মাটিতে। কবিতায় একেই বলে 'আলো-ছায়ার আলপনা-আঁকা!' বুবাই বললে,—'টিয়াপাখি! জ্যোচ্ছনাবুড়ির সঙ্গে দেখা হয় না? আমার যে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে!'

'বুড়িকে আমি তো কোনওদিনই দেখিনি! কিন্তু বুড়ি সবাইকেই দেখতে পায়। ওর সঙ্গে মনে মনে কথা বললেই বুড়ি শুনতে পায়। দেখবে? বলো এখন মনে মনে কিছু, দেখবে, শোনে কি না?'

বুবাই চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললে,—'জ্যোচ্ছনাবুড়ি, জ্যোচ্ছনাবুড়ি, তুমি যদি আমার কথা শুনতে পাও, তবে রুপোর নদীটাকে আবার জলের নদী করে দাও। এমন থমকে থাকা নদী দেখতে ভালো লাগে না একদম।'

সঙ্গে সঙ্গে কুলুকুলু শব্দ শুনতে পেয়ে বুবাই পেছন ফিরে দ্যাখে, নদী বয়ে যাচ্ছে—কী স্রোত! কাঠকুঠো মুহূর্তের মধ্যে হুশ করে এখান থেকে ওখানে ভেসে যাচ্ছে! কী সুন্দর মিষ্টি জোলো একটা হাওয়াও বইতে শুরু করল। বুবাই অবাক! জ্যোচ্ছনাবুড়ি তার কথা শুনেছে! বুবাইয়ের হঠাৎ মনে হয়, এই বনটাই কি সোনাঝুরি বন? সেই যে বাবা ছেলেবেলায় যেখানে হারিয়ে গিয়েছিলেন? সেই বনটাই কি এটা? কে উত্তর দেবে?

'হ্যাঁ, এটাই সেই বন,' টিয়াপাখি উত্তর দেয়, 'তোমার বাবাকে এখান থেকেই খুঁজে পেয়েছিল মেঝেনরা।'

'বাবাকেও কি তুমি নিয়ে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ, আমিই তো।'

'এই বনে। এই নদীর ধারে?'

'তাই তো। কী সুন্দর বন নয়? কী সুন্দর নদী না? আর কী সুন্দর চাঁদের আলো?'

'তবে যে বাবা বললেন, বাবাকে ভূতে ধরেছিল? বাবা তো তোমাকে দেখতেই পাননি!''

'ভূত? ভূত আবার কী?'

'তুমি, তুমিই ভূত নও তো? টিয়াপাখি?'

'ধ্যাত! আমি তো পাখি। যদিও ম্যাজিকের পাখি!'

'এই সোনাঝুরি গাছগুলো কি সত্যি-সত্যি গাছ? না ম্যাজিকের গাছ?'

'সত্যি নয় তো কী? কত ফুল ঝরে আছে না? মাটিময়, ঝুরো ফুলে ভরা। মিছিমিছি গাছে কি ফুল ধরে? প্লাস্টিকের লতাপাতা দ্যাখোনি?'

বুবাইয়ের মনে পড়ল মেঝেনরা বলেছিল, ভূতেরা ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে এনে ছোট্ট-ছোট্ট সোনাঝুরি গাছ করে দেয়। তারাই বড়-বড় সোনাঝুরি গাছ হয়ে বেড়ে ওঠে। এরা সবাই যদি মানুষ হয়? ওরে বাবা! এত বাচ্চা ধরে এনেছিল? বনে গাছের যে শেষ নেই! এদের মা-বাবাদের কত কষ্ট!

'ও জ্যোচ্ছনাবুড়ি, এরা যদি গাছ না হয়ে মানুষই হয়, তুমি এদের তা হলে আবার মানুষ তৈরি করে দাও না কেন গো?' বুবাই তাড়াতাড়ি মনে মনে প্রার্থনা করে। নদীর হাওয়া সোনাঝুরি বনের পাতা কাঁপিয়ে শিরশির করে বয়ে যায়। গাছ গাছই থাকে। কিন্তু বাতাসের শব্দটা যেন শোনায় অনেক লোকের দীর্ঘশ্বাস ফেলবার মতো। যেন হায় হায় করে ওঠে বনটা। বুবাইয়ের বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। এ সে কোথায় এসেছে? কোথায় রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ে তাদের দোতলা বাড়ি! আর কোথায় এই নদীর ধারে, অচেনা সোনাঝুরি বনের আলোছায়া! বাবা বেচারি ঘুম ভেঙে যদি ওকে খোঁজেন? তা হলে কী হবে?

'আমি বাড়ি যাব! অ টিয়াপাখি!'

বুবাইয়ের বুকের মধ্যে গুরগুর করতে থাকে। যদি আর কোনওদিন বাড়ি ফেরা না হয়? 'টিয়াপাখি, আমার ভয় করছে। আমি বাড়ি যাব।' যদি জ্যোচ্ছনাবুড়ি আর ভালো না বাসে? শুধু হাত নাড়লেই আগের মতন যদি ডানা আর না ওড়ে? যদি আর বাড়ি ফিরতে না পারি? কোনওদিনই না? এমনি সোনাঝুরি বনের মধ্যে এমনি আলোছায়ায় ঝিরঝিরির মধ্যে ছুটে ছুটে, ছুটে ছুটে, সারা জীবন? এমনি কুলুকুলু নদীর শব্দ আর পাখির বাঁশির শিসের শব্দ ছাড়া কোনও শব্দ থাকবে না? 'বুবাই' বলে বিকেলবেলা ডাকতে আসবে না বন্ধুরা? আর মা? মা দিল্লি থেকে ফিরেই 'বুবাই' 'বুবাই' বলে কত ডাকবেন, সাড়া নেই! কত খুঁজবেন—ইশ, কী বিচ্ছিরি—বুবাইয়ের ভীষণ কান্না পেয়ে যায়। কেন এল সে?

'ও টিয়াপাখি! আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো!'

'চলো না। হাত নাড়লেই তো উড়তে পারবে।' টিয়া বলল, কিন্তু ভয়ে বুবাই ভাবল হাত-পা আর নড়বেই না বুঝি। তবু বুবাই হাত নাড়তে চেষ্টা করল। আর অমনি বুবাইয়ের পা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠতে লাগল। বাঃ। এই তো উড়তে পারছি! বুবাই ভাবল, জ্যোচ্ছনাবুড়ি কী ভালো!

উড়তে-উড়তে, মাঠ পেরিয়ে নদী পেরিয়ে, উড়তে-উড়তে, বুবাই সে কদমগাছের

ডালে বসল। আরে। গাছটা তো সত্যি-সত্যিই এখন রুপোর গাছ! এত শক্ত-শক্ত পাতা কি কোনও সত্যিকারের গাছের হয়? বুবাই তাড়াতাড়ি বললে, 'ও জ্যোচ্ছনাবুড়ি, কদমগাছটা কি এমনিই থাকবে? রূপকথার গাছ হয়ে?'

'তা কেন?' টিয়া বললে। 'সকাল হলেই আবার কদমগাছ হয়ে যাবে।'

'আর তুমি? তুমি সত্যি-সত্যিই টিয়াপাখি হতে পারো না? জ্যোচ্ছনাবুড়িকে বললেই তো...'

'কেন পারব না? কিন্তু আমার সে-ইচ্ছেই নেই। আমার পুতুল খেলার পাখি হয়ে থাকতেই ভালো লাগে যে! সত্যি-সত্যি পাখি হলে কত্ত মুশকিল! রোজ রোজ খাবার খোঁজো, বাসাটাসা বাঁধো, ডিম পাড়ো, ছানাদের বড় করো, অসুখ করলে কষ্ট পাও, তারপরতো মরেই যাব—কত কিছু! এখন তো বাবা স্রেফ পুতুলের জীবন। অমর জীবন। এটাই তো ভালো। তাই না? তোমার খেলাঘরে আমি দিব্যি ভালো আছি। ফুটকি যদি না কামড়ে দেয়।'

কিন্তু বুবাই ভাবল, পুতুল হয়ে থাকতে হলে সেটা ওর একটুও ভালো লাগত না।

নিজের বাড়ির চেনা বারান্দায় ফিরে এসে এবার মনে হল, যেন একটু একটু ঘুম পাচ্ছে। যেন অনেক দূর ঘোরা হয়েছে, বুবাইয়ের সত্যিই এবার ক্লান্ত লাগছে। চোখের পাতা জুড়ে আসছে।

'যাই, শুয়ে পড়ি গে? ঘুম পাচ্ছে!'

'তাই ভালো। সকালে আবার তোমার ইস্কুল আছে। শুয়েই পড়ো গে'—বলল টিয়াপাখি বন্ধু।

'গুডনাইট জ্যোচ্ছনাবুড়ি, থ্যাংক ইউ টিয়া, খুব ভালো লাগল এই বেড়ানোটা। আচ্ছা, এটাকেই কি ভূতে ধরা বলে?'

হেসে উঠে টিয়াপাখি বললে,—'ভূতই কাকে বলে জানি না তো! বরং বাবাকেই জিগ্যেস কোরো। এটা হল জ্যোচ্ছনাবুড়ির ম্যাজিক। এটা ভূতের খেলা নয়।' বলেই টিয়াপাখি উড়ে গেল কদমগাছের ভেতরে। বুবাই ঘরে গিয়ে পা টিপে টিপে ঘুমন্ত বাবার পাশে শুয়ে পড়ল। খাট থেকেই জানলা দিয়ে দেখল যতদূর পর্যন্ত চোখ যায়, তখনও ছড়ানো রয়েছে দীর্ঘ মাঠভরতি এলোমেলো দুধে-ধোওয়া টিলা, দূরে ঝকঝক করছে রুপোলি নদী—তার ওপারে ছায়াছায়া মতো সোনাঝুরি বনটা এখনও দেখা যাচ্ছে। বুবাই পাশ ফিরে বাবার গায়ে হাত রেখে একবার ভাবল বাবাকে ডেকে তুলে দেখাবে কি না। তারপর আস্তে করে ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরে তখনও বাঁশির সুরের শিস শোনো যাচ্ছে।
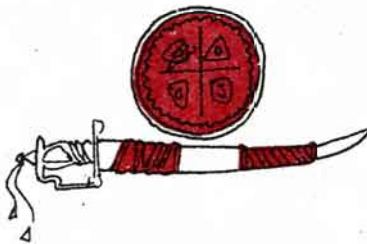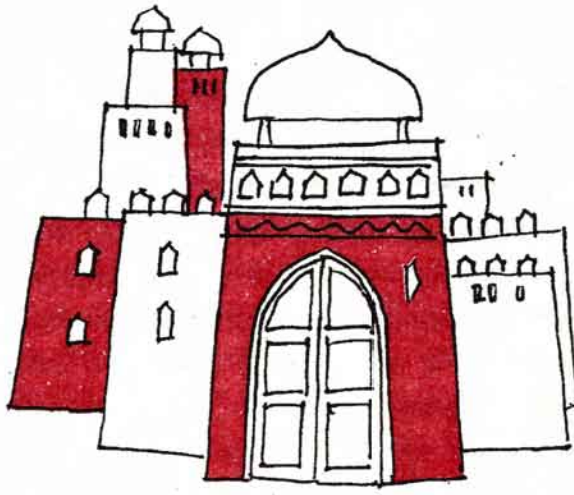
রুবাইয়ের বারান্দা আর বনপাহাড়ি

'এক যে আছে গহিন অরণ্য। অরণ্যের কোণে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো মস্ত একটা মর্মরপাথরের রাজবাড়ি। রাজবাড়িতে সাতটা মহলের সাতটা সিংহদুয়ারে সাত-সাতখানা হাতি বাঁধা আছে, মোটা রুপোর শেকলে। আর প্রত্যেকটা গেটে, মানে তোরণে, ঠিক মনুমেন্টের মতো, না ঠিক দিল্লির কুতব মিনারের মতো, দুখানা করে বিরাট উঁচু মিনার (ওয়াচ টাওয়ার আর কী), তার মানে, সাত দুগুণে চোদ্দোটা ওয়াচ টাওয়ারের প্রত্যেকটার মাথায় দুজন করে, অর্থাৎ চোদ্দো, দুগুণে আঠাশজন যণ্ডাগুন্ডা সেপাই। তাদের মাথায় রঙিন সিল্কের বুটিদার রাজস্থানি উষ্ণীষ, ঘাড়ে বন্দুক ('উষ্ণীষ' কথাটা কী সুন্দর!)। সেপাইদের কিন্তু কোনওই কাজ নেই, তারা দিনরাত, রাতদিন শুধু ঘুমোচ্ছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে, এ ওর গলা জড়িয়ে, বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে তো ঘুমোচ্ছে। আর হাতিগুলো...'

"দিঁদিঁ! দিঁদিঁ কই? দিঁদিঁর কাঁছে দুঁধ খাঁব।"

ওঃ, রুবাই! ঘুম ভাঙলে আর এক মিনিট শান্তি পাবে না। দিদি যেই বাড়িতে ঢুকল, তো শুরু হয়ে যাবে দিদি কই, দিদি কই। রুবাই দৌড়ে বারান্দা থেকে ঘরে পালিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়।

*

হাদিগুলোও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে। ঠিক ঘুমোচ্ছে না, কিন্তু জেগেও নেই। থাকবে কেমন করে? তাদের কি কেউ খেতে দেয়? ঘুমন্তপুরীতে সবাই তো ঘুমোচ্ছে। হাতিরা খিদেয় রোগা হয়ে গেছে। সরু হয়ে গেছে। তাদের হাড়পাঁজরা জিরজির করছে, ওই রামধনিয়ার গরুদের মতো। কতদিন খেতে পায়নি! রোগা রোগা হাতি। সরু সরু হাতি। দেখলেই কান্না পায়। আহা, ওদের খুলে দিলেই ওরা বনে গিয়ে চরে খেতে পারে। কিন্তু শক্ত শেকলে করে বেঁধে রেখেছে যে ওদের! বাইরেটা সুন্দর হলে কী হবে, রাজবাড়িটাতে কোনও শ্রী নেই। ফাঁকা ফাঁকা উঠোন, ঘাস নেই। উড়নচণ্ডে বাগান, ফুল নেই। ন্যাড়া ন্যাড়া গাছ। ফল নেই। গাছে নতুন পাতা পর্যন্ত নেই। না আসে পাখি, না প্রজাপতি, না ভ্রমর, না কাঠবেড়ালি। ঘাসই নেই, পোকামাকড়, ফড়িংটড়িং যে আসবে, তারা থাকবে কোথায়? খাবে কী? রাজবাড়িটা পেল্লায়, ধবধবে সাদা পাথরে রোদ পিছলে পড়ছে। কিন্তু কোনও ছিরিছাঁদ নেই। একটিও জনপ্রাণী, কুকুর, বেড়াল পর্যন্ত চোখে পড়ে না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পেতলের কবজা-আঁটা চওড়া লোহার পাত-আঁটা কালো কাঠের তোরণদুয়ারগুলো সবসময়ে হাট করে খোলা। যার খুশি ঢুকে যেতে পারে। কিন্তু ঢোকে না কেউ। ওখানে যে ডাইনিখোকার মায়াজাল বিছানো আছে। জীবজন্তুরা ঠিকই মনে মনে টের পেয়ে যায় কোথায় ডাইনিখোকার মন্তর পড়া। শুধু মানুষগুলোই ঠকে। ডাইনি-খোকার চোখ অজগর সাপের মতো, ভয়ঙ্কর। ওই চোখে চোখ পড়লেই, ব্যস! ডাইনিখোকা এক নিমেষে তার বিষমন্তর দিয়ে তোমাকে বশ করে নেবে। উড়ন্ত কালো ঘোড়ায় চড়ে সে হুশ হুশ করে উড়ে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে। তার কাজই কেবল মানুষজনকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া, অকস্মাত করে ফেলা। জীবজন্তুরা এসব খবর জানে, তাই তারা ওর ফাঁদে পড়ে না। ডাইনি-খোকার কপালের ওপর জটাজুট ঝুলছে। তার ভেতরে চোখদুটো গরম লোহার ভাটার মতো ঘুরছে। আর নাকটা? উঃ! নাকটা ঠিক টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো। বেঁকেচুরে ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বিচ্ছিরি চেহারা ডাইনিখোকার—ভীষণ কঠিন, নিষ্ঠুর। নির্মম মতন। অনেকটা ঠিক ওই কাপালিকদের যেমন দেখতে হয় তেমনই আর কী!

'রুবাই,' মা ডাকলেন, 'রুবাই! এ কী! স্কুল থেকে এসেই শুয়ে পড়েছ খাটে? জামাকাপড় বদলে হাতমুখ ধুয়ে খাবে এসো। 'দিদি, দিদি' করে বুবাই কত ডাকল তোমাকে। খেলতে যাবে না? বুবাই রেডি হয়ে গেছে কখন।'

না। খেলতে যাবে না রুবাই। খেলতে গেলেই বড্ড ঝগড়াঝাঁটি হয়ে পার্কে। বান্টু ভীষণ ঝগড়া করে, বিশেষ করে রুবাইয়ের সঙ্গে। রুবাই ওদের থামাতে পারে না। বুবাইটা কেবল ছুটে আসে, 'দিদি, দিদি' করে। রুবাই বেচারি তখন কী করবে? রোগা হলে কী হবে, লম্বা বলে বোধ হয় বান্টুর গায়ের জোর বেশি আর স্বভাবটাও বেজায় বুনো, অবাধ্য। এমনকী বয়সে বড় রুবাইকেও মাঝে মাঝে এমন খ্যাপাতে শুরু করে দেয় বান্টু যে, অস্থির হয়ে

বুবাইকে নিয়ে বাড়িতে পালিয়ে আসতে হয় রুবাইকে। বুবাইকে রোজ কাঁদায়, তবুও বোকা বুবাইটা রোজই খেলতে যেতে চায়। রুবাইয়ের খুব খারাপ লাগে। বুবাই বাড়িতে থাকতে ভালোবাসে না। রোজ রোজ বিকেলবেলায় ওর পার্কে যাওয়া চাই-ই। কিন্তু রুবাইয়ের ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটি, মারামারি ভীষণ বিশ্রী লাগে। বান্টুকে সামলানো পার্কে কারও কম্ম নয়, সে একটা দুর্দান্ত অবাধ্য বুনো ঘোড়ার মতো ছেলে। এত মারধোর খায় জেঠুর কাছে, এত শাস্তি পায় স্কুলে সারদের কাছে, তবু তার শিক্ষা হয় না। বান্টুর মা-বাবা নেই কিনা? পার্কে যেন তারই একচ্ছত্র রাজত্ব, সেখানে জেঠু নেই, সারেরা নেই।

রুবাই তার চেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে গল্প বানাতে পছন্দ করে। কিংবা নিজের খাটে শুয়ে-শুয়ে চোখ বুজে সিনেমা দেখতে। সিনেমাটাও নিজে নিজেই বানিয়ে নেয় রুবাই। বুবাইকে গল্প বলতেও খুব ভালোবাসে রুবাই। কিন্তু বুবাই যে গল্প শুনতে চায় না সবসময়ে। ওর মারামারিই পছন্দ। আর রুবাইয়ের গল্পে তো মারামারি নেই। রুবাইয়ের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় বান্টুকেই বুবাই বেশি পছন্দ করে কি না? বান্টু বয়সে রুবাইয়ের কাছাকাছি। তবু কেন যে ও ছোট ছেলেদের মারধোর করে, রুবাই বুঝতে পারে না। বান্টুর মা-বাবা থাকলে ও বেচারি নিশ্চয় এমন করত না। বান্টু যে জেঠিমার কাছে থাকে।

'রুবাই!' এবার মার গলা রাগী রাগী।

'যাই মা!' রুবাই ছোটে।

বুবাই-বান্টুরা ফুটবল খেলছে। রুবাইয়ের বন্ধুরা ওপাশে ব্যাডমিন্টন খেলছে। রুবাই খেলছে না। রুবাই দেখছে। খেলা দেখছে বলেই মনে করছে সবাই, কিন্তু রুবাই আসলে খেলা দেখছে না। রুবাই দেখছে নীল, বেগুনি আকাশে কমলা রঙের সূর্য। গোল একটা বেলুনের মতো ভেসে আছে। ফুলকো-ফুলকো রেশমি মেঠাইয়ের মতো গোলাপি, বেগুনি, কমলা রঙের হালকা-হালকা মেঘ, নীল বেগুনি সরু সরু চিলতে চিলতে ডুরে ডুরে মেঘ আকাশময় ভেসে বেড়াচ্ছে, কিরি কিরি কাটা ছুরির ধারের মতো কোনও কোনও মেঘের ধারগুলো যেন কিরি কিরি, কালো পুঁতির মালার মতো,—না, পুঁতি না, পদ্মফুলের বিচির মালার মতো সারি-বাঁধা পাখি উড়ে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে, কিচিরমিচির ডাকতে ডাকতে। 'ব-লা-কা' কি ওকেই বলে? বলাকা তো বকের সারি। বক তো সাদা রঙের। এরা তো সবই কালো রঙের পাখি। তবে? এরা তবে বোধ হয় বক নয়। হাঁস। সুবচনির সেই খোঁড়া হাঁসের মতো। উড়োহাঁস। বালিহাঁস। কাছ থেকে ওদের কেমন দেখতে কে জানে? কমলা রঙের সূর্য পশ্চিম দিকের নীল সরোবরে ভেসে আছে। ভেসে নেই, ডুবে যাচ্ছে। রোজ সূর্য ডুবে যায়। কিন্তু রোজ সূর্য ভেসে ওঠে না, শুধুই ওঠে। যা ডোবে, তাকে তো ভাসতে হবে আগে? কী জানি! চাঁদ, সূর্য, তারা—এরা সবাই কত লক্ষ লক্ষ যোজন যোজন মাইল দূরে। অথচ আলোটা কত কাছে। কী আশ্চর্য, না? এই আলো যেন টেলিফোনের মতো। দূরে, কিন্তু কাছে। উঃ, পিঁপড়ে! এই যে পিঁপড়েদের লাইন! লাইনটা, রুবাই ভাবে, এটাও তো মাটির তলা দিয়ে কত দূরে চলে যাচ্ছে। এটা পিঁপড়েদের বিশাল রাজ্যের হাইওয়ে, গ্রান্ড

ট্যাঙ্ক রোড। নীচে পিঁপড়েদের শহর আছে, অফিস আছে, কেল্লা আছে, কারখানা আছে, রাজারানি আছে, রাজার বাড়িও নিশ্চয় আছে, শ্রমিক আছে, মিস্ত্রিটিস্ত্রি সবই আছে। কী জানি স্কুল-কলেজও আছে কি না? পিঁপড়েদের সিনেমা হল, পিঁপড়েদের রেস্টুরেন্ট—আর পিঁপড়ে-বাচ্চারা খেলা করবে বলে এইরকম পার্কও থাকতে পারে, সুড়ঙ্গ দিয়ে লুইস ক্যারলের সেই অ্যালিসের মতো যদি ঢুকে যাওয়া যেত! ইস, সে তো আর হওয়ার নয়। যাক গে!

সেই গহন অরণ্যের গল্পটায় সাতটা হাতি বাঁধা পড়ে আছে। ভুখা ভুখা রোগা রোগা হাতি, সেই গল্পটার শেষকালে, হাতিগুলোকে রাজকন্যা এসে খুলে দেবে। অনেক কলাগাছ এনে তাদের পেটভরে খেতে দেবে। দুঃখী হাতি থেকে তারা আবার মোটা মোটা খুশি হাতি হয়ে যাবে—কিন্তু ডাইনি খোকা, তার কী হবে? তাকে, তাকে—নাঃ, রুবাই, কাউকেই মেরে ফেলার কথা ভাবতে পারে না। অত যে দুষ্টু ডাইনি খোকাটা, তাকেও না। ওকেও দুষ্টুমি সারিয়ে ভালো করে ফেলতে হবে। ও আর মন্দ ছেলে থাকবেই না। মন্দ না থাকলেই ওকে আর মরতে হবে না। কেন সব্বাইকে ঘুম পাড়াত ও? কেন অমন দুষ্টুমি করত? সব রাজ্যসুদ্ধু লোককে অকম্মা বানিয়ে দিত? কেন না একটা দুষ্ট রাক্ষস এসে যে ওর বাবা-মা দুজনকেই ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন খুব ছোটবেলায়—আর ওকে একটা চিলেকোঠায় মন্ত্র পড়ে ডাইনি বানিয়ে ফেলেছিল। সেই রাক্ষসের পাড়ানো কালঘুমটা আর ভাঙেনি। ওর বাবা-মা মরেই গেছেন। ওইজন্যই তো ডাইনি ও খোকা বিশ্বসুদ্ধু সবাইয়ের ওপর রাগতে শুরু করেছে। সবাইকেই ধরে ধরে জাদুবন্দি করে রাখছে। জাদুবন্দি থাকার সময়ে মানুষের খিদেতেষ্টা থাকে না, দশ বছর ঘুমোলেই সেটা কালঘুম হয়ে যায়। আর ভাঙে না। শুধুই ঘুম পায়। হাতিরা তো মানুষ নয়, তাই ওদের খিদেও আছে, তেষ্টাও আছে। বড় তোরণের বাইরে মস্তবড় শ্বেতপাথরের পদ্মফুল, ফোয়ারাতে জল উপচে পড়ছে দিনরাত। কিন্তু সেই জলে ডাইনি-খোকার সর্বনাশ! বুড়ো ডাইনির বিষমন্ত্রে এই বনে কোথাও একফোঁটাও জল নেই। তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও উপায় নেই, তেষ্টায় পাগল হয়ে লোকে এসে প্রাণভরে ওই মন্ত্রপড়া জল খায়। আর ওই জলটা খেয়ে কত পথহারা পথিক যে লাল-নীল নুড়িপাথর হয়ে আছে! তারা ওইরকম নুড়ি হয়ে ওই জলের মধ্যেই পড়ে আছে। কিন্তু কেউ যদি তাদের বের করে মাটির ওপর রাখে, তখনই তারা আবার মানুষ হয়ে যাবে, কিন্তু কেউ যে সেকথা জানে না!

রাজবাড়ির মধ্যে রাজা আছেন। সিংহাসনে ঘুমন্ত। সভায় বসে। পাশে মন্ত্রী, ঘুমন্ত। সভাসদরা সবাই সেজেগুজে সভায় বসে গম্ভীর হয়ে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। রানি তাঁর সখীদের সঙ্গে ঝুলবারান্দায় বসে রোদে চুল শুকোতে শুকোতে ঠাট্টা মজা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এক বারান্দা সুন্দরী মেয়ে হাসিমুখে ঘুমিয়ে আছে ঝুলবারান্দার চন্দ্রাতপের নীচে। চন্দ্রাতপ কথাটা খুব সুন্দর। রুবাইয়ের খুব ভালো লাগে। রাজারানির একমাত্র মেয়ে 'বনহরিণী'। রাজকন্যা বনহরিণী এখানে নেই। তার স্কুলে দূরে পাহাড়ের ওপরে এক বোর্ডিং স্কুল। রুবাইয়ের দাদা টুবাই যেমন খড়্গাপুরে আই আই টি-তে বোর্ডিংয়ে থাকে, তেমনই। সে বেচারি জানেও

না এদিকে তার মা-বাবার বাড়িতে কী ভয়ানক সব কাণ্ড হয়েছে! বনের মধ্যে রাজবাড়িতে ডাইনিখোকা এসে সব লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে। সে বাবাকে চিঠি লেখে। সে মাকে চিঠি লেখে। কিন্তু কেউই উত্তর দেন না। দেবেন কী? চিঠিপত্র তো সব বাইরের তোরণের সামনে মস্ত রুপোর চিঠির বাক্সতে জমা হচ্ছে এক বছর ধরে। সেই পুজোর ছুটিতে...

'বান্টু, এই বান্টু, বুবাইকে শিগগির ছেড়ে দাও বলছি।' হঠাৎ রুবাই চেঁচিয়ে ওঠে। তার চোখ পড়ে যায় বান্টু বুবাইকে মাটিতে ফেলে বুকের ওপরে চড়ে বসেছে। বুবাই দুহাতে বল আঁকড়ে আছে। রুবাই দৌড়ে গিয়ে ছাড়িয়ে দেয়। বুবাই এবার কান্না শুরু করে। বান্টু ওর বলটা কেড়ে নিয়েছে।

'নেয় নি গে, বুকে লাগেনি তো তোমার? আর একটা বল কিনে দেব সোনা, তোমাকে ও বলটা দিয়ে খেলতে হবে না।' রুবাই ভাইকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু বলটা তো বান্টুর নয়। বুবাইকে বড়মামুর দেওয়া জন্মদিনের উপহার। বুবাই দেবে কেন? সত্যি কথাই! 'বান্টু, বলটা ফেরত দাও। ওটা বুবাইয়ের জন্মদিনের পাওয়া।' বান্টু কথা কানেই তোলে না। তার ভারী বয়ে গেছে। বলটা বাউন্স করাতে করাতে মাঠের ও-প্রান্তে নিয়ে পালিয়ে যায় বান্টু। পিছু পিছু রুবাই দৌড়োয়। কাঁদতে কাঁদতে বুবাই দৌড়োয়। চিতু, জোজো, খোকন, সকলেই দৌড়োয়। 'বান্টু, বলটা দিয়ে দাও বলছি!'

রাজকন্যে বাড়ি ফিরছেন। ছুটতে ছুটতে এসে দরজায় দেখেন, এ কী! ফুলের মালা নেই, আম্রপল্লব নেই, তোরণ সাজানো হয়নি। তোরণে সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, বাজনা বাজছে না, তোপ পড়ছে না, আর রোগা রোগা হাতিটি শিকলি বাঁধা, দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। তবু রাজকন্যেকে দেখেই শুঁড় তুলে 'বৃংহতি ধ্বনি' করে সে জানান দিল অন্য হাতিদের যে, রাজকন্যে বাড়ি এসেছেন। হাতির চেহারা দেখে তো রাজকন্যের কান্না পেয়ে গেল। 'ওগো শ্যামপিয়ারি, কী করে তুমি রোগা হলে? পাঁজরের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, অস্থিপঞ্জরসর্বস্ব? এত দুর্বল, যেন দাঁড়াতে পারছ না?'

রাজকন্যে হাত বুলিয়ে দিলেন শ্যামপিয়ারির গায়ে। হাতির ছোট ছোট চোখ দিয়ে টপটপ করে বড় বড় জলের ফোঁটা পড়ল। রাজকন্যে হাতির পা থেকে শিকলি খুলে দিলেন। অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার মাহুত কোথায়? তোমার কী অসুখ করেছে শ্যামপিয়ারি?'

আর মাহুত! মাহুতরা তো পিলখানাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এক বছর ধরে। সাতজনেরই এক অবস্থা। দোরে দোরে গিয়ে হাতিদের প্রত্যেককেই রাজকন্যে খুলে দিলেন। একটা বিশাল দাঁড়কাক এসে সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে রোগা হাতিটাকে ভীষণ বিরক্ত করতে লাগল। ঠুকরে ঠুকরে পাগল করে দিচ্ছে বেচারিকে। রাজকন্যে দেখলেন ফোয়ারাতে জলের পাত্রভরতি অজস্র রঙিন নুড়ি পাথর। একটা রামধনু রঙের নুড়ি তুলে যেই কাকটার দিকে ছুঁড়ে মেরেছেন,

কাক তো উড়ে গেল। কিন্তু মাটিতে খাড়া হয়ে গেল একজন কাঠুরে। কাঁধে কুঁড়ুল। কোমরে গামছা। বাতাস ফুঁড়ে বেরোল না কি?

'আরে! তুমি আবার কোথা থেকে এলে?'

'আমি? ওই নুড়ি থেকে।'

রাজকন্যে তো অবাক!

'মানে?'

তখন কাঠুরে সব ব্যাপার রাজকন্যেকে খুলে বলল। যেই সে মন্ত্রপড়া জল খেয়েছে, আর ম্যাজিকের চোটে নুড়ি হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই ডাইনিখোকার মন্ত্রের খবরও সমস্ত মনে-মনেই জানতে পেরে গেছে। জাদুমন্ত্রে তেমনই নিয়ম। ডাইনিখোকা এখন অন্য একটা দেশে। কিন্তু প্রত্যেক পূর্ণিমার রাত্রে সে এসে নতুন করে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে যায়, কেন না দিনে দিনে জাদুমন্ত্রের জোর ক্রমশ কমে আসে।

পূর্ণিমার আর মোটে একদিন বাকি। ডাইনির আসার সময় হয়েছে। কাঠুরে বলল, 'জলের এই সমস্ত নুড়িরাই পথভোলা মানুষ। ওদের জল থেকে বের করে শুকনো মাটিতে রাখলেই জাদু কেটে যাবে।'

তখন রাজকন্যে আর কাঠুরে মিলে জল থেকে রঙিন নুড়িগুলো সব বের করে শুকনো ধুলোয় ফেলল। আহা, কতরকমের মানুষই যে হল! তারা সবাই প্রাণ ফিরে পেয়ে দু'হাত তুলে রাজকন্যেকে আশীর্বাদ করতে করতে যে যার বাড়িতে—

'রুবাই, আবার শুয়ে পড়লে, না খেয়ে? বুবাই পর্যন্ত জেগে আছে, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে? ছি-ছি, তুমি না দিদি?'

রুবাই মোটেই ঘুমোয়নি। কিন্তু মাকে সে কিছু বলে না। বলে লাভ নেই। চোখ বন্ধ করে আছে যখন, তখন মা তো বলতেই পারেন। এবার উঠে খেতে বসতে হবে। ন'টা বাজে। মা কিছু জানেনেই না রুবাই কী করছে!

ডাইনিখোকা আসছে। হুশ-হুশ করে শব্দ হচ্ছে তার উড়ন্ত ঘোড়ার কালো ডানার। জ্যোছনায় বনে যেন বান ডেকেছে। কাঠুরে বলেছে ডাইনির নিজের জাদুমন্ত্র যে-জলে মাখানো আছে—সেই জলটা তার গায়ে হাতির শুঁড় দিয়ে ছিটিয়ে দিলেই তার ডাইনি-মন্তর সব নষ্ট হয়ে যাবে। সেই ভয়েই তো হাতিদের ওই অবস্থা করেছে। পাছে ওরা গায়ে জল দেয়, তাই তো হাতিদের সে বেঁধে রাখত। রাজকন্যা এদিকে তোরণের হাতিদের শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছেন কালকে কী করতে হবে। কালো ঘোড়া থামল। ডাইনিখোকা তার জটা দুলিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে দেখে, তোরণের দরজা বন্ধ। আরে, দরজা কেন বন্ধ? অবাক হওয়া মাত্রই ঝুপ্পুস করে

তার গায়ে সাত পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল যেন। সাত-সাতটা শুঁড়ভরতি মন্ত্রপড়া জল নিয়ে ডাইনি খোকার গায়ে হাত আর উড়ন ঘোড়ার গা-ময় ছিটিয়ে দিয়েছে।

অমনি বনের ভেতর একটা বিদ্যুৎ চমকানির মতো জোর আলোর ঝলক উঠল, আর ডাইনির সমস্ত জাদুমন্ত্র সেই মুহূর্তে ফুস করে কেটে গেল। চোদ্দোটা মিনারের মাথায় আঠাশ ঘুমন্ত সেপাই জেগে উঠে একসঙ্গে গর্জন করে উঠল, 'কে যায়! কে যায়? কে যায়?'

'খবর্দার!'

সেও যেন বাজ পড়ার মতো শোনাল, এমনই নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজপুরী।

জেগে উঠল দরজার পাশে বৃদ্ধ প্রহরী। রাজকন্যেকে দেখে সে হেসে বলল, 'আরে রাজকন্যে বনহরিণী, কখন ইস্কুল থেকে এলে ভাই? তোরণ যে এখনও সাজানো হয়নি? তোপও তো দাগা হল না?' বলতে বলতে প্রহরী দৌড়ে তোপ দাগতে গেল। রাজকন্যে বাড়ি আসার দিনে এটা নিয়ম কি না? তোপের শব্দে রাজসভায় রাজা জেগে উঠে বললেন, 'মন্ত্রী, তোপ কেন দাগল? ব্যাপার কী? আমরা কি কোনও যুদ্ধ জিতলাম?'

তোপের শব্দে ঝুলবারান্দায় রানি জেগে উঠে বললেন, 'সখী, তোপ কেন দাগল? ব্যাপার কী? রাজকন্যে বনহরিণীর কি তবে ঘরে আসার দিন আজকে?'

তোপের শব্দে ডাইনিখোকার কানে তালা লাগল। তার জাদুর ঘোড়া কাগজের ঘোড়া হয়ে মাটিতে চ্যাপটা হয়ে পড়ে গেল। ডাইনিখোকা দুহাতে কান চেপে ধরে চোখ বুজে কাঁদতে-কাঁদতে মাটিতে বসে পড়ল। সে তখন একটা কোঁকড়া চুলের, টিকলো নাকের, বড় বড় চোখের রোগা লম্বা, ছোট ছেলে হয়ে গেছে। তার মা নেই। তার বাবা নেই। রাক্ষসের পুষ্যিপুত্তুর হয়ে সে এরকম রাক্ষুসে ডাইনি-মন্তর শিখে ডাইনি সেজেছিল। জাদুমুক্তির মুহূর্তে সবকিছুই ভুলে গেছে। তার মার জন্য, বাবার জন্য মন কেমন করছে। রাজকন্যে বনহরিণী তাকে হাত ধরে দাঁড় করালেন। অনেকটা বান্টুর মতো দেখাচ্ছে ছেলেটাকে।

'তোমার নাম কী?'

'বনপাহাড়ি।' সে বলল।

'তোমার দেশ কোথায় বনপাহাড়ি?'

'নেই।'

'তবে তুমি এইখানেই থাকো।' রাজকন্যে ভাবলেন রাজবাড়িতে তো এতদিন কোনও রাজপুত্তুর ছিল না। এবার থেকে—

'রুবাই, রুবাই, এখনও শুলে না?' মা তাড়া লাগাচ্ছেন।

'কী করছ তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে, অন্ধকারে? বারান্দাতে? ঘরে এদিকে আলো জ্বলছে, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো শিগগির। কাল সকালে স্কুল আছে। না?'

'যাই, মা।' রুবাই নিজের মনে একটু হেসে ঘরে এসে আলো নিভিয়ে দেয়।

'গুডনাইট, বনপাহাড়ি। সুইট ড্রিমস।'

ভালো করলেই মন্দ হবে

এক দেশে এক পণ্ডিতমশাই থাকতেন। পণ্ডিতমশাইয়ের একটিমাত্র মেয়ে ছিল। সেই মেয়েও প্রায় বিদ্যালংকারের মতো পণ্ডিতানি হয়ে উঠেছিল। মাত্র তেরো-চোদ্দো বছর বয়েসেই! পণ্ডিতমশাই তাকে কার কাছেই বা রেখে টোলে আসবেন? তার তো মা নেই। পণ্ডিতমশাই নিজেই দুটো আতপ চাল, আলুসিদ্ধ ফুটিয়ে নেন, বাপেতে মেয়েতে খান। কিংবা দই-কলা-চিড়ে-গুড় দিয়ে ফলার করেন। সাধ্যমতন মেয়েকে খুব যত্ন করেন বাবা। মেয়ে যখন বছরদশেক হল তখন থেকে সে-ও শুরু করল বাবার জন্য ভাত ফোটাতে, আর ফলার মাখতে। পড়াশুনো নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন দুজনেই।

একদিন পণ্ডিতমশাই রাজসভায় নিমন্ত্রণ পেলেন। সেখানে দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের নিয়ে মস্ত বড় এক আলোচনা সভা বসেছে। ব্যাকরণ আর ন্যায় নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিতর্ক হবে।

যিনি জিতবেন, রাজামশাই তাঁকে পুরস্কার দেবেন।

নিমন্ত্রণ পেয়ে পণ্ডিত চললেন, কিন্তু তাঁর টোল খোলা রইল, তাঁর মেয়েই টোলের ছাত্রদের পড়াতে পারে এখন।

বনের পথে পণ্ডিতমশাই দেখলেন একটা সুন্দর সোনালি রঙের সাপের সঙ্গে এক নেউলের লড়াই হচ্ছে। সে কী ভীষণ লড়াই! উনি আর এগুতেই পারছেন না। নেউলের পরাক্রমে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত সাপটা নেতিয়ে পড়ে, যখন মরো-মরো অবস্থা, তখন পণ্ডিতমশাই আর পারলেন না, হাতের ছড়িটা দিয়ে নেউলের মাথায় ঠাঁই করে এক ঘা

বসিয়ে দিলেন। আর অমনি নেউলেটাও জিব বের করে অক্কা পেয়ে গেল।

পণ্ডিতমশাই চলে গেলেন তাঁর রাজসভাতে, মরো-মরো সাপটার গায়ে তাঁর ঘটি থেকে জলের একটু ছিটে দিয়ে, যাতে তার একটু আরাম হয়।

বিশাল জনসভা। হইহই কাণ্ড। রইরই ব্যাপার। কত দেশ থেকে কত পণ্ডিত এসেছেন, কী ভয়ানক তর্কই না জুড়ে দিলেন তাঁরা সকলে মিলে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের পণ্ডিতমশাইয়ের বিতর্কে জিৎ হল। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আর চমৎকার কারুকার্য করা শালটি নিয়ে মেয়ের জন্য আর ছাত্রদের জন্য এক পুটুলি সন্দেশ, আর একহাঁড়ি রাজভোগ সমেত, পণ্ডিতমশাই তো খুশি মনে বাড়ি ফিরবেন। আবার পথে সেই বন পড়ল, বনের পথের ঠিক মাঝখানে দেখেন সেই সোনালি সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। পণ্ডিতমশাইকে দেখেই ফণা তুলে ফোঁস করে তেড়ে এল। পণ্ডিতমশাই বললেন, 'আরে আরে? আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?'

সাপ বললে, 'চিনতে পারব না কেন! তুমিই তো সেই পণ্ডিতমশাই, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে তো একমাস আগে! নেউলকে মেরে!'

'তবে? তবে? এই কি তোমার উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন?'

'উপকারীর অপকার করাই হচ্ছে আমাদের এই বনের নিয়ম। আমি আমাদের নিয়মমাফিক কাজই করছি। কৃতজ্ঞ নই কে বললে? কৃতজ্ঞ নিশ্চয়ই। কিন্তু অপকার করাটা আমাদের কর্তব্য। তা ছাড়া আমি ক্ষুধার্ত।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাপ, তুমি বরং এই এক হাঁড়ি রাজভোগ, আর এই একথালা সন্দেশ খাও। আমি বৃদ্ধ, নেহাতই নীরস নৈয়ায়িক, আমি কি তেমন স্বাদু খাদ্য?'

সাপ বললে, 'স্বাদ-বিস্বাদ বুড়ো-ছোঁড়া বুঝি না আমরা। তুমি উপকার করেছ, আমি তোমাকে খাবই খাব! সেদিন নেহাত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, তাই পারিনি। নইলে তোমায় সেদিনই খেতুম।' বলেই হাঁ করল। তখন পণ্ডিত বললেন, 'কিন্তু এই যে আমি তর্কযুদ্ধে জিতে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আর শালটা উপহার পেয়েছি, আমার মেয়েকে গিয়ে সে সব দিতে হবে না? তুমি বাছা তিনদিন অপেক্ষা করো বরং। আবার আমি ফিরে আসছি।' সাপ বললে, 'তা হলে, রাজভোগের হাঁড়ি আর সন্দেশগুলো রেখেই যাও। তিনদিন ওতেই চালিয়ে দিই। নিশ্চয় ফিরে এসো কিন্তু।'

পণ্ডিতমশাই তাতে রাজি হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়িতে পণ্ডিতের জয়ের খবর শুনে মেয়েও খুব খুশি, ছাত্ররাও খুব খুশি। কিন্তু পণ্ডিতমশাই কেমন মনমরা। মেয়ে বললে, 'বাবা, তুমি এত বড় সম্মান জিতে এসেছ, কোথায় আনন্দ করবে, মিষ্টিমুখ করাবে সবাইকে, তা নয় মুখ যেন হাঁড়ি। কী ব্যাপার?' পণ্ডিত বললেন, ''মিষ্টিমুখ তো সেই ময়াল সাপকে করিয়ে এসেছি। এবার যাব তার ছ'মাসের মতো ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে। মা সুলক্ষণা, এইবার থেকে এই টোল তুমিই চালাবে। আমি আর ফিরব না। আমি চললুম।'

সুলক্ষণা তো অবাক! 'কেন? কেন? কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?' পণ্ডিত তখন খুলে বললেন ব্যাপারটা কী। শুনে একটু ভেবে, সুলক্ষণা বললে, 'ঠিক আছে—বাবা আমিও যাই চলো। দেখি কী করতে পারি।' বলে সুলক্ষণা একখানা ধারালো রামদা, মানে মস্ত

বড় একটা কাটারি, যা দিয়ে গাছ পর্যন্ত কাটা যায়, আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে বনে চলল বাবার সঙ্গে। বনের মধ্যে ময়াল সাপ বসে আছে। পণ্ডিতকে দেখেই আকাশপাতাল জোড়া হাঁ করে, লেজ দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল তাঁকে।

সুলক্ষণা তাড়াতাড়ি বললে, 'বোসো বোসো, সাপমশাই। বলি, এত তাড়া কীসের? পেটে তো এখনও রাজভোগ আছে। সাতজন্মে, এত বড় বিশ্ব পৃথিবীতে কোথাও শুনিনি, যে কোথাও ধর্ম বলে 'উপকারীর অপকার করো।' তুমি মহাপাপী হবে। তা জানো কি?'

সাপ বললে, 'শোনো। আমি কোনওই পাপ করছি না। যে দেশের যা নিয়ম। এই বনের বাসিন্দাদের এটাই ধর্ম। বিশ্বাস না হয় ওই বৃদ্ধ বটগাছকে জিগ্যেস করো। জানতে পারবে কেন এ কথা বলছি।' সুলক্ষণা বৃদ্ধ বটগাছকে গিয়ে প্রশ্ন করল। বটগাছ বললে, 'হ্যাঁ। সত্যিই আমরা এই বনে এইরকমই আইন করেছি। অনেকদিন আগে একজন চোর অনেক গয়নাগাঁটি চুরি করে পালাচ্ছিল। আমার পাশের গাছটি ছিল সত্যকালের অশ্বত্থগাছ। তার বুকে ছিল এক মস্ত কোটর। চোরের পেছু পেছু রাজার পেয়াদারা ধাওয়া করেছিল। চোর বললে কেঁদে, হে সত্যকালের অশ্বত্থবৃক্ষ, আমি তোমার আশ্রয়প্রার্থী, আমাকে একটু আশ্রয় দাও। রাজার পেয়াদা যেন আমাকে দেখতে না পায়।' অশ্বত্থগাছ তখন কোটরের মুখটা বন্ধ করে দিলে। রাজপেয়াদারা আর চোরের নাগালই পেল না। পেয়াদারা চলে গেলে, চোর বেরিয়ে চলে গেল তার ধনরত্ন নিয়ে। কিন্তু একটি খুব বড় মণি অশ্বত্থগাছের কোটরের ফাঁক দিয়ে গলে শিকড়ে ভেতরে পড়ে গিয়েছিল। সেই চোরটা এত লোভী, যে পরে আবার ফিরে এল ওই মণিটাকে উদ্ধার করবার জন্যে। অশ্বত্থগাছের শিকড় গুঁড়ি সব কেটে ছারখার করে সে মণি উদ্ধার করল। তার অত্যাচারে অশ্বত্থ বেচারা মরেই গেল। সেই থেকে আমরা ঠিক করেছি উপকারীর অপকার করব। করতে হয়। সাপের তুমি প্রাণ বাঁচিয়েছ। এখন এই বনের আইনে সাপ তোমাকে খেয়ে ফেলতেই পারে। তাতে ওর কোনও দোষ হবে না।' শুনে সুলক্ষণা বললে, 'গাছদাদু, সাপদাদু, এই তো দিব্যি বোঝা গেল যে আপনারা যুক্তিযুক্ত ব্যাপারই করছেন। তবু, সহ্য করতে তো কষ্ট হয়? আমার বাবা চলে গেলে আমি অনাথ হয়ে যাব। এত বড় পৃথিবীতে একলাটি থাকব কেমন করে? আমাকে কে দেখবে, আমিই বা কাকে দেখব?' রাজভোগ খেয়ে তৃপ্ত সাপের তখন মায়া হল। সাপ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'তোমাকে দেখাশুনো করতে আমিই না হয় তোমাকে বিয়ে করে ফেলেছি। তোমার আর ভাবনা নেই।' মেয়ে বললে, 'বেশ, তবে আগে বাবা তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করুন। তারপর বরং তুমি বাবাকে খেয়ো। কেমন?'

পণ্ডিত তো মেয়ের কথাবার্তা শুনে থ। বেচারি তখনও বন্দি, সাপের পাকে পাকে জড়ানো, নট নড়চড় নট কিচ্ছু অবস্থা। কিছুই করবার উপায় নেই। কিন্তু সাপ আস্তে আস্তে তাঁকে পুরোপুরি মুক্ত করে দিলে। তখন পণ্ডিতের মেয়েটি বনফুল তুলে দুটি চমৎকার গোড়ে মালা গেঁথে আনল। ময়াল সাপকে একটা দিল, একটা নিজে রাখল।

তারপর কাঠ সংগ্রহ করে এনে হোমের আগুন জ্বালল। বলল, 'বাবা, তাহলে আমার বিয়েটা এবার দিয়ে দাও?'

পণ্ডিত আর কী করেন! চোখের জলে মন্ত্র পড়ে সাপের হাতেই কন্যা সম্প্রদান

করলেন। তখন জোর গলায় মেয়ে বললে, 'হে সত্যকালের বটবৃক্ষ! দেখলে তো, তোমার বনের সাপ কত ভালো? আমার বাবাকে খেয়ে ফেলবার আগে তাঁর কন্যাদায় উদ্ধার করে দিল। এবার তাহলে তোমাদেরই বনের আইন অনুযায়ী আমিও আমার কাজটা করি?' বলেই তার রামদা বের করে সাপের সোনালি গায়ে বসিয়ে দিলে মোক্ষম এক কোপ। সাপ গেল দু-টুকরো হয়ে দুদিকে ছিটকে। খতম!

সুলক্ষণা বললে, 'হে সত্যকালের বটগাছ, তোমাদের বনের যেমন কানুন, সেই অনুযায়ীই আমি কাজ করেছি। তোমাদের নিজের দোষেই সাপের প্রাণটা গেল। তোমার উলটো কানুন চালু করেছিলে। একজনের দোষে কি আর একজনের শাস্তি হয়? তোমরা যা জানতে না, সেই চোর তার পরেই পেয়াদাদের হাতে ধরা পড়েছে, এখনও পচছে সে জেলখানাতে। অন্যায় করলে একদিন না একদিন তার শাস্তি হয়। আর উপকারীর অপকার করা সব যুগেই মহাপাপ।' এই বলে সে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে গেল। আর সেই থেকে সেই বনের গাছপালা পশুপাখিরাও তাদের ওই উদ্ভট নিয়মটা ফের পালটে ফেলেছে।

উপকারীর ক্ষতি করবি?
শেষকালে ঠিক নিজে মরবি।।

শুক্তিমতী

মহাভারতে, কোলাহল নামে একটি পর্বতের কথা আছে। পর্বতের কোথায় শান্ত গম্ভীর স্বভাব থাকবে তা নয়, তার খাদে খাদে, গুহায় গুহায়, ঝরনার ঝিরিঝিরি, জলপ্রপাতের গুমগুম শব্দ, তার বনে বনে পাখিদের কলকাকলি, বাঁদরদের কিচিরমিচির, বাঘের গর্জন, হাতির বৃংহিত শোনা যেত, আর তারই প্রতিধ্বনি বাজত মালভূমিতে মালভূমিতে। তাই সেই পর্বতের নাম ছিল, কোলাহল।

কোলাহল পর্বতের বনভূমিতে একটি বিশেষ সম্পদ ছিল, একটি সুগন্ধী, সুমিষ্ট অমৃতফলের গাছ। দেবতারাও মাঝে মাঝে সেই অমৃতফল খেতে নেমে আসতেন। আর ছিল এক স্ফটিক নীল দিঘি। সেখানে ফুটত অম্লান পঙ্কজ। প্রতি দুই মাসে একটি করে ফুল ফোটে। দিঘিতলের পঙ্কে জন্মে সেই পদ্ম সূর্যের দিকে গ্রীবা তুলে দাঁড়ায়। স্বর্গ থেকে কিন্নরী অপ্সরীরা আসতেন সেই পুষ্প আহরণ করতে। অম্লান পঙ্কজে যে মালা গাঁথা হয় তার নাম বৈজয়ন্তী মালা। সেই মালাটি গাঁথতে দিনের পর দিন কেটে যায় বটে, কিন্তু মালার ফুল কোনওদিন শুকোয় না, সেই মালার মাদকতাভরা সৌরভ কখনও মৃদু হয়ে যায় না। তার বর্ণ একটুও মলিন হয় না। একদিন শুক্তিমতী নামে একজন পরম গুণবতী কিন্নরী স্বর্গ থেকে কোলাহল পর্বতে নেমে এলেন। নীলদিঘির জলে স্নান করে, চুল এলিয়ে, গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে তাঁর অম্লান পদ্মের মালাটি গাঁথতে বসলেন। কোলাহল পর্বত একদিন ধরে কত দেবদেবীকে দেখেছেন, এত অপ্সরি-কিন্নরী দেখেছেন, কিন্তু সেই যে সকালবেলায় নরম আলোয় এলোচুলে শুক্তিমতীকে দেখলেন আপনমনে বৈজয়ন্তী মালাটি

গাঁথতে, তাঁর মনপ্রাণ একেবারে মুগ্ধ মোহিত হয়ে গেল। কোলাহল এক সুপুরুষ যুবার রূপ ধারণ করে এসে বললেন, 'শুক্তিমতী, তুমি এই বৈজয়ন্তী মালাটি কার জন্য গাঁথছ?' শুক্তিমতী হেসে বললেন—'তা তো জানি না। যে নেবে, তারই। মালাটি তো শুধু গাঁথার আনন্দেই গাঁথছি, দেবার কথা এখনও ভাবিনি।'

কোলাহল তখন নতজানু হয়ে বসে শুক্তিমতীর সামনে বদ্ধ-অঞ্জলি পেতে বললেন, 'শুক্তিমতী, তোমার মালাটি আমার কণ্ঠে পরিয়ে দেবে?' শুক্তিমতী অবাক! তিনি বললেন, 'তুমি কে? আমার হাতের মালাটি প্রার্থনা করছ কোন সাহসে?' 'আমিই কোলাহল পর্বত। যার কোলে তুমি বসে আছ। তোমার মতো শ্রীময়ী কাউকেই আমি কোনওদিন দেখিনি, তুমি আমার পত্নী হবে? হিমালয়ের পত্নী যেমন মেনকা, তেমনি তুমি হবে কোলাহলের পত্নী শুক্তিমতী। আমরা দেবতাদের আশীর্বাদ পাব!' শুক্তিমতীর গাল দুটি গোলাপিই ছিল, এবার লাল টুকটুকে হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'আগে তো মালাটি গাঁথা শেষ হোক। সবে তো আরম্ভ করেছি।' তবু কোলাহল বললেন, 'সুমিষ্ট অমৃতফলের ভোগ সাজিয়ে দেব রোজ তোমাকে, পান করাব এই অম্লান পদ্মের মধুতে তৈরি সুরা। সূক্ষ্ম মেঘের হালকা শাড়ি জড়িয়ে দেব তোমার গায়ে। যা রেশমের চেয়েও নরম। বনের পাখিরা তোমাকে গান শোনাবে, হরিণরা হবে তোমার সখী, সিংহ তোমার দেহরক্ষী হবে, হাতি হবে তোমার বাহন। কিন্নরী শুক্তিমতী, তুমি কোলাহল পর্বতের বউ হবে। তারপরে মালাটি তুমি আস্তে আস্তে গেঁথো।' এত সব মিষ্টি বাক্য শুনে শুক্তিমতীর লজ্জা করছিল, তিনি চোখ তুলে কোলাহল নামে রূপবান যুবকটিকে দেখলেন। আপত্তির কিছুই তাঁর চোখে পড়ল না। আধখানা গাঁথা মালাটিই কোলাহলের গলায় পরিয়ে দিলেন শুক্তিমতী। তারপর তাঁরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর করতে লাগলেন। দেবতারা খুশি হয়ে পারিজাত ফুল উপহার দিলেন, চাঁদ উপহার দিলেন জ্যোৎস্না। ঢালু ফুলবনে সব ফুলগুলি ফুটে উঠল।

কিছুকাল পরে শুক্তিমতী আর কোলাহলের একটি চন্দ্রকলার মতো মেয়ে হল। তার নাম গিরিকা। গিরিকা যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণবতী। চেদি দেশের রাজা মৃগয়া করতে এসে তাঁকে দেখতে পেয়ে রানি করে নিজের রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। রাজপ্রাসাদে গিরিকা খুবই আদরে আছেন রাজার প্রাণাধিকা পাটরানি হয়ে। তবু মাঝে মাঝে মায়ের জন্যে যখন মন উতলা হয়, অমৃতফলের স্বাদের জন্যে, বনফুলের গন্ধের জন্যে মন কেমন করে, রাজার ঐশ্বর্যে আর মনপ্রাণ ভরে না, গিরিকা তখন কোলাহল পর্বতে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসেন, মা শুক্তিমতীর কাছে বিশ্রাম নিতে।

শুকিমতী একদিন গিরিকাকে কাছে ডেকে বললেন, 'মা গিরিকা, আমার আর এই মর্ত্যবাস যে ভালো লাগছে না মা। মর্ত্যের জীবন তো আমার জন্যে নয়, আমি কিন্নরী, একদিন না একদিন আমাকে স্বর্গে ফিরে যেতেই হবে। তুমি বরং একটু তোমার অবুঝ বাবাকে বুঝিয়ে বলো। এবারে সময় হয়েছে, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। সামনের পূর্ণিমা রাতে আমি ফিরে যাব।'

শুক্তমতী চলে যাবেন শুনে গিরিকা মর্মাহত হলেন, তবু মায়ের যুক্তিটা না মেনে উপায় নেই। কিন্তু এতে কোলাহল পর্বতের এতই মন খারাপ হল যে তিনি আর কথাই

বলতে পারলেন না। তাঁর চোখ থেকে অবিরাম জল ঝরতে লাগল। 'যেয়ো না' এই কথাটিও তিনি উচ্চারণ করতে পারলেন না। শুক্তিমতী স্বর্গে ফিরে গেলেন।

কোলাহলের মন খারাপ দেখে পাহাড়সুদ্ধু সবারই মন খারাপ। বনে বনে পাখিরা আর গান গায় না, পশুরা গর্জন করে না, ঝরনারা কুলুকুলু শব্দে নৃত্য করে না, হাতি বৃংহিত ধ্বনি করে না, এমনকী গুহায়, মালভূমিতে, খাদে, প্রতিধ্বনিও স্তব্ধ করে না, এমনকী গুহায়, মালভূমিতে, খাদে, প্রতিধ্বনিও স্তব্ধ হয়ে রইল। কোলাহল পর্বতের নামটাই মিথ্যা হয়ে গেল। বাস্তবিক এত নিঃশব্দ পর্বত আর জগতে কোথাও রইল না।

ওদিকে শুক্তিমতীর স্বর্গে গিয়েও শান্তি নেই। কোলাহলের বিরহ শোকে তিনিও ব্যাকুল। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুবৃষ্টি হয়ে অবিশ্রান্ত ঝরে পড়তে লাগল কোলাহল পর্বতের মাথায়। কোলাহলের চূড়ায় তখনও দুলছে তাঁরই পরিয়ে দিয়ে আসা আধখানা গাঁথা অম্লান পঙ্কজের বৈজয়ন্তী মালা। কোলাহলের হৃদয়েও অম্লান রয়েছে শুক্তিমতীর প্রতি ভালোবাসার প্রণয়পুষ্পটি।

কিছুদিন পরে রানি গিরিকা বাবার খোঁজ নিতে বাপের বাড়ি এসে দেখেন কোলাহল পর্বতে আবার প্রাণের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটি ঝরনার নূপুরধ্বনি। নতুন একটি নদী সৃষ্টি হয়েছে কোলাহল পর্বতের সর্ব অঙ্গ ঘিরে, জড়িয়ে, নেচে নেচে নামছে সেই তন্বী, স্বচ্ছ, ঝলমলে নদীটি, তার পরনে যেন হালকা মেঘের শাড়ি, তার জলে যেন অমৃতফলের মিষ্ট স্বাদ, আর সবচেয়ে আশ্চর্য তার স্রোতে আধো ফুটে রয়েছে একটি অম্লান পঙ্কজের কুঁড়ি। গিরিকাকে যেন নদীটি ডাকছে। এক অদৃশ্য টানে গিরিকা নদীর ধারে গিয়ে বসলেন। কুলুকুলু স্বরে তাঁকে ডেকে আদর করে নদী বলল, 'এসেছিস মা? আয়, আমার কাছে বোস! তোর বাবাকে তো একেবারে ছেড়ে থাকতে পারলাম না রে!'

সেই থেকেই মহাকায় কোলাহল পর্বতের প্রাণ ওই রূপসী শুক্তিমতী নদীটি। প্রতি পূর্ণিমা রাত্রে জ্যোৎস্নায় অপ্সরি কিন্নরীরা এসে তাঁরই স্রোতে জলকেলি করেন, আর তখন কোলাহল পর্বতের কোলাহল যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়!

এক চাষির তিন মেয়ে

এক গরিব চাষির তিনটি চাঁদের টুকরো মেয়ে ছিল। শশীকলা, শরৎশশী আর কিরণশশী। তাদের যত গুণ, তত রূপ। তারা যত বুদ্ধিমতী, ততই কর্মঠ, তেমনি বুঝদার। বাবার সঙ্গে মাঠেও কাজ করে, মার সঙ্গে ঘরেও কাজ করে, আর তিনজনেই গ্রামের পাঠশালাতে সবটা পড়া শেষ করেছে। চাষি আর চাষিবউয়ের ভীষণ ভাবনা। রূপে-গুণে-স্বভাবে শিক্ষায় এমন লক্ষ্মী মেয়েগুলির উপযুক্ত পাত্র কোথা থেকে জুটবে! সারা গ্রামে—আশেপাশের গ্রামেও—একটিও পাত্র ছিল না ওদের স্বামী হবার যোগ্য। গরিব চাষি আর ক'টা বাইরের লোককে চেনে?

ভাবতে ভাবতে চাষির খুব অসুখ করে গেল। তিনটি মেয়ে এতে দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ল। বড় মেয়ে বললে, 'বাবা, আজ যদি এই গ্রামে কোনও বাইরের লোক আসে, সেই আমার বর হবে। তুমি আর ভাবনা কোরো না।' সেই সময়ে আকাশ দিয়ে ঝড়ের দেবতা যাচ্ছিলেন, তিনি শুনতে পেয়ে খুব খুশি। প্রচণ্ড বজ্রবিদ্যুৎ আর একশো মাইল গতিতে দুর্বার বাতাস সমেত চাষির গ্রামে এসে হাজির। গাছপালা ভেঙে, কুটিরের চাল উড়িয়ে তিনি গ্রামের খুব ক্ষতি করছেন—চাষিবউ ছুটে সত্যকালের বটবৃক্ষকে গিয়ে জিগ্যেস করলে, 'হে ঠাকুর, কোন অপরাধে আমাদের এত কষ্ট দিচ্ছ? আমরা কী করেছি?' তখন ঝড়ের দেবতা বললেন, 'কষ্ট তো দিইনি, আমি এসেছি তোমার বড় মেয়েকে বিয়ে করতে। আমি তো এরকমই!' শুনতে পেয়ে বড় মেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এসে তাকে বললে, 'হে ঝড়ের দেবতা, আমি তোমাকে এক্ষুনি বিয়ে করতে রাজি। তুমি এ গ্রামে আর থেকো না।' তখন

ঝড় থেমে গেল। সুন্দর একটি দেবতুল্য যুবক এসে দাঁড়ালেন শশীকলার সামনে। তারপর তো শশীকলাকে বিয়ে করে, ঝড়ের দেবতা তাকে নিয়ে চলে গেলেন। চাষি-চাষিবউ খুশিও হল আর দুঃখিত হল। মেয়ে আবার কবে আসবে, তা কেউ জানে না। দেবদেবীদের ব্যাপার!

চাষি ক'দিন ভালো থাকল। মাঠে যায়, কাজকর্ম করে। তারপর আবার চিন্তা-ভাবনায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। যায়-যায় অবস্থা। এবার মেজ মেয়ে শরৎশশী বললে, 'বাবা, ভাবনা কোরো না। আজ গ্রামে যে-কোনও বাইরের লোক আসলে, সেই হবে আমার উপযুক্ত বর।' চাষিবউয়ের তো মেয়ের কথা শুনে অবধি বুক ভয়ে ধুকপুক করছে—কে জানে আবার কোন দেবতা ওর কথাটা শুনে ফেলল। এবার 'আমিই বর' বলে এসে হাজির হবে! ভাবতে না ভাবতেই হুড়মুড় করে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। চাষিবউ দৌড়ে আবার বটবৃক্ষের তলায় গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতেই, শুনতে পেল, 'আমি ভূমিকম্পের দেবতা। আমি এসেছি তোমার মেজ মেয়েকে বিয়ে করতে। ভয় কেন পাচ্ছ? আমার তো রকমসকম এরকমই।' বলতে না বলতেই হুড়মুড় করে মন্দিরটা ভেঙেই পড়ল আর মসজিদের দেওয়ালটা ফেটে চৌচির। ভূমিকম্প হলে সবাইকে উঠোনে বেরিয়ে আসতে হয়। সেটাই নিয়ম। শরৎশশীও এসেছিল। সে শুনতে পেয়ে বলল, 'তবে আমাকে বিয়ে করে তুমি এক্ষুনি সন্তুষ্ট হও। এত ক্ষতি কোরো না গ্রামের।'

সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প থামল। সুন্দর দেবতুল্য একটি যুবক এসে দাঁড়ালেন শরৎশশীর সামনে। আনন্দ অনুষ্ঠান করে বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। আর দেবতার আশীর্বাদে আবার সব ধ্বংস-হওয়া মন্দির মসজিদ আগের মতন হয়ে গেল।

চাষিও সুস্থ হয়ে মাঠে যায়। এবার সঙ্গে কেবল ছোট মেয়েটি—কিরণশশী, আর চাষিবউ। চাষি যত ছোট মেয়ের দিকে তাকায় তত তার উদ্বেগ হয়। বিয়েটা না দিলেই নয়। মেয়ের তো মা হবার বয়েস হয়ে গিয়েছে। ভাবতে ভাবতে, চাষির যা স্বভাব, তাই-ই হল। সে অসুস্থ হয়ে শয্যা নিল। চাষিবউ আর কিরণশশী খুব ভাবনায় পড়ল। কিরণশশীও তার দিদিদের মতো বললে, 'বাবা, আর ভাবনা কোরো না—আজকে যদি বাইরের কোনও লোক এই গ্রামে আসে, তবে সেই হবে আমার বর।' কিরণশশীর কথা ফুরোতে না ফুরোতে বিশাল এক জলস্তম্ভ উঠল সমুদ্র থেকে। এমন বন্যা এল গ্রামে যে কুমির, হাঙররা এসে ধানখেতে সাঁতার কাটতে লাগল। নোনাজলে সব ধান নষ্ট, বাড়িঘর ভেসে গেল, মানুষরা সব গাছের ডালে উঠে বসে আছে। সমুদ্রে ঢেউ ক্রমে আছড়ে পড়ছে উঠোনে। কিরণশশী এবার নিজেই চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি কে? তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে বলে এসেছ? তবে শিগগির আমাদের গ্রামকে রক্ষা করো, আমাকে নিয়ে চলে যাও।' সঙ্গে সঙ্গে বন্যা শান্ত হয়ে গেল। সব জল যেন ম্যাজিক করে সরে গেল। ধানখেতে পাকা ধানে ঢেউ খেলতে লাগল। যেন নোনাজল কোনওদিন ঢোকেইনি সেখানে। কোথায় কুমির? কোথায় হাঙর? কোথায় সমুদ্র? একটি দেবতুল্য রূপবান যুবক এসে কিরণশশীর সামনে দাঁড়ালেন। দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। কিরণশশীও শ্বশুরবাড়িতে চলে গেল।

চাষি খুব নিশ্চিন্ত। চাষিবউয়ের খুব মন খারাপ। তিনটে মেয়েকে নিয়ে তার সংসার ঝলমল করত আনন্দে। কোথায় কোন সব ধ্বংসের দেবতাদের সঙ্গে তাদের বিয়ে দিয়ে

দেওয়া হল! ঝড়ের দেবতা, ভূমিকম্পের দেবতা, বন্যার দেবতা—এরা দেবতা? না অপদেবতা? এরা ভালো তো কিছুই করে না, কেবল মন্দই করে। মেয়েগুলোর জীবন কীভাবে কাটবে কে জানে? ওরা তো মন্দ করতে জানে না। কেউ কারুর ক্ষতি করলে সহ্য করতে পারে না। এখন ওদের স্বামীরা সারাক্ষণ ক্ষতি করে বেড়াবে, ওদের সেইসব সইতে হবে। চোখ বুজে থাকতে হবে। চাষি বললে, 'না বউ, তুমি ভুল বুঝেছ। ঝড়ের দেবতা আসলে পবনদেবের ছেলে। আমাদের প্রাণবায়ু। নিশ্বাসের বাতাস তিনিই দেন। শশীকলা পবনদেবের বউমা হয়েছে। আমাদের প্রাণবায়ু। নিশ্বাসের বাতাস তিনিই দেন। শশীকলা পবনদেবের বউমা হয়েছে। আর ভূমিকম্পের দেবতাকে চিনতে পারলে না? তিনি তো মাটির দেবতা, মা বসুমতীর ছেলে। খেতখামার যা করি সব তো তাঁরই কৃপায়। মাঝে মাঝে অমন একটু-আধটু হয়। আর বন্যার দেবতা বরুণদেবের ছেলে। জল ছাড়া কি আমরা প্রাণে বাঁচতে পারি? জল মানে জীবন। দেবতারা আমাদের পরীক্ষা করে নিলেন। দেখো, মেয়েদের কিছু ক্ষতি হবে না। ঝড়ে, ভূমিকম্পে, বন্যায় আমাদের গ্রামের যা যা ক্ষতি ঘটেছিল, সবই তো আবার তাঁরাই দৈববলে সারিয়ে-সুরিয়ে আগের চেয়েও ভালো করে দিয়ে গেছেন। আমরা কথা দিয়ে কথা রাখি কিনা সেটাই দেখছিলেন। এবার থেকে আমাদের গ্রামে ঝড়ে, ভূমিকম্পে, বন্যায় কোনও ক্ষতি হবে না, দেখো। এখন থেকে এটা যে ওঁদেরই আপন শ্বশুরবাড়ির গ্রাম হয়ে গেল! গ্রামের ভালো ছেড়ে কক্ষনও মন্দ করবেন না আমাদের জামাইরা।'

সেই শুনে চাষিবউও খুব খুশি। আর সত্যি সত্যি সেই গ্রামে কোনওদিন ঝড়ের তাণ্ডব হয় না, বন্যার তাণ্ডব হয় না, ভূমিকম্প হয় না।

কয়েক বছর গেল। অনেকদিন মেয়েদের না দেখে মন খারাপ, তাই চাষিবউ বললে চাষিকে, 'চলো, আমরা বাইরে তীর্থ করে আসি।' চাষি রাজি। সে-ও বললে, 'তাই চলো।' দুজনে পুঁটলিতে চিড়ে-গুড় বেঁধে তো বেরিয়ে পড়েছে। যাচ্ছে, যাচ্ছে। যাচ্ছে। সাতটা নদী, চোদ্দোটা মাঠ, আঠাশটা গ্রাম পার হয়েছে। একদিন রাত্রি নামল এক বনের মধ্যে। সামনে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি দেখে ওরা সেখানে ঢুকে পড়ল রাত কাটাতে। সেটা ছিল এক দানবের বাড়ি। সে চাষিকে দেখে ভাবলে, বেশ, একে দিয়ে খুব খাটানো যাবে। গায়ে অনেক জোর আছে। আর চাষিবউটা রোগাসোগা মানুষ, ওকে দিয়ে কিসসু কাজ হবে না, ওকে বরং ঈগল পাখির বাসায় রেখে আসি। ঠুকরে খেয়ে নিক। এই ভেবে দুষ্টু দানবটা চাষিবউকে এক পাহাড়ের চুড়োয়, উঁচু গাছের মগডালে ঈগল পাখির বাসার মধ্যে রেখে দিয়ে এল। শোঁ শোঁ করে সেখানে জোরে বাতাস বইছে। চাষিবউ কেঁদে উঠল, 'ও আমার শশীকলা কন্যে, তোমার বাবাই বা কোথায় হারিয়ে গেলেন, আমিই বা কোথায় এসে পড়লুম?' অমনি ঝড় উঠল, চাষিবউকে ঈগল পাখির বাসা থেকে উড়িয়ে এনে, চাষিকে দানবের ডেরা থেকে উড়িয়ে এনে, দুজনকে একসঙ্গে সোজা নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। সেখানে পৌঁছে তারা দ্যাখে, সামনে কে? না শশীকলা। কোলে দুই নাতি-নাতনি, তাদের নাম ঝঞ্ঝা আর সমীরণ। নাতি-নাতনি মেয়ে-জামাই নিয়ে অনেকদিন খুব আনন্দে কাটল। তারপর, একদিন চাষি আর চাষির বউ আবার তীর্থে রওনা হল।

যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে, এবার একটা ন্যাড়া পাহাড়ে পথ আটকে গেল। সন্ধেবেলা, কোথায় যাবে? ওই পাহাড়েরই একটা গুহায় ঢুকে রাত্রের আশ্রয় নিল দুজনে। তখন সেই গুহায় থাকত এক রাক্ষস। সে দেখলে, বাঃ, বেশ মোটাসোটা আছে চাষিটা, কাল ওকেই খাব। আর এই রোগা-পাতলা চাষিবউটা কোনও কাজের নয়। অস্থিচর্মই সার—ওকে বরং খাদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিই। সেই অন্ধকার গা-ছমছমে স্যাঁতসেঁতে খাদের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না, অনেক উঁচুতে একফালি আকাশে তারার সারি। চাষিবউ কেঁদে উঠল, 'ও আমার শরৎশশী কন্যে, তোমার বাবা কোথায় গেলেন, তোমরাই বা কোথায় রইলে? আমি যে পাতালে পড়ে গেছি!' অমনি ভীষণ ভূমিকম্প হল। মাটির চাঙড়সুদ্ধু চাষিবউকে খাদের ভেতর থেকে তুলে এনে, চাষিকে পাহাড়ের গুহা থেকে তুলে এনে, ভূমিকম্প একসঙ্গে দুজনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। সেখানে পৌঁছে চাষিবউ দ্যাখে কী, না সামনে তার শরৎশশী। কোলে নাতনি, নাম ভূদেবী। আর নাতি, নাম ভুঁইদোল। নাতি-নাতনি নিয়ে শরৎশশীর কাছে খুব আনন্দে অনেকদিন কাটিয়ে, তারা আবার তীর্থে রওনা হল।

যেতে, যেতে, যেতে একদিন রাত্রি নামল সমুদ্রের ধারে। সমুদ্রে থাকত এক জলদস্যু। সে দেখলে, বাঃ, চাষিটি তো বেশ নাদুস-নুদুস, নধর, কাল ওকেই খাব। আর বউটা বড্ড রোগাপটকা, ওকে জলে ফেলে দিই। এই বলে চাষিকে সে একটা গর্তের মধ্যে বেঁধে রেখে চাষিবউকে সমুদ্রের ঢেউয়ে ছুঁড়ে দিল। চাষিবউ ডুবছে, ভাসছে, ডুবছে—এমনি করে করে কোথায় দূরে ভেসে যেতে যেতে কেঁদে উঠল, 'ও আমার কিরণশশী, সোনামণি, আমি যে ডুবে গেলুম, আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হল না।' অমনি সমুদ্রের বাণ এল, এক ঝটকায় চাষিবউ চলে এল তীরে। গর্ত থেকে চাষিকে উদ্ধার করে নিয়ে বাণ তাদের দুজনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল। চাষিবউ দ্যাখে, সামনে কে হাসছে! কিরণশশী। তার কোলে নাতি আর নাতনি। তাদের নাম? তরঙ্গ আর প্লাবন। চাষি আর চাষিবউ অনেকদিন আনন্দ করল, তারপর একদিন ছুটি নিয়ে তীর্থে বেরুল।

এবার নাতি সমীরণ তাদের হুস করে উড়িয়ে নিয়ে পৌঁছে দিল তীর্থক্ষেত্রে। দেখাটেখা হলে, তারপর নাতনি তরঙ্গ তাদের যত্ন করে মা-গঙ্গার ঢেউতে দুলিয়ে পৌঁছে দিল ফের তাদের নিজেদের গ্রামে। সেখানে পৌঁছে তারা তো অবাক! চাষি-চাষিবউ দ্যাখে এতদিন তারা যে গ্রামে ছিল না, খেতে দেখে তা বোঝার মোটেই কোনও উপায় নেই। নাতনি ভূদেবীর যত্নে তাদের খেতে পাকা ধানে ঢেউ খেলছে। আর সেই খানে চাঁদের আলো ঝিকমিক করছে—শশীকলা, শরৎশশী আর কিরণশশীর হাসিমুখের মতন।
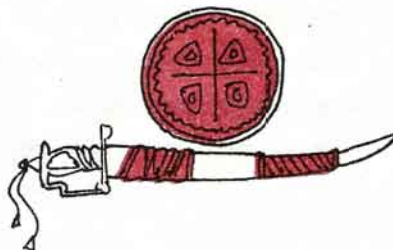
তাতাই আর বাবুই

তোমরা কি 'ডাকঘর'-এর অমলকে চেনো? আর তার বন্ধু সুধাকে? তাতাই চেনে। তাতাইয়েরও তো অসুখ করেছে কিনা, অমলের মতন তাকেও বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে এখন। তবে খুব বেশিদিন নয়, ডাক্তারকাকু বলেছেন আর পাঁচদিন বাদেই ইস্কুল যেতে পারবে। পাঁচদিন—কেন?

আসলে ডাক্তারকাকু বলেছিলেন সাতদিন। তাতাই দিন গুণছে তো, দু'দিন হয়ে গেছে, আরও পাঁচদিন বাকি। কিন্তু খেতে ভালো লাগছে না, কেবল ডালমুট, ঝালমুড়ি, ফুচকা, তেঁতুল মাখা, আমের আচার, এইসব জিনিসের কথা মনে পড়ছে। কিন্তু এসব ভালো ভালো জিনিস এখন বন্ধ। সর্দি-কাশি না সারলে টক খাওয়া হবে না। দূর—তাতাই জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে আবার সেই ঝুঁটিওয়ালা বুলবুল পাখিটা এসে বসেছে কদমগাছের ডালে। কদমের ফল নাকি পাকলে টক হয়। বুলবুলিটা ঠুকরে খায়। তাতাইও ওই ফলটা একদিন খাবে। কেন খাই না আমরা কদম-ফুল? বাবুই বলল ওরা নাকি খেয়েছে। বিহারে খায়। টকের অম্বল রান্না করে ওই ফল দিয়ে। আর এখানে? কত ফল পড়ে নষ্ট হচ্ছে। কেউ খায় না—না, কেউই খায় না তা নয়। পাখিরা খায়। মানুষে খায় না। অথচ বাজার থেকে যত বাজে বাজে সবজি—করলা, লাউ, পেঁপে, এইসব কিনে আনে। রজনীগন্ধা গাছের তলায় একটা করে যে পেঁয়াজ থাকে তাতাই দেখেছে, সেগুলোও তো কউ খায় না। তাতে হয়তো রজনীগন্ধার গন্ধ থাকে। পেঁয়াজের মতন দেখতে হলে কী হবে, আসলে পেঁয়াজ নয়। না রজনীগন্ধা খেতে একটু ইচ্ছে করল না তাতাই-এর। শুয়ে শুয়ে কী যে করে? টিভিটাও তো এ-ঘরে

নেই, ওপরতলায় এখন ওপরে যাওয়া বারণ। ওই জানলাই ভরসা। আর বই। মামু 'ডাকঘর' প্রেজেন্ট করেছিল, আর 'গল্পসল্প'। গত বইমেলা থেকে তাতাই এতদিন ফেলে রেখেছিল। বইটই পড়তে ওর ভালো লাগে না। কমিক বই থেকে ছবি দেখতে, 'অমর চিত্রকথা' দেখতে, টিভি দেখতে, আর খেলার মাঠে যেতে, ফুটবল আর ক্রিকেট খেলতে ভালো লাগে তাতাই-এর। 'গল্পসল্প'টা তাতাই-এর কেমন যেন শক্ত শক্ত লাগছে—এখনও পড়া শেষ হয়নি। 'ডারঘর'টা তবু ভালো লেগেছে। কিন্তু মামু যে 'চাঁদের পাহাড়' বইটা দিয়েছিল, সেটা আরও ভালো। এখন শুয়ে শুয়ে 'ডাকঘর'টা যেন বেশি করে বুঝতে পারছে তাতাই। জানলা দিয়ে কত কী দেখা যায়। ছোড়দি বলেছিল আজ একটা সিনেমার গল্প বলবে। তা সে তো ফিরলই না এখনও। মা ইস্কুলে। বাবা অফিসে। বাড়িতে শুধু বিন্দুমাসি। বিন্দুমাসির হাতের কাজ যেন কখনওই শেষ হয় না। হয় এটা ধুচ্ছে, নয় ওটা কুটছে, নাহলে সেটা শুকুতে দিচ্ছে, একটুখানি যে এসে বসবে তাতাই-এর কাছে তা না। ওই বাবুইটাই তবু একটু আসে। ওর তো ইস্কুল নেই। সকালবেলায় ওর বাবার সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘোরে ঝাড়ু বালতি নিয়ে। ও তো জমাদার কিনা? দুপুরে স্নান করে খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা ছাড়া কিছু করার থাকে না, তখন তাতাই-এর জানলার কাছে এসে দাঁড়ায়। বিন্দুমাসি ওকে আগে ভেতরেই আসতে দিচ্ছিল না কিন্তু মা বলেছেন আসতে দিতে। বাবুই অনেক গল্প জানে। আজই বাবুই ওকে একটা ভূতের গল্প বলেছে। ওদের গ্রামের গল্প।

'দুই শেঠ ছিল, তাদের দুজনের মধ্যে যত ভাব, তত ঝগড়া। শেষে তারা ঠিক করল তাদের ছেলেমেয়ে হলে, বিয়ে দিয়ে ওরা দুজনে বেয়াই হবে। তাহলে আর ঝগড়া থাকবে না। কিন্তু ছেলের বাবা যে হবে, সেই তো জিতে যাবে। ''দহেজ'' পাবে। বউ পাবে।'

—' 'দহেজ'' আবার কী?' তাতাই বলে।

—'এই টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি, বাসনপত্র।'

—'ওঃ, পণ? পণ নেওয়া তো বে-আইনি, তাও জানে না ওরা?'

—'এ তো অনেক আগেকার গল্প, তখন হাইকোর্টই হয়নি তো আইন!' বাবুই হেসে উড়িয়ে দিল। 'আর আমাদের জাতের নিয়ম কী জানো তো? বরকেই পণ দিয়ে বউ কিনতে হয়। বউ এসে তো বরের ঘরে খাটাখাটুনি করবে, তার মা-বাবা অমনি তাকে ছেড়ে দেবে কেন? আমি তো টাকা জমাচ্ছি, বিয়ের জন্যে। যত ছোট্ট বউ, তত কম টাকা। তত কমদিন ওকে ওর বাবা-মা খাইয়েছে কিনা? তা ছাড়া বেশি কাজও করতে পারবে না। তাই অল্প পণে হয়ে যায়। যত বড় বউ হবে তত বেশি পণের টাকা। আমার মা মরে যেতে বাবা যে দাদার বিয়ে দিল, ভাবিজি দাদার চেয়ে সাত বছরের বড়। সে এসেই আমাদের সংসারের হাল ধরল। ওর জন্যে অনেক টাকা পণ লেগেছিল। বাবা তো দেশেই থাকে না। আমরা ন'জন মোট ভাইবোন। ভাবিজি বড় না হলেই চলত না। ভাবিই আমাদের রান্না করে খাইয়ে বড় করেছে। আমি বাবা ছোটবউ দেখে বিয়ে করব, যাতে পয়সা কম লাগে?'

—'এখনই বিয়ে করবে কি? তোমার বয়েস কত? তুমি তো আমারই সমান।'

—'এখন না; পরে। দেশে গেলে।'

—'গল্পের কী হল?' তাতাই তাড়া দেয়।

—'হ্যাঁ। তারপর, দুই শেঠেরই মেয়ে হল।'

—'অ্যাঁ? বিয়ে দেবে কেমন করে?'

—'সেই তো মজা। একটা শেঠ খুব লোভী ছিল। সে মেয়ে হয়েছে এই খবরটা চেপে গেল, আর খুব করে কাঁসার বাজিয়ে দিল, থালা পিটিয়ে। তার মানে, ছেলে জন্মেছে জানিয়ে দিল।'

—'তারপর?'

—তারপর লোভী শেঠ তার বউকে একদম বারণ করে দিল, 'কাউকে বলবে না যে মেয়ে হয়েছে। আমরা ওই শেঠের মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেব।' ওর বউ তখন অবাক হয়ে বললে, 'কেমন করে বিয়ে হবে? এও তো মেয়েই?'

—শেঠ বললে, 'সে তখন দেখা যাবে। এখন আশীর্বাদ তো হয়ে যাক।' মেয়েকে শেঠ জন্ম থেকেই ছেলেদের পোশাক পরিয়ে রাখল, আর মেয়ের নাম দিল বলবীর।

অন্য শেঠের মেয়ের নাম হল রানি। রানি আর বলবীরের যখন ছ'বছর বয়েস তখন দুজনের আশীর্বাদ হয়ে গেল খুব ঘটা করে, বাজনা-টাজনা বাজিয়ে, গয়নাগাঁটি দিয়ে। তারপন্দর কী খাওয়াদাওয়া। বারো বছর বয়েসে আরও ঘটা করে ওদের বিয়ে হল। বলবীর বেচারি তো জানে, সে ছেলে, ছোট থেকে ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেই বড় হয়েছে, পরনে ধুতি, সিল্কের আচকান, মাথায় ইয়াবড় পাগড়ি, পায়ে জরির নাগরা।

মনের আনন্দে বিয়ে করে সে ঘরে বউ নিয়ে এল। এদিকে শেঠনি মা বেচারি তো কেঁদেই অস্থির। 'দহেজে'র লোভে দুটো মেয়েতে বিয়ে দিয়ে দিল কিনা লোভী শেঠ? এও কখনও হয়? শেঠনির মনে পাপের ভয়। শেষটা সে চুপিচুপি গিয়ে ফুলশয্যার রাত্রেই বর-বউকে ডেকে বললে,—'দ্যাখো বউমা, এ বিয়েটা ঠিক বিয়ে হয়নি, আমার বলবীরও আসলে মেয়েই। ঠিক তোমার মতোই সুন্দরী। কিন্তু ও নিজে সেটা জানে না। ও ভাবে ও বুঝি ছেলে। ওর বাবা ওকে যা বুঝিয়েছেন আজন্ম, ও তাই বুঝেছে। ওর কোনও দোষ নেই। আমি অনেক বারণ করেছি, ওর বাবা কিছুই শোনেনি। আমাকে মেরে ধরে চুপ করিয়ে রেখেছেন।' এ কথা শুনে বলবীর তো আকাশ থেকে পড়ল। আর মনের দুঃখে, অভিমানে, রাগে, তক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, যেদিকে দু-চোখ যায়। রানি কী করবে, বুঝতে না পেরে, সেও ঘাঘরা গুটিয়ে ছুটল তার বরের পেছু পেছু। এদিকে ভীষণ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। ওরা দুজনে একটা গাছের নীচে দাঁড়াল। গাছটাতে একশো আঠাশজন ভূতের বাসা। তারা বলল,—'এ কী? আমাদের ভয়ে এ গাছের নীচে জনমনিষ্যি কক্ষনও দাঁড়ায় না—এই বাচ্চাদুটোর কি প্রাণে ভয়ডর নেই?' ভূতেদের সর্দার গিয়ে ওদের বলল,—'অ্যাই, তোরা কোথায় যাচ্ছিস? কী করছিস এইখানে এত বৃষ্টির মধ্যে?'—ভূতের সর্দার অবশ্য ভূত সেজে যায়নি, একজন রাখাল সেজে গেছিল। বলবীর তাকে খুলে বলল, তাদের কী ব্যাপার। 'আমার বাবা মিথ্যেবাদী, লোভী, আমরা দুই বর-বউ, কিন্তু দুজনেই মেয়ে। আমাদের কী হবে?'

ভূতের সর্দার বললে, 'দাঁড়াও। মজা দেখাচ্ছি। এ বিয়েটা মোটে বিয়েই নয়—কিচ্ছু

ভেবো না—শেঠকেই আমরা খেয়ে বানিয়ে দিচ্ছি। আর, বাছা বলবীর, যদি তুমি চাও তোমাকে আমি সত্যি ছেলে বানিয়ে দিতে পারি। আমরা তো ভূত হই। সব পারি।'

বলবীর বলল,—'না, আমি মেয়ে, মেয়েই থাকব।'

রানি আর বলবীর তখন রানিদের বাড়িতে চলে গেল। আর লোভী শেঠ? হঠাৎ দুপুরবেলায় তার আপিসে সে যখন শেঠজি হিসেবনিকেশ করতে বসতে যাবেন তাঁর দাঁড়ি-গোঁফ হঠাৎ মেঝেয় খসে পড়ল। মাথায় খোঁপা, আর উড়নি, গায়ে গয়না, পরনে ঘাঘরা-চোলি এসে গেল। মেয়েলি সরু গলায় শেঠ হুঙ্কার দিলেন—'ইধার আও!'

প্রজারা কেউই এল না। আসবে কি? সবাই হেসেই তো গড়াগড়ি। কেউ তার কথা শুনছে না।

তখন শেঠনি তাকে বললে,—'এটা তোমার পাপের ফল। দেবতারা রাগ করেছেন। শিগগির তোমার বন্ধুকে তার 'দহেজ' ফেরত দাও। রানি আর বলবীর কোথায় গেল? খুঁজে এনে, দুজনের দুটি ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দাও। তোমার লোভ আর মিথ্যা কথার ফলেই তুমি মেয়ে হয়ে গিয়েছ। এখন বোঝো, মেয়েদের জীবন কীরকম কষ্টের হয়।' শেঠনি তখন রানির বাবাকে খবর দিয়ে, তার সব দহেজ ফেরত দিয়ে দিলে। আর পাশের গ্রামের দুই শক্তপোক্ত চাষিভাই, রঘুয়া আর ভগুয়াকে ডেকে এনে গ্রামের লোকেরা রানি আর বলবীরের খুব ঘটাপটা করে আবার বিয়ে দিয়ে দিলে। শেঠ ঘাঘরা চোলি পরে লজ্জায় ঘরের কোণে বসে রইল। বসে বসে এখনও ডাল ভাঙে। গম পেষে। রুটি চাপাটি বানায়। সবজি রাঁধে। মহিষের দুধ দোয়। দুধ জ্বাল দেয়। মাখন বানায়। ঘি বানায়। আর বলবীর তো সব ছেলেদের কাজ শিখেছিল। সেই তার বাবার ব্যবসা দ্যাখে—দপ্তরের কাজকর্ম দেখে। আর তার বর রঘুয়া চাষ করে। ওদিকে রানি আর ভগুয়ারও দিন খুব সুখেই কাটল, ভূতের সর্দারের দয়ায়। ভালো গল্প নয় এটা?" বাবুই তাতাইকে জিগ্যেস করল। তাতাই ভেবেচিন্তে বললে,—'হ্যাঁ, বেশ ভালো, অনেকটা গুপীগাইনের মতন।'

—'সেটা আবার কী গল্প? জানি না তো?'

সত্যি তো? বাবুই তো দ্বারভাঙার ছেলে! ওকে তাহলে এবার গুপীগাইনের গল্পটা বলা যাবে। তাতাই খুব খুশি হল। যাক একজনও লোক তো পাওয়া গেছে গুপীগাইন-বাঘাবাইনকে চেনে না?

—'সেও একটা ভূতের রাজার গল্প। তবে এরকম নয়। এটাতে যেমন একটা দুষ্টু শেঠের শাস্তি আছে, ওতে সেরকম কিছু নেই।' বলে—তাতাই গল্পটা যেই শুরু করেছে, বিন্দুমাসি অমনি এসে বললে,—'এই যে, হরলিকস! তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে।' আর বাবুইও তক্ষুনি—'পরে আসব' বলে ছুটে পালিয়ে গেল।

তাতাই তখন থেকে জানলার দিকে তাকিয়ে আছে, বাবুই কখন আসবে।*

* [বাবুইয়ের গল্পটা একটি রাজস্থানি গ্রাম্য গল্পের ভাব অবলম্বনে খানিকটা তৈরি করা।]

রূপবতীর বিয়ে

রূপবতী একে রাজকন্যে, তায় পরমা সুন্দরী, যেমন হয় রাজকন্যেরা। এদিকে তার বিয়ে আর হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কেন হচ্ছে না? বিয়ের বয়েস হয়েছে, দিগ্বিদিকে রাজপুত্তুরেরও অভাব নেই। তবু রূপবতীর বিয়ে হয় না। সে বারান্দায় বসে বসে রূপটান মাখে আর টিয়াপাখিকে বোল পড়ায়। টিয়া বলে, 'রূপবতী রাজকন্যের যুগ্যি বর এখনও জন্মায়নি।' শুনে রাজার চুল রাগে খাড়া-খাড়া, রানির চোখ রাগে গোল-গোল। রূপবতীর বিয়ে আর হবে কী করে? রূপ হলেই তো হয় না, মানুষটা কেমন দেখতে হবে তো? রূপবতী বড্ড অহংকারী। রূপের বড়াই তার বড্ড বেশি। সেই ভয়ে জগতে হেন রাজা নেই, রাজপুত্তুর নেই, মন্ত্রীপুত্তুর নেই (এমনকী কোটালপুত্তুর কি সদাগরপুত্তুরেও রাজার আপত্তি ছিল না) যে রূপবতীকে বিয়ে করবে। 'রাজকন্যা রূপবতী? ও বাবা! ও মেয়ের সঙ্গে ঘর করবে কে?'—এই বলে সবাই ছুটে পালায়। প্রথম প্রথম বেশ কয়েকবার দিব্যি স্বয়ংবর সভা বসেছিল, রাজপুত্তুরের দল এসেওছিল, মালা নিয়ে রূপবতী সভাতে গিয়েওছিল। কিন্তু তার পরেই তো হয় কেলেংকারি। রূপবতী সবাইকে ঠাট্টাতামাশা করে, কাউকেই ওর পছন্দ হয় না। মানী লোকেরা বারবার আসবে কেন তাদের মান হারাতে? স্বয়ংবর সভা ডাকলেও আর কেউ আসে না।

শেষকালে অনেক বলে কয়ে, চেষ্টাচরিত্র করে, রাজা একটা শেষবারের মতন স্বয়ংবর

সভা ডাকলেন। তাতে পাঁচজন মাত্র রাজা সাহস করে এলেন (কেন না রাজকুমারদের সাহসে কুলোল না) পাঁচ দেশ থেকে রথ ছুটিয়ে। রাজামশাই তাঁদের ফুলচন্দন দিয়ে, সানাই বাজিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

রূপবতী সভায় ঢুকতেই যেন ঘরে বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল। সত্যি, সে বড় সুন্দর দেখতে। কিন্তু চলাফেরায়, চোখের চাউনিতে দম্ভ যেন ফেটে পড়ছে। সভায় ঢুকে রূপবতী একেকজন রাজার সামনে যাচ্ছে, আর ভুরু নাচিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে এক-একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিচ্ছে। মালা নয়, বিদ্রুপই ছিল রাজাদের ভাগ্যে।

জয়পুরের রাজাটি নাদুসনুদুস, গোলগাল। তার সামনে গিয়ে রূপবতী বললে, 'ও বাবা, এ যে তেলের পিপে!'

মণিপুরের রাজামশাই রোগা লম্বা, তাঁকে দেখে বললে, 'আহাহা, যেন পাটকাঠি!'

রতনপুরের রাজার গালদুটি একটু ফুলের মতন আছে, তাঁকে দেখে রূপবতী সখীদের বললে, 'দ্যাখ, দ্যাখ, ফুলকো লুচি!'

কাঞ্চনপুরের রাজার রং একটু কালো, রূপবতী গালে হাত দিয়ে বললে, 'বাপ রে! এ যে কালির দোয়াত!'

পলাশপুরের রাজা পরম রূপবান। রূপবতী তার কোনও ত্রুটিই খুঁজে পায় না, হঠাৎ দেখতে পেল মাথার ওপরে একটুখানি চুল বাতাসে উড়ে ঝুঁটির মতন রয়েছে। রূপবতী অমনই হেসে গড়িয়ে পড়ল, 'এটা যে একটা কাকাতুয়া রে!'

হাতের মালা হাতেই রইল। সখীদের সঙ্গে হাসিহাসি করতে করতে মল-ঝুমঝুম, নূপুর-রিনিঝিনি অহংকারী পা ফেলে রূপবতী অন্তঃপুরে ফিরে গেল।

নিমন্ত্রিত রাজাদের মুখ লাল। রাগে, অপমানে তাঁদের মুখে বাক্য নেই। রূপবতীর বাবা তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলেন। মেয়ের আচরণে তিনি যারপরনাই লজ্জিত। তাঁর ভয় হল, অপমানিত হয়ে এই পাঁচটা রাজ্যের রাজা যদি এখন একজোট হয়ে তাঁকে আক্রমণ করেন? রাজারা খেপে গেছেন তাতে সন্দেহ নেই। ডেকে এনে অপমান করা হয়েছে তাঁদের। রাজামশাই ভয় পেলেন। আর রূপবতীর দায়িত্বহীন দুঃশীল আচরণের জন্যে তার ওপর ভয়ানক রাগ হল। এখন কী হবে? কিন্তু নাঃ, তেমন কিছু হল না। রাজকন্যে অসভ্যতা করলে কী হবে, অভ্যাগতরা ভদ্র। তাঁরা বললেন,—'মহারাজ, রূপবতীর জন্যে বর জোগাড় করা আপনার কাজ নয়। ওটা ওকে নিজেই খুঁজে নিতে দিন।'

কিন্তু রাজামশাই রূপবতীর আচরণে এত লজ্জিত, এত বিরক্ত যে, রাগে গরগর করতে করতে তিনি সভার মধ্যে ঘোষণা করলেন, (যেমন রাজারা বলে থাকেন আর কী) —'কাল ভোরে উঠে যার মুখ দেখব, তারই হাতে রূপবতীকে সঁপে দেব।'

অতিথি রাজারা প্রত্যেকেই হায়-হায় করে উঠলেন, রাজাকে অনেক বারণ করলেন এমন নিষ্ঠুর শপথ না নিতে। কিন্তু রাজার সেই এক গোঁ। মহারানি ঘরে গিয়ে দোর দিলেন। রূপবতীও শুনল, কিন্তু উচ্চবাচ্য করল না।

পরদিন ভোর হতে-না-হতে একটা মিষ্টি গানের সুর শুনে রাজার ঘুম ভেঙে গেল।

রাজা বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখেন, নীচের রাস্তায় উমনোঝুমনো কাঁধ পর্যন্ত রুক্ষ জটা-পড়া চুল, একমুখ দাড়িগোঁফ, হাতে একতারা, পরনে তালি-মারা শতচ্ছিন্ন একটা আলখাল্লা-পরা একজন লোক ভারি চমৎকার গান করছে। সে ফকির, না সন্ন্যাসী, না বাউল, না ভিখিরি, সে হিন্দু না মুসলমান, ছোকরা, না বুড়ো, কিছুই বোঝবার উপায় নেই তাকে দেখে। গান শেষ করে আউলবাউল লোকটি রাজার কাছে হাত পাতল। রাজামশাই তাকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন। তারপর সেপাই পাঠিয়ে রাজপুরোহিতকে ধরে আনলেন মন্দির থেকে। সখীরা ভয়ে কাঠ। রানিমা অঝোরে কাঁদছেন। রাজামশাই সেই ভিখিরির হাতেই কন্যা সমর্পণ করলেন। তাঁর যেমন কথা তেমনই কাজ। এদিকে রাজকন্যা বিয়ে করে ভিখিরি কোথায় খুশি হবে তা নয়। উলটে সে বললে, 'আমি একারই খাবার জোটাতে পারি না, আবার বউকে খাওয়াব কেমন করে? নিজেরই থাকার ঠিক নেই, ভবঘুরে, বাউন্ডুলে জীবন, বউকে রাখব কোনখানে? এ আবার কীরকম ভিক্ষে দেওয়া?'

রাজা তখন ভিখিরির হাতে পাঁচটা সোনার মোহর দিয়ে বললেন, 'এই নাও, এই দিয়ে যা পারো করো। এই ঢের। আর কখনও এখানে এসো না। তোমাদের কারও মুখদর্শন করতে চাই না আমি।'

রানিমা লুকিয়ে মেয়ের আঁচলে কিছু রাজভোগ পুঁটলি বেঁধে দিয়ে দিলেন। কে জানে মেয়ে কোথায় চলল। কবে আবার দেখা হবে। দেখা হবে কি হবে না। কী খাবে। কোথায় থাকবে। এত আহ্লাদে মানুষ!

রূপবতী তো রেগেই অস্থির। কিছুতেই যাবে না সে অচেনা আউলবাউল একটা ভিখিরির সঙ্গে, রাজপ্রসাদ ছেড়ে। কিন্তু ভিখিরির ব্যবহারটি খুব ভদ্র, আর গানের গলাটা সত্যি যেন জাদুঢালা। রাজকন্যা যখন দেখল রাজপ্রাসাদে সকলেই আশা করছে সে এই ভিখিরির সঙ্গে যেদিকে দু-চক্ষু যায় চলে যাবে,—তখন তারও আর ওখানে থাকতে ইচ্ছে করল না। কেউই তো বলল না, 'রূপবতী, যেয়ো না, থাকো।' বলবে কেন? সবার সঙ্গেই যে তার তিরিক্ষি ব্যবহার। সুতরাং রাগে গরগর করতে করতে রাজকুমারী রূপবতী অগত্যা ওই অচেনা আউলবাউল লোকটির হাত ধরে, পথে বেরোল। বর মানুষটা বেশ। রূপবতীর সঙ্গে বেশ সম্ভ্রম করে চলছে। ভিখিরির মতো পায়ের নীচে থেকেও কথা বলছে না, আবার 'স্বামী' বলে মিছিমিছি ওপর থেকে বিশ্রী সর্দারিও ফলাচ্ছে না। রূপবতীর দিকে নজর রেখেছে, যাতে কাঁকরে পা না পড়ে, কাদায় পা না পড়ে। শহর ছেড়ে বনের পথে কিছুটা হেঁটে বর ওকে জিগ্যেস করলে, 'রাজকন্যে, তোমার কি ক্লান্তি লাগছে? এই তো একটা বুড়ো বটগাছ, তুমি এর ছায়ায় একটু বসবে?'

রাজকন্যের পা ব্যথা করছে, সে বসতে পেয়ে বেঁচে গেল। আঃ কী আরাম। ঠান্ডা ছায়ায় বসে তার শরীর জুড়িয়ে গেল।

'এই প্রকাণ্ড বনটা কার? এত বিশাল-বিশাল ছায়াভরা গাছে ভরতি?'

আউলবাউল বর বললে, 'ওই যে কালকে যে রাজাটা এসেছিল না, কাকাতুয়ার মতন ঝুঁটিওয়ালা, এই বন তার।'

আর-একটু গিয়ে রাজকন্যা বললে, 'জল খাব, জলতেষ্টা পেয়েছে।'

পাশ দিয়েই বয়ে যাচ্ছিল ঝিরঝির করে স্বচ্ছ সুন্দর একটা নদী, সেখান থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে রূপবতী বললে, 'আঃ! কী সুন্দর মিষ্টি জল। এই ঝরনা কোথা থেকে আসছে।'

'ওই কাকাতুয়া রাজার রাজ্য থেকে।'

ঘন বন থেকে বেরিয়ে এসে পড়লে সবুজ গরু-চরানোর মাঠে, সেখানে স্বাস্থ্যবান সব গরু চরে বেড়াচ্ছে। তারপর সোনালি ঢেউখেলানো ধানখেত। খেত পেরোতে না পেরোতে আমবাগান, লিচুবাগান, কলাবাগান, ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছ। তারপর দিঘি, তালবন, নারকেল বাগান—লক্ষ্মীশ্রী উপচে পড়ছে এমন সুন্দর-সুন্দর সব গ্রাম। তকতকে নিকোনো উঠোনে ধানের গোলা, ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। তারপর এক মস্ত এক নদী, তাতে কী বড়-বড় বাণিজ্যের নৌকো। মস্ত-মস্ত হাটবাজার। যতই যা দ্যাখে রূপবতী বলে, 'বাউল, এইসব কি আমার বাবার রাজ্য?'

বাউল হাসে। বলে, 'না রূপবতী, সে তো অনেকক্ষণ ছেড়ে এসেছি। এসব সেই কাকাতুয়া রাজার রাজত্ব!'

শেষকালে তারা এসে পৌঁছল বিরাট এক নগরে। দেখেই বোঝা যায়, প্রজারা খুব সুখে-শান্তিতে আছে। সুন্দর-সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়ি, পরিচ্ছন্ন দোকানপাট, মন্দির, মসজিদ, গির্জে। শহরের মধ্যিখান দিয়ে ঝরঝর করে সেই নদীটা বয়ে যাচ্ছে, তাতে রংচঙে রামধনুর মতন সব সেতু। গাড়ি-ঘোড়া সব ঝকঝকে, রাস্তাঘাট সব ধোয়ামোছা, তকতকে। দু-ধারে ছায়াভরা গাছ। 'এই সুন্দর শহরটা কার?'

'এ সেই কাকাতুয়ার রাজধানী।'

একটা মার্বেল পাথরের প্রাসাদ এল, যেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতন সুন্দর। 'এখানে কে থাকে?'

'ওই কাকাতুয়া রাজা।'

বেচারি রূপবতী এবার বলেই ফেললে, 'আউলবাউল, আমি খুব ভুল করেছি। রাজাটাকে আসলে দেখতে চমৎকার ছিল, আমি শুধু-শুধুই ওকে ঠাট্টা করেছি। বুদ্ধি থাকলে আজ তোমার মতন ভিখিরির বউ না হয়ে এই প্রাসাদের রাজরানি হতে পারতুম।'

উত্তরে বাউল বেচারি আর কী বলবে? তার কাছে তো সত্যি রূপবতী কোনও দম্ভ প্রকাশ করেনি। সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে-হাঁটতে শহরের ধারে একটা ছোট ভাঙামতন পাতার কুটিরের সামনে এসে পড়ল ওরা। রূপবতী বললে, 'এই ভাঙা কুঁড়েঘরে কে থাকে?'

'এখানেই তো আমি থাকি। তুমিও এখানে থাকবে,' বলল রূপবতীর বর। 'আজ থেকে এটা তোমারও বাড়ি।' দাড়িগোঁফের ফাঁকে মিষ্টি করে হেসে, মিষ্টি গলায়, 'এসো', বলে রাজকন্যের দুটি হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল ভিখিরি-বর।

রূপবতী আর কী করে? জীবনে কোনওদিনও সে মাটির ঘরে পা দেয়নি, পাতার চালা দ্যাখেনি। খিদে পেয়েছে। ঘুম পেয়েছে। ক্লান্তিতে শরীর নুয়ে পড়ছে। মায়ের দেওয়ার রাজভোগ যা পুঁটলিতে ছিল দুজনে মিলে ভাগ করে তাই খেল। সে তো শখের খাবার।

তাতে কি পেট ভরে? রূপবতী চেয়ে-চেয়ে দেখলে মাটির মেঝে মাটির দেওয়াল, এককোণে একটা মাটির প্রদীপ। রাজবাড়িতে তার ছিল মর্মরের মেঝে, স্ফটিকের দেওয়াল, সোনার প্রদীপ। রুপোলি পালঙ্কে রেশমের শয্যা। এখানে একটা মাদুর গুটোনো ছিল।

বাউল যত্ন করে সেইটে বিছিয়ে দিলে। বললে, 'নাও, শুয়ে পড়ো।'

বাসন বলতে একটা মাটির হাঁড়ি, একটা মাটির থালা আর একটা মাটির গেলাস। ভিক্ষে করে যেদিন যা পায় বাউল সেইটে ফুটিয়ে নেয়। কুটিরের সামনে ছোট উঠোনে তিনটে ইট পাতা আছে, সেটাই উনুন। আজ তো সঙ্গে ভিক্ষে বলতে আস্ত একটি রাজকন্যা আর পাঁচটা মোহর। কোনওটাই ফুটিয়ে খাওয়া যাবে না। বাউল বেরোল বাজার করতে। চাল-ডাল, আলু-পেঁয়াজ, তেল-নুন নিয়ে এসে রাজকন্যেকে বললে, 'ওঠো, দেখে নাও কেমন করে উনুন ধরাতে হয়, কাঠকুঠো, শুকনো পাতা দিয়ে।'

উনুন ধরিয়ে বাউল নিজেই খিচুড়ি চাপিয়ে দিলে। 'রূপবতী, শিখে নাও, কেমন করে খিচুড়ি রাঁধতে হয়। মাঝে-মাঝে আমি রাঁধব আর মাঝে-মাঝে তুমি।'

রূপবতীর চোখ দিয়ে ঝরঝরিয়ে জল পড়ছে। একে তো কাঠকুটোর ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে। তায় পেঁয়াজ কুটে চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। সবার ওপরে, মনের দুঃখের অশ্রু তো ঝরছেই। খিচুড়ি রান্না হল, এক থালা থেকে ভাগ করে দুজনে যখন খেল, খিদের মুখে সেটা রাজবাড়ির পোলাওয়ের চেয়ে কম সুস্বাদু লাগল না রূপবতীর। এক গেলাস জল খেয়ে, এক মাদুরে শুয়ে, রূপবতী রাজকন্যা কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমন্ত রূপবতীকে দেখলে কে বলবে সে অত অহংকারী, অত রাগী? আহা, যেন মোমের পুতুলটি! কেবল চোখের কোণে জলটুকু দেখলেই বোঝা যায়, মোম নয়, মানুষ।

সকালে উঠে বাউল কোথা থেকে একগোছা বেত নিয়ে এসে জলের মধ্যে ভিজিয়ে দিলে। বললে, 'বউ, আমি তো গান গেয়ে ভিক্ষে করে দুজনের মতন রোজগার করতে পারি না, তোমাকেও কিছু করতে হবে। তুমি বরং বাড়িতে বসে বেতের ঝুড়ি-চুপড়ি বোনো। বেচে দুটো পয়সা আসবে, তোমার একটু আরাম হবে।'

'ঝুড়ি?' রূপবতী তো আকাশ থেকে পড়ল।

'আমি কেমন করে ঝুড়ি বুনব? ওসব কি আমি জানি?'

বাউল বললে, 'কিছু ভাবনা নেই, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।' কেবল ভালো গানই করে না, দিব্যি ভালো ঝুড়ি বুনতে পারে রূপবতীর বর। কিন্তু শেখালে কী হবে রাজকন্যে বেত নোয়াতেই পারে না। ছুলতেও পারে না। তার হাতে কড়া পড়ছে, তার চামড়া উঠে যাচ্ছে। বেতের ঝুড়ি বোনা রূপবতীর দ্বারা হল না।

বরের স্বভাবটি সত্যি ভালো।

রূপবতী তো কোনওদিন রান্নাঘরে যায়নি, রাঁধতে-বাড়তে শেখেনি। সে কোনওদিন সেলাই করেনি। কোনওদিন কিছুই করেনি সংসারের। ব্যাপারটা তার বর বুঝতে পারে। তাকে চাপ দেয় না। নিজেই রান্নবান্না সেরে ফেলে। রূপবতীকে কিছু বলে না। শুধু একদিন তার ছেঁড়া আলখাল্লাটা রূপবতীকে বললে একটু সেলাই করে দিতে, সে তখন রান্না করছে। রূপবতী তো আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্তারক্তি করে বসে রইল। বাউল তাড়াতাড়ি গাঁদাফুলের

পাতা চিবিয়ে তার রস চিপে দিয়ে, রাজকন্যের আঙুলের রক্ত আর চোখের জল বন্ধ করলে। রূপবতী কিছুই জানে না, কিছুই পারে না। রূপবতী পড়ে-পড়ে ঘুমোয়। আর মাঝে-মাঝে কাঁদে, আর চারিদিকে চেয়ে দ্যাখে। চাষি সারাদিন চাষ করছে রোদে, কামার লোহা পেটাচ্ছে গরমের মধ্যে, ফেরিওয়ালা ফিরি করে বেড়াচ্ছে ভরদুপুরে, কেউই বসে নেই। কেউ বিনা কাজে থাকে না। দেখে-দেখে একদিন সে নিজেই বললে, 'বাউল, আমি কিছু কাজ করতে চাই।'

বাউল তো খুব খুশি। তক্ষুনি একঝুড়ি মাটির বাসন কিনে এসে বউকে বললে, 'চলো, তোমাকে হাটে বসিয়ে দিয়ে আসি। তুমি এগুলো বিক্রি করো বসে বসে।'

বেলা দুপুরের আগেই তার সব জিনিস বিক্রি হয়ে গেল। রূপবতীর রূপ যেন দুঃখে-কষ্টে আরও খুলেছে। মন খারাপ, মুখ ভার। মুখে একটুও হাসি নেই, তবু সবকিছু হুড়মুড় করে বিক্রি হয়ে গেল। বাউল তো খুব খুশি। একবারই কেবল রূপবতী তার আগেকার অহংকারী স্বভাবটা প্রকাশ করে ফেলেছিল, একটা ষণ্ডাগুন্ডা মতন লোক এসে ওকে বিরক্ত করছিল, রূপবতী দিয়েছে তাকে একটা থাপ্পড় কষিয়ে।

পরদিন আবার হাটে বসেছে মাটির বাসন নিয়ে রূপসী রূপবতী। আবার বিক্রিবাটা শুরু হয়েছে পুরোদমে। হঠাৎ হল কী, কোত্থেকে একটা মাতাল ঘোড়সওয়ার এসে তার বাসনকোসনের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। রূপবতী হাহাকার করে উঠল। তার এত কষ্টের বাসনগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। কিন্তু কাকে ধরবে? কাকে বকবে? সেপাই তো ঘোড়াসুদ্ধু হাওয়া। ভাঙা জিনিস তো আর জোড়া লাগবে না। রূপবতী চোখভরা জল নিয়ে কুটিরে ফিরল। বাউল বললে, 'না, হাটে বসাটা তোমার পক্ষে ঠিক নয়। তুমি বড্ড রূপসী। দুষ্টু লোকে তোমাকে বিরক্ত করবেই। তার চেয়ে বরং রাজবাড়ির রাঁধুনি বামুন আমার বন্ধুমানুষ। তাকে বলে দেখি যদি রাজবাড়ির পাকশালাতে তোমাকে ঢোকাতে পারে।'

বেচারি রাজকন্যে রূপবতী। জীবনে কখনও সে নিজের প্রাসাদের পাকশালে ঢোকেনি, তাকে কিনা অন্যের বাড়ির রান্নাঘরে দাসীবৃত্তি করতে হবে?

রাঁধুনি মানুষটি বড় ভালো। রূপবতীকে দেখেই বুঝেছে তার কাজকর্মের অভ্যাস নেই। তাই ওকে সামান্য ফাইফরমাশ করা ছাড়া শক্ত কাজ দিত না। রাজার রান্নাঘরে তো জোগাড়ের অভাব নেই?

রোজ রাত্রে বাড়ি ফেরার সময়ে রাঁধুনি রূপবতীর আঁচলে কিছু খাবারদাবার বেঁধে দিত বাউলের জন্যে। এই ক'দিনে রূপবতীরও বাউলের ওপর বেশ মায়া পড়ে গেছে। লোকটা মানুষ ভালো।

হপ্তাখানেক বাদে, একদিন রূপবতী দ্যাখে শহরসুদ্ধু সরগরম। মোড়ে-মোড়ে তোরণ বাঁধা হচ্ছে, পতাকা ওড়ানো হচ্ছে, রাজবাড়ি, ধোয়ামোছা, সোনারুপো পালিশ হচ্ছে, মন্ত্রীমশাই খুব ব্যস্ত, দারুণ উত্তেজনা চারদিকে? কী? না মহারাজার বিয়ে। তারই প্রস্তুতি চলছে। সারা শহর শুধু নয়, সারাটা রাজ্য যেন মেতে উঠেছে।

রাজপ্রাসাদে তো উত্তেজনার শেষ নেই, উঠোনে ভিয়েন বসেছে, সুগন্ধে বাতাস 'ম'

'ম' করছে। সন্ধ্যায় কাজের পরে রূপবতী যখন বাড়িতে ফিরছে বুড়ো রাধুনি যথানিয়মে তার কোঁচড় ভরে দিল ভিয়েনের মণ্ডামিঠাই দিয়ে। 'বরের জন্যে নিয়ে যাও।' বেরোবার মুখে রাঁধুনিবুড়ো ডেকে বললে, 'যাবে নাকি প্রাসাদে? চলো, একবার দেখে আসি কেমন প্রস্তুতি চলছে?'

রূপবতীরও খুব কৌতূহল হচ্ছিল। তা ছাড়া প্রাসাদের ভেতরটা সে তো কোনওদিন দ্যাখেইনি। এ-ঘরে ও-ঘরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখছে তাতেই মুগ্ধ দুজনে। অবশেষে নাচঘরে কিছু হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে যেই না দরজায় হাত রাখা, অমনি সেটি খুলে বেরিয়ে এলেন—কে? না রাজামশাই স্বয়ং। রূপবতীকে দেখে বললেন, 'এটি আবার কে? একে তো দেখিনি?'

রাঁধুনি বামুন বললে, 'এটি আমাদের নতুন জোগাড়ে। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। যাও, রাজামশাইকে পেন্নাম করো।'—রূপবতী লজ্জায় মরে যাচ্ছে। এ তো সেই কাকাতুয়া রাজা। যাকে মিছিমিছি অপমান করেছিল।

রূপবতীর অহংকার আর নেই, কিন্তু অভ্যেসটা থেকে গেছে। রাজার মেয়ে সে, বাইরের লোককে প্রণাম করতে শেখেনি। যেই না দুই হাত তুলে নমস্কার করতে গেছে রাজাকে অমনি তার কোঁচড় থেকে রাজ্যের মণ্ডামিঠাই ঝরঝর করে মর্মরের মেঝেয় ঝরে পড়ে গেল। আর ঘরসুদ্ধ লোকজন হো-হো করে হেসে উঠল। 'লুকিয়ে-লুকিয়ে খাবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বাড়িতে? এইবার ধরা পড়ে গেছে।'

রূপবতী লজ্জায় অপমানে অস্থির হয়ে চোখের জল চাপতে-চাপতে দরজার দিকে ছুট লাগাল।

কিন্তু পালাবে কোথায়? রাজামশাই নিজে এসে তাকে পাকড়ে ফেললেন। হাতদুটি ধরে মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'কী গো, রূপবতী রাজকন্যে, কোথায় পালাচ্ছ তোমার নিজের বাড়ি ছেড়ে?'

রূপবতী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে রাজামশাই মুকুট খুলে ফেললেন, হেসে বললেন, 'আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো তো চিনতে পারো কিনা? আমিই তোমার আউলবাউল বর, আর সেই ষণ্ডাগুন্ডা লোকটা, যাকে তুমি এক থাপ্পড় লাগালে, আর সেই মাতাল ঘোড়সওয়ার। এবার চিনেছ?'

তার পরে আর কী? রাজবাড়ির রোশনচৌকিতে খুশির সানাই বেজে উঠল। রূপবতীর পুরোনো সখীর দল হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এল, হাত ধরে তাকে কনে সাজাতে নিয়ে গেল। আর রূপবতীর বিয়ে। চন্দনে, রূপটানে, ময়ূরকণ্ঠী রেশমি জামদানিতে, চোখে জল, ঠোঁটে হাসি, রূপবতী সাজতে-সাজতে হঠাৎ জানলা দিয়ে দ্যাখে নীচে কে? রাজামশাই আর রানিমা সেজেগুজে সপ্তঘোড়ার রথ থেকে নামছেন, মুখে হাসি আর ধরে না!*

[একটি আইরিশ উপকথার ছায়া অবলম্বনে]

ঊষসী

দক্ষিণ দেশের রাজার বারোজন ছেলে ছিল। ছোট বটে, কিন্তু রাজপুত্রেরা যেমন রূপবান, তেমনি গুণবান। তারা মৃগয়া শেখে, ঘোড়ায় চড়ে, অস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা শেখে, ব্যায়াম করে। কিন্তু ঘরভরতি বীরপুরুষের রানিমার মন ভরে না। তাঁর একটা তুলতুলে মেয়ের জন্য মন কেমন করে। যে যুদ্ধ করবে না, বাগান করবে, ফুল সাজাবে, কবিতা পড়বে, গান গাইবে, তাঁর কাছে কাছে থাকবে। কিন্তু মেয়ে আর হয় না। একদিন ঘুম থেকে উঠে তিনি বারন্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। ঊষাকাল। রাতের আঁধার কেটে গেছে, আকাশের রং আলতো গোলাপি, বেদানার দানার মতন—তাতে নরম আলোর আভা ছড়িয়ে টুকটুকে-লাল সূয্যি উঠছে—আর তক্ষুনি একসারি নাম-না-জানা কুচকুচে কালো পাখি ভারি মিষ্টি শিস দিতে দিতে আকাশ দিয়ে উড়ে গেল।

রানিমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—'বা, কী সুন্দর! আমাকে যদি কেউ অমনি একটা গোলাপি রঙের মেয়ে দিত, তার লাল সূর্যের মতন ঠোঁট, আর কালো পাখিদের মতন চোখ, আর গলার সুর ওইরকম মিষ্টি, তাহলে আমার বারোটা ছেলেকেই আমি তাকে দিয়ে দিতুম!'

ঠিক সেই সময়ে ওখান দিয়ে পরিদের রানি যাচ্ছিলেন। রানিমার কথা শুনে তাঁর খুব রাগ হল। মানুষের কিছুতেই মন ভরে না। এত সুন্দর একডজন রাজপুত্তুরে কোল ভরতি, তাতেও রানির মন ওঠে না? ঠিক যেটি নেই সেইটিই চাই, যা আছে তাতে খুশি নয়। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। যা চেয়েছ তাই পাবে।

পরিরানি বুড়ি ঠান্‌দি সেজে রানির কাছে এলেন আর বললেন,—'তুমি বড় নিষ্ঠুর কথা বলেছ রানি, তোমার কথাই সত্যি হবে। ঠিক ওমনি একটা মেয়ে পাবে, কিন্তু তোমার একটা ছেলেও ঘরে থাকবে না।'—বলেই পরিরানি তো অদৃশ্য। কিন্তু রানিমার মন খারাপ হয়ে গেল। সত্যি সত্যি কি তিনি ছেলেদের দিয়ে দিতে চেয়েছেন? ওটা একটা কথার কথা, কিন্তু নিষ্ঠুর কথা মিছিমিছিও বলতে নেই।

এর পর রানিমার তো মেয়ে হবার দিন ক্রমশ কাছে এসে পড়ল। আঁতুড়ঘরে যাবার আগে রানিমা তাঁর বারোজন ছেলেকেই নিজের ঘরে ঢুকিয়ে চর্তুদিকে সেপাই-সান্ত্রি ঘিরে, সব দরজায় সাতটা করে তালা মেরে গেলেন। কিন্তু যেই না রানিমার মেয়েটি জন্মাল, তার কান্না শোনা গেল, ওমনি ঘুমে সেপাই-সান্ত্রিদের চোখ জড়িয়ে এল, তারা এ-ওর ঘাড়ে ঢুলে পড়ল। এক মিনিট পরে যখন তাদের সাড় এল, ঘর তখন খালি। একটিও রাজপুত্তুরকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অথচ একটাও তালা খোলেনি কেউ। কেবল অনেক উঁচুতে একটা ঘুলঘুলি খোলা ছিল।

রাজবাড়ির বুড়ো মালি বললে, সে বাগানে কাজ করতে করতে দেখেছে, রাজবাড়ির একটা ঘুলঘুলি থেকে পরপর একসারি বুনো হাঁস বেরিয়ে নীল আকাশে উড়ে গেছে। কিন্তু বুড়ো গাঁজা খায় বলে কেউ তার কথা বিশ্বাস করলে না।

এ-রাজ্য ও-রাজ্য ঢুঁড়ে অস্থির হয়ে গেলেন রাজামশাই। একটা নয়, দুটো নয়, বারোটা ছেলে। তাদের আট বছর বয়েস, তারা উধাও হয়ে যাবে কোথায়? রানি কেঁদে ভাসালেন, রাজা কেঁদে ভাসালেন—কিন্তু রাজপুত্তরদের খোঁজ পাওয়া গেল না। ফুটফুটে ছেলেদের হারিয়ে রাজারানি মনমরা হয়ে গেলেন। এমন সুন্দর মেয়েটি পেয়েও তাঁদের মুখে আর হাসি ফিরল না।

রাজকুমারী উষসী অবশ্য খুব লক্ষ্মী মেয়ে। যেমন তার স্বভাব মিষ্টি, তেমন তার শিক্ষা। আর দেখতে তো সে জন্মেছেই সুন্দর হয়ে। সে দ্যাখে মা-বাবার মনে সুখ নেই। দ্যাখে একটা ঘরে বারোটা খাট-বিছানা, বারোটা পড়ার টেবিল-চেয়ার, ঘোড়াশালে বারোটা তেজি ঘোড়া। অথচ ভাইয়েরা নেই। রাজবাড়িতে কেউ বলতেও পারে না তারা কোথায়। কেউ জানে না।

উষসী একদিন মাকে জিগ্যেস করলে—'আমার ভাইরা কোথায় গেল? তারা এ-বাড়িতে নেই কেন? ইস্কুলে তো ছুটি হয়, বাণিজ্য থেকেও লোকে ফেরে, চাকরি থেকেও ছুটি নেয়। আমার ভাইরা ফেরে না কেন?'

রানিমা তখন চোখের জলে ভেসে মেয়েকে বললেন পরিরানির কথা। নিজের দোষেই এত বড় ক্ষতি ডেকে এনেছেন, রানিমার কান্না আর থামে না। উষসী মায়ের মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে, তারপর মার গলা জড়িয়ে ধরে বললে,—'মাগো, তুমি আর কেঁদো না, আমি যাচ্ছি ভাইদের খুঁজতে। একটুও ভাবনা কোরো না, আমি তাদের উদ্ধার করে আনবই। দেখো, পরিরানি আমার সহায় হবেন।'

উষসীর তুলনা হয় না। যেমন তার সুবুদ্ধি, তেমনি তার সুসাহস। উষসী যায়, যায়, যায়। ঘন বন ঝামরে পড়েছে। এক ক্রোশ যায়, দু-ক্রোশ যায়, সন্ধে হয়, হয়, যখন

দশ ক্রোশ গেছে, ঊষসী দেখলে বনের মধ্যে একটা মখমল সবুজ উঠোন, তার মধ্যে কী সুন্দর একটা কুটির। ঠিক পাশ দিয়ে ঝিরঝিরে একটা ঝরনা-নদী বয়ে যাচ্ছে। যেন পটে আঁকা ছবি। ঊষসীর পা ব্যথা করছে, তার খিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে, কত পথ যে হেঁটেছে তার হিসেব নেই। ঝরনার জলে হাত মুখ ধুয়ে, আঁজলা ভরে জল খেয়ে, ছায়ায় বসে একটু জুড়োল। কুটির থেকে কেউ বেরুচ্ছে না দেখে শেষে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল।

ভেতরে ঢুকেই অতসীর চক্ষু চড়কগাছ! মেঝেয় দুধ-ধবধবে বারোটা বিছানা পাতা আছে। বারোটা পিঁড়ি পেতে তার সামনে বারোটা থালা-গেলাস-বাটি সাজানো রয়েছে। কেউ যেন এসে খেতে বসবে। খেয়ে উঠে ঘুমোতে যাবে। বারোটা গামছা শুকোচ্ছে দড়িতে। দরজার ধারে বারো জোড়া নাগরাজুতো। ঠিক যেমন ঊষসীর বাবা পায়ে দেন।

ঊষসী ঘুরে ঘুরে দ্যাখে কলসিতে মিষ্টি জল, কড়াতে দুধের ক্ষীর, ঝুড়িতে পাকা ফল। সুগন্ধে ঘর ম-ম করছে। ঊষসীর খিধে পেয়েছিল। পেট ভরে আম, কলা, ক্ষীর খেয়ে, ভাবছে একটু শুয়ে নেবে, অমনি ঝড়ের মতন শব্দ করে কারা যেন এসে পড়ল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল চোখ জুড়োনো বারোটি রাজপুত্তুর। ঊষসীকে দেখেই তারা হায় হায় করে উঠল।

—'ও হো হো, কী সর্বনাশ!' বলে গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

ঊষসী বললে,—'কেন, কেন? এতে অত হাহাকারের কী আছে? কী এমন সর্বনাশ করেছি আমি তোমাদের? একটু খাবার খেয়ে ফেলেছি কেবল! এই তো?'

ছেলেরা হইহই করে বলে উঠল,—'আরে না, না, সেজন্যে নয়। তুমি কিনা মেয়ে? তাই।'

ঊষসীর আরও রাগ হয়ে গেল।

—'বা রে? মেয়ে তো কী হয়েছে?'

—'একজন মেয়ের জন্যেই যে আমাদের এই দুর্দশা। বারো বছর হল এক পরির শাপে আমরা বুনো হাঁস হয়ে আছি। সারাদিন জলে জলে, খালেবিলে চরে বেড়াই, পোকামাকড়, মাছটাছ ধরে খাই। রাত্তিরে বাড়ি এসে মানুষ হয়ে মানুষের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। পরদিন উঠে, আবার হাঁস!'

ঊষসী বললে,—'কেন ভাই তোমাদের এই অবস্থা?'

—'আমাদের মায়ের একটা অন্যমনস্ক কথার জন্যে আজ আমাদের এই কষ্ট। আমরা তাই ঠিক করেছি এই ঘরে প্রথম যে মেয়ে পা দেবে, তাকে আমরা কেটে কুচিকুচি করব।'

শুনে ঊষসী একটুও ভয় না পেয়ে খুশিতে উথলে উঠে বললে,—'দাদাভাই, দাদাভাই, আমিই তোমাদের সেই অপয়া বোনটি, যার জন্যে তোমাদের এই দুরবস্থা। আমাকে তোমরা কাটবে কেমন করে? তোমাদের হারিয়ে বাবা-মা কেঁদে কেঁদে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন। তাঁদের মুখে আমি কোনওদিন হাসি দেখিনি। তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই আমি এই গহন বনে এসেছি। চলো আমার সঙ্গে।'

এবার ভাইদের কাঁদবার পালা। তারা বোনকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বললে— 'বোনটি, এত বড় কঠিন প্রতিজ্ঞা রাখার চেয়ে আমাদের মরে যাওয়াই ভালো।'

বলামাত্রই পরিরানি সেখানে উপস্থিত। তিনিই ওদের ফলমূল জুটিয়ে দিতেন, দুধের ক্ষীর বানিয়ে দিতেন, নিজেই যখন ভার নিয়েছেন, দেখাশুনো না করে উপায় কী? এখন এরা এত মন্দ কথা বলছে, উড়ে না এসে উপায় আছে? কেউ কোনও মন্দ ইচ্ছে প্রকাশ করলেই তিনি ঠিক শুনতে পেয়ে যান। আবার বুড়ি ঠান্‌দি সেজে লাঠি ঠুকঠুক করে হাজির হয়ে পরিরানি বললেন,—'বালাই ষাট! ও আমার কেমন কথা? ছিঃ। মরবে কেন? কক্ষনও না। অমন বিতিকিচ্ছিরি পণ করাটাই তো অন্যায় হয়েছে। শুধু শুধু একটা নির্দোষ মেয়েকে তোমরা মারবে বলে ঠিক করেছিলে কেন? রাগের মাথায় যদিও বা ভেবে থাকো, ঠান্ডা মাথায় এখন সে শপথ ভেঙে ফ্যালো। অমন হিংস্র শপথ রাখতে নেই।'

শুনে ভাইরা খুশি হয়ে বোনকে আদর করতে লাগল। উষসী বললে, 'চলো, তবে এবার তোমরা বাড়ি চলো?'—ভাইদের মুখ মলিন হয়ে গেল।

—'বাড়ি কেমন করে যাই বোন? দিনের বেলায় যে আমরা বুনো হাঁস হয়ে উড়ে যাই?'

উষসী শুনে বললে,—'সে কী? এই অন্যায় অভিশাপ কাটানোর কোনও মন্তর নেই?'

ঠান্‌দিদি পরিরানি তখন বললেন, 'থাকবে না কেন? আছে। কিন্তু সে বড় কঠোর ব্রত। পারবে তুমি সেই ব্রত পালন করতে? তোমার ভাইদের উদ্ধার করতে কেবল তুমিই পারো।'

উষসী বললে,—'কত কঠোর? যতই কঠিন হোক, আমি পারব। আমি সেই ব্রত পালনে রাজি। আমার ভাইদের আমি মানুষ জীবনে ফিরিয়ে আনতে চাই। তাতে ভালোই হোক আর মন্দই হোক।'

—'বেশ, তবে শোনো এই মহাব্রতের নিয়ম। জলা-জংলায় যে পাটবন হয়, সেই বুনো পাটগাছ তুলে এনে, তার ছাল ছাড়িয়ে, তা থেকে আঁশ বের করে, তাই থেকে সুতো কেটে, সেই সুতো দিয়ে বারোটা গেঞ্জি বুনে দিতে হবে বারোজন ভাইয়ের জন্যে। তা হলে তাদেরও আর কোনও শাপমন্যি লাগবে না, তোমরাও না। কিন্তু এই কাজ যখন করবে তখন তোমাকে চরম সংযমের ব্রত নিতে হবে। একটিও কথা কওয়া চলবে না, হাসা চলবে না, কান্নাকাটিও করা চলবে না। কারুর সঙ্গে কথা না বলে, না হেসে, না কেঁদে, একটানা পাঁচ-পাঁচটা বছর তোমাকে কেবল এই কাজটি করে যেতে হবে। পাঁচ বছর পর গেঞ্জি বোনা শেষ হয়ে যাবে। ভাইদের সেগুলো দিয়ে দিলেই ওদের শাপমোচন হয়ে যাবে। কিন্তু এত কঠিন কাজ তুমি কচি মেয়ে কি পেরে উঠবে?'

উষসী বললে, 'আমি মোটেই কচি মেয়ে নই। আমাকে দেখতে কচি-কচি হলে কি হবে? আমি এই ব্রত নিশ্চয় পালন করতে পারব।'

—'বেশ, তবে তোমার কথাবার্তা, হাসিকান্না সব বন্ধ এখন পুরো পাঁচ বছরের মতন।

কেবল খাবে, ঘুমোবে আর বুনবে।'

—'আর রান্নাবান্না? অন্য অন্য কাজ? ভাইরা তো দিনের বেলা থাকে না।'

—'ততদিন ভাইরাই তোমাকে খাওয়াবে পরাবে যত্ন করবে। কিন্তু যদি ব্রতভঙ্গ করো, হেসে ফ্যালো, কেঁদে ফ্যালো, কিংবা কথা কয়ে ফ্যালো, তা হলে কিন্তু জীবনে কোনওদিনও তোমার ভাইরা আর মানুষ হবে না, ওই বুনো হাঁস হয়েই বনে-বাদাড়ে উড়ে বেড়াবে। খুব শক্ত ব্রত কিন্তু! পারবে তো?'

উষসী বললে—'নিশ্চয়ই পারব। পারতে হবে বইকী। আমার ভাইদের না নিয়ে আমি বাড়ি ফিরবই না! বলে এসেছি মাকে।'

শুনে খুশি হয়ে বারো ভাই বললে, 'বোনটি, কুছ পরোয়া নেই—আমরাই তোমার সঙ্গে কথা বলব। আমরা তোমাকে গান শোনাব, তোমার যাতে মন ভালো থাকে। ভালো ভালো রেঁধে খাওয়াব, বনজঙ্গলের গল্প শোনাব, বারো বছরের কত গল্প জমে আছে, পাঁচ বছরে ফুরোবেই না। তোমাকে কোনও কথা বলতে হবে না।'

পরিরানি বললেন—'কিন্তু বাছারা, হাসির গল্পও বলা চলবে না, দুঃখের গল্পও বলা চলবে না, হেসে ফেললেও ব্রতভঙ্গ, কেঁদে ফেললেও ব্রতভঙ্গ। আর এমন কোনও প্রশ্নও কোরো না, যাতে ওকে কথা বলে উত্তর দিতে হয়। ঘাড় নাড়লে, ঠিক আছে।'

বারো ভাই একসঙ্গে বলে উঠল—'তাই হবে ঠান্‌দিদি!'

উষসীও বললে—'আশীর্বাদ করো ঠান্‌দিদি, যেন ব্রত রাখতে পারি।'

শুনে ফোকলা হেসে পরিরানি বললেন, 'আশীর্বাদে তো হবে না বাছা, তোমার চেষ্টাতেই হবে যা হবার।' বলেই উধাও হয়ে গেলেন।

উষসী তো বেরুল জলা খুঁজতে। বারো ভাই বুনো হাঁস, তারা জলা-জংলা চেনে। আগে আগে উড়তে উড়তে বোনকে নিয়ে গেল পথ দেখিয়ে সেই বিলের কাছে যেখানে অজস্র পাটখেত আপনি হয়ে রয়েছে। না, খেত ঠিক নয়, জংলা পাটবন। উষসী যত্ন করে পাটগাছের ছাল ছাড়িয়ে তার আঁশ ছাড়িয়ে সুতো বুনতে লাগল। পরিরানি জাদুবলে তাকে সবই শিখিয়ে দিলেন মনে মনে। সুতোর গুলি পাকাতে পাকাতেই তো দু'বছর কেটে গেল। তারপর শুরু হল গেঞ্জি বোনা। বছরে চারটে করে গেঞ্জি বুনতে পারছে উষসী। চার বছর যখন শেষ, তখন আটটা গেঞ্জি বোনা হয়েছে। আরও এক বছর বাকি, বাকি চারটে গেঞ্জি তার মধ্যে নিশ্চয় বুনে ফেলতে পারবে।

সারাদিন ভাইরা বুনো হাঁস হয়ে বনে উড়ে যায়, উষসী একা একা বসে গেঞ্জি বোনে। একদিন এক রাজকুমার বনের মধ্যে মৃগয়া করতে এসে পথ হারিয়ে উষসীর বাড়িতে হাজির। রাজকুমার যে কথাই জিগ্যেস করেন, বেচারি উষসী উত্তর দেয় না, চোখ দিয়ে উত্তর দেবার চেষ্টা করে। তাই দেখে রাজকুমারের প্রাণে খুব মায়া জাগল, তাঁর মনে হল এই করুণ চেহারার সুন্দরী মেয়েটি নিশ্চয় বোবা। দেখামাত্রই রাজকুমার উষসীকে ভালোবেসে ফেললেন। উষসী যদিও কথা বলে না, রাজকুমার তাকে নিজের কথা বললেন। তিনি উত্তর দেশের রাজার ছেলে, তাঁর উষসীকে রানি করতে ইচ্ছে হয়েছে। উষসী কি যাবে তাঁর সঙ্গে, সাদা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে, উত্তর দেশে?

উষসীর তখনও চারাটে জামা বোনা বাকি—সে কী করে? কথা বলা চলবে না, হাসিকান্নাও বন্ধ। উষসী ঘাড় নেড়ে বললে—না। রাজকুমার ফিরে গেলেন।

কিন্তু পরদিন দুপুরে আবার এল পক্ষীরাজ—রাজকুমার এসে আবার অনেক মিনতি করলেন উষসীকে। উষসী তার সুতোর গুলি আর জামাগুলো দেখাল—আরও চারটে বাকি বোঝানোর চেষ্টা করল আঙুলে।

রাজকুমার কী বুঝলেন কে জানে, তিনি হাঁটু গেড়ে বসে দু-হাতে উষসীর হাত দুটি ধরলেন। উষসীরও রাজকুমারকে খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু ব্রত আছে যে? সে ঝুড়ি ভরে তার সুতো, আর আটটা তৈরি জামা নিয়ে, রাজপুত্তুরের হাত ধরে পক্ষীরাজে উঠে বসল। মনে মনে জানে যে, তার ভাইরা ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে। নইলে ঠান্‌দিদি পরিরানি তো জানতেই পারবেন। তিনি তো সবই দেখতে পান।

উত্তর দেশের রাজকুমারের এক সৎমা ছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল নিজের প্রিয় ভাইঝির সঙ্গে রাজকুমারের বিয়ে দেন। এদিকে রাজকুমার নিজে নিজেই বিয়ে করে নিয়ে এলেন এক পরমা সুন্দরী কন্যেকে। বনের মেয়ে, কথা বলে না, নাম বলতে পারে না, ঠিকানা বলতে পারে না, হাসে না, কাঁদে না। এসেই প্রথমদিন পায়ে কাঁটা ফুটে রক্তারক্তি। ছুরি দিয়ে রাজবদ্যি সেই কাঁটা বের করে দিলেন। তাতেও চোখে একবিন্দু জল পড়ল না।

বিয়ের উৎসব হল খুব ঘটা করে। রাজা তো ছেলেকে খুব ভালোবাসেন। কতরকমের মজার কাণ্ড-কারখানা করল রাজসভার বিদূষক আর সঙেরা। সব লোকের হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা হয়ে গেল। আর নতুন বউ? ঠিক যেমন দুর্গাপ্রতিমার মতন শান্ত মুখ, তেমনিই রইল। এ কখনও স্বাভাবিক হতে পারে? রানিমার দু-চক্ষের বিষ উষসী। কবে যে তাকে দূর করে নিজের ভাইঝিকে আনবেন, তাঁর কেবল মাথায় সেই চিন্তা। যুবরানি হয়েছ, কোথায় আনন্দ করবে তা নয়, দিনরাত্তির মাথা গুঁজে কী সব বিশ্রী পাটের সুতোর গেঞ্জি বুনছে। এক ঝুড়ি গেঞ্জি পাশে নিয়ে বসে আছে সবসময়। কী দেখে যে এমন পাগলিকে মনে ধরল রাজকুমারের? মাঝে-মাঝে রানিমার ইচ্ছে হয় ওই গেঞ্জির ঝুড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে। কিন্তু উপায় কী? যুবরানির পাশে সবসময়ে আছে একশো সখী। যুবরানি তাদের সঙ্গে কথাও বলে না, হাসিঠাট্টাও করে না। তবু তারা ওকে যত্ন করে।

এমন সময়ে উষসীর বাচ্চা হবার সময় হল। আঁতুড়ঘরে কেবল আছেন রানিমা আর ধাইমাবুড়ি। উষসীর চমৎকার একটি মেয়ে হল। রানিমা বললেন ধাইমাকে, 'তুমি যাও বাছা, একটু হাত ধুয়ে খেয়েদেয়ে এসো। অনেক তো পরিশ্রম করেছ? আমি ততক্ষণে বাচ্চার কাছে আছি!' ধাইমা যেই বাইরে গেছেন, রানিমা অমনি বাচ্চাটাকে নিয়ে জানলার ধারে গেলেন ছুড়ে নীচে ফেলে দেবেন বলে। গিয়ে দেখেন, চমৎকার। একটা নেকড়ে বাঘ! বাগানে এসে, জিব চাটতে চাটতে ঠিক এদিক পানেই তাকাচ্ছে! রানিমা 'হুশ! যাঃ' বলে বাচ্চাটাকে নীচে ফেলে দিলেন, আর নেকড়ে বাঘ তাকে মুখে করে লুফে নিয়ে চলে গেল। রানি তখন নিজের আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত বের করে ঘুমন্ত উষসীর ঠোঁটে মুখে বেশ করে মাখিয়ে দিলেন। তারপর কেঁদেকেটে বুক চাপড়ে হাহাকার করতে করতে রাজাকে ডেকে আনলেন—'দ্যাখো, তোমার ছেলের বউ রাক্ষুসি। নিজের বাচ্চা নিজে খেয়ে ঘুমিয়ে

আছে।' ঘুমন্ত ঊষসীর ক্লান্ত, মিষ্টি, সরল, স্বর্গীয় মুখটি দেখে রাজার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না যে এই কচি মেয়েটা রাক্ষুসী। কিন্তু ব্যাপার তো বোঝা গেল না? বিচার চাই। এদিকে রাজকুমার দেশে নেই। মৃগয়া করতে বেরিয়েছেন পূর্ব দেশে। রাজকুমার না ফিরে এলে তাঁর বউকে শাস্তি দেওয়াটা ঠিক হবে না। রাজা বললেন, 'যুবরাজ ফিরে এলে, বিচারসভা বসবে। বারোজন ভাইয়ের জীবন নির্ভর করছে তার ওপরে। একটা হাতা শেষ হতে যুবরাজ ফিরে এলেন। তাঁকে জানানো হল যে, তাঁর সুন্দর একটা মেয়ে হয়েছিল ঊষসীর মতনই দেখতে। কিন্তু ঊষসী রাক্ষুসি। সে তাকে লুকিয়ে খেয়ে ফেলেছে। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে গেঞ্জি বুনে চলেছে। যদি ও নিজেই বাচ্চাকে না খেত, তা হলে কি এমন ধীরস্থির থাকত? বাচ্চাকে খুঁজত, কান্নাকাটি করত। কিন্তু যুবরানি যেমনকে তেমনি। যেন পাথর প্রতিমাটি। মুখে টুঁ শব্দটি নেই। চোখে একফোঁটা জল নেই। এ মেয়ে রাক্ষুসি না হয়েই যায় না।

ঘরদোর জানা নেই, নামধাম জানা নেই, অমন বন থেকে কুড়োনো মেয়েদের কখনও ঘরের বউ করে আনতে নেই। রূপকথায় কে না পড়েছে, যে তারা সব রাক্ষুসি হয়? তারপর ঘোড়াশালের ঘোড়া খায়, হাতিশালের হাতি খায়। এও সময় পেলে সে সবই করবে। খিদে পেলে রাজপুত্তুরকেই হয়তো খেয়ে ফেলবে। কে জানে? এসব কথা শুনে রাজকুমারের মন খুবই বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। তিনি ঊষসীকে জিগ্যেস করলেন—'যা শুনছি এসব কি সত্যি?'

ঊষসী ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল—'না।'

—'তুমি কি বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলেছ?'

ঊষসী এমন অদ্ভুত কথার কী উত্তর দেবে? রাগে দুঃখে লজ্জায় ঘেন্নায় সে কোনও উত্তরই দিল না। নিজের মেয়ে হারিয়ে তারমনে একে কষ্টের শেষ নেই, আবার তাকেই কিনা বলছে, 'খেয়ে ফেলেছ?' ঊষসী চুপ করে বুনে যেতে থাকল।

—'তোমাকে তা হলে ফাঁসি দেওয়া হবে'—বললেন সৎমা, আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে। ঊষসী চুপ করে বুনেই চলল। শেষ হাতাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

তারপর সেপাই-সান্ত্রীরা তো পালকি করে ঊষসীকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে এল। ঊষসী নামল গেঞ্জির ঝুড়ি নিয়ে। যুবরাজের দুচোখে জল বাধা মানছে না। তিনি ঊষসীর দুহাত ধরে বললেন—'মাথা নেড়ে শুধু একবারটি বলে দাও, তুমি নির্দোষ, তুমি কক্ষনও আমাদের বাচ্চাটাকে খেয়ে ফ্যালোনি। আমি জানি তুমি এমন কাজ করতেই পারো না।'

রাজকুমারের কথায় এবার ঊষসীর চোখের জল ঝরে পড়ল। ঊষসী কথা বলে উঠল—'না যুবরাজ—এমন নিষ্ঠুর অভিযোগকে উত্তর দেবার যোগ্য কথা বলে আমি মনে করি না। আমার হারানো মেয়ের জন্যে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে—আর তোমরা আমাকেই—'

এমন সময়ে ঝড়ের মতন শব্দ করে একদল রংচঙে বুনো হাঁস উড়ে এসে ঊষসীকে ঘিরে ধরল। আর অমনি একমুখ হেসে, ঊষসী ঝুরি থেকে গেঞ্জি নিয়ে একটা একটা করে হাঁসেদের গায়ে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা অপরূপ রূপবান এক-একজন রাজপুত্র হয়ে

যেতে লাগল। প্রত্যেকের হাতে রোদে ঝকঝক করছে খোলা তলোয়ার। ফাঁসি দেখবে বলে যারা এসেছিল, তাদের চক্ষু চড়কগাছ।

—'উষসী আমাদের একমাত্র বোন। আমরা দক্ষিণ দেশের রাজপুত্র। উষসী রাজকন্যা। ওকে ফাঁসি দেবার আগে তোমরা এসো, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো।' ঝনঝনাৎ করে ভয়ংকর শব্দে বেজে উঠল বারোটা ইস্পাতের তলোয়ার! যুবরাজ এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে বললেন—

—'তলোয়ার বন্ধ করো ভাই, আমরা পরস্পরের কুটুম—এসো এসো, তোমাদের আতিথ্য পাওনা আছে আমাদের ঘরে। উষসী আমার অতি আদরের বউ, আমি ওকে কক্ষনও ফাঁসি দিতে দিতুম না।'

—'কিন্তু তার আগে আমি বিচার চাই যুবরাজ,' উষসী বলল,—'কে আমার বাচ্চা চুরি করেছে? আজ তাকেই শাস্তি দেওয়া উচিত।'

উষসীর মিষ্টি গলায় স্পষ্ট কথা শুনে তো সভা মুগ্ধ—রাজবাড়িতে সবার মধ্যে আনন্দের রোল পড়ে গেছে। সবচেয়ে খুশি যুবরাজ নিজে। 'কিন্তু এতদিন তুমি কথা কওনি কেন কন্যে? তোমার নাম কী, তাও বলোনি!'

—'আমার নাম উষসী!'

তখন ভাইরা যুবরাজকে সব কথা জানাল। কত কঠোর সংযমব্রত পালন করে, কত কঠিন সাধনার পরে উষসী তার বারোজন ভাইকে মনুষ্যজীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। কথা বলাই শুধু নয়, হাসিকান্নাও তার বারণ ছিল। চরম অন্যায় অভিযোগেরও উত্তর দিতে পারেনি, সন্তানশোকেও চোখের জল ফেলতে পারেনি। একবার ভুল করলেই বারোজন ভাইকে জন্মের শোধ হারিয়ে ফেলতে হত। এমন অসামান্য সংযম কেবল মুনিঋষিদেরই থাকে! এরই নাম তপস্যা!

উষসীর কঠোর ব্রতের কথা জেনে তো সভাসুদ্ধু মানুষ শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে থ! মহারাজ কেবল বারবার রানিমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, একটু অদ্ভুত চোখে। তাঁর মনে কী একটা সন্দেহ হচ্ছিল।

ঠিক এমন সময়ে সভার মধ্যে একটা নেকড়ে বাঘ এসে হাজির হল। অতি আজব দৃশ্য—নেকড়ে বাঘের মুখ থেকে একটা ছোট্ট বেতের দোলনা দুলছে। সেই দোলনায় শুয়ে শুয়ে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে উষসীর মেয়ে। এদিকে নেকড়ে বাঘকে দেখেই তো সৎমা ভয়ে সিঁটিয়ে গেছেন।

নেকড়ে দোলনাটা নামিয়ে রেখে সৎমার ঘাড়টা কামড়ে ধরে, এক লাফে বেরিয়ে গেল প্রাসাদ থেকে।

কী হল? কী হল? চমক কাটতে না কাটতেই ঠানদিদি বুড়ি সেজে পরিরানি এসে হাজির। তিনি বললেন নেকড়ে বাঘ হয়ে তিনিই সেদিন বাচ্চাটা নিয়ে গেছলেন, নইলে বাগানে আছড়ে ফেলে ওকে তক্ষুনি মেরেই ফেলতেন দুষ্টুবুদ্ধি রানিমা। রানিমার জন্যে তখন আর কারুর দুঃখু হল না। কিন্তু পরিরানি তো আর সত্যি সত্যি নেকড়ে বাঘ নন? তিনি দুষ্টু সৎমাকে খাননি। কেবল বহুদূর মরুভূমির প্রান্তে ছেড়ে দিয়ে

এসেছেন। কিছুদিন একটু তিনি কষ্ট করুন, তারপর স্বভাব শুধরে যাবে। তখন তিনি ফিরে আসবেন বাড়িতে।

উষসী এইভাবে খুদে রাজকুমারীকে কোলে করে আর বড় বড় বারোজন রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে, অনেক সুন্দর সুন্দর উপহার সমেত, যুবরাজের সঙ্গে সাদা পক্ষীরাজের চড়ে দক্ষিণ দেশে ফিরে চলল। মা-বাবার কাছে বুঝি ভাইদের পৌঁছে দিতে হবে না? তাঁরা তো পাঁচ-পাঁচটা বছর তারই আশায় আশায় দিন গুনছেন। কবে তাঁদের উষসী ফিরবে, তাঁদের হারানিধি নিয়ে।

আমার কথা ফুরিয়ে গেল,
বুনো হাঁসরাও উড়িয়ে গেল—
যাঃ—*

* একটি আইরিশ উপকথায় ছায়া অনুসরণে।

দয়ালু রাজা

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁকে দেশের লোকেরা খুব ভালোবাসে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না। রাজা যেন ঠিক আর সব রাজাদের মতন নন। একটু আলাদা রকম মানুষ। রূপসায়রের পাড়ে একটা মেলা বসে প্রত্যেক ঝুলন-পূর্ণিমাতে। সেখানে সবদেশের সদাগরেরা বেসাতি নিয়ে আসে, যার সেটা সবচেয়ে ভালো জিনিস রাজা সেটা কিনে নেন। তারপর যার কাজে লাগবে তেমন কাউকে দান করেন। যেমন ধরো, হিমানীপুর থেকে সদাগরেরা সবাই আনে গরম ঘরকে ঠান্ডা করবার যন্ত্র। রাজা সবচেয়ে ভালো যন্ত্রটি কিনে দেশের সবচেয়ে ভালো গোয়ালাকে দিলেন। তার মাখন ক্ষীর যাতে গরমে নষ্ট না হয়ে যায়। লেখনীপুরের সদাগরেরা আনে কলম। খাগের কলম, হাঁসের পাখার কলম, ময়ূরপাখার কলম, রুপোর কলম, জড়োয়া-পাথর বসানো কলম, একসঙ্গে লাল কালি, নীল কালি ভরা যায় এমনি দু-নলা ঝরনাকলম, এইসব। রাজা সবচেয়ে ভালো কলমটি কিনে কবিশেখরকে দিলেন। এমন আর কী। রাজার যেন দয়ার শরীর, তেমনি ধীরস্থির বুদ্ধি, আর খুব সাহসী তিনি। একবার পরদেশ থেকে অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে এক দস্যুরাজা এসেছিল, রাজা তখন গিয়ে এমন যুদ্ধ করলেন, দেশের লোকেরা অবাক হয়ে গেল। সেই থেকে তারা জানলে যে তাদের রাজা অস্ত্রচালনায় পটু। আগে এ খবরটা কেউ জানতই না। জানবে কী করে? এ-রাজা যে মৃগয়া করেন না। তিনি বলেন, আহা, বনের পশু বনে আছে, থাকুক। শুধু শুধু কেন তাদের কষ্ট দেওয়া। রাজাকে দুষ্ট লোকেরা পিছনে বলত—ভীরু, বনে যেতে ভয় পান। কিন্তু পরদেশের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের সময়

তারা দেখলে, রাজা কত সাহসী—প্রাণে ভয়ডর বলে কিছু নেই। দুষ্টু লোকেরা লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেল।

রাজা আপনমনে রাজ্যময় ঘুরে বেড়ান পায়ে হেঁটে। কবিশেখরই তাঁর মন্ত্রী, রাজা নিজেই রাজ্যের সেনাপতি। রাজ্যে কোটাল বলে কেউ নেই। দেশে কাউকেই শূলে চড়ানো কিংবা ফাঁসি দেওয়া হয় না। কেউ চুরিটুরি করলে সেপাইরা ঠিক তাদের ধরে ফেলে; আর তাদের দু-বছরের জন্যে একটা দ্বীপে খানিকটা জমি দিয়ে দেওয়া হয়। সেই জমিতে তারা কুটির বাঁধে, চাষবাস করে, একা একা থাকে। থাকতে থাকতে একটা মায়া পড়ে যায় তখন তাদের বউ-বাচ্চাদের সেখানে পাঠিয়ে দেন রাজা, তারা বউ-বাচ্চাদের নিয়ে সেখানেই থাকে। আর চুরি করে না।

দেশে সবাই যথেষ্ট খেতে পায়, পরতে পায়, তাই চুরি-জোচ্চুরি করেও না কেউ বড় একটা। সবাই মিলে সুখে-শান্তিতে থাকে।

রূপসায়রের মেলায় ব্যাধেরা কত পাখি ধরে আনে। রাজা একা সমস্ত পাখি কিনে নেন। তারপর প্রতিপদের ভোরবেলায় সূয্যি ওঠার সময়ে তাদের খাঁচার দরজাগুলি খুলে দেন। বনের পাখিরা রাজাকে আশীর্বাদ করতে করতে বনে উড়ে যায়।

রাজা মাছ খান না, মাংস খান না, ডিম খান না, জ্যান্ত প্রাণী মেরে খাবার কথা ভাবতেই তাঁর মনে এত কষ্ট হয়।

রাজার রাজভোগ হয় ফলে, ছানায়, শাক-সবজিতে, দুধে-ভাতে।

রানিদের এসব মোটে পছন্দ হয় না। রাজার তিনটি রানি। বড় রানি ধবধবে সাদা, সোনালি ঢেউ-খেলানো তাঁর চুল, নীল কাচের মতন চোখ। তিনি বেশ মিশুক। মেজোরানির গায়ের বর্ণ কাঁচা হলুদ, চোখ দুটি যেন বাদামচেরা, কুচকুচে কালো; খাড়াখাড়া পা পর্যন্ত লম্বা ইয়া ভারি চুলের বহর—ছোট্ট-খাট্ট লাজুক মানুষটি। আর ছোটরানি? তাঁর গায়ের বর্ণ মাকালীর মতো ঘনশ্যাম। কোঁকড়া-কোঁকড়া, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া একমাথা চুল, হাসিটি সেই কালো মুখে শ্বেত-পাথরের মতন ফুটে আছে—ঠিক যেন স্বয়ং শ্যামা-মা। কিন্তু শরীরে তাঁর রাগ নেই। তিন রানিতে খুব ভাব। কক্ষনও ঝগড়া হয় না। রাজা যখন যুবরাজ ছিলেন, একবার দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তখন নানাদেশ থেকে এইসব রত্নের মতন কন্যেগুলিতে কুড়িয়ে এনেছেন। এঁরা সবাই যে রাজকন্যে, তাঁদের হাবভাব, চলাফেরা দেখলেই তা বেশ বোঝা যায়। প্রত্যেকের মুখে নরম মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। কিন্তু কেউই তাঁরা রাজার ভাবসাব বোঝেন না। রাজামশাইয়ের বিধবার মতন নিরিমিষ্যি আহার, তাঁর ফকিরের মতন হেঁটে-হেঁটে রাজ্যিময় ঘোরা, তাঁর সোনার মুকুট পরতে লজ্জা করা, এসবই রানিদের আশ্চয্যি লাগে। রাজা মাথায় একটা মোটা জুঁই ফুলের গোড়ে মালা জড়িয়ে রাখেন—তার নীচে রাজমুকুটটা লুকোনো থাকে। রাজার হাতে নানা ফুলের গাঁথা একটা ছড়ি থাকে, সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে উনি পথ হাঁটেন। তার ভেতরে রাজদণ্ড লুকোনো আছে কি না আছে, কেউই জানে না, এমনকী রানিরা পর্যন্ত না। তাঁরা নিজের দেশে যেমনটি দেখে এসেছেন, এ-রাজার সঙ্গে তার কিছুই যেন মেলে

না। তাঁরা যত দেখেন, তত আশ্চয্যি হন।

রানিরা আবার অন্তঃপুরচারিণী নন। রাজা মোটে ভালোবাসেন না কেবল অন্তঃপুরে থাকা। বলেন, তোমরাই দেশের লোকেদের মা। মায়েদের কখনও সন্তানের কাছে পরদার আড়াল হলে চলে? রানিরা তাই রাজার পাশে-পাশে তিনটি সিংহাসনে সভায় বসেন রোজ সকালে। বিচার যখন চলে, রাজা তখন রানিদেরও মত চান। রাজার দয়ালুপনাতে মাঝে-মাঝে কিন্তু রানিদের খুব রাগ হয়ে যায়। কিন্তু মুখে প্রকাশ করেন না, লোকে তা হলে মন ছোট ভাববে কি না।

একদিন একজন মৃত্যুমুখী ব্রাহ্মণ এসে বলল, মরবার সময়ও তার মনে শান্তি নেই। কেন না তাঁর মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। বোবাকালা বলে সে-মেয়েকে কেউ বিয়ে করবে না। রাজা বললেন, 'ঠিক আছে, তা হলে আমিই তাকে বিয়ে করব। ব্রাহ্মণ, আপনি মেয়েকে ডাকুন।' গরিব ব্রাহ্মণ তো অবাক! সে নিজের কানকে নিজে বিশ্বাস করতে পারলে না। তার বোবাকালা মা-হারা অভাগী মেয়েটা হবে রাজরানি? সে আহ্লাদে দুহাত তুলে রাজাকে আশীর্বাদ করতে-করতে সেখানেই মরে গেল। রাজা তার মেয়েটিকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। মেয়ের গায়ের রংটি ঠিক যেন গঙ্গাজলের মতো গেরুয়া-বাদামি। তার চোখ দুটি যেন তাতে ভেসে-বেড়ানো দুটি কালো-সাদা রাজহাঁস, সে-চোখে আজন্ম দুঃখের কাজল পরানো। এক-আকাশ মেঘের মতো চুল, কেউ বেঁধে দেয়নি। মা নেই কিনা তার। পরনে ছেঁড়া ধানি রঙের শাড়ি, যেন গঙ্গার ধারে ধানখেত! পদ্মলতা হাত দুটিতে দুটি রুলিও নেই, পায় নূপুর নেই, কানে মাকড়ি পর্যন্ত নেই। এত গরিব তারা। রাজা অবাক হয়ে ভাবলেন, আহা, আমার রাজ্যে এত গরিবও আছে! এবার তো আরও ভালো করে দেখতে হবে, আরও ঘুরে ঘুরে।

বড়-মেজো-ছোটরানি তিনজনে বাঁ-হাত দিয়ে বরণ করে হেলায় অচ্ছেদ্দায় নতুন রানিকে ঘরে তুললেন। তাঁরা তিনজনে সুন্দরী, কিন্তু এই বোবাকালা মেয়ের দুঃখিনী রূপের কাছে তাঁরা যেন বাসিফুলের মতন মলিন হয়ে গেলেন। বড়রানি, মেজোরানি, ছোটরানির খুব হিংসে হল। এদিকে বোবাকালাকে হিংসে করতেও লজ্জা। তাকে তো ক্ষ্যামাঘেন্না দয়াধর্ম করতেই হবে। সে যে ধরিত্রীর মতো চুপচাপ। অথচ রানিমায়েরা কিছুতেই মন থেকে তাকে ভালোবাসতে পারছেন না। থালার কোণে ছাই বেড়ে খেতে দেন।

বামুনের মেয়েও মনে জানে, রানিরা তাকে ভালো চোখে দ্যাখেননি। তাই তো প্রাণপণে খাটে। খেটেখেটে রানিদের মন রাখতে চায়। তাঁদের চুল ধুয়ে দেয়, চুল শুকিয়ে দেয়, পায়ে আলতা পরিয়ে দেন, নখ কেটে দেয়, কাপড় কেচে দেয়, দাসী, নাপিতিনি, ধোপানি সকলের কাজ একা করে। রাজবাড়ির দাসীদের কাজের ছুটি আছে, নতুন রানির ছুটি নেই। সারারাত রানিদের বাতাস করে মশা তাড়িয়ে দেয়, পা টিপে দেয়। সে ভালো করে খায় না, ভালো করে ঘুমোয় না, কেবলই এক মনে রানিদের সেবা করে। তারপর একদিন তার একটি মেয়ে হল। তিন রানিকে নিয়ে রাজা গেলেন মেয়ে দেখতে। গিয়ে দেখেন মেয়ে মায়েরই মতন সুন্দরী। তিন রানির খুব রাগ হল। তাঁরা ঠিকরে চলে এলেন।

রাজা আদর করে মাথার জুঁইফুলের গোড়ে মালাটি মেয়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। অমনি তার বোবা মায়ের দুঃখী-দুঃখী ভাবটি কেটে গিয়ে তাকে যেন দুর্গাপ্রতিমার মতন দেখতে হয়ে গেল।

এমন সময়ে একবার রাজপুত্তুরের খুব অসুখ করল। রাজবৈদ্য কিছুতেই সারাতে পারে না, কত হাকিম, কত বদ্যি এল গেল। শেষকালে দৈববাণী হল একদিন, 'যদি কোনও মা তার সন্তানকে ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রে মা-কালীর কাছে বলি দিয়ে সেই রক্ত এনে রাজার ছেলের কপালে ছোঁয়ায়, তা হলেই রাজার ছেলে বাঁচবে। নইলে ওই রাতেই তাঁর মৃত্যু।'—রাজা শুনেই হুকুম জারি করলেন, 'খবরদার! আমার ছেলের বেঁচে কাজ নেই। তার আয়ু যদি ফুরিয়ে যায় তাকে আমরা টানাটানি করে বাড়াতে পারব না। কিন্তু কোনও প্রজা যেন তার সন্তানকে বলি দিতে না যায়।'—রাজাকে খুশি করবার লোভে লোকে যে কত কী পাগলামি করে ফ্যালে তার তো ঠিক নেই। কারুর হয়তো দশটা ছেলেমেয়ে। সে এত গরিব সব ক'টাকে খেতে পরতে দিতে পারে না, সে তখুনি একটাকে বলি দিতে রাজি। তার বদলে রাজা নিশ্চয় অনেক ধন-সম্পত্তি দেবেন, তার অন্য ন'জন ছেলেমেয়ে ভালোভাবে বেঁচে যাবে। এইসব হিসেব করে অনেকে। দুঃখে-কষ্টে মানুষের হিসেব অনেক সময় অন্যরকম হয়ে যায় কিনা, রাজা তাই আগেই বারণ করে দিলেন সবাইকে।

রাজপুত্তুর এদিকে মারা যাচ্ছেন। তার দেহ বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। চার মা সারাদিন সেবা করেন। আর কাঁদেন। দয়ালু রাজার মুখে আর হাসি নেই। দেখতে দেখতে ঝুলন-পূর্ণিমা এসে পড়ল। রূপসায়রের মেলা বসবে। বাইরের দেশের সদাগরেরা এল। রাজার মুখে হাসি নেই। দেশে আনন্দ নেই। কী হল? না রাজার ছেলে মারা যাচ্ছে। আজই শেষ রাত্রি। শুনে সদাগরেরা ছাউনি গুটিয়ে ফেলে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে বসল।

রাজপুরীতে রাত্রি যেন কাটছে না। রাজা বিলাপ করছেন—'হে পূর্ণিমার রাত্রি, তুমি পোহায়ো না, হে আমার পুত্রের আয়ু, তুমি ফুরায়ো না।' রাজার খাওয়া নেই, ঘুম নেই—রাজা ছেলে কোলে করে ঠায় বসে আছেন। তিন রানি লুটিয়ে কাঁদছেন। সোনার চাঁদ রাজপুত্তুরের চোখে চাউনি নেই। মুখে কথা নেই। নিশ্বাসটুকু পড়ে কি পড়ে না। ছোট্ট রাজকন্যেকে কোলে নিয়ে নতুন রানি পাশেই স্থির হয়ে বসে ভগবানের নাম করছেন মনে মনে। তাঁর মুখে তো শব্দ নেই। শুধু চোখ দিয়ে জল ঝরছে। ভোরের দিকে রাজা একবার চেয়ে দেখেন কী, চারজন রানিই উঠে গেছেন। তারপর ভাবলেন, হয়তো খুব নরম মন বলে এ-দৃশ্য দেখতে পারছেন না। বসে থাকতে-থাকতে কাঁদতে-কাঁদতে রাজার ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল। আসলে তিন রানি তখন ঠাকুরঘরে হত্যে দিয়ে আছড়ে পড়েছেন। হঠাৎ রাজার মনে হল যেন রাজপুত্তুর চোখ মেলেছেন। ভালো করে চেয়ে দ্যাখেন—তাই তো? ঝুলন-পূর্ণিমার চন্দ্রদেব কখন অস্ত গেছেন—পুব আকাশ আলো করে দিনমণি সূর্য উঠছেন, আর রাজপুত্তুর বাবার মুখের

দিকে চেয়ে অল্প-অল্প হাসছেন!

এ কী হল? তবে তো দৈববাণী ভুল! রাজার ছেলের তো আয়ু ফুরিয়ে যাবার কথা এই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে? তা হলে? রাজা হঠাৎ দেখেন, ছেলের কপালে তাজা রক্তের টিপ!

কে দিলে? কে দিলে? কখন দিলে? কে করলে এমন ভয়ানক কাজ? কোন নিষ্ঠুর মা, কোন লোহার হৃদয় যা রাজার ছেলের প্রাণটা ফিরিয়ে দিয়ে গেল গো?

রাজা পিছনে, সামনে, আশেপাশে কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না। তিন রানিমা ছুটে এলেন। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু নতুন রানি এলেন না। রানিরা বললেন, 'কী হিংসুটি! আমাদের ছেলে বেঁচে উঠেছে কিনা, তাই হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে তার। মেয়ে রাজসিংহাসন পেত যে নইলে?' রাজা বললেন, 'ছিঃ! এমন কথা মনেও আনতে নেই। হতেই পারে না। সারারাত জেগে সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। দাসীদের পাঠাও ওকে ডাকতে। খুব আনন্দের দিন আজ। সবাই মিলে আনন্দ করতে হবে।' দাসীরা খুঁজে এল। অন্দরের কোথাও তো নেই ছোটরানি?

শেষে খুঁজতে খুঁজতে দেখে কী, বাগানের মধ্যে শ্বেতপাথরের মন্দির আছে, সেখানে মেয়ে কোলে নতুন রানি অজ্ঞান হয়ে শুয়ে। মেয়ের ছোট্ট গলাটি খড়্গ দিয়ে কাটা। রক্ত পড়ে শ্বেতপাথরে দালান যেন লালপাথরের হয়ে গেছে।

রাজা দৌড়ে এলেন। এত রক্তও ছিল এইটুকুনি একরত্তি মেয়ের শরীরে! রানিরা ছুটে এলেন। কবিবেশখর এলেন। প্রজারা এল। রাজবৈদ্যও এলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও রানির জ্ঞান আর ফিরল না। নিশ্বাস আর পড়ল না। দয়ালু রাজা কেঁদে উঠে মা-কালীকে বললেন, 'মাগো, তোমার মনে এই ছিল? বোবাকালা দুঃখিনী মেয়েটার কপালে এত দুঃখুও তুমি লিখেছিলে! আমি যদি জীবনে জ্ঞাতসারে কোনও পাপ না করে থাকি, তা হলে এই মুহূর্তে ওদের পুণ্যের প্রাণ ফিরিয়ে দাও। তার বদলে আমার প্রাণটা নাও।' বলে রাজা খড়্গটি তুলে নিজের গলায় এক কোপ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল, খড়্গটি রাজার হাত থেকে ছিটকে মা-কালীর হাতে ফিরে গেল। রাজা অবাক হয়ে দেখলেন বামুনের মেয়ের কোলে রাজার মেয়েটি কেঁদে উঠল। নতুনরানি উঠে বসে চারদিকে এত লোকজন ভিড় দেখে লজ্জায় একগলা ঘোমটা টেনে মেয়েকে দুধ খাওয়াতে বসলেন। রাজা ডাকলেন নতুনরানিকে— 'ধন্য মা তুমি! তুমি মানুষ নও নতুন রানি, তুমি দেবতা।' তিন রানিই ছুটে এসে, নতুন বইয়ের পায়ে পড়লেন। চোখের জলে ক্ষমা চাইলেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে বোবা বউ মিষ্টি গলায় কথা বললেন। 'ছি ছি রানিমা, কী যে করেন—কী যে করেন— উঠুন উঠুন।' শাঁখ বাজল, ঘণ্টা বাজল, দেবতাদের আনন্দে শুকনো আকাশে সাতরঙের রামধনু উঠল। রাজামশাই, চার রানি, রাজকন্যা, রাজপুত্রকে নিয়ে দয়ালু রাজার প্রজারা আনন্দে নাচতে লাগল। মা সরস্বতীর দয়ায় বোবা রানিমা কথা বলছেন, রানির পুণ্যে রাজপুত্তুর বেঁচে উঠেছেন।—

দয়ালু রাজার পুণ্যের প্রাণ।
মরামানুষকে জীইয়ে দেন।।
বোবাকালা বউ দয়াবতী।
তাঁর জিবে যান সরস্বতী।।
তিন রানিমা লজ্জা পেল।
নতুন বউকে কোলে নিল।।
রাজা প্রজা সবাই নাচে।
রূপসায়রের মেলার মাঝে।।
সওদাগররা বাজায় ঢোল।
মেলার মাঠে হুলস্থূল।।
নেইকো দুঃখ নেইকো ক্লেশ।
ধন্যিরাজার পুণ্যি দেশ।।

বনহংসী

রানিমা সদ্য স্নানটি সেরে এসে পিঠে ভিজে চুল ছড়িয়ে উঠোনে গামছা কাপড় মেলে দিচ্ছিলেন, হঠাৎ আকাশ থেকে একটা সাদা মতন কী যেন টুপ করে খসে পড়ে তাঁর কাপড়ে জড়িয়ে গেল। প্রথমে একটু চমকে উঠলেও রানিমা কাপড়টি সাবধানে সরিয়ে দেখেন, আরে, এ তো দেখি ছোট্ট একটা হাঁসের ছানা। থরথর করে কাঁপছে। সে বোধহয় এখনও বেশিদূর উড়তে শেখেনি, নতুন উড়তে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গিয়েছে। রানিমা তাঁর রেশমি শাড়ির আঁচল দিয়ে সাবধানে হাঁসের ছানাটিকে কোলে নিলেন, আয়রে আমার সোনামণি, ও মা! এ যে এখনও ওড়বার মতো বড়ই হয়নি, তবে আকাশ থেকে পড়ল কেমন করে? ও, এই যে ধবধবে সাদা পালকের গায়ে লাল রক্তের ফোঁটা। তার মানে একে নির্ঘাৎ ঈগলপাখি কী বাজপাখি কোনও এক শিকারি পাখিতে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, পায়ের নখের থাবাতে আঁকড়ে। সেই নখের বাঁধন ফসকে ছানাটা পড়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস পড়ল, তাই তো বেঁচে গেল বেচারি, নইলে তো ওকে খেয়েই ফেলত শিকারি পাখিটি। অবশ্য তারই বা কী দোষ, সে তো এই ভাবেই খাবার জোগাড় করে।

রানিমা খুব যত্ন করে বুনো হাঁসের ছানাটিকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন, তার ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন, তাকে কাঁসার রেকাবিতে করে একটু ভাত খেতে দিলেন। হাঁসের ছানার খুব খিদে পেয়েছিল বোধ হয়, কুপকুপ করে সব ভাতগুলি একটি একটি করে তার ছোট্ট হলুদ ঠোঁটে তুলে খেয়ে নিল। রানিমা একটি গোল বেতের ঝুড়ির মধ্যে কাঁথা পেতে ওর জন্যে নরম বিছানা করে সেখানে হাঁসের ছানাটিকে শুইয়ে দিয়ে আদর করে বললেন, 'তোমার

নাম দিলুম, বনহংসী। আজ থেকে তুমি হলে আমার মেয়ে।'

হাঁসের ছানা কী বুঝল সেই জানে, সে পাখনাতে মুখ গুঁজে গোল মতো হয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঠিক সেই সময়ে আকাশ দিয়ে তথাস্তু মুনি যাচ্ছিলেন আপন মনে বর দিতে দিতে। তথাস্তু মুনি যদি ঠিক ঠিক সময়ে তথাস্তু বলে ফেলেন তবে তো দারুণ মজা, সেটা সত্যি হয়ে যাবে। তথাস্তু মানে তাই হোক। উনি সব সময়ে তাই হোক তাই হোক বলে সমস্ত প্রাণীদের আশীর্বাদ করতে করতে চলেন। এটাই তাঁর স্বভাব, তাই তাঁর নাম হয়েছে তথাস্তু মুনি। কিন্তু উনি কেবল ভালো ইচ্ছে পূরণ করেন। মন্দের বেলায় উলটো হয়ে যায়। ধরো যদি তুমি অন্যের মন্দ চিন্তা করো, মন্দ ইচ্ছের কথা বলো, আর তক্ষুনি তথাস্তু মুনি সেখান দিয়ে যাচ্ছেন, তাহলেই মুশকিল। আর তোমার রক্ষে নেই। তখন ওই মন্দ ইচ্ছেটা যে বলে, তার নিজেরই সেটা হয়ে যায়। ওইজন্যে অন্যের মন্দ হোক, এরকম ভাবতে নেই তো, যা বলছিলুম, তথাস্তু মুনি তো রানিমার কথাটি শুনতে পেয়ে তথাস্তু বলে দিলেন।

রানিমা বাকি ভিজে কাপড় শুকোতে দিয়ে, রাজার জন্যে আর নিজের জন্যে ভাত বাড়তে গেলেন। রাজামশাই রাজসভা থেকে এবারে আসবেন, লাঞ্চ টাইম হল। খেতে বসে রানিমা রাজামশাইকে বললেন, 'জানো, আজ কী মজা হয়েছে? আকাশ থেকে কী পড়েছে আমার উঠোনে?'

রাজামশাই মাছের মুড়ো খেতে খেতে বললেন, 'কী পড়েছে? নিশ্চয়ই ভো কাট্টা কোনো ঘুড়ি?'

রাজামশাই ঘুড়ি ওড়াতে বেশ পছন্দ করেন। ভাদ্র সংক্রান্তিতে দারুণ ঘুড়ি ওড়ানোর কম্পিটিশন হয় তাঁর রাজ্যে। রাজা আগ্রহের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন, 'কী ঘুড়ি পেলে? ল্যাজওয়ালা, না পেটকাটি, চিলেঘুড়ি, না চাঁদিয়াল?'

রানিমা তাঁর কোঁকড়া চুলের মাথাটি ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁকিয়ে দুষ্টু হেসে বললেন, 'কিচ্ছু বলব না, চলো দেখবে।'

খেয়েদেয়ে সুগন্ধি পান চিবুতে চিবুতে রাজামশাই চললেন রানিমায়ের ধরা ঘুড়ি দেখতে। রানিমা আগে আগে, রাজামশাই পিছু পিছু। গোল ঘুড়িটির কাছে পৌঁছে রানিমা দাঁড়িয়ে পড়ে রাজাকে বললেন, 'কাছে যাও, দ্যাখো না কী ঘুড়ি।'

রাজা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ কী! এ কে?'

রানিমা হেসে হেসে বললেন, 'ও বনংহসী। আমার মেয়ে।'

রাজা বললেন, 'তাই তো দেখছি। কিন্তু তুমি যে বললে আকাশ থেকে পড়েছে?'

রানিমা বললেন, 'তাই তো পড়ল। ঈগলপাখির নখ থেকে পড়েছে।'

রাজা অবাক চোখে ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সে কী! অত ওপর থেকে পড়ে বেঁচে আছে কেমন করে?'

রানি বললেন, 'পাখির ছানা তো, পালকের শরীর, তাই কিছু হয়নি।'

রাজামশাই এবারে রানিমার মুখের দিকেই অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আরও তাজ্জব চোখে।

'...পাখি? এই বাচ্চাটা পাখির ছানা? তুমি কী বলছ রানি?'

রানি এবার রাজার মুখের ভাব দেখে বুঝলেন, কিছু গোলমাল হয়েছে। এগিয়ে গিয়ে ঝুড়ির ভিতরে তাকিয়েই তাঁর চক্ষু স্থির।

'আরে? আরে? সত্যিই তো, এ এখানে এল কোথ্থেকে?'

এ তো হাঁসের ছানা নয়, খুব সুন্দর একটি কচি বাচ্চা মেয়ে কাঁথায় শুয়ে হাত-পা নেড়ে আপনমনে খেলা করছে। এ কে? রানিও অবাক।

রাজা বললেন, 'যেই হোক, ও আমাদের মেয়ে।'

রাজারানির ছেলেমেয়ে ছিল না, তাঁরা তো বেজায় খুশি।

তথাস্তু মুনির আশীর্বাদে তাঁদের এখন কোল জোড়া ফুটফুটে মেয়ে।

বনহংসী রাজকন্যে রাজারানির আদরে আবদারে ঠিক যেন বর্ষাকালের চারাগাছটির মতো ঝলমলিয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। রাজপুরীতে আহ্লাদের শেষ নেই। রাজা তাকে তাঁর জানা সব বিদ্যে শেখাচ্ছেন, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইন, রাজধর্ম, অস্ত্রবিদ্যা। আর রানি শেখাচ্ছেন তাঁর প্রিয় বিদ্যে ছবি আঁকা, নাচগান, গল্প-কবিতা পড়া, পাখি পশুকে মায়ামমতা করা। রান্নাবান্না, ঘরের কাজ তো সবাই শিখে যায়। আর বনহংসী নিজে নিজেই শিখে ফেলেছে খিড়কির পুকুর সাঁতরে এপার ওপার করতে, আমগাছে পেয়ারাগাছে চড়তে। কেবল সে বড় হয়েও কোনো দিনই মৃগয়া করতে যাবে না রাজামশাইকে বলে দিয়েছে। পশুপাখিদের মারার কথা ভাবতেই তাঁর প্রাণে খুব কষ্ট হয়। অস্ত্রবিদ্যাই সে শিখতে চায়নি, কেন না যুদ্ধ করা আসলে খারাপ। মানুষ মারার কাজ। এই কথা শিখিয়েছেন তাঁকে রানিমা। কিন্তু মন্ত্রীমশাই বলেছেন বনহংসীকে সব বিদ্যাই শেখাতে হবে, বড় হলে সে-ই সিংহাসনে বসবে। মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার মতো তাকেও একাধারে রাজা আর রানি দুই-ই হতে হবে তো?

এমনি করে বনহংসী বড় হচ্ছে, হঠাৎ একদিন রাত্তিরে হল কী, কোথা থেকে এক দুস্যর দল এসে ওদের আক্রমণ করে রাজামশাই আর মন্ত্রীমশাইকে ধরে নিয়ে পালিয়ে গেল।

কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

রানিমা বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আর বনহংসী রাজ্য সামলাব, সেনাপতিমশাই আপনি যান সৈন্যসামন্ত নিয়ে ওদের খুঁজে পেতে উদ্ধার করে আনুন।'

সেনাপতি তো বেরিয়ে পড়লেন সৈন্য নিয়ে। তারপরে আর তাদেরও খোঁজখবর নেই।

কী হল? কী হল? কী হল?

ফুস্ মন্তরে রাজা গেলেন, মন্ত্রী গেলেন, সেনাপতিও গেলেন।

এমন সময় দুস্যরা একটা চিঠি পাঠাল, তারা সেনাপতিকে কারাগারে ভরেছে। রাজাকে আর মন্ত্রীকেও বন্দি করে রেখেছে। সবাইকে ছেড়ে দেবে রানিমা যদি আধখানা রাজ্য যৌতুক সমেত রাজকন্যাকে দস্যুদলের রাজার সঙ্গে বিবাহ দেন। রাজ্য রক্ষা করতে রাজকন্যে তো

এক কথায় দস্যুদের প্রস্তাবে রাজি। কিন্তু রানিমা বাধা দিলেন, 'না, অত তাড়া কীসের? ওঁরা নিজেরা না পারলে আমি ঠিক ওদের উদ্ধার করে আনব। কিছুতেই আমার বনহংসী কন্যেকে দুষ্টু দস্যুদের হাতে সম্প্রদান করব না। রাজা আর মন্ত্রী একসঙ্গে আছেন, দুজনেই তো রাজনীতি, রাজধর্ম জানেন। একজনের অসীম সাহস, আর একজনের পাকা মাথাতে বুদ্ধি গিজগিজ করছে। তাতেও যদি ওঁরা নিজেরা নিজেরা না ফিরতে পারেন সে ক্ষেত্রে আমাকেই ওদের ফিরিয়ে আনতে যেতে হবে। কিন্তু তাই বলে ওদের চাপের কাছে নত হব না।'

বনহংসী বলল, 'না মা, তুমি যেয়ো না, সে খুব ভুল হবে। তুমি রাজ্য ছেড়ে গেলে আরও অন্য শত্রুরা এসে রাজ্য আক্রমণ করবে। সবাই জানে এখন রাজ্যে রাজা নেই, সেনাপতিও নেই। তোমার ভরসাতেই প্রজারা রয়েছেন। আমিই বরং যাই ওঁদের উদ্ধারের চেষ্টা করি। কিচ্ছু ভেবো না মা গো, আমি ঠিক পারব। আমার অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যসামন্ত, কিচ্ছুই লাগবে না। আশীর্বাদ করো, বাবাকে ফিরিয়ে আনি।'

রানিমা বললেন, 'ঠিক বলেছ, তাই যাও। আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি সফল হয়ে ফিরবে।'

বনহংসী দস্যুরাজার রাজ্যের দরজাতে পৌঁছোতেই সেই দেশের বিশাল দরজাটা মহাতোরণ যার আদুরে নাম, প্রচণ্ড ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে তাকে বলল, 'এই যে বনহংসী, সুপ্রভাত। কিন্তু আপনি ফিরে যান, এখানে বিপদ।'

শুনে বনহংসী বললে, 'সে তো ভালো কথা, ফিরব তো বটেই, কিন্তু আগে তো আপনাকে একটু মালিশ করে আরাম করে দিই। আপনার দেখছি কোমরে বড় কষ্ট।' বলে দোকান থেকে একটু কেরোসিন তেল এনে মহাতোরণের কবজাগুলোতে ভালো করে মালিশ করে দিলে। তোরণের খুব আরাম হল। আর একটুও ক্যাঁচকোঁচ না করে তোরণ বললে, 'আপনার ভালোর জন্যেই বলছি আপনি ভিতরে যাবেন না, এই দরজার ভিতর থেকে কেউ বেরুতে পারে না।' বলেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বনহংসী দেখলে তাই তো, ভারি বিপদ। রাজামশাই, মন্ত্রীমশাই, সেনাপতিমশাই, সৈন্য-সামন্তেরা সব্বাই তো ভিতরে রয়ে গেছেন। কী করি?

কাছেই একটা বন ছিল। সেইখান দিয়ে গাছের নীচে বসে বসে ভাবছে, কী করা। হঠাৎ দেখল এক দল সাদা ধবধবে হাঁস উড়তে উড়তে তোরণ পেরিয়ে আকাশপথে দস্যুরাজের ভিতর ঢুকে গেল।

বনহংসী বলল, 'আহা ওদের মতো আমিও যদি উড়তে পারতুম।'

অমনি কে যেন বলে উঠল, 'পারো তো। তুমি বনহংসী, তুমি উড়তে পারো না তা কি হয়?'

বনহংসী এদিকে চায়, ওদিকে চায়, কাউকেই দেখতে পায় না।

তারপরে দ্যাখে এইটুকু এক কাঠবিড়ালি পাশেই বসে মাতব্বরি চালে ওর সঙ্গে কথা বলছে।

কাঠবিড়ালি বলল, 'ওই হাঁসের দল যখন আবার উড়ে বনে ফিরে আসবে তুমি ওদের

ডেকে উপায় জিগ্যেস করো। ওরা তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'ওরা কি আমাকে চিনবে?'

'দ্যাখো, তুমি চেনো কিনা। ওই দিঘির ধারে বসো, ওরা ওইখানে আসবে।'

বনহংসী দিঘির ধারে গিয়ে বনের ফল আর দিঘির জল খেয়ে গাছের নীচে বসে রইল, যতক্ষণ না হাঁসেরা ফেরে। সূর্য পাটে নামতেই হাঁসের ঝাঁক ডানা ঝটপট শব্দে ফিরে দিঘিতে নামল। বনহংসী দেখল তাদের বড় সুন্দর দেখতে, মস্ত বড় রাজহংস তারা। কী সুন্দর লম্বা গলা তাদের, গলার স্বর যদিও কর্কশ।

বনহংসী বললে, 'পেন্নাম হই। আমি বনহংসী, আমার একটু সাহায্য দরকার।'

উত্তরে হাঁসের দলপতি প্যাঁক প্যাঁক করে বললেন, 'আমরাও তো বুনো হাঁসই, তুমিও যা আমরাই তা। বলো, তোমার জন্যে কী করতে পারি?'

বনহংসী তখন বললে, তার বাবাকে, মন্ত্রী, সেনাপতি, সৈন্যসামন্ত সমেত ধরে রেখেছে ওই রাজ্যের দস্যুরাজা। বনহংসীর সঙ্গে তার বিয়ে না দিলে সে ওদের ছাড়বে না। কিন্তু রানিমা কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি নন।

দলপতি হংসরাজ সব শুনে বললেন, 'সত্যিই তো এমন জোর জবরদস্তির বিয়েতে রাজি কেন হবেন মা বাবা? দাঁড়াও একটা উপায় ঠাওরাই, তোমার বাবাকে উদ্ধার করবার। আমরা কাল যখন যাব ভিতরের দিঘিতে মাছ ধরতে তখন বরং তোরণের আর কারাগারের চাবিগুলো তোমাকে এনে দেব।'

হংসরাজের গিন্নি বললেন, 'বরং তোরণের চাবি বনহংসীকে দাও আর কারাগারের চাবি রাজামশাইকে দাও। উনি ভিতর থেকে চুপি চুপি রাত্তিরে বেরিয়ে পড়ুন। বনহংসী লুকিয়ে ওখানে পৌঁছোবে কী করে? দ্বীপের মধ্যে কারাগার।'

হংসরাজ বললেন, 'ঠিক, ঠিক, আমরা বরং রাজাকে জানিয়ে দেব কেমন করে সাঁতার দিয়ে ওঁরা তোরণের কাছাকাছি যেতে পারবেন। তুমি সেখানে থাকো, আমরাও থাকব।'

কিন্তু বনহংসীর শান্তি নেই। অতজন কি চুপিচুপি পালাতে পারে? রাজা তো একা নন। সবাই পালাতে গেলে সবাই ধরা পড়ে যাবেন।

অন্য উপায় ভাবতে হবে।

তখন হংসরানি বললেন, 'শোনো বনহংসী, আমি বলি কী, চাবিটাবির দরকার নেই এখন, ও সব থাক। তুমি শুধু তোমার বাবাকে উদ্ধার করো আগে। আমরাই তোমার বাবাকে বাইরে বের করে দিতে পারি, বাকিদের উদ্ধার তিনি এসে করুন। সেটা রাজামশাই হিসেবে তাঁর দায়!'

আগে থেকে রাজাকে ফিসফিসিয়ে খবর দিয়ে রাখল হাঁসেরা। রাত্তিরের অন্ধকারে কারাদ্বীপ থেকে তুলে রাজামশাইকে বিছানার চাদরে জড়িয়ে নিয়ে বুনো রাজহাঁসের দল ঠোঁটে করে উড়িয়ে নিয়ে এল তাদের নিজেদের দিঘির ধারে, বনের মধ্যে। বনহংসী তো আহ্লাদে আটখানা। 'বাবা!'

রাজামশাইও অবাক! 'বনহংসী! এই গহন বনে, রাজহাঁসেদের রাজ্যে তুই কী করে এলি মা?'

হংসরাজ বললেন, 'চলে এল, আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে।'

রাজামশাই হাত জোড় করে বললেন, 'হে হংসরাজ, আপনারা আমাদের আত্মীয়ের অধিক উপকার করলেন। কী বলে যে ধন্যবাদ দেব? বলুন আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?'

হংসরানি হাসিমুখে বললেন, 'আর আপনার, যে আমার কচি মেয়েটিকে বাজপাখির নখ থেকে বাঁচিয়ে এত বড়টি করেছেন, তার বেলা?

রাজ এতদিনে বুঝলেন রানি মেয়ের নাম কেন বনহংসী রেখেছিলেন। কিন্তু খটকা রয়েই গেল, বুনোহাঁসের ছানাটি মানুষ হয়ে গেল কেমন করে? তথাস্তু মুনির ব্যাপারটা তো ওঁরা জানতে পারেননি? রাজা ভাবলেন বোধহয় রানিমার অন্তরের ভালোবাসার জোরেই হাঁসের ছানা মানুষের ছানা হয়ে গিয়েছে। ভালোবাসায় কী না হয়?

হংসরাজ কিন্তু গম্ভীর মুখে বললেন, 'রাজামশাই, চাইলে আপনি আমাদের জন্যে একটি কাজ করতে পারেন। যেখানে যত জলাশয় আছে, সব বুজিয়ে দিয়ে আজকাল আকাশ ছোঁয়া বাড়ি হচ্ছে, আমাদের আর বাসস্থান থাকছে না, জলাশয়গুলো বোজানো বন্ধ করুন।'

মহারাজ বললেন, 'এই? আমি কথা দিলুম, আমার রাজ্যে আজ থেকে জলাশয় বোজানো বে-আইনি হয়ে গেল। এক্ষুনি রাজসভাতে গিয়েই ঘোষণা করে দেব।'

রাজ্যে ফিরে রাজামশাই রানিমাকে নিয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। জলাশয় বোজানো বন্ধ হল। হইহই রইরই করে প্রজাদের সঙ্গে করে নিয়ে তেড়ে গিয়ে দুষ্টু দস্যুরাজকে চকিতে বন্দি করে, রাজামশাই মন্ত্রী আর সেনাপতিকে সৈন্যসামন্ত শুদ্ধ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। মস্ত এক ফিস্টি হল সারা রাজ্যের মানুষের জন্যে। তাতে ইরানি পোলাও, আফগানি রুটি, কাশ্মীরি ঘি ভাত, রুইমাছের কালিয়া, চিতলমাছের পেটি, কইমাছের হরগৌরী, কচি পাঁঠার কোর্মা, মুরগির টাংরি কাবাব, চিংড়িমাছের কাটলেট, ভেটকি মাছের ফ্রাই, মাংসের চপ, কী নেই? ছ্যাঁচড়া, চাটনি, পাঁপড়ভাজা, দই, মিষ্টি, রাবড়ি, সব আছে। এমনকী পেস্তা-বাদাম, কেশরী ফুলের মালাই পর্যন্ত।

কিন্তু আর এক পাশে, অন্য টেবিলের ওপরে বড় বড় রুপোর থালা ভরতি হামান দিস্তে দিয়ে যত্ন করে ভাঙা কাঁচা ঝিনুক আর গুগলি শামুক আর কুচো মাছের রাশি থরে থরে সাজানো কেন?

এ আবার কীরকম খাবার? এসব কাদের জন্যে? একটু বাদেই দেখা গেল কাদের নেমন্তন্নের খাবার ওগুলো, যখন স্বপ্নের মতো সুন্দর রাজহংসের দল ধবধবে সাদা মেঘের মতো এসে নামল রাজবাড়ির বাগানে, নেমন্তন্ন খেতে। বাঃ! আজকের উৎসবে যে বনহংসীর যুবরাজকন্যে হবার খবর ঘোষণা করবেন রাজামশাই। বনহংসীরা আসবে না?

চাষির বউ চম্পাকলি

এক দেশে এক জমিদার ছিল। তার খুব একটা সুনাম ছিল না। চাষিদের ওপরে অত্যাচার করত। তাদের দুঃখকষ্ট বুঝত না। যার যেটি সুন্দর, যার যেটি ভালো জিনিস আছে সেটি তার নিজের নেওয়া চাই। সেপাই পাঠিয়ে কেড়েকুড়ে নিত। তাই ভয়ে কেউ কোনো ভালো জিনিস ব্যবহার করত না। কারুর বাগানে আমটি ভালো, সব আম জমিদার নিজের জন্যে পাড়িয়ে নেবে। অনেকদিন ধরে পরিশ্রম করে চমৎকার একটা শাড়ি বুনেছে কোনও তাঁতি, বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে বলে। খবর পেলেই জমিদার সেটা বিনা পয়সায় কেড়ে নেবে, যাকে খুশি তাকে দিয়ে দেবে বলে। এ হেন জমিদারের কানে গেল, এক চাষার ঘর থেকে মাঝে মাঝে ভারি সুন্দর চাঁপাফুলের সুবাস বেরোয়, মাইলের পর মাইল সেই সুগন্ধ ছড়িয়ে যায়, অথচ তার উঠোনে কোনও চম্পা গাছ নেই। তাহলে কি সে আতরের ব্যবসা করছে? জমিদার পেয়াদা পাঠাল। ঘরে ঢুকে দেখে এসো ব্যাপার কী। বাতাসে তখনও হালকা চাঁপাফুলের সুবাস ছড়িয়ে ছিল, সেই সুগন্ধ শুঁকে-শুঁকে পেয়াদা ঠিক চাষির ঘরে পৌঁছে গেল। ঘুরে ঢুকে পেয়াদা দেখল চাষির বউ কোলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছে, কোথাও কোনও চাঁপাফুলের চিহ্ন নেই। গন্ধটা ওরই চারিপাশে ভুরভুর করছে। আরে, এমন চাঁপাফুলের গন্ধ এল কোথা থেকে? পেয়াদা ভড়কে ভ্যাবাচ্যাকা! কী বলবে সে ফিরে গিয়ে? জমিদার তো তার কথা বিশ্বাস করবে না। উত্তর না নিয়ে গেলে শাস্তি দেবে। পাইক-পেয়াদারা তো ভয় পেলে জানান দেয় না, সে উলটে বউটাকে ধমক লাগাল, 'খুব আতর মাখার শখ হয়েছে, না? গরিবের ঘোড়া

রোগ! কোথায় রেখেছিস আতরের শিশি বোতল। বের কর। জমিদারবাবু সব নিয়ে যেতে বলেছেন!'

কথা শুনে বউ হেসেই আকুল! যত হাসে তত চাঁপাফুলের গন্ধ বেরোয় তার গা থেকে। আসলে বউটি হাসলেই ওর শরীর থেকে ওই চম্পাসুরভি বেরুত, আর দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে যেত। গ্রামের লোকেরা এই নিয়ে খুব গর্বিত ছিল, আগেকার অপ্সরাদের মতো চাষিবউ যেমন সুশ্রী তেমনি সুবাসিনী। বউ হাসতেই দমকা অপরূপ চাঁপা গন্ধ বেরুল যেই, অমনি পেয়াদা 'পেয়েছি পেয়েছি' বলে নেচে উঠে আহ্লাদে ছড়াই লিখে ফেললে,

'এবার মিটেছে সব ধন্দ
ঘরে কেন চাঁপাফুলের গন্ধ
আজ থেকে তোর ঘরে থাকা বন্ধ!'

এই বলে চাষির বউ আর তার বাচ্চাকে ধরে নিয়ে গেল দু-দিন ধরে হাঁটিয়ে সেই জমিদারের বৈঠকখানাতে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'ধরে এনেছি স্যার, এই বউটা হাসলেই ওর গা থেকে চাঁপাফুলের বাস বের হয়। আর অনেক দূর অবধি বাতাসে ভেসে ছড়িয়ে পড়ে।'

জমিদার বললে, 'তাই নাকি? আমিও তেমন কথাই শুনেছি বটে! কই, তাহলে একটু ভালো করে হাসো দিকিনি চম্পাহাসিনী? আমরা একটু সুগন্ধ শুঁকি!'

কিন্তু অমন হাসো বললেই কি হাসি পায়? অত হেঁটে বউ তখন খুব ক্লান্ত, কোলের বাচ্চাটার ঘুম পেয়েছে সে কান্নাকাটি শুরু করেছে, বউয়ের জলতেষ্টা পেয়েছে, খিদে পেয়েছে, সেদিকে জমিদারের কোনও নজর নেই, বলে কিনা, এক্ষুনি হাসো? হাসো বললেই কি হাসা যায়? হাসি পাবে তবে তো হাসবে? ভেতর থেকে আপনাআপনি হাসি পাওয়া চাই, খিদে তেষ্টার মতো, হিশি-পটির মতো, ভেতর থেকে না পেলে জোর করে কী করে হবে? তবু, জোর করে কাঁদা যদিও বা যায়, খিলখিলিয়ে হাসতে পারে কেউ, কোথাও কোনও হাসির ব্যাপার না ঘটলে? জমিদারের খামখেয়ালির ভয়ের চোটে বউ বেচারি হাসতে অনেক চেষ্টা করল, কিছুতেই হাসি পেল না তার। সে বুঝেছে না হাসলে জমিদার তাকে ছাড়বে না। বাড়িতে তো ফিরতে হবে? চাষি বেচারি একলাটি আছে, সে খেত থেকে ফিরে দেখেছে, ঘরে বউ বাচ্চা কেউ নেই! ওদের না দেখে সে কত ভয় পেয়েছে, ভাত খেল কি না কে জানে, এই সব যত ভাবছে আর ততই বউয়ের কান্না পাচ্ছে, হাসিঠাট্টার কথা মোটেই মনে পড়ছে না তার, সে হুকুম মাফিক হাসবে কেমন করে?

রাগি জমিদার চটেমটে তাকে ভেতর মহলের একটা ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্দি করে রেখে দিল।

'যতক্ষণ না হাসছ, যতক্ষণ চাঁপার গন্ধটা না পাচ্ছি, তোমার মুক্তি নেই!' জমিদারের লোকেরা ওকে খাবার দিল, জল দিল, বিছানাও করে দিল, কিন্তু চম্পাকলির মুখে চোখের জলের দাগ পড়া আর ফুরোয় না।

রাত্তিরে তার ঘুম হচ্ছে না, বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে বউ জানলাতে এসে দাঁড়িয়েছে,

একটু হাওয়া খাবে বলে। শোনে নীচে দুই চোরের মিটিং বসেছে। তারা জমিদারের সিন্দুক থেকে অনেক কিছু চুরি করে এনেছে, তারই ভাগ-বাঁটোয়ারা চলছে। একজন চোর বলছে, 'এই সাতনরি হারটার মতো হার আমি এই রাজ্যে কোথাওই দেখিনি।' আরেকজন চোর বললে, 'আর এই হিরের নেকলেসটা তিন ভুবনে কোথাও দেখিনি আমি!'

পাশের অন্ধকারে গাছের নীচে আরেকজন মানুষ ছিল, তারা খেয়াল করেনি। সে বেচারা ধোপা, তার গাধাটি হারিয়ে গিয়েছে। ধোপাদের জীবনে গাধা খুব জরুরি। তার পিঠে চড়িয়ে পুঁটলি-পুঁটলি কাপড় নিয়ে ধোপারা ঘোরে। সে তিনদিন ধরে সমানে গাধা খুঁজে না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু শুয়েছে। চোরেদের কথাবার্তা শুনে সে ভাবল, 'বাঃ, এরাও তো অনেক ঘুরেছে, এদের জিগ্যেস করা যাক!' তাড়াতাড়ি উঠে বসে চোরেদের ডেকে ধোপা বললে, 'ও ভাই, তোমরা তো বললে সারা রাজ্য ঘুরেছ, তিন ভুবনও ঘুরে এসেছ, তোমরা আমার গাধাটাকে কোথাও দেখেছ কি? একটা কানে কালো দাগ?' এদিকে ঘরে বন্দি চাষিবউ ধোপা বেচারার মুখে এত অদ্ভুত বোকা কথা শুনে ভীষণ জোরে হেসে ফেলল, তার সেই হাসিতে চাঁপাফুলের গন্ধ বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সুবাসে ঘুম ভেঙে উঠে বসে জমিদারের গিন্নি বললেন, 'ওই তো চাঁপাফুলের গন্ধ! চাষিবউ নিশ্চয় হাসছে! আহা, ওকে খুলে দাও!' তক্ষুনি পেয়াদা গেল বউকে তালাচাবি খুলে দিতে। পাইক বলল, 'বউ, স্যার তখন তোমাকে এত করে বললেন তুমি হাসলে না, কেবল কাঁদলে। আর এখন একা-একা হাসছ। তুমি কি পাগল?'

বউ কিছু বলে না, শুধু অল্প-অল্প হাসে।

এবারে জমিদার আর তার গিন্নির কাছে অন্দরমহলে নিয়ে গেল ওকে। জমিদারগিন্নি বললেন, 'এত রাতে, একা ঘরে, তোমার কী এত হাসির জিনিস মনে পড়ে গেল, আমাদেরও বলো।'

তখন বউ জানলা থেকে শোনা গল্পটা বলল।

ঘরশুদ্ধ সবাই হোহো করে হেসে উঠল, জমিদারমশাইও। শুধু হাসতে হাসতে হঠাৎ জমিদারগিন্নির একটা ভুরু কুঁচকে গেল, 'তাই তো, আমার সাতনরিটা কই? আরে-আরে, 'তাই তো, আমার সাতনরিটা কই? আরো-আরে, আমার হিরের নেকলেসটা?'

ধর-ধর, ছোট-ছোট, এক্ষুনি চোরেদের ধরে আন! পাইক বরকন্দাজ ছুটল চারিদিকে। চোরেরা ধরা পড়ল। জমিদারগিন্নি গয়না ফেরত এল, মনের আনন্দে তিনি ধোপাকে আরেকটা নতুন গাধা কিনে দিলেন। বাচ্চা কোলে নতুন শাড়ি পরে, আর মোহরের পুঁটলি নিয়ে চাষির বউ ঘরে ফিরল হাসতে-হাসতে।

আর চম্পাকলির মনখোলা হাসি থেকে ছড়িয়ে পড়া চাঁপাফুলের সুগন্ধে কী যেন একটা ম্যাজিক আছে। মন্দ লোকের মন আপনাআপনি বদল হয়ে ভালো লোকের মন হয়ে যায়। সেই থেকে মন্দ জমিদারের মনমেজাজ ভালো হয়ে গেল, সে আর অত্যাচারী

রইল না। উলটে উপকারি জমিদার হয়ে গেল। গরিব চাষিদের জমি বিলি করে দিয়ে তাদের দৈন্য ঘুচিয়ে, নতুন করে জীবন শুরু করল।

আহা, চম্পাকলির হাসি
আমরা বড্ডো ভালোবাসি।
আমার কথাটি ফুরাল
চাঁপার বাসটি ছড়াল।

(তামিল উপকথা মল্লি রাজকুমারের বীজ নিয়ে, পরিবর্তিত কাহিনি)

মায়া অরণ্যে মণি-মানিক

এক গ্রামে মানিক নামে একটি ছেলে ছিল। মানিক খুব ভালো শিকারি, তার হাতের লক্ষ্য দারুণ তীক্ষ্ণ, তার স্বভাবটিও মিষ্টি।

গ্রামের লোকেরা তাকে খুব ভালোবাসে। কিন্তু মানিকের মা-বাবা-ভাই-বোন কেউ নেই, তাই তার সবসময়ে মন কেমন করে। খুব একটা মিশুক নয় সে, নিজের মনে থাকে, মেঘ দেখে গান বাঁধে, বৃষ্টি এলে বাঁশি বাজায়। খুব তো জলের অভাব ওদের দেশে। বৃষ্টি হয় না।

বড় হলে মানিকের তো একটা সংসার চাই, তাই গ্রামের লোকেরা তার সঙ্গে গ্রামেরই একটি মেয়ের বিয়ে দেবে বলে স্থির করল, মেয়েটি ভারি লক্ষ্মী। তার মা-বাবারও মানিককে খুব পছন্দ। কিন্তু ওরা তো এখনও ছোট আছে, বড় হলে ওদের বিয়ে হবে। মেয়ের নাম মণি।

মানিক এদিকে সেদিকে শিকার করে বেড়ায়। এ-বনে সে-বনে ঘোরে। জীবজন্তু শিকার করে গ্রামে এনে সবার সঙ্গে ভাগ করে খায়। একদিন সে পাহাড় ডিঙিয়ে দূরের একটা উপত্যকায় গেল, নতুন কিছু খুঁজতে। সেখানে গিয়ে মানিক খুব সুন্দর একটা গন্ধ পেয়ে সেই গন্ধ অনুসরণ করে গিয়ে আশ্চর্য এক বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চন্দনের বন। চন্দনের গন্ধ পেয়েছিল সে। আরও কত অচেনা অজানা সব ছায়াভরা গাছ, ফলের গাছ, কত ফুলের গাছ, পুরো বনটাই সুগন্ধে আর রঙে রঙে মাতোয়ারা। মনে হল এখানে, এই উপত্যকাতে খুব বৃষ্টি হয়, একটুও জলের অভাব নেই।

এমন অপরূপ অরণ্যে ঢুকে মানিক তো মুগ্ধ। কী সুন্দর ঢেউ খেলানো নীচু নীচু ঢালু সবুজ পাহাড়, তাতে কত শরবতের মতো সুগন্ধি বরফের মতো শীতল স্বচ্ছ জলের ঝরনা ঝরে মাটিতে পড়ে সরু নদী হয়ে ছুটে যাচ্ছে, দেখলেই অঞ্জলি ভরে জল খেতে ইচ্ছে করে। তাতে সোনালি রুপালি ছোট ছোট স্বচ্ছ মাছ স্রোতে খেলা করছে। কিন্তু জলে কীসের যে সুগন্ধ, মানিক শিকারি হয়েও বুঝতে পারল না। নিশ্চয়ই কোনও সুগন্ধী পাথরের ওপর দিয়ে বইছে। তাদের ধারে ধারে অজস্র রং-বেরঙের বাহারি ফুল ফুটে আছে, সে ফুল তুলে মালা গেঁথে গলায় পরবার, চুলে পরবার কেউ নেই। গাছে গাছে পাকা ফল, ফলের ভারে গাছেরা নুয়ে পড়েছে, পেড়ে খাবার লোক নেই। পাহাড়ের গায়ে চমৎকার সব শীতল ছায়াভরা গুহা, সেখানে আরামসে ঘুমিয়ে থাকা যায়। রীতিমতো সংসার পাতা যায় এত বড়। ঝলমলে রঙিন হাজার রকমের পাখি আর প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে। হরিণ, খরগোশ, ক্যাঙারু, ওয়্যালাবি, সজারু, গোসাপ, গিরগিটি, ব্যাং, আহা, চারিদিকে শিকার করে খাবার মতো কত পশু, শিকারিদের স্বর্গ। মানিক ঠিক করল সে এখানেই থাকবে। মণি বড় হলে তাকে বিয়ে করে এনে এখানেই সংসার পাতবে। একটাই শুধু প্রশ্ন। এত সুন্দর বন, তাতে একটাও মানুষ নেই, এমনকী বিষাক্ত সাপও নেই। কেন নেই? মানিক দেখল ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য করার মতো। এত চমৎকার, এত নিরাপদ বনের খবর সে-ই প্রথম পেল? গ্রামের বড়রা আর কেউ জানে না?

সে কেমন করে হয়?

আসলে হয়েছে কী, সবাই জানে। কিন্তু মানিকের বাবা-মা ছিলেন না বলে তাকে কেউ মনে করে বলে দেয়নি যে ওই বনটাই সেই গল্পে শোনা 'মায়া অরণ্য'। ওখানে কক্ষনও যেতে নেই। ঢুকলেই সবাই সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো হয়ে যায়, আসল বয়েস নিয়ে কেউ বেরোতে পারে না। তাই কেউ ঢোকে না। যাতে মানুষেরা আসে তাই লোভ দেখানোর জন্যেই এক অদৃশ্য জাদুকর বনটিকে অত সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। যারা এসেছে, তাদের যৌবনের মায়া দিয়েই অরণ্যটি এত সুন্দর হয়েছে। জাদুকর মানুষ খায় না, মানুষের যৌবন খায়। যাতে সে কোনওদিন না বুড়ো হয়, যাতে মরণ তার নাগাল না পায়।

মানিক আনন্দেই আছে, সে তো মিশুক নয়, কোনও দিনই তার বেশি বন্ধু নেই, সে ঘাস, ঝরনা, পাখির সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতে পারে। মনের সুখে বাঁশি বাজায় মানিক। গান বাঁধে। সত্যি, জলের অভাব নেই এই বনে। 'মায়া অরণ্যে' সবুজ ঘাস, সাদা ঝরনা, মিষ্টি বুলি পড়া রঙিন পাখির অভাব নেই। মানিকের একা লাগে না। কিন্তু 'মায়া অরণ্যে'র অভিশাপ, সেখানে যে ঢুকবে সে তক্ষুনি বুড়ো মানুষের মতো দেখতে হয়ে যাবে; আরও কষ্টের কথা, তার মনে মনে আসল বয়েসটাই থাকবে। সে নিজেকে যুবক ভাববে, আর অন্যেরা তাকে বুড়োমানুষ ভাববে। কেউ কেউ তো বন ছেড়ে বেরোতেই পারবে না। যে বেরোবে সে বুড়ো থুত্থুরো হয়ে বেরুবে। তাই ভয়ে কেউ ঢোকে না।

*

গ্রামের লোকেরা মানিককে না খুঁজে পেয়ে বুঝতে পারল না, সে অন্য কোথাও চলে গেল, নাকি সে 'মায়া অরণ্যে' ঢুকে হারিয়ে গেল? দূরের দূরের গ্রামের লোকেরা খোঁজ পাঠাল, মণির বাবা-মা তো খুবই অস্থির, আশীর্বাদ হয়ে গিয়েছে, মেয়ের হবু বর হারিয়ে গেলে চলবে কেন? তাঁরাও দূত পাঠালেন গ্রামগঞ্জে। ইতিমধ্যে মণি বড় হয় উঠল। যেমন রূপসী, তেমনি গুণী, আর বুদ্ধিমতী মেয়ে। অল্পবয়সি অনেক ছেলের মা-বাবারা তাকে ছেলের বউ করে ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন। 'মানিক তো হারিয়ে গেছে, ও না বলে চলে গেছে, ও নিশ্চয়ই তোমাকে চায় না। ওর কথা ভুলে যাও,' মণিকে বলল সবাই। মণি শুনল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে সবাই তো খুঁজে এলো, এবার আমি নিজে একবার খুঁজে আসি, তার পরে ঠিক করব কী করা যায়।' মণি নিজেও খুব ভালো শিকারি, তাই নির্ভয়ে তার মা-বাবা বললেন 'ঠিক আছে। তুমি যাও, আর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাই। যদি তোমার কোনও উপদেশের প্রয়োজন হয়?' মণি বলল, 'ভালো কথা। চলো তবে তিনজনেই যাই।'

তিনজনে মিলে খুঁজতে বেরুলেন। খোঁজ খোঁজ, একদিন গেল, দুদিন গেল, হপ্তা গেল, খোঁজ নেই। পাহাড় পেরিয়ে সেই উপত্যকায় নেমে এসে মণি হঠাৎ পেল কীসের যেন গন্ধ? আঃ, সত্যি তো, সর্ব শরীর জুড়িয়ে দেয়। বাবা, মা, সবাই সেই সুবাস পেলেন। সত্যি, ভারি মধুর গন্ধটি, ঠিক যেন চন্দনের গন্ধ। মনে হতেই মণির বাবা ভুরু কুঁচকে বললেন—'কিন্তু এখানে চন্দনের গাছ হবে কোথা থেকে, এখানে তো ও গাছ জন্মায় না! ওটা নিশ্চয় 'মায়া অরণ্যে'র মায়াবী ডাক! তুই ওই সুগন্ধের টান যাস না, মণি, ওখানে বিপদ!'

মণি ভালো মেয়ে। বাবার কথা শুনে চন্দনের গন্ধে ভুলল না। থামল না, চলতে লাগল। সারা দিন রোদ্দুরে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের তলায় পৌঁছে ওরা তিনজনে একটা গাছের নীচে বিশ্রাম করছেন, হঠাৎ একটা বাঁশির সুর শোনা গেল। ভীষণ মন কেমন করা সুর, বাঁশির সুরটা ওদের সকলেরই চেনা, ওদের গ্রামের গান, মানিকের বাঁধা গানের সুর বাজছে ওই বাঁশিতে। গানটা গ্রামের সকলেই গাইতে পারে।

'ওই তো আমাদের মানিকের বাঁশি!' বলে উঠলেন ওর মা, 'মানিকের গান! মানিক নিশ্চয়ই বেঁচে আছে, ধারে কাছেই আছে।'

'কী জানি, বাঁশিটাও তো ''মায়া অরণ্যে''-র মায়া হতে পারে?' বাবার সন্দেহ আর যায় না।

মণি বলল, 'আমি ওই সুর ধরেই ওর কাছে পৌঁছে যাব।'

'কিন্তু ও যদি ''মায়া অরণ্য'' থেকে বাঁশি বাজায়?' মা বললেন দুর্ভাবনা করে।

বাবা বললেন, 'তা হলে চলো ফিরেই যাই। মানিক থাকুন। ওখান থেকে কেউই তো বেরিয়ে আসেনি। তোমাকে আমরা ওই ''মায়া অরণ্যে''-র মধ্যে ঢুকতে অনুমতি দিতে পারি না। তাই না?' বাবার প্রশ্নের উত্তরে মা চুপ করে রইলেন।

মণি বলল, 'না বাবা, আমাকে যেতেই হবে, তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের তো আমাকে শুধু উপদেশ দেবার কথা, অনুমতি দেবার তো কথা ছিল না?'

বাবা বললেন, 'তা হলে উপদেশই শোনো। ওই বনে এক জাদুকরের অভিশাপ আছে। ঢুকলেই সবাই বুড়ো হয়ে যায়, তুমিও বুড়ো হয়ে যাবে। আর জামাই নিশ্চয়ই এতদিনে খুব বুড়োমানুষ হয়ে গেছে। তুমি চিনতেও পারবে না তাকে। সে-ও চিনবে না তোমাকে। সংসারই বা পাতবে কেমন করে দুই বুড়ো মানুষে? তার চেয়ে তুমি ফিরে চলো, একজনের জীবন সুস্থ থাক। দুজনেরই জীবন নষ্ট করে কী লাভ?'

মণি শুনল। বলল, 'বাবা, ভয় নেই, আমি মানিককে ঠিক উদ্ধার করে আনব। ও নিশ্চয়ই বুড়ো হয়নি, বুঝতে পারছে না? তা হলে এতক্ষণ ধরে এত সুন্দর বাঁশি বাজাতেই পারত না। কখন দম ফুরিয়ে যেত। দেখো আমার কিছু হবে না। তোমরা ভয় পেয়ো না, আমি চললুম।'

তখন মা বললেন, 'যাবেই যখন, তখন বলি। সব জাদুমন্ত্রের একটা করে উলটো মন্ত্রও থাকে। আমার বিশ্বাস, এই জাদু ভঙ্গ করারও কোনও জাদুমন্ত্র নির্ঘাত আছে, তোমাকে আগে সেটা শিখতে হবে। তারপরে নির্ভয়ে বনে ঢুকবে। তার আগে নয়। জাদুমন্ত্রের সঙ্গে তোমার অস্ত্রবিদ্যা লড়াই করতে পারবে না।'

'সত্যি, মা, তুমি কী ভালো। কিন্তু কে আমাকে বলে দেবে সেই উলটো মন্তরটা? তুমি?'

'মন্তরটা তো আমি জানি না। তবে আমার দিদিমা জানতেও পারেন, তিনি লালপাহাড়ে থাকেন, ওই গ্রামের লোকেরা অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানে। চলো যাই তার কাছে।'

'ততক্ষণে যদি আর বাঁশি না বাজে? যদি ওকে হারিয়ে ফেলি?'

'আরে বাজবে, বাজবে, আগে চলো তো লালপাহাড়ে।' বাবার আর তর সইছে না।

লালপাহাড় অনেক দূরে। পৌঁছোতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাস্তায় কেউ নেই। সব ঘরবাড়ি অন্ধকার। সেখানে চিতাবাঘ বেরোয় বলে সবাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। মণির মায়ের দিদিমার বাড়িতে গিয়ে ওরা দ্যাখে আলো জ্বলছে। দিদিমা ঘটর ঘটর করে চরকা ঘুরিয়ে সুতো কাটছেন। মণিদের দেখে খুব খুশি হলেন। দিদিমা বললেন, 'তোমাদের কথাই ভাবছিলুম। 'মায়া অরণ্যে'র চাবি চাই?' মণি তো অবাক।

'কেমন করে জানলেন?'

'আমি যে তোমার মায়ের দিদিমা, আমি সব টের পাই। দাঁড়াও। কই, কোথায় তোরা? হালুম?'

ডাকতেই একটা চিতাবাঘ ঘরে চলে এল। ভূমিষ্ঠ হয়ে পেন্নাম করে, পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'আজ্ঞা করুন, ম্যাডাম।'

'আমার নাতনিকে ''মায়া অরণ্যে''-র মায়া কাটাবার মন্তরটা দাও। আর তিনদিন বাদেই তোমাদের ছুটি হয়ে যাবে। হুলুমকেও জানিয়ে দিয়ো। এর পরে হুক্কা হুয়া ডিউটিতে আসবে।'

'যো হুকুম, ম্যাডাম!' বলে চিতাবাঘ উঠে বসল। তারপর খুব কায়দা করে নিজেরই

থাবা থেকে এক টুকরো ঝকঝকে বাঁকা নোখ ভেঙে নিয়ে বলল, 'এইটে কাছে রাখুন। হারাবেন না। এতে করে মায়া অরণ্যের মায়াজাল আপনাকে ছোঁবে না।'

'আর আমার বরের কী হবে? সে তো ওই মায়া অরণ্যেই বাস করছে এখন।'

'ওকেও এইটেই ছুঁইয়ে দেবেন, তা হলেই হবে। আমরাও তো মায়ার তৈরি। আমাদের কি সত্যি চিতাবাঘ ভেবেছেন? আমরা আপনার মায়ের দিদিমার মন্তর পড়া পুতুল, এই গ্রামের রক্ষক, আসল চিতাবাঘ এলে তাড়াই।'

সেই রাত্রে ভালো খেয়েদেয়ে অনেক আদরে আরামে ঘুমিয়ে ওরা সকালে উঠে আবার ফিরে চলল 'মায়া অরণ্যে'র পথে।

'মায়া অরণ্যে'র কাছাকাছি এসেই ওরা আবার শুনতে পেল বাঁশির সুর। যাক বাবা, ওই তো মানিক। হাঁপ ছেড়ে মণি বলল, 'মা, বাবা, তোমরা অরণ্যের বাইরে অপেক্ষা করো। আমি একাই ভিতরে যাব। আমার কাছে মন্তর আছে। কিচ্ছু ভাবনা নেই, সুরের সুতো ধরে ধরে ওর কাছে ঠিক পৌঁছে যাব।'

সব সময়ে শিকারিরা শব্দ অনুসরণ করে শিকার করতে ও শিকার ধরতে জানে। সেই যে দশরথ রাজা অন্ধ মুনির ছেলের কলসিতে জল ভরার শব্দকে হরিণের জলপানের শব্দ ভেবে ভুল করে না দেখে দূর থেকে শব্দভেদী তির মেরে মেরেই ফেলেছিলেন, এও অনেকটা তেমনি। মণি বাণ মারবে না, সশরীরে হাজির হবে বাঁশির কাছে। ওর মা-বাবা জানেন, মেয়ে খুব দক্ষ শিকারি। তাঁরা আর ভয় পেলেন না। জাদুবাঘের নখ মা ওর গলার হারের লকেটে পুরে দিলেন। জাদুর অস্ত্র জাদু। তাঁরা অরণ্যের বাইরে গাছের নীচে বসে বাঁশি শুনতে থাকলেন, মণি ঢুকে গেল। বাঁশির সুর ধরে ধরে, সবুজ সবুজ পাহাড়, হিরের মতো ঝকঝকে ঝরনা, মাছভরা স্রোতস্বিনী নদী, রং-বেরঙের ফলের বাগিচা, পাখির ঝাঁক, প্রজাপতির পাল, দেখতে দেখতে সে পৌঁছে গেল এক গুহার সামনে। সেখানে নদীর স্রোতে পা ডুবিয়ে বসে একজন বুড়োমানুষ চোখ বুজে বাঁশি বাজাচ্ছেন। তার ইয়াব্বড় লম্বা লম্বা সাদা দাড়ি গোঁফ, সব চুল সাদা, আর লম্বা লজটা। বাঁশি ধরা হাতের আঙুলে কিন্তু একটা লতাপাতার শুভেচ্ছা আংটি আছে, তার জোড়াটা রয়েছে মণির আঙুলে। মণি দৌড়ে গিয়ে বলল, ''মানিক! মানিক! দ্যাখো আমি এসে গেছি!'

মানিক অবাক হয়ে দেখল, আরে? মণি যে! সেই রূপসি মেয়েটা বড় হয়েছে, কিন্তু ওর মতো বুড়ো তো হয়নি এখানে এসে? ঝরনার জলে সে দেখেছে নিজের বুড়ো মুখ। মানিক চেঁচিয়ে ওঠে, 'মণি তুমি এক্ষুনি পালাও, এখানে তুমি এক মুহূর্তও থেকো না। তা হলে আর এরকম সুন্দর থাকবে না, আমার মতো বুড়ো হয়ে যাবে। এই বনে অভিসম্পাত আছে।'

মণি বলল, 'হ্যাঁ আমিও চলে যাব, আমার সঙ্গে তুমিও যাবে। চলো, তোমাকেই নিতে এসেছি। এখানে বসে বাঁশি বাজালেই চলবে? আমাদের বিয়ে করতে হবে না বুঝি?'

'বিয়ে আর কেমন করে হবে? আমি তো বুড়োমানুষ হয়ে গিয়েছি।'

'কেন, তুমি শিকার করতে পারো না? আগের মতো লক্ষ্যভেদ করতে পারো না বুঝি? হাত কাঁপে?'

'যা! কী যে বলো, কেন পারব না, হাত-ফাত কাঁপবে কেন? লক্ষ্যভেদ করতে আগের

মতোই পারি। বরং এখানে তো কেউ নেই, মনোযোগে আরও উন্নতি হয়েছে।'

'বাঁশি বাজাতে পারো না?'

'তাও পারি। সারাদিনই তো বাজাই।'

'বেশ, তবে বুড়ো কোনখানে হয়েছ, বলো দেখি? চুল দাড়ি তো মানুষে কেটে ফ্যালে। কলম লাগায়। কত কী করে! আর তো সবই ঠিক আছে, চলো তোমার বিয়ে দেওয়া হবে এবারে। আমার মা-বাবা বনের বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

'এই বুড়োর সঙ্গে ওঁরা তোমার বিয়ে দেবেন?'

'কী আর করা, কথা দেওয়া হয়ে গিয়েছে, বুড়ো হও আর যাই হও, এখন তো আমি অন্য কাউকে বিয়ে করব না।'

বলে, মণি নিজের গলার হারের লকেটটা মানিকের বুকে ছুঁইয়ে দিল। বলল, 'এবারে ঝরনার জলের মধ্যে চেয়ে দ্যাখো তো কে এসেছে? এর কী বিয়ে দেওয়া যেতে পারে?' মানিক তাকিয়ে দেখল, আরে? এ কে? এ তো সেই আগকার মানিক! সেই সুঠাম যুবক। কালো চুল দাড়ি, বলিরেখা নেই। কী করে হল? মণিও কি জাদুকরি?

তারপরে ওরা দুজনে বন থেকে অনেক ফুল, ওর প্রচুর জল নিয়ে গ্রামে ফিরে চলল। সঙ্গে সঙ্গে চলল ওর পাখি, প্রজাপতির বন্ধুরা। বনের প্রাণীরা সবাই ওকে বিদায় জানাচ্ছে! নদীরা, পাহাড়েরাও বলছে, 'আবার এসো, আমরা আবার একা হয়ে গেলুম।' যাবার সময়ে হঠাৎ কী মনে হল, মানিক পাহাড়কে ডেকে বলল, 'পেন্নাম হই, পাহাড়দাদু, মাত্র একখানি ছোট ঝরনা আমাদের গ্রামকে দেবে? তোমার তো কতগুলো আছে আমাদের গ্রামে একটাও নদী নেই, ঝরনা নেই, বৃষ্টি নেই, জল নেই, খুব কষ্ট।' পাহাড় বললে, 'ঠিক আছে। তোমার বিয়ের উপহার। একটা পাতার পাত্রে যত্ন করে নিয়ে যাও, গিয়ে পাহাড়ে ঢেলে দিয়ো।'

বনের বাইরে বেরিয়ে মণির বাবা-মা-র কাছে এসে দাঁড়াতেই ওরা আনন্দে কেঁদে ফেলেছেন। 'কই, জামাই বুড়ো তো হয়নি? যত বাজে কথা! তিরধনুক কুঠার নিয়ে, কোমরে বাঁশি বেঁধে এই তো সেই চেনা মানিক। চমৎকার মানিয়েছে দুজনকে।' মণির হাতে একটা পাতার বাটিতে একটু জল। মন্ত্রপড়া জল বোধ হয়। গ্রামে পৌঁছেই সবার আগে ওরা দুজনে পাহাড়ের মাথায় উঠে পাতার জলটুকু পাথরে ঢেলে দিল। অমনি কী সুন্দর একটা আস্ত আলো ঝলমলে ঝরনা তৈরি হয়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে নীচে গ্রামের দিকে নামতে লাগল। মণি-মানিককে মায়া পাহাড়ের আদরের উপহার।

সেই ঝরনা ক্রমে নদী হল, ওদের গ্রামে আর জলে কষ্ট রইল না। আর নদীর নাম দেওয়া হল, 'মণি মানিক'। সে নদীর জল কোনওদিন শুকিয়ে যায় না।

'মায়া অরণ্যে'র কী যে হল? আমি সেই বনের কথা শুনিনি অনেক দিন।

ধৈর্য-নুড়ি আর ধৈর্য-ছুরি

এক দেশে একজন গরিব মা থাকতেন। মনিয়া নামে তাঁর ছোট মেয়েটিকে নিয়ে। মা যখন বাইরে যেতেন কাজকর্ম করতে মেয়ে একা ঘরে বসে-বসে সেলাই করত, নানারকম ফুল তুলত কাপড়ে। একদিন জানালায় বসে-বসে মেয়েটি সেলাই করছে, ছোট্ট এক টুনটুনি পাখি উড়ে এসে বলল,—'হায়রে খুকি, ছোট্ট খুকি, তোমার কপালে আছে একজন মরা মানুষ!' বলেই পাখিটা উড়ে পালাল জানালা দিয়ে। মেয়েটার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সন্ধেবেলায় মা ফিরতে মাকে সে পাখির কথা জানাল। মা বললেন,—'যখন কাজকর্ম করবি, সবসময়ে দরজা-জানালার ছিটকিনি বন্ধ করে রাখবি।'

পরদিন মেয়েটা সব দরজা-জানলায় খিল তুলে বন্ধ করে কাজ শুরু করল। এমন সময়ে হঠাৎ—টুকি! পাখিটা এসে তার সামনে বসল!—'হায় রে খুকি, ছোট খুকি, তোমার কপালে আছে একজন মরা মানুষ!' বলেই পাখি উড়ে পালিয়ে গেল। মেয়েটি খুব ভয় পেল, কেমন করে এল পাখিটা? মা এলে তাঁকে জানাল কী হয়েছে। মা বললেন—'কাল দরজা-জানলা বন্ধ করে আলমারিটার মধ্যে ঢুকে বসে প্রদীপ জ্বেলে কাজ করবি।'

মা যেই বেরিয়েছেন, মেয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে, আলমারির মধ্যে ঢুকে, প্রদীপ জ্বেলে সেলাই শুরু করল। সেলাই করেছে কি করেনি,—টুকি! পাখি তার সামনে! 'হায়রে আমার ছোট্ট খুকি তোমার কপালে আছে এক মরা মানুষ!' আবার একই কথা বলে সে উড়ে গেল। বেচারা মেয়েটার আর কোনও কাজেই মন বসল না সেদিন। সেলাই তুলে রেখে সে ভাবতে বসল পাখিটার ওই অদ্ভুত কথাবার্তার মানে কী? তার মা-ও সেদিন

বাড়ি ফিরে যখন শুনলেন এবারেও পাখি ঠিক এসেছিল। রহস্যটা কী, জানবেন বলে মা পরের দিন আর বেরুলেন না কাজে। অকথা-কুকথা বলাটা বন্ধ করতে হবে পাখিটার!

এরপর থেকে মা কিংবা মেয়ে কেউই আর বেরুতে না বাড়ি ছেড়ে, যদি সে ফিরে আসে? একদিন পাশের বাড়ির মেয়েরা এসেছিল বেড়াতে। তারা মেয়েটির মাকে বলল, 'মাসিমা, আজ মনিয়াকে ছেড়ে দিন, আমরা সবাই ওকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। বাড়িতে বসে থেকে থেকে ওর মন খারাপ।' মা বললেন—'ঠিক আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরো, ওকে একা ছেড়ে দিও না যেন।' সারাদিন ওরা নদীর ধারে পিকনিক করল, নাচগান করল। তারপর সন্ধ্যা হচ্ছে দেখে ওরা বাড়ি চলল। পথে তেষ্টা পেয়েছে বলে একটি ঝরনায় জল খেতে গেল। সবাই এক-এক করে জল খাচ্ছে, মনিয়া যেই জল খেতে গেছে হঠাৎ ম্যাজিকে একটা দেওয়াল তৈরি হয়ে ওকে বাকি মেয়েদের থেকে আলাদা করে দিল। এমন অদ্ভুত দেওয়াল কেউ কোনওদিন দ্যাখেনি। এত উঁচু যে কেউ সেটা ডিঙোতে পারে না। মেয়েরা সবাই ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলল। এবারে কী হবে? আমরা ওর মাকে কী বলব গিয়ে? একজন বলল, 'আমি তো বলেছিলাম ওকে নিস না, তুই-ই তো নিলি।' আরেকজন বলল, 'মোটেই না। ও বলল।'—এমনি করে মেয়েরা ঝরনার কাছে ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি করতে লাগল অসহায়ভাবে উঁচু পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে।

মনিয়ার মা দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করছেন। মেয়েগুলো ফিরে এল রাত বাড়তে, হাউমাউ করে হাপুস নয়নে কাঁদতে-কাঁদতে। ওরা মাকে বলতেই সাহস পাচ্ছিল না মনিয়ার কী হয়েছে। সবশুনে মনিয়ার মা দৌড়ে-দৌড়ে ঝরনার কাছে পাঁচিলের ধারে গেলেন, আর মা মেয়ে দুদিক থেকে দুজনের কান্নায় আকাশবাতাস ভরে উঠল।

কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে মনিয়া ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন ঘুম থেকে উঠে মনিয়া দ্যাখে পাঁচিলের গায়ে মস্ত একটা দরজা! ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। ভেতর চমৎকার একটা প্রাসাদ। জীবনে কোনওদিন এমন প্রাসাদ দ্যাখেনি সে। দেওয়ালে চল্লিশটা চাবি ঝুলছে। মনিয়া এক-এক করে চাবি দিয়ে বন্ধ দরজাগুলি খুলতে লাগল। একটা ঘর রুপোর। একটা ঘর সোনার। একটা ঘর হিরের। একটাতে শুধু পান্না। আর একটাতে চুনি। প্রত্যেক কামরায় এক-একরকম মণিরত্ন ঢালা। দেখতে-দেখতে মনিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে গেল তাদের ঝলসানিতে।

চল্লিশ নম্বরের ঘরে যখন এল, সে দেখল খুব সুন্দর দেখতে একটি ছেলে একটা হাতির দাঁতের খাটে ঘুমিয়ে আছে। তার পাশে মুক্তোর একখানা পাখা। আর তার বুকের ওপরে এক টুকরো পুথির পাত। তাতে লেখা—'যদি কেউ চল্লিশদিন ধরে আমার পাশে বসে আমাকে পাখার বাতাস করে আর আমার জন্যে প্রার্থনা করে, তাহলে তার কপাল খুলে যাবে।'

মনিয়া তক্ষুনি প্রার্থনা করতে বসে গেল। আর মুক্তোর পাখাটি নিয়ে হাওয়া করতে লাগল ঘুমন্ত ছেলেটাকে। ছেলেটিকে রাজপুত্তুর বলেই মনে হচ্ছে, যেমন চেহারা তেমনি সাজপোশাক গয়নাগাঁটি। একটিবারও না উঠে মনিয়া চল্লিশদিন ধরে বাতাস করল আর প্রার্থনা করল ছেলেটির জন্যে। চল্লিশদিন যেদিন পূর্ণ, সকালবেলায় মনিয়া দেখল জানালার বাইরে একটি মেয়ে গোরু চরাচ্ছে। মনিয়া তাকে ডেকে বলল, 'তুমি একটু পাখাটা করবে।

আর প্রার্থনা করবে; আমি ততক্ষণ স্নানটা সেরে আসি। চল্লিশদিন স্নান করিনি।' মেয়েটি বলল,—'নিশ্চয়ই।' মনিয়া স্নানে গেল। তারপরে মেয়েটি রাজপুত্রের বুকের ওপরে রাখা পুথির পাতাটা পড়েছে। আর তার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি ঢুকেছে।

ইতিমধ্যে রাজপুত্তুরের ঘুম ভাঙল। চোখ মেলে সে গোরুচরানি মেয়েকে দেখে ভাবল,—'এই আমাকে সেবা করে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে।' তখন সেই মেয়েকে সে বললে,—'তুমিই আমার বউ তাহলে।' মনিয়া যখন স্নান সেরে এল সে নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না। গোরুচরানি মেয়ে বললে,—'দ্যাখো দ্যাখো, আমি রাজার মেয়ে হয়ে এমন সাদাসিদে থাকি, আর এই দাসী কিনা এত গয়নাগাঁটি পরেছে? যা, যা রান্নাঘরে যা, নিজের কাজে মন দে!' মনিয়া হাসবে না কাঁদবে? রাজপুত্তুর কিছু বুঝতে পারলে না। একজন তার বউ আরেকজন তার রাঁধুনি, এটাই বুঝল। উৎসবের সময় এল। রাজপুত্তুর সবাইকে উপহার দেবেন। বউকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কী চাও?' সে বলল,—'এমন একটা পোশাক চাই যেটা কাঁচি কাটেনি। সুঁচও সেলাই করেনি।' তারপর রাজপুত্তুর রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধুনি মেয়েকে জিগ্যেস করলেন,—'সে কী চায়?'

মনিয়া বললে,—'একটা শক্তপোক্ত ধৈর্য-নুড়ি চাই, আর একটা রাখাল ধৈর্য-ছুরি চাই—দুটোই চাই!' রাজপুত্তুর বাজার করতে গেলেন। বউয়ের জন্যে পোশাক পেলেন, শাড়ি। কিন্তু ধৈর্য-নুড়ি আর ধৈর্য-ছুরি কোথাও যে মিলছে না? কী করেন? রাজপুত্তুর জাহাজে চড়ে সমুদ্রে ভেসে গেলেন। কথা দিয়েছেন যে ধৈর্য-নুড়ি আর ধৈর্য-ছুরি আনবেন। না নিয়ে বাড়ি ফেরেন কোন মুখে? জাহাজ হঠাৎ একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনেও যাবে না, পেছনেও যাবে না। ব্যাপার কী? ব্যাপার কী? ক্যাপ্টেন ভয়ে পেয়ে গিয়ে যাত্রীদের ডেকে বললেন—'তোমাদের মধ্যে নিশ্চয় একজন কেউ আছে, যে কথা দিয়ে কথা রাখেনি তাই জাহাজ এগোচ্ছে না।' রাজপুত্তুর এগিয়ে গিয়ে বললেন তিনিই সেই লোক। তখন তাঁকে জাহাজ থেকে ডাঙায় নামিয়ে দিয়ে জাহাজ সমুদ্রে অপেক্ষা করতে লাগল। সে যাতে কথারক্ষা করে ফিরে আসতে পারে। রাজপুত্তুর যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে, শেষে একটা মস্ত ঝরনার কাছে এসে থামল। একজন রাক্ষস সেই ঝরনার মালিক। সে এসে রাগী গলায় বললে,—'তুমি কে? কী চাও?'—একটুও ভয় না পেয়ে রাজপুত্তুর বললে,—'আমি চাই একটি ধৈর্য-নুড়ি আর একটি ধৈর্য-ছুরি।'

'ওঃ এই?' বলে রাক্ষস পরমুহূর্তেই দুটো জিনিস এনে রাজপুত্তুরের হাতে দিয়ে দিল। রাক্ষসটি খুব উদার আর ভালোমানুষ। রাজপুত্তুর অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে নাচতে-নাচতে জাহাজে ফিরে এল। তারপর যথাসময়ে নিজের বাড়িতে চলে এল উৎসবের মুখে-মুখে।

এই ধৈর্য-নুড়ি আর ধৈর্য-ছুরি দিয়ে মনিয়া কী করবে, সেটা জানতে রাজপুত্তুরের খুব কৌতূহল হল। কী অদ্ভুত দুটো জিনিস চেয়েছে। তাই রাত্তিরবেলায় চুপিচুপি রাজপুত্তুর রান্নাঘরে গেল, কী ব্যাপার জানতে। সারাদিনের কাজকর্ম সেরে, ক্লান্ত হয়ে রাঁধুনি এসে ধৈর্য-নুড়ি আর ধৈর্য-ছুরি দুটি বের করে মাটিতে বসল। বসে, মনিয়া নিজের জীবনের গল্প বলতে শুরু করল ধৈর্য-নুড়ি আর ধৈর্য-ছুরিকে। তার ছোটবেলা, তার মায়ের কথা, সেই টুনটুনি পাখিটার অদ্ভুত ভবিষ্যৎ বাণীর কথা, মা'র আর তার কী ভীষণ উদ্বেগ গিয়েছে

সেকথা। মনিয়া যত বলে, নুড়িপাথরটি তত দুলে ওঠে। দুলতে দুলতে সে ছটফট করতে শুরু করে যেন সে পাথর নয়।

মনিয়া বলল তাদের পিকনিকে যাওয়া, ঝরনার জল খেতে এসে পাঁচিল তৈরি করে বন্দি হয়ে পড়া, চল্লিশদিন ধরে রাজপুত্তুরের সেবা, প্রার্থনা, পাখা করার পরে স্নান করতে যাওয়ার জন্যে গোরুচরানি মেয়েটিকে বসিয়ে যাওয়ার ফল। পাথরটা আরও ফুলে, ফুঁসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ফেটে যাওয়ার উপক্রম করল মনিয়া তখন তাকে বলতে থাকে, গোরুচরানি মেয়ে তাকে কীভাবে ঠকিয়ে রাঁধুনি করে দিয়ে নিজে রাজপুত্তুরের বউ হয়ে বসেছে। পাথরটা শুনতে-শুনতে আর সহ্য করতে পারল না। এবার সত্যি-সত্যি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। রাজপুত্তুর অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখলেন। মনিয়া এবার ধৈর্য-ছুরিটা হাতে নিয়ে ধৈর্য-নুড়িকে বলল,—'তুমি পাথর হয়ে যে অবিচার শুনে সহ্য করতে পারলে না চৌচির হয়ে ফেটে গেলে, আমি মানুষ, দুর্বল মেয়ে হয়ে সে যন্ত্রণা কেমন করে সহ্য করি?'—এই বলে মনিয়া ছুরিটা নিজের বুকে ঢুকিয়ে দিতে যাচ্ছিল—রাজপুত্তুর যদি তাড়াতাড়ি না ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর হাতটা চেপে ধরত, সর্বনাশ হয়ে যেত।

—'ওহো, তুমিই তাহলে আমার ভাগ্য!' এই বলে রাজপুত্তুর মনিয়াকেই বিয়ে করে নিল। আর গোরুচরানি মেয়েকে আবার গোরু চরাতে মাঠে পাঠিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু এবার শাস্তি, বহুদূরে ধূ-ধূ তেপান্তরের মাঠে। মনিয়ার মাকে আনতে পালকি পাঠানো হল। মনিয়ার পাড়ার সেই বান্ধবীরা সবাই এল। খুব আনন্দ করে রাজপুত্তুরের সঙ্গে মনিয়ার বিয়ে হয়ে গেল। ছোট্ট একটা টুনটুনি পাখি মাঝে-মাঝেই এসে ওর জানলায় বসে। আর বলে—'ও খুকি! সোনার খুকি, তোমার কপালে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে! সুখী হও! সুখী হও!'
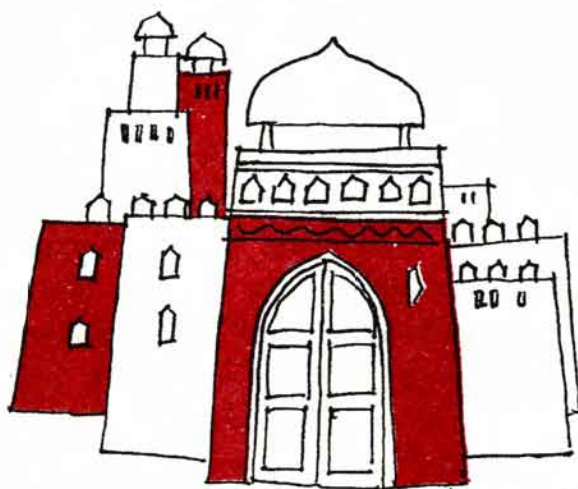
নীল সায়রের সবুজ মেয়ে

একদিন সমুদ্রে দারুণ ঝড় উঠেছিল। সেই ঝড়ের মধ্যে আকুলিবিকুলি করছিল একটা ছোট্ট জেলে নৌকো। তার দিকবিদিক জ্ঞান ছিল না আর, ঝোড়ো বাতাস তাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখানেই ভেসে যাচ্ছিল সে, তাতে ছিল দুজন মানুষ, বুড়ো জেলে আর তার নাতি। নোনা জল ঢুকে নৌকো প্রায় ডুবুডুবু হতে, বুড়ো জেলে দেখলে একজনের ভার সইতে পারলেও নৌকো দুজনের ভার সইবে না। তখন সে কথা নাতিকে না জানিয়ে, বুড়ো নাতিকে বললে, 'জোজো, আমি তো বুড়ো হয়েছি, এবারে আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। এই ঝড়ে জলে আজ যদি মারা যাই, তুই ভয় পাস না, আমি সব সময়ে তোর সঙ্গে সঙ্গে থাকব, এই বঁড়শিটা তোর ঘুনসিতে শক্ত করে বেঁধে রাখ, বঁড়শির ভেতরে আমি থাকব, বিপদে পড়লেই আমাকে ডাকিস।' তার একটু পরেই একটা বিশাল ঢেউ এসে নৌকো প্রায় ডুবুডুবু করে দিল, কথাবার্তা বন্ধ, দুজনেই উলটে পড়ল, কোনওরকমে নৌকো আঁকড়ে থাকা, যাতে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে না যায়, লন্ডভন্ড কাণ্ড, খানিক বাদে জল নেমে যেতে জেলের নাতি দেখলে দাদু নৌকোতে নেই। ভীষণ ভয় পেয়ে জোজো 'দা-দুউউউউ' বলে চেঁচিয়ে উঠল, ঝড়ের আওয়াজে কিছু শোনাই গেল না। তখন জোজোর মনে পড়ল বঁড়শির কথা, ওর কোমরে ঘুনসির সঙ্গে বাঁধা বঁড়শিটা হাতে নিয়ে জোজো ডাকল,

'দাদুভাই!' সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল,

'কী জোজো?'

'ভীষণ ঝড়, তুমি কোথায়?'

'এই তো তোমার সঙ্গেই আছি। ভয় নেই।'

খোলা নৌকোতে জোজো একা, রাত্রি গভীর, আকাশে তারা নেই, অন্ধকার ঘন করে তুলেছে শুধু কুণ্ডলী পাকানো দৈত্যের মতো কালো কালো মেঘ আর মেঘ। তাতে মাঝে-মাঝে প্রচণ্ড শব্দ করে ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত চিরে ফেলে। আস্তে আস্তে বৃষ্টি কমে এল, ঝোড়ো বাতাস কমে এল, দাদুর সঙ্গে কথা কয়ে জোজোর আর ভয় করছে না। ক্লান্তিতে, খিদেতে নেতিয়ে পড়ে জোজো ভিজে নৌকোর শক্ত পাটাতনেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল তার নৌকো একটা কালো পাথরে গিয়ে ঠেকেছে, সেখানে এক সবুজ রং-এর জলপরি বসে বীণা বাজাচ্ছে। কী অপূর্ব তার সুর।

সেই বীণার সুরেই জোজোর ঘুম ভাঙল। তখন ঝড় থেমেছে, রাত্রিও ভোর হয়ে এসেছে, পুব আকাশে গোলাপি রং লেগেছে।

জেগে উঠে জোজো দেখে তার সামনে সত্যি সত্যি মস্ত একটা কালো রং-এর পাথর, পাথর ঠিক নয়, বরং একটা ছোট্ট পাহাড় বলা যায়, তাতেই নৌকোটা ঠেকেছে, কিন্তু ভাঙেনি। গড় দেখে মনে হয় একটা কোনও পর্বতের চুড়োটুকুনি শুধু, বাকি সবটাই জলের তলায়। এই বিরাট পাথরটা কেবল জলের ওপরে মাথা তুলে রেখেছে। তাতে একটাও গাছপালা নেই, কিন্তু মাঝে-মাঝে পাথরটা পুরু শ্যাওলায় শ্যাওলায় কার্পেটের মতো নরম সবুজ হয়ে আছে। যেন কেউ ভেলভেটের বিছানা পেতে রেখেছে। জোজো ভাবল, 'যাই দেখি কিছু খাবারদাবার পাই কিনা। অন্তত একটু আরাম করে শোয়া তো যাবে।' নেমে পাথরটার একটা খোঁচা মতন কোণে নৌকোটা বাঁধল জোজো। তারপরে ঘুরে দেখতে বেরুল পাহাড়টা। একটু গিয়েই সুন্দর একটা বীণার সুর এল তার কানে, খুব আস্তে, হালকা করে বাজছে, যেন অনেক দূরে। এই সুরটাই বুঝি শুনেছিল সে তার স্বপ্নে? খুঁজতে গিয়ে জোজো দেখে একটা গুহার ভিতর থেকে আওয়াজটা আসছে। ভিতরে যাবে কি যাবে না, একটু ভেবে, জোজো সেই গুহার মধ্যে ঢুকেই পড়ল। গুহাটি অন্ধকার নয়, অল্প অল্প আলো আসছে, তার মানে গুহার অন্যমুখ বেশি দূরে নয়। বেশিদূর যেতে হল না, গুহা ফুরিয়ে গেল এই সুন্দর প্রবালের বাগানে এসে। সেখানে সাদা, গোলাপি আর কমলা রং-এর অজস্র প্রবাল ঝাঁকে-ঝাঁকে ফুটে আছে, তাদের মধ্যে একটি মেয়ে একমনে বসে বসে বীণা বাজাচ্ছে। বীণাটি ধবধবে সাদা, ঠিক যেন হাতির দাঁতের বীণা। কিন্তু হাতির দাঁত তো সমুদ্রে নেই? তবে কীসের? বোধহয় তিমি মাছের হাড় দিয়ে তৈরি, জোজো ভাবল। আর মেয়েটার গায়ের রং খুব অদ্ভুত রকমের শ্যাওলা, ঠিক ওই স্বপ্নের সবুজ জলপরির মতো অবিকল শ্যাওলা সবুজ, যেন নরম ভেলভেটের তৈরি পুতুল একটা। বুকে পিঠে ছড়িয়ে আছে তার ঢেউ খেলানো এলোচুল, কোমর ছাড়িয়ে লম্বা, আর গাঢ় নীল রং-এর, ঠিক মাঝ সমুদ্রের মতো। মেয়েটির চোখের মণির রং-ও একই, ঘন নীল। রাতে তো এই মেয়েকেই স্বপ্নে দেখেছিল সে বীণা বাজাতে।

জোজোকে দেখে মেয়েটা হাসল, যেন কতদিনের চেনা। সে-ও কি দেখেছিল স্বপ্নে, জোজোকে? জোজো দেখল, শ্যাওলা রং-এর মেয়ের দাঁত কিন্তু ঝকঝকে ফরসা, শ্যাওলা ধরা নয়। আর তার চারিদিকে ভারি সুন্দর একটা সুবাস ছড়িয়ে রয়েছে, চাঁপাফুলের গন্ধের মতো। জোজো বললে, 'তুমি আমাকে ডেকে এনেছ?' বীণা থামিয়ে মেয়েটা বললে, 'ঠিক ধরেছ। আমার কোনও বন্ধু নেই কিনা?' তারপরে বীণা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে

আছে বটে কিন্তু সেটা একটা সবুজ রং-এর আঁশ সময়ে সাপেরা দাঁড়ায়। আহ, পা নেই মেয়েটার। মৎসকন্যা বেচারি। সমুদ্রে জেলেদের জালে মাঝে-মাঝে ছোটখাটো মৎসকন্যারা ধরা পড়ে, তাদের জেলেরা আবার জলে ছেড়ে দেয়। কী করবে ওকে নিয়ে? মৎসকন্যারা তো মৎস্যও নয়, কন্যাও নয়। কিংবা একটু একটু দুটোই।

সে মেয়েরা না ঘরের, না জলের। জলেও তার সঙ্গী নেই, স্থলেও তার সঙ্গী নেই। একেবারেই একলাটি, তাই সে শুধু গান গায়, শুধু চুল আঁচড়ায়, শুধু বীণা বাজায়। আর রাতবিরেতে জাহাজ গেলে, মাঝ সমুদ্রের নাবিকদের সঙ্গে ভাব করতে চায়। জোজো বললে, 'আমার নাম জোজো, আমি জেলেদের ছেলে, মাছ ধরি। কন্যে, তুমি যদি মাছ হও তো বলো, আমি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই। আমাদের পুকুরে তোমাকে আদর করে পুষব। তুমি ঘাটে বসে বীণা বাজাবে আমি শুনব। যাবে আমার সঙ্গে?'

মৎস্যকন্যা বলে, 'না ভাই জোজো, আমি তো নীল সায়রের মৎস্যকন্যে, আমি কি তোমার মতো? নোনা জল ছেড়ে কোথাও গিয়ে বাঁচব কি না কে জানে? তুমি বরং আমার সঙ্গে থেকে যাও, আমরা খেলা করি এই প্রবাল দ্বীপের বাগানে।'

জোজো বললে, 'সে তো হয় না, সবুজ কন্যে, আমার মা বসে আছেন বাড়িতে আমার আর দাদুর পথ চেয়ে। দাদু হারিয়ে গেছেন এই ঝড়ে। আমি শুধু দুয়েকটা দিন থাকতে পারি তোমার দেশে। কিন্তু এখানে খাব কী? তোমাদের দেশে তো কিছুই নেই।'

সবুজ কন্যে হেসে বললে, 'আমার বীণা যে শুনেছে, তার খিদেও পায় না, তেষ্টাও পায় না। সে সবার চেয়ে আলাদা হয়ে যায়। তুমি বাড়ি ফিরতে চাইছ, যাও, কিন্তু তুমি আর ওদের সঙ্গে আগের মতো মিশতে পারবে না। এখন তুমি জলপরিদের দেশের লোক হয়ে গিয়েছ। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছ একবার? তুমি কি আর সেই আগের জোজো আছ?'

জোজো দেখে, সত্যিই তো, তার সারা গা হালকা সবুজ রং-এর হয়ে গিয়েছে, কচি কলাপাতার মতো। সেই একবার পাড়ার দেবুর জন্ডিস হয়েছিল, সে যেমন হলুদের মতো হলদে রং-এর হয়ে গিয়েছিল, জোজো তেমনিই সবুজ হয়েছে। জোজো আরও দেখল তার পা দুটো যেন জুড়ে যাবার মতো হচ্ছে। ও কী রে বাবা, সে-ও মাছ হয়ে যাবে নাকি? সর্বনাশ! জোজো ভয়ে অস্থির হয়ে বঁড়শি স্পর্শ করে ডাকল, 'দাদুভাই, আমার বড় বিপদ।' অমনি দাদুভাই বললে, 'মাথা ঠান্ডা রাখো জোজোভাই, এই তো আমি বলে দিচ্ছি কী কী করতে হবে তোমার সবুজ রং ধুতে। তুমি গিয়ে সাদা প্রবালের ঝাড় থেকে একটা টুকরো ভেঙে নাও। ওই পাহাড়ের পিছনদিকে একটা ঝরনা আছে। প্রবালের টুকরোটা সাবানের মতো ঘষে ওই ঝরনার পিঠে জলে স্নান করে ফেলো। দেখো তারপরে কী হয়।'

তখন জোজো আকুল হয়ে বললে, 'দাদু, যেও না, শোনো, আমার না, পা দুখানা—' ওর কথা থামিয়ে দিয়ে হেসে উঠে দাদু বললে, ''কিছু ভয় নেই ভাই, তোমার পা দুটো জুড়ে গিয়ে কখনও মাছের লেজ হয়ে যাবে না। বরং যা বলি, এই কথাটি মন দিয়ে শোনো। তুমি দেখবে চাঁদনি রাতে সবুজ জলপরি তার মাছের লেজটা মাটিতে খুলে রেখে ওই ঝরনাতে স্নানে নামে। তুমি করবে কি, লুকিয়ে লেজটা টেনে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে। তাহলেই ও আর মৎসকন্যে থাকবে না। তোমার মতোই মানুষ হয়ে যাবে।'

দাদুর কথা শুনে জোজোর মন আনন্দে নেচে উঠল। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্দুর উঠেছে। তার মানে আজ রাতে চাঁদ উঠবে নিশ্চয়।

কী মনে করে, সাদা প্রবালের দুটো টুকরো ভেঙে নিল জোজো। তারপরে ঝরনাটা খুঁজতে গেল পাহাড়ের পিছন দিকে। ওই তো কী সুন্দর ঝরনা ঝরছে পাথরের গা বেয়ে রুমঝুম শব্দ করে নীচে এসে অনেক নুড়ি পাথরের মধ্যে জড়ো হচ্ছে, মিঠে জলের কুণ্ড তৈরি হয়েছে একটা। তার চারিদিকে ঘিরে ঝিরঝিরে পাতাওয়ালা গাছে সাদা হলুদ বেগুনি ফিরোজা হাজার রং-এর নাম না জানা ফুল ফুটেছে, তার আশেপাশে কী সুন্দর বড় বড় ঝলমলে পাতাবাহারের গাছ। এতক্ষণ এই পাহাড়ে জোজোর চোখে পড়েনি কোনও গাছপালা, তার মনে মহা আনন্দ হল। ফুলে গাছে আর পাতাবাহারে সাজানো রঙিন নুড়ি-পাথরের মেঝেওয়ালা সেই স্বচ্ছ জলকুণ্ডটা দেখে মনে হয় ঠিক যেন একটা সুইমিং পুল। জোজো জলে নেমে সেই প্রবলখণ্ডটি ঘষে ঘষে আরামসে স্নান করে দেখে ওর রং আর অমন বিশ্রী সবুজ তো নেই, বরং আগের চেয়ে অনেক সুন্দর ঝকঝকে তকতকে তাজা হয়েছে, এতদিন নোনা জলে আর কড়া রোদে নৌকোয় সাগরজলে ঘুরে ঘুরে জ্বলে যাওয়া চামড়া থেকে কালি সব উঠে গিয়েছে।

রাতের বেলায় জোজো লুকিয়ে রইল পাথরের আড়ালে, বীণা বাজাতে বাজাতে জলকন্যা এসে পড়ল ঝরনার ধারে। এসে, বীণাটি নামিয়ে রেখে, মাছের লেজটা টেনে খুলে ফেলতেই সুন্দর দুটো স্বাভাবিক মানুষের পা বেরিয়ে এল তার ভিতর থেকে। জলকন্যা ঝরনাতে নেমে মনের সুখে সাঁতার কেটে স্নান করতে লাগল। আর জোজো চুপিচুপি তার লেজের খোলসটা নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল গভীর সমুদ্রে। কন্যা টেরও পেল না। তার স্নান সারা না হতেই জোজো এসে বলল,

'জলকন্যে, এই প্রবালের টুকরোটা গায়ে ঘষলে তোমার আসল রং ফিরে যাবে। দ্যাখো, আমি কেমন সুন্দর বদলে গিয়েছি।'

মৎসকন্যা তো চমকে উঠেছে।

'সে কি? তুমি কেমন করে ঝরনার কথা জানলে?'

জোজো বললে, 'আমি সব জানি।' বলে সে পাতাবাহারের পাতা আর ঘাসফুল, বনফুল দিয়ে চমৎকার একটা কাপড় বানিয়ে জলকন্যেকে পরতে দিল। কিন্তু প্রবালখণ্ডে স্নান সারতে রাজি হল না সবুজ মেয়ে। সে সবুজই থাকতে চায়। তার নীল চুলই পছন্দ। জোজোরও তাই।

যেই না মাছের লেজটা সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া, অমনি জাদুর বীণাটিও উবে গেল মাটি থেকে। আর সবুজ মেয়ে জলের মধ্যেই প্রায় ডুকরে কেঁদে উঠে বললে,

'উঃ, আমার কী খিদেই পেয়েছে!'

জোজো বললে, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, দেখছি কোথায় কী পাই।'

তারপরে নিজের নৌকোতে উঠে সমুদ্রে জাল ফেলল জোজো, অনেক মাছ উঠল, আর উঠল অতি সুন্দর একটা শঙ্খের তৈরি ঝাঁপি। সে তারপরে কিছু মাছ নৌকোতেই রাখল ঘরে নিয়ে যাবে বলে, আর কিছু মাছ কলাপাতায় জড়িয়ে, পাথরের গা থেকে নুন ছেঁচে মাখিয়ে, পাতার আগুন জ্বেলে ঝলসে পাতুরি করে নিয়ে, নিজে খেল, আর জলকন্যেকে

খাওয়াল। আর ঝাঁপিটি নিয়ে গিয়ে সবুজ মেয়েকে দিল। তারপরে ওরা রওনা হল গ্রামের দিকে। ওর কাছে কম্পাস আছে, দেশে ফিরতে অসুবিধে হল না, শান্ত আবহাওয়ায় নৌকো সোজাই জোজোদের গ্রামের সমুদ্রতীরে এসে ভিড়ল। সমুদ্রতীরে তখন প্রচুর ভিড়, অনেক জেলেনৌকো সেদিন ফেরেনি, এখন একে একে ফিরছে। বাড়িতে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে জোজো বললে, ''মাগো সর্বনাশ হয়েছে, প্রবল ঝড়ের মধ্যে দাদুকে সমুদ্দুরে হারিয়ে ফেলেছি, কিন্তু এই দ্যাখো তার বদলে সমুদ্দুর আমাকে কাকে দিয়েছেন, সবুজ কন্যের মতো একটা বন্ধু। আজই ওকে একটা বীণা কিনে দিতে হবে কিন্তু, মা। ও আসলে বীণাবাদিনী।''

'বেশ তো, বেশ তো' বলে মা মাছগুলো তুলতে গিয়ে দেখেন, সঙ্গে একটা সুন্দর দেখতে শঙ্খের তৈরি ঝাঁপি। 'এটাতে কী আছে রে?'

জোজো বললে, 'কি জানি মা,- জানি না তো?'

সবুজ কন্যে বললে, 'আমি জানি, ওটা আমার স্ত্রীধন। আমার বাবা সমুদ্র আদর করে দিয়েছেন, তবে আমার ইচ্ছে করলে আমি ও থেকে যাকে খুশি যত খুশি ধনরত্ন দানধ্যান করতে পারি। ওটা কোনওদিন শূন্য হবে না।'

এই বলে সে ঝাঁপিটা খুলে মেঝের ওপরে উপুড় করে দিল। আর চুনি পান্না হিরে মুক্তোর জ্যোতিতে আলো-ঝলমল করে উঠল গরিব জেলের আঁধার ঘরটি। 'সোজা করলেই ঝাঁপি আবার ভরে উঠবে', কন্যে বললে।

জোজোর মা বললেন, 'না বাছা, তোমার ধনসম্পত্তি তোমারই থাকুক, সবুজ মেয়ে, আমাদের ঘরে তো ওসবের দরকার নেই, বেঁচে থাক আমার জোজো, আর বেঁচে থাকুন তোমার বাবা সমুদ্দুর, কোনওদিন তোমার ভাতমাছের অভাব হবে না।'

কিন্তু জোজো হইহই করে বলে উঠল, 'কে বলেছে দরকার নেই? আলবাত দরকার আছে। চলো চলো এক্ষুনি ওই ধনরত্ন দিয়ে একটা হাতির দাঁতের বীণা কিনে আনি আমাদের বীণাবাদিনীর জন্যে। নইলে ও বাজাতে ভুলেই যাবে।'

পড়শীরা হইচই করে উঠল,

'কিন্তু বীণাবাদিনী বড্ড লম্বা নাম, জলকন্যেই ভালো।'

'জলকন্যে তো আর নেই সে? স্থলকন্যে হয়ে গেছে যে।'

'সবুজ মেয়ের নাম শ্যামলিমা হোক।'

'কিংবা শৈবাল থেকে শৈবালিনী?'

'তা কেন, অত শক্ত নাম ধরে ডাকব কেন', জোজোর মা বললেন।

'ও কি শুধুই সবুজ? ওর চুলের রং দেখেছ, চোখের রং? নীল সায়রের মেয়ের নাম হোক নীলসায়রী।'

তারপরে কী হল? হাতির দাঁতের বীণা এল, আর নীলসায়রীর গুণের কথা ছড়িয়ে পড়ল দেশে-বিদেশে। জোজো এখন বড় মাছ ধরা জাহাজ, যাকে বলে 'ট্রলার', তাই নিয়ে আরও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়।

চাষি বউয়ের মেয়ে

এক গ্রামে এক চাষি আর তার বউ থাকত, তার তিনটি ছেলে। একটিও মেয়ে নেই। তারা সবাই মিলে মাঠে চাষবাস করত। একদিন চাষিবউ দেখতে পেলে একটা সদ্য উড়তে শেখা পাখির ছানাকে বাজপাখি ধরে নিচ্ছে। দেখেই চাষিবউ বাজপাখিকে তাড়া দিল, তার মুখ থেকে যাতে পাখির ছানাটা পড়ে যায়। পাখির ছানা মরণের মুখ থেকে ছাড়া পেয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিজের বাসাতে উড়ে পালাল। তার মা সব শুনে চাষি বউয়ের কাছে এসে বললে, 'চাষিবউদি, পেন্নাম হই। আমার মেয়েটাকে তুমি বাঁচিয়েছ, আমি তোমাকে একটা বর দিতে চাই। বলো, তুমি কী চও?' চাষিবউ ছোট্ট পাখির কথা শুনে হেসেই অস্থির। সে বললে, 'ঠিক আছে, তা হলে আমার যেন তোমার মেয়ের মতন মিষ্টি একটা মেয়ে হয়।' পাখি মা বললে 'তথাস্তু, তাই হোক।'

পাখি মায়ের বরে চাষি বউয়ের একটি সুন্দরী মেয়ে হল। চাষি, আর তার বউয়ের আহ্লাদের অবধি নেই। তারা সারাদিন মেয়েকে আদর করে, ভাইদের এতে অল্প অল্প হিংসে হয়ে যায়। তারা বেচারারা সারাদিন বাবার সঙ্গে মাঠে রোদের মধ্যে খাটে, আর বোনটি কাঁথায় শুয়ে মায়ের সঙ্গে খেলা করে। বোন যতদিন আসেনি, মা শুধু তাদেরই ছিল। কিন্তু সেই তারাও একসময় ভালোবেসে ফেলল বোনকে, সে এতই মিষ্টি। ভাইরা তার নামই দিয়ে দিল মিষ্টি।

আস্তে আস্তে মিষ্টি বড় হল, ভাইদের সঙ্গে সে-ও এখন মাঠের কাজে যায়। চাষিবউ ঘরে থাকে, বাকি পাঁচজনের দেখাশোনা করে। তাই বলে ভেবো না সে খেতের কাজ

জানে না। সে ঘরের কাজও জানে, খেতের কাজও পারে। দরকার পড়লে চাষিবউ মাঠের কাজে এক্সপার্ট কিন্তু, মেয়েকেও সে ঘরের আর মাঠের দুরকমের কাজেরই শিক্ষা দিচ্ছে। ছেলেদেরও দিতে চেষ্টা করেছিল, ছেলেরা কিছুতেই ঘরের কাজ শিখতে চায় না। মা হাসে। মা জানে ঘাড়ে পড়লেই শিখে যাবে কষ্টেসৃষ্টে। এখন থেকে শিখে রাখলে সহজ হত। কিন্তু ছেলেরা তার কথা শোনে না। ঘরের কাজ ওদের ভালো লাগে না। খেতের কাজ ফুরোলে ওরা মাঠে খেলাধুলো করে।

এর মধ্যে একদিন চাষি গহন বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিল একটা কাজে। সেই বনে এক বটগাছের কোটরে থাকে এক মস্ত লোভী বুড়ো অজগর সাপ। সে যা পায় তাই গিলে খেয়ে ফেলে, খিদে পাক না পাক। সে যেই না চাষিকে দেখেছে অমনি কপ করে ধরে মনের আনন্দে গিলে ফেলেছে।

চাষি আর বাড়ি ফিরছে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে চাষিবউ বড় ছেলেকে পাঠাল বাবাকে খুঁজে আনতে। বড় ছেলেকে বনের ধারে দেখে গাছের ওপরে পাখি মা বললে, 'বনের মধ্যে ভয়ানক অজগর সাপ আছে, সাবধান, শুধু হাতে যেয়ো না।' চাষির ছেলে তার কথায় কান না দিয়ে শুধু হাতেই বনে ঢুকে পড়ল। আর অজগর তাকে দেখেই মুচকি হেসে টুপ করে গিলে ফেলল।

একদিন গেল, দুদিন গেল, ছেলেও ফিরছে না। তখন দুর্ভাবনায় মেজোছেলে বললে, 'মা, এবারে আমি যাই বাবার খোঁজে। দাদাকেও তো খুঁজে আনতে হবে।' চাষিবউ বললে, 'একা একা যাসনি, এবারে দুই ভাই একসঙ্গে যা, বিপদে পড়লে পরস্পরের সহায় হবি।'

দুই ভাই রওনা হয়ে গেল। বনের ধারে পৌঁছতেই গাছের ওপর পাখি মা বললে, 'বনের মধ্যে মস্ত অজগর সাপ আছে তোমাদের বাবাকে, দাদাকে সেই গিলেছে, তোমরা তাকে মারতে অস্ত্র নিয়েছ তো?'

চাষির ছেলেরা পাখির কথা গেরাহ্যি করলে না। বনে ঢুকে 'বাবা, বাবা, দাদা, দাদা' বল ডাকতে ডাকতে দু-ভাই পুকুরের ধারে বটগাছের নীচে পৌঁছে, ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে বসল। যেই ছোট ছেলে পুকুরে জল খেতে গেছে, অমনি বুড়ো অজগর কোটর থেকে বেরিয়ে এসে মেজকে কুপুৎ করে গিলে ফেলেছে। ছোট তো ফিরে এসে মেজদাকে খুঁজে পায় না, মেজদা গেল কোথায়? লুকোচুরি খেলছে না তো? 'মেজদা' বলে কোটরে উঁকিঝুঁকি দিতেই তার মুণ্ডুটা ধরে সব গবগব করে সারা শরীরটা মুখের মধ্যে টেনে নিল লোভী অজগর। তার তো পেট ভরা, তার মধ্যে চাষি আছে, তার দুই ছেলে আছে, তিন নম্বরকেও ভরে নিল পেটে। ফুলতে ফুলতে পেট এবার ফাটে আর কি!

তার গরম হতে লাগল। অজগর কোটরের বাইরে এসে ঘুম-ঘুম চোখে কুণ্ডলী পাকিয়ে শীতল সবুজ ঘাসের ওপরে খোলা আলো-বাতাসে অলসভাবে শুয়ে রইল। শীতের এখনও একটু দেরি আছে, এখনই তো ঘুমিয়ে পড়া যাবে না। যা পেল্লায় খাওয়াদাওয়া হয়েছে, তা হজম করতে করতে শীতকালেও কেটে যাবে। কী করবে, বনের পশুরা তো তার ধারে কাছে আর আসে না। শীতের ব্যবস্থা করে রাখাই ভালো।

এদিকে দিন যায়, রাত যায়, চাষি বউয়ের ঘরের লোকেরা কেউ ঘরে ফেরে না।

চাষিবউ আর তার মেয়ে নিজেরা নিজেরা কতদিন চাষ-বাস করবে? ছজনের কাজ কি দুজনে পারে? চাষির মেয়ে মিষ্টি বললে, 'মা গো, এবারে আমি যাই, দেখি বাবাকে, দাদাদের খুঁজে পাই কিনা।' চাষিবউ বললে, 'সাবধানে যেয়ো, আর এই শাবলটা, আর কাঠ কাটার কুড়ুলটা সঙ্গে নিয়ে যাও, যদি কোনও কাজে লাগে। আমাদের তো কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই। বনে কত বিপদ।'

মিষ্টি বনের ধারে পৌঁছোতে, গাছের ওপর থেকে পাখি মা বললে,

'সোনার মেয়ে মিষ্টি মেয়ে
বাপদাদাদের ফিরিয়ে নিয়ে
ঘরে ফিরবে লড়াই জিতে
ভুলো না আমায় থ্যাংকিউ দিতে।'

অবাক হয়ে মিষ্টি দেখল ছোট একটা পাখি তাকে আশীর্বাদ করছে। সে বললে, 'পেন্নাম হই পাখি মা। কিন্তু তাঁদের কোথায় পাব? তাই তো জানি না।'

পাখি বললে,

'বুড়ো বটের তলায় যাবে
অ-য় অজগর দেখতে পাবে
পেটের দরজা খুলবি
বাপদাদাদের তুলবি।'

মিষ্টি বললে, 'ও বাবা! অজগর সাপের পেটে আবার দরজা আছে নাকি?'

পাখি হেসে বললে, 'না থাকলে তুই দরজা কেটে নিবি। কুঠারটা আছে কী করতে? আগে শাবলটা সাপের মাথায় মারবি, সে মরে যাবে। তখন কুড়ুল দিয়ে মাথা কেটে বাদ দিয়ে, সাবধানে পেটটা চিরে ফেলবি। বাবা, দাদাদের সবাইকে ওইখানেই পেয়ে যাবি। দুষ্টু সাপ শুধু শুধু লোভ করে বনের অনেক প্রাণীকে খেয়ে ফেলেছে বছরের পর বছর।'

মিষ্টি বনের ভেতরে ঢুকে দেখে তাই তো? বটগাছের নীচে বিশাল এক অজগর সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। মিষ্টি পা টিপে টিপে ঠিক পিছন থেকে গিয়ে দুই হাতে শাবল ধরে জোরসে মেরে দিল সাপের মাথাতে এক বাড়ি! মাথা চ্যাপটা হয়ে গেল। তখন কুড়ুল দিয়ে দুষ্টু সাপের মাথাটা কেটে বাদ দিয়ে তার পেটটা চিরে ফেলে মিষ্টি দেখে পাশাপাশি শুয়ে আছে তার বাবা, বড়দা, মেজদা, ছোড়দা। চারজনেই অজ্ঞান, অচৈতন্য। মিষ্টি কলাপাতা কেটে এনে ঘাসের ওপরে তাদের প্রত্যেককে শুইয়ে রেখে দেখে সাপের পেটের মধ্যে আছে অনেক মণি মানিক হিরে মুক্তো। কে জানে কাদের খেয়েছিল, তাদের হজম করে ফেলেছে। এসব তো হজম হয় না। হঠাৎ সে শুনল গাছের ওপরে পাখি বলছে, 'সব ধন তুই নিয়ে নে/তোদের দুঃখু ঘুচেছে।' মিষ্টি বললে, 'থ্যাংক ইউ পাখি মা, থ্যাংক ইউ, তোমার জন্যেই এদের ফিরে পেলুম।'

পুকুরের জল এনে বাবা-দাদাদের মাথায় মুখে ঢালতে ঢালতে তাদের জ্ঞান ফিরল।

মরা সাপ, শাবল, কুড়ুল আর মিষ্টিকে দেখে সকলেই বুঝল কী হয়েছে। মাটিতে ধনরত্নের রাশি। পাঁচজনে মিলে তাদের কোমরের গামছাতে আর শাড়ির আঁচলে বেঁধে সব ধনরত্ন কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে এলো চাষি বউয়ের জন্যে।

চাষিবউ স্বামী-পুত্রদের ফিরে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে মিষ্টিকে কোলে বসিয়ে অনেক চুমু খেয়ে বললে, 'সাধে কি আমি একটা মেয়ে চেয়েছিলুম?'

পাখি মা ওদের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এসেছিল। সে বললে, 'আমাকে একটা থ্যাংকিউ দাও!'
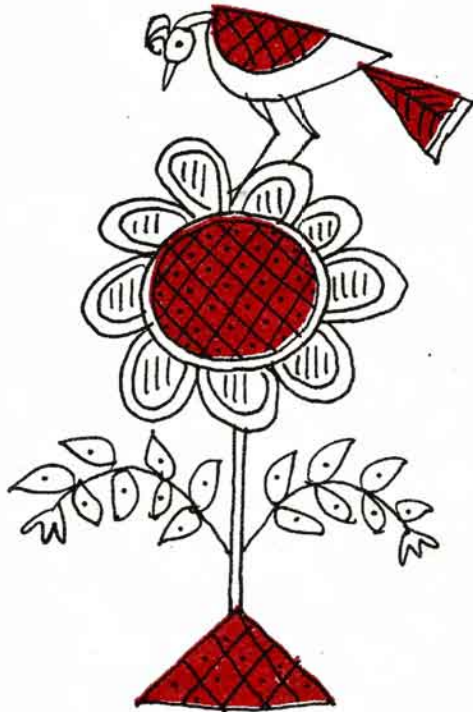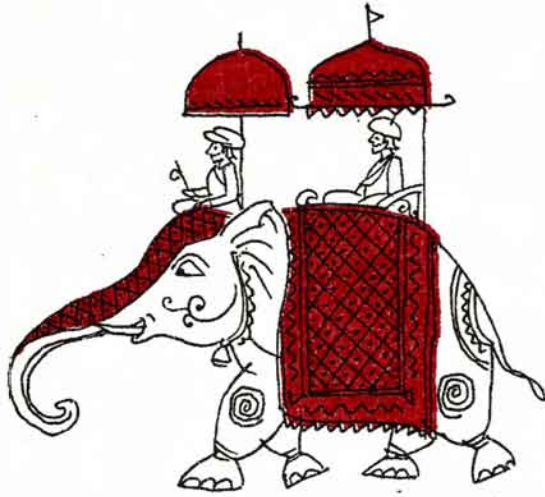
জাদুর কৌটো

এক গ্রামে এক সাধু এসে অভিশাপ দিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের গ্রামের কেউ কখনও গ্রামের বাইরে যেতে পারবে না। গেলেই সর্বনাশ। আর বাইরের লোকদের ঢুকতে দিতে পারবে না। এলেই সর্বনাশ! সেই থেকে সেই গ্রামের লোকেরা একা একা একঘরে হয়ে বাঁচে। কারুর সঙ্গে মেলামেশা করে না। তাদের সঙ্গেও কেউ মেলামেশা করে না। পৃথিবীর নিয়ম হচ্ছে একা একা থাকতে থাকতে লোকে বোকা হয়ে যায়। তাদের জ্ঞানগম্যি বাড়ে না, বরং কমে যেতে থাকে। এই গ্রামের লোকেরাও ক্রমে ক্রমে বোকা হয়ে যেতে লাগল। ভীষণ বুদ্ধি কমে গেল তাদের।

একদিন হল কী, প্রচণ্ড এক কালবৈশাখীর ঝড়ে সেই উজবুকপুর গ্রামের সবকিছু উলটপালট করে দিল—দড়ি থেকে উড়ে গেল কাপড়চোপড়, উঠোন থেকে উড়ে গেল বাড়ির কুলো ডালা, পুকুর পাড় থেকে উড়ে গেল মাজবার বাসনকোসন, মাঠ থেকে গরু ছাগল পর্যন্ত ছেড়ে যেতে লাগল, কুড়ে ঘরের চালতো বটেই।

একজন ঘরামি তখন চাল ছাইছিল, সে চাল খড় লাগাতে লাগাতেই উড়ে গেল চালের সঙ্গে—গিয়ে পড়ল এক মেলার মাঠে। এত লোকজন গরামি জীবনেও দেখেনি! সে ভয় পেয়ে লোকজনদের নিজের গ্রামের নাম বলতে, তারা ওকে উজবুকপুরের রাস্তা দেখিয়ে দিল। যেতে যেতে ঘরামির মনে হল আহা, তার বউয়ের জন্য একটা কিছু উপহার নিয়ে গেলে হয়। পকেটে পাঁচ টাকার কয়েন ছিল, বাতাসে নোট সব উড়ে গেছে। সে দোকানে ঢুকে বললে, 'আমার বউয়ের জন্য একটা কিছু উপহার দাও তো?' দোকানি

লোকটি ভালো, একটা সুন্দর রঙিন চৌকো কৌটোতে একটি চৌকো আয়না ভরে তার হাতে দিল—'নাও। তোমার বউ এটা পেয়ে খুব খুশি হবে।'

ঘরামি বাড়ি পৌঁছে আর কাউকে লজ্জায় বলেনি, যে সে গ্রামের বাইরে গিয়ে হাটের মধ্যে আছড়ে পড়েছিল ঝড়ের বাতাসে, কিন্তু বউকে বলল। বলে, কৌটোটা তার হাতে দিল—'এই নাও, এটা তোমার জন্য।'

বউ খুব খুশি হয়ে বাক্সটির ঢাকনা খুলেই তার মুখ অন্ধকার।

একি?

কৌটোর ভেতরে ও কে?

কাকে ঘরে নিয়ে এসেছে তার কর্তা? এ তো আরেকটা বউ। খুব সুন্দর দেখতে আরেকটা বউ।

ঘরামির বউ তো কাঁদতে কাঁদতে ছুটল, তার মায়ের কাছে—'মাগো, দ্যাখো তোমার জামাইয়ের কাণ্ড! এই কৌটোতে করে আর একটা বউ নিয়ে এসেছে ঘরে। একটা অল্পবয়সি মেয়ে।'

শুনে মা প্রবল চটেমটে বললেন—'কই? কোথায় সে? দিচ্ছি আমি তাকে গ্রাম থেকে ভাগিয়ে, নিয়ে এলেই হল আরেকখানা বউ? দেশের কি আইনকানুন নেই?'

বউয়ের হাত থেকে কৌটো নিয়ে খুলে মা দেখেন—'আরে এ তো কোনও অল্পবয়সি বউ নয়? এ তো এক খাণ্ডারনি, রাগি বুড়ি রে? রাগে চোখ লাল, দাঁত কটরমটর করছে।' সে বললে—'একে কেন বিয়ে করে আনতে যাবে আমার জামাই? আর যদিও বা এনেই থাকে, এ তোর কোনও ক্ষতি করবে না। ক'দিনই বা বাঁচবে? এ তো বুড়ি। ওর তো দিন ফুরিয়েছে।'

বউ বলল—'মা তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? বুড়ি কোথায়? এই তো একটা অল্পবয়সি বউ! তোমার বোধহয় চোখে ছানি পড়েছে মা।'

মা বললে—'কই, না তো? ছানি তো পড়েনি? এই তো তোর মাথার উকুনগুলো সব দেখে দেখে তুলতে পারছি—'

'তবে এমন কেন হচ্ছে মা? ভুলভাল?'

'চলো জামাই ধরি। সে বলুক।'

সব শুনে ঘরামি বললে—'কী কাণ্ড! আমি তো বুড়ি, কিংবা বউ, কিছুই আনিনি? শুধুই একখানি কৌটো এনেছি। দেখি তো ব্যাপারটা কী? তোমরা এসব কোত্থেকে পেলে?' কৌটো হাতে নিয়ে, ঢাকনি খুলেই তো ঘরামির চক্ষু চড়কগাছ!

তাই তো?

কৌটো তো খালি না? তাঁর মধ্যে যে একটা গোঁপদাড়িওয়ালা লোক বসে আছে ঘাপটি মেরে? বউও নেই, বুড়িও নেই, একটা লোক রয়েছে।

ঘরামি বললে—'ওরে বাবা, এর মধ্যে ঢুকে একটা লোক চলে এসেছে দেখছি হাট থেকে! এক্ষুনি ওকে তাড়াতে হবে—আমার বউ-বাচ্চাদের ক্ষতি করে যদি ও? কিন্তু তাকে তাড়ানো যাবে কেমন করে?'

বুড়িমা বললে—'কাজির কাছে চলো। কাজিই বিচার করবেন কৌটোর ভেতরে কে বসে আছে। বউটা, না বুড়িটা, না লোকটা।'

কাজির বাড়ি গিয়ে শোনে তিনি স্নান করতে নদীতে গেছেন। তখন ওরাও সদলে নদীতে চলল কাজিকে ধরতে। কাজি বেশ বুড়োসুড়ো মানুষ। অনেকদিন ধরে এই গ্রামের কাজি তিনি। সবাই তাঁকে মান্যিগণ্যি করে। তিনি তখন ঘাটে বসে গা মুছে পোশাক পরছেন। কাজি বললেন—'দাঁড়াও, তৈরি হয়ে নিই, তারপর তোমাদের অভিযোগ শুনছি।'

কাজির সাজসজ্জা শেষ হলে, তাঁকে তিনজনে মিলে যে যার কথা বললে, সব শুনেটুনে কাজি বললেন—'দেখি, কই? কৌটোটা দেখি?'

ভয়ে ভয়ে কৌটো তাঁর হাতে দিল ঘরামি। কাজি খুললেন।

খুলেই অবাক।

—'আরে তোরা সকলেই তো মিথ্যে কথা বলছিলি। এই কৌটোর মধ্যে তার একটা কাজিকে পুরে নিয়ে এসেছিস তুই! একই গ্রামে দুজন কাজি? নাঃ, কখনোই তা সম্ভব নয়।' এই বলে কৌটোটা ছুঁড়ে নদীর মাঝখানে ফেলে দিলেন। চুকে গেল ল্যাঠা।

বউ, মা দুজনেই খুশি হল। সব চেয়ে খুশি হল ঘরামি। সাধে কি সন্ন্যাসী এসে বসেছিল, গ্রামের বাইরে পা দিবি না? দিলেই সর্বনাশ!

জোড়া মানিক

কাঠুরেদের মেয়ে টুমটুম-পিকপিককে তোমরা তো চেনো? ওরা একদিন ইস্কুল থেকে ফিরছিল, হঠাৎ কালো করে বৈশাখী ঝড় এল। অমনি টুমটুম দিদির হাতে বইখানা ধরিয়ে দিয়ে লাগাল ছুট। পিকপিক তো দিদি, কী আর করে, দু-বোঝা বই নিয়েই দৌড়ল। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই অ্যায়সা বৃষ্টি নেমে গেল যে দু-বোনকেই বড় বটগাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়তে হল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে ওরা দেখে কী গাছের এপিঠে হেলান দিয়ে আরেকজন লোকও দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী সুন্দর গায়ের রং, যেন দুধে আলতায় গোলা—মাথায় যেমন উঁচু সে, তার বুকখানা তেমনি চওড়া—গায়ের চামড়াটি যেন মুরশিদাবাদী গরদের মতো লাল আর চকচকে। কাঁচাপাকা একমাথা ঢেউ খেলানো বাবরি চুল আর জুলপি, জুলপির সঙ্গে পেল্লায় একজোড়া গোঁফ। আর চোখ দুটো? ঈশ, কী বড় বড় আর কী টানাটানা, যামিনী রায়ের ছবির মতন যেন মুখ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, একেই বোধহয় বলে পদ্মপলাশ লোচন। সেই চোখে যেমন মায়ামমতা মাখানো, তেমনি আছে একটা রাশভারী ওজন—ভয় করে না বটে কিন্তু কেমন একটা সম্ভ্রমের ভাব হয়। চেহারাখানা রাজারাজড়ার মতন হলে কী হবে, লোকটির পরনে মাত্তর একটি ফরসা লেংটি! সারা গায়ে কোথাও আর সুতোটি পর্যন্ত নেই। লোকটার হাতে একটা পেতলের লাঠি-মতন আছে, বেশ মজার দেখতে। এই লাঠিখানা রাখালের লাঠি নিশ্চয়ই নয়, দারোয়ানদের লাঠিও নয়—পুলিশের বেটনও তো পেতলের হয় না। তবে কি এটা কোনো বাঁশি? কী জানি, ওটা হয়তো সিঁদকাঠিও হতে পারে। লীলা মজুমদারের গল্পে শিবু চোরের একটা সিঁদকাঠি ছিল,

সে তাই নিয়ে খালি গায়ে লেংটি পরে সিঁদ কাটতে বেরুত। কিন্তু সে তো বেরুত রাত্তিরে। এখন তো দিনের বেলা। লোকটা গায়ে তেল মেখেছে বলে মনে হয় না, কিন্তু ওর চাকচিক্যটা যেন চামড়ার ভেতর থেকে আপনি ফুটে বেরুচ্ছে। তা ছাড়া মুখখানা তো মোটেই চোরের মতন নয়, ওই চাউনিও তো রাজার মতন চাউনি! পোশাকটা ভিখিরির হলে কী হবে। কিন্তু হাতে ওই পেতলের লাঠিটা কী জন্যে? টুমটুম আর কৌতূহল চাপতে না পেরে বলেই ফেলল ঃ 'হ্যাঁ গো, তোমার হাতের ওই লাঠিটা আমায় একটু দেবে?'—অমনি লোকটি যেন চমকে উঠল। হাত জোড় করে বলল—'হে কল্যাণী, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। ইহা ভিন্ন আর যাহা কিছু তুমি প্রার্থনা করিবে, আমি সানন্দে তাহাই দান করিব। কিন্তু ইহা আমার রাজদণ্ড! রাজদণ্ডটি দাতব্য নহে।' ব্যাপার দেখে পিকপিক টুমটুম তো থ! বলে কি। রাজদণ্ড? ওটা তাহলে সোনার তৈরি? গাছতলাতে এ আবার কেমন রাজা? টুমটুম বললে—'তোমার গা খালি, পা খালি, মাথা খালি, তুমি কেমন রাজা? শুনেছি শুধু গান্ধী মহারাজই ছিলেন লেংটি পরা রাজা। তুমি আবার কে?'—রাজামশাই বললেন, 'হে কন্যাকে, আমার রাজবেশ, আমার শিরোপা, আমার অলংকার-সমূহ, পাদুকাদ্বয়, রাজছত্র, সকলই দান করিয়া ফেলিয়াছি। অদ্য যে আমার দানমহামেলা দিবস ছিল। আমার অশ্ব, রথ এমনকী সারথি পর্যন্ত দান করিয়া এক্ষণে পদব্রজে কান্যকুব্জে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। তাই আমাকে কথঞ্চিৎ বিসদৃশ দেখাইতেছে হয়তো বা। ইহাতে, হে শশীমুখী, তোমরা বিভ্রান্ত হইও না।' পিকপিক তক্ষুনি বলে উঠল ঃ "ওমা। তবে তো আপনি নিশ্চয়ই মহারাজ হর্ষবর্ধন হবেন? প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আপনারই তো দানমহামেলার উৎসব হয় শুনেছি। তা, আপনার বোন রাজ্যশ্রী কেমন আছেন?'—মহারাজ হর্ষবর্ধন এবার গোঁফ ছড়িয়ে মিষ্টি করে হেসে বললেন—'বালিকে, তোমার সুমধুর আলাপে আমার প্রাণে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদ হইতেছে। রাজকুমারী রাজ্যশ্রী কুশলে আছেন। তিনি রথযোগে পূর্বাহ্নেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।' কথা বলতে বলতে জোলো বাতাসের শীতে রাজামশাই থিরথির করে একটু কেঁপেকেঁপে উঠছিলেন। তাঁর তো আর খালি গায়ে থাকা অভ্যেস নেই। পিকপিক তাড়াতাড়ি বললে—'আহা গো, রাজামশাই, ভিজে মাথায়, আদুড় গায়, জোলো হাওয়ায় আপনার দেখছি ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। এক কাজ করি, বৃষ্টি তো ধরে এসেছে, আমি এক দৌড়ে আপনার জন্যে একটা গামছা নিয়ে আসি, আপনি মাথায় শুকনো করে মুছে ফেলুন।' বলতে বলতেই বাড়ির দিকে ছুট! টুমটুম তখন বললে—'মাথাটাথা মুছে, আপনি বরং চলুন আমাদের বাড়িতে। বাবার একটা ধুতি পরে কান্যকুব্জে ফিরে যান। ছি, ছি, রাজামশাই, এমন লেংটি পরে কেউ রাস্তায় বেরোয়? দেশের লোকে ভাববে কী?'—কথাটি রাজামশাইয়ের মনে ধরল। ইতিমধ্যে পিকপিক একটা ছাতা আর একটা গামছা নিয়ে হাজির। গা-মাথা মুছে শুকিয়ে, ছাতাটি মাথায় দিয়ে, গামছাটি গায়ে দিয়ে রাজামশাই লজ্জা-লজ্জা মুখ করে কাঠুরের বাড়িতে এলেন। একগলা ঘোমটা টেনে কাঠুরে-বউ তাড়াতাড়ি তাঁকে পরিষ্কার কাচের গেলাসে আদা-চা, তৈরি করে দিলে, নতুন বেতের ধামা ভরতি তেল-মুড়ি-লংকা মেখে দিলে। কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে মাটির দাওয়ায় আসন কেটে বসে, মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্ধন মনের সুখে গরম গরম চা-মুড়ি খেলেন। তারপর কাঠুরের আটহাতি ধুতিখানি কোমরে জড়িয়ে, একটি

শুকনো গামছা গায়ে মুড়ি দিয়ে রাজা আবার পথে নামলেন। কিছুতেই ছাতাটা নিতে রাজি হলেন না। ছত্রধর কোথায়? তাঁর নাকি নিজে নিজে ছাতা ধরে থাকার অভ্যেস নেই, হাত ব্যথা করবে! কাঠুরের জুতো জোড়া তাঁর পায়ে লাগল না, তাই কাঠুরে তাঁর পায়ে তিনটি টাকা রেখে বললে ঃ 'রাজামশাই, সামনের গ্রামে একজোড়া ভালো বিদ্যেসাগরী চটি কিনে নেবেন—আপনার সোনার পায়ে ফোস্কা পড়ছে খালি পায়ে পথ হেঁটে।'—রাজামশাই তখন দুহাত তুলে ওদের আশীর্বাদ করে বললেন ঃ 'তোমাদিগের এই পরম স্নেহ আমি কদাচ বিস্মৃত হইব না। তৎকালে তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই চাহিয়া লইও। কেবল এই রাজদণ্ডটি ব্যতীত! অদ্য বরং এই রাজদণ্ড হইতেই দুইটি মাণিক্য খুলিয়া লইয়া তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া যাই।'—শুনেই পিকপিক আর টুমটুম টিপটিপ করে রাজামশাইকে দুটো পেন্নাম করলে। আদর করে তাদের হাতের মুঠোয় সাতরাজার ধন জোড়া মানিক দুটি ভরে দিয়ে, রাজামশাই লাল-গামছা-গায়ে বনের পথে হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে গেলেন।

কাঠুরে-বউয়ের লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে মহারাজা হর্ষবর্ধনের সেই জোড়া মানিক তোলা আছে। রাত্তিরে তা থেকে জ্যোতি বেরিয়ে মা লক্ষ্মীর আসনটি আলো করে রাখে, আর তেলের পিদিম জ্বালতেই হয় না। ওদিকে পিকপিক আর টুমটুম তো দিন গুনছে। আর সাড়ে তিন বছর মাত্র বাকি! তার পরেই আবার মহারাজা হর্ষবর্ধন এই পথ দিয়ে যাবেন। তখন কী কী বই, কী কী খেলনা চেয়ে নিতে হবে, রোজই তার নতুন নতুন লিস্টি তৈরি করছে দুই বোনে। এইবেলা তোমরাও কিছু চেয়ে নেবে নাকি?

শঙ্খচূর্ণিকা ঠাকরুন

এক গ্রামে এক কাঠুরে ছিল। তার দুই মেয়ে, পিকপিক আর টুমটুম। পিকপিক বড়, সে শান্ত, শিষ্ট, বুদ্ধিমতী। টুমটুম ছোট, সে একটু দুষ্টু আছে, একটু বোকা আছে। ভদ্রতা সভ্যতা এখনও বেশি শেখেনি। লোকের সামনে খালি পায়ে চলে আসে, নাক-টাক খুঁটে ফেলে, টাক দেখলে হেসে ফেলে, টিকি দেখলেই টেনে ফেলে। কিন্তু টুমটুম খুব সাহসী। সে তো বই পড়তে শেখেনি, ভূতের গপ্পো-টপ্পো পড়েনি, ভূত যে আছে, তা-ই সে জানে না। পিকপিক কিন্তু জানে। সে খুঁটিয়ে জানে শাঁখচুন্নি কেমন হয়, মেছোপেত্নি কী চায়, বেম্মদত্যি কেমন দেখতে, মামদোর স্বভাব কেমনধারা। পিকপিক তাই অন্ধকারে বেরুতে চায় না। একলা ঘরে থাকতে চায় না। কিন্তু ছোট বোনটি পাছে ভয় পায়, তাই ভূত-পেত্নির কথা কিছু বলেও না, কিন্তু ঠিক সামলে সুমলে রাখে। ঠিক দুকখুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা, তাই তখন সে টুমটুমকে মাঠে যেতে দেয় না, গাব গাছের কাছে তো নয়ই। সন্ধে হলেই আশশ্যাওড়ার পাশ দিয়ে হাঁটা বারণ। অমাবস্যের রাতে বেলগাছের ধারকাছ দিয়ে যেতে দেয় না বোনটিকে। কিন্তু টুমটুম তো বোঝে না কেন বারণ করে! তাই সে মাঝে-মাঝে ভুলেটুলে চলে যায়।

একদিন কাঠুরে গেছে বনে কাঠ কাটতে, পিকপিক মায়ের সঙ্গে ঘরের কাজকম্মো করছে, টুমটুম দেখে গাবগাছের ডগাতে একটা লাল টুকটুকে চৌখুপি ঘুড়ি আটকে আছে। অমনি টুমটুম গাছে চড়তে গেল! গাছে পা দিয়েই শোনে, সে জানেও না যে ভূত-পেত্নিরা নাকি সুরে কথা কয়। সে বললে—'তুমি কে গো? তোমার গলায় কী হয়েছে? তোমার

গলা ওরকম শোনাচ্ছে কেন?' শুনে শাঁকচুন্নি তো অবাক। আচ্ছা মেয়ে তো? শাঁকচুন্নি চেনে না?' সে বললে, 'আমিঁ শ্রীঁশ্রীঁ শঁঙ্খচূঁর্ণিকাঁ দেঁবী।' টুমটুম ভাবলে এ আবার কোন দেবীরে বাবা? তেত্রিশ কোটির মধ্যে একজন হবেন! বুদ্ধি করে বললে—'পেন্নাম হই ঠাকরুন। আমি টুমটুম। ওই ঘুড়িটা ধরতে এসেছি। তোমার গলায় কী হয়েছে? টনসিল? একটু গার্গল করবে?' শাঁকচুন্নি প্রণাম পেয়ে খুব খুশি। আরও খুশি গার্গল করার কথা শুনে। তার আবার প্রাণে গানবাজনার খুব শখ। আর তার ভূতজীবনের আদর্শ হচ্ছে লতা মঙ্গেশকরের মতো গান গাওয়া। ওই নাকি সুরের জন্যই যত গণ্ডগোল হয়ে যায়। শাঁকচুন্নি ভাবলে এই সুযোগে যদি নাকী গলাটা সারিয়ে নিয়ে লতার মতন করে ফেলা যায় তা ছাড়ি কেন? সে বললে—'গাঁর্গলটাঁ কীঁ জিঁনিস?' ব্যাপার দেখে টুমটুমের তো গালে হাত! অবাক হয়ে সে বললে—'তুমি কোথাকার লোক? গার্গলক জানো না? মুখে নুন-গরম জলের আঁজলা নিয়ে গলায় গড়গড় শব্দ করতে হয়। তাহলেই গলা সেরে যায়। তা তুমি কোত্থেকে কথা কইচো? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো?' শাঁকচুন্নি বললে—'দেঁখেঁ কি হঁবে? কঁথা তোঁ শুঁনতেঁ পাঁচ্ছঁ?'

শাঁকচুন্নিকে দেখতে যে ভালো নয়, সে নিজেও তা জানে। তার টুমটুমের পুতুলের মতন চেহারার সামনে বেরুতে লজ্জা করল! ভয় দেখানোর জন্যেই সে চেহারাটা তৈরি, তাই নিয়ে ভাব-করা যায় কি? শাঁকচুন্নি তো বুঝে ফেলেছে যে টুমটুম ভয় পাবে না, বরং তাকে দেখলে কৌতূহলী হবে। হয়তো বলবে ঃ ও কি ভাই তোমার দাঁতগুলো অত বড় বড় কেন, অত হলুদ কেন? মাজো না বুঝি? কিংবা বলবে ঃ ও কী! তোমার হাত-পাগুলো অমন কাঠি হয়ে গেল কী জন্যে? অসুখ করেছিল?

অথবা বলবে ঃ আরে ! আরে! ও কেমন পা তোমার? গোড়ালিদুটো সামনের দিকে কেন? অত বড় বড় চুল কেন রেখেছ? অত লম্বা লম্বা নোখ কেন বাড়িয়েছ? কাটতে পারোনি। আনো দেখি কাঁচি। সাতপাঁচ এইসব ভেবে ভেবে শাঁকচুন্নির মনে বুদ্ধি এল। বললে—'দেঁবতাঁদের কিঁ অঁমন চঁট কঁরে দেঁখতেঁ পাওয়া যাঁয়?'

বোকা হলেও টুমটুমের বুদ্ধি আছে। সে বললে—'তুমি যদি দেবতা হও। তাহলে আমাকে একটা বর দাও তো দেখি?'

শাঁকচুন্নি বললে—'কীঁ বঁর?'

টুমটুম বললে—'ওই লাল ঘুড়িটা পেড়ে দাও তো।'—'এঁ—ইঁ বলে শাঁকচুন্নি টুক করে ঘুড়িটা ফেলে দিলে ওপর থেকে।'

টুমটুম তো অবাক! আরে? এ তো সত্যিই দেবী! টুমটুম বললে—'আরও বর দিতে পারো নাকি তুমি? তাহলে দাও দিকিনি আমার বাবার জন্যে একটা ঠেলাগাড়ি বানিয়ে? মাথায় করে বয়ে বয়ে কাঠ আনতে আমার বাবার খুব কষ্ট হয়।'

শাঁকচুন্নি বললে—'এঁ আঁর এঁমন কীঁ?' বলেই হাত বাড়িয়ে পাশের গাঁ থেকে একটা ঠেলাগাড়ি এনে দিলে। টুমটুম তার হাতখানা দেখতে পেলে না। শুধু চক্ষের নিমেষে দেখলে তার পাশে এক ঠেলাগাড়ি। ভূতেরা ইচ্ছে মতন অদৃশ্য থাকতে পারে। টুমটুম ইচ্ছে করলেও পাঁচ মিনিটের জন্যেও অদৃশ্য হতে পারে না। না পেরে তার নানা অসুবিধা হয় প্রায়ই।

অদৃশ্য হয়ে যদি রন্টুদের পেয়ারা গাছে চড়া যেত, অদৃশ্য হয়ে যদি মা-র আচারের বয়াম পড়া যেত, ইত্যাদি নানা দরকার থাকে টুমটুমের। কিন্তু সে তো দেবতা নয়। সে ভাবলে, দেবতাদের কী মজা। যেমন খুশি দেখা দেন, বাকি সময়টা অদৃশ্য থাকতে পারেন। টুমটুমেরও ঠিক তাই হলে ভালো লাগত। যাক গে বেঁচে থেকে তো কেউ দেবতা হতে পারে না, টুমটুম তাই বেশিক্ষণ মন খারাপ করলে না ওই নিয়ে। হাতে ঘুড়ি। পাশেই বাবার নতুন ঠেলাগাড়ি। টুমটুমের মেজাজ প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে বললে—'তা, ছংচুন্নিকা ঠাকুর। তুমি একটু প্রসাদ খাবে?' টুমটুম তো ছেলেমানুষ। জানে না যে ঠাকুরেরা 'নৈবেদ্য' খান, আর মানুষ ঠাকুরদের এঁটো কলাবাতাসাটা 'প্রসাদ' বলে খায়। ঠাকুর আবার 'প্রসাদ' খাবে কী? কিন্তু ও দেখেছে প্রসাদের জন্যে ওর মা কলা কাটেন, বাতাসা কিনে রাখেন। টুমটুম একছুট্টে বাড়ি গিয়ে দুটো বড় বড় বাতাসা দিয়ে এল শাঁকচুন্নির জন্যে। 'এই নাও। প্রসাদ খাও।'

শাঁকচুন্নি বেচারি পাতকুড়ানো নোংরা খায়, শ্মশানে-মশানে মরা জিনিস খায়, আঁস্তাকুড় থেকে ছাইপাঁশ খায়, সে তো কখনও বাতাসা খেতে পায়নি। তার এত ভালো লাগল বাতাসা মুখে দিয়ে, মনে হল যেন অমৃত! সে তক্ষুনি টুমটুমকে আরেকটু ভালোবেসে ফেললে। টুমটুম ততক্ষণে বাড়ি গিয়ে গেলাসে তার জন্যে নুন-গরমজল নিয়ে এসেছে। যেমন টুমটুমের হাত থেকে বাতাসা দুটো হঠাৎ ম্যাজিকের মতো উবে গিয়েছিল, তেমনি গেলাসটাও টুক করে অদৃশ্য হয়ে গেল। টুমটুম বললে ঃ 'এ জলটা যেন খেওনা, গার্গল করতে দিয়েছি। তোমার নাকি গলাটা আমার বিচ্ছিরি লাগছে।'

শাঁকচুন্নি বললে ঃ 'বাঁ। এঁই বুঁঝি গাঁর্গল?' বলেই তিনতুড়ি দিয়ে গেয়ে উঠল— 'হুঁম্ তুঁম্‌সে প্যাঁর কঁর লুংগি, বাঁতেঁ হজাঁর কঁর লুংগিঁ।'

টুমটুম বললে—'ও কী গো? ও যে খুব পুরানো গান? নতুন কিছু জানো না?'

শাঁকচুন্নি তখন গাইলে—'তোঁমাঁর হঁলঁ শুঁরুঁ আঁমাঁর হঁলঁ সাঁরাঁ'—এ গানটা বেশ ভালোই লাগল টুমটুমের। সে ভাবলে—আশ্চর্য! ঠাকুররাও গান করেন তা তো জানতাম না? ভাবতাম তাঁরা বুঝি কেবল স্তোত্র পড়েন, আর নমস্তস্যৈ, নমস্তুতে এই সব করেন। সে বললে, 'ঠাকুর,—তুমি গার্গলটা করে নাও। জল জুড়িয়ে যাবে।' বলে ঘুড়ি নিয়ে খেলতে চলে গেল।

এদিকে শাঁকচুন্নি তো প্রাণপণে গার্গল করছে। সে লতা হবেই। সবটা নুনজল ফুরিয়ে যেতে গেলাসটি হাত বাড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে নিয়েছে নুনজলের জন্যে। শ্মশান থেকে চিতার আগুনে সেঁকে জলটা গরমও করে নিয়েছে। আরও গার্গল করছে। কিছুতেই নাকি ভাবটি কাটছে না। একটুর জন্যে ঠিক লতা-টাইপ আওয়াজটা বেরিয়েও বেরুচ্ছে না।

পিকপিক এমন সময়ে বোনকে খুঁজতে এদিকে আসছিল। হঠাৎ শুনলে গাবগাছ থেকে গঁড়গঁড়—গঁড়গঁড় শব্দ, তার পরেই ঝপাস করে গরম গরম কী যেন তার মাথায় পড়ল। আর যাবে কোথায় 'বাবাগো-মাগো' বলে যেই সে পালাতে যাবে অমনি গাছের শেকড়ে পা জড়িয়ে ধপাস। টুমটুম ছুটে এসে দিদিকে তুললে, দিদির মাথা ভিজে ভিজে। ব্যাপার শুনে বললে, 'ও কিছু না। ও তুই মাথাটা পুকুরে ধুয়ে ফ্যাল। ছংচুইন্নকা দেবী গার্গল করচেন।' শুনে তো পিকপিক আবার পড়ে যাবার যো—'সে কি।' টুমটুম বললে,—

'হ্যাঁ। ঠাকরুনের গলাটা ধরেছে কিনা, গান গাইতে পারছেন না। আমি তাই নুন জল দিয়েছি।' পিকপিক ভয় পেলেও বুদ্ধি হারায় না। সে ঠান্ডা মাথায় বোঝবার চেষ্টা করলে, কি হচ্ছে। টুমটুম ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতেই পুরো গল্পটা বললে। ঘুড়ি প্রমাণ তার হাতেই। আবার বাবার জন্যে ঠেলা গাড়িখানা গাবগাছে হেলানো রয়েছে। দেখেশুনে পিকপিক ক্রমে ধাতস্থ হল। সে বুঝলে শাঁকচুন্নিটা লোক ভালোই, মিশুক আছে। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের যার-তার সঙ্গে মেশা তো উচিত নয়? হলেই বা ভালো লোক, ভূত তো সে? কখন মেজাজ খারাপ থাকবে, ঘাড়টাড় মটকে ফেলবে, তার ঠিক কী? পিকপিক একমনে ভাবতে লাগল ঃ কী করা? কী করলে ভূত রাগ করবে না, ভূতের ক্ষতি হবে না, আবার এই মেলামেশাটাও বন্ধ হবে। তারপর বললে ঃ 'আচ্ছা টুমটুম, শঙ্খচূর্ণিকা ঠাকরুন কি বিশ্বসঙ্গীত সম্রাজ্ঞী প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে চান?'

গাছের ওপর থেকে জবাব এল ঃ 'সেঁটা কোঁথাঁয় হঁবে ভাঁই?'

পিকপিক এই প্রথম স্বকর্ণে ভূতের ভাষা শুনলে। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবলে ঃ কই, ভয় তো করছে না? বরং সে বুঝলে, ওষুধ ধরেছে। শাঁকচুন্নি মজেছে। বললে, 'স্কটল্যান্ডে হচ্ছে। এডিনবরা শহরে।'

শাঁকচুন্নি বললে, 'কঁবে হঁবে?'

পিকপিক কালবিলম্ব করলে না। বললে—'আজই।' অমনি শোঁও-ও করে একটা আওয়াজ হল, গাবগাছের একটা সরু ডাল ভেঙে পড়ল। শঙ্খচূর্ণিকা দেবী টেকঅফ করলেন।—এক লম্ফ দিয়ে ডাঙা পার হয়ে, আরবসাগর, লোহিতসাগর, ভূমধ্যসাগর, বে-অব-বিস্কে পেরিয়ে, নর্থসির তীরে, স্কটল্যান্ডে গিয়ে টাচ-ডাউন! ভূতেদের অনেক নিয়ম কেউ একলাফে ডিঙোয় তাহলে তার আর ভারতীয় ভূতসমাজে ঠাঁই হয় না। শাঁকচুন্নি এডিনবরায় পৌঁছে দেখে, তাই তো। সত্যি সত্যি সেখানে বিখ্যাত 'এডিনবরা মিউজিক ফেস্টিভ্যাল' হচ্ছে। গানবাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে শাঁকচুন্নি দেশের কথা ভুলেই গেল। লতা না হয়ে সে এখন জোন বায়েজ হবার সাধনা করছে।

পিকপিক টুমটুমকে সাবধান করতে বলে দিয়েছে—'দ্যাখ, অচেনা লোকের সঙ্গে কথা কইতে নেই। সে দেব, দানব, মনিষ্যি, যেই হোক।'' শঙ্খচূর্ণিকাদেবী যে আসলে শাঁকচুন্নি ভূত ছিলেন, তা কিন্তু টুমটুম এখনও জানে না। আর আশ্চর্য ব্যাপার, পিকপিকের একবার ভূতের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হতে গিয়ে সেই ভয়-ভাবটাও যেন কেটে গেছে। এখন সে গাবগাছের নীচে যেতে তো ভয় পায়ই না, আশশ্যাওড়া ঝোপের পাশেও যায়। কিন্তু শাঁকচুন্নির এঁটো গেলাসটা সে কিছুতেই রান্নাঘরে তুলতে দেয়নি। তাতে মাটি ভরে একটা মানিপ্ল্যান্ট লাগিয়েছে বারান্দায়। কাঠুরে তো বাড়ি ফিরে গাড়ি দেখে অবাক। তারপর সাতদিনেও যখন কেউ সেই ঠেলাগাড়ি নিতে এল না, তখন সেই গাড়ি করেই কাঠুরে মন থেকে কাঠ আনতে লাগল, হাটে কাঠ নিয়ে যেতে শুরু করল। আর মনে মনে শাঁকচুন্নিকে থ্যাংকিউ বলল। টুমটুমের কিন্তু অতশত বুদ্ধি নেই। গাছের উঁচু ডালে ঘুড়ি আটকে থাকতে দেখলেই তার মনে হয়—আহা গো শঙ্খচূর্ণিকা ঠাকরুন যদি স্কটল্যান্ডে চলে না যেতেন?

কাঠুরে আর কাঠঠোকরা

এক মস্ত বনে একটা ছোট্ট রঙিন কাঠঠোকরা পাখির ছানা থাকত। তার মা ছিল না, বাবা ছিল না, ভাই ছিল না, বোন ছিল না। কেবল একটা ঝুঁটি ছিল আর একজোড়া ঠোঁট ছিল। সে ছোট্ট হলে কি হবে, ঠুক্‌ঠুক্‌ করে কাঠ ঠুকরে ঠুকরে দিব্যি গর্ত করতে পারত। কাঠঠোকরার যা স্বভাব।

সেই বনে এক কাঠুরে যেত। সে খুব বুড়ো হয়ে গেলে কী হবে, সে-ও ঠুক্‌ঠুক্‌ করে কুড়ুল মেরে দিব্যি ছোট-ছোট শুকনো ডাল কাটতে পারত। ছোট গাছ সে কাটত না মায়া করে। ছেলেমানুষ গাছ তো, এখনও বড়ই হয়নি, কেটে ফেলে কেমন করে? আর বড় গাছও সে কাটত না। বুড়ো মানুষ তো, গায়ে অত শক্ত নেই যে অ্যাত্তোবড় গাছটা কাটতে পারে।

সে রোজ যখন কাঠ কাটে, কাঠঠোকরা পাখির ছানাও তখন কাঠে গর্ত করে। দুজনে বেশ দেখা হয়। দেখতে দেখতে ভাবও হয়ে গেল। বুড়ো যখন দুপুরে টিফিন খেত, কাঠঠোকরাকে তু-তু করে ডেকে একটুকরো রুটি কি একটুখানি পেয়ারা খেতে দিত। কাঠঠোকরাও মনে আনন্দে খেত।

একদিন বুড়ো বললে, 'উঃ, আর পারি না। আমার যদি একটা ছেলে থাকত!'

কাঠঠোকরা বললে, 'কেন কাঠুরেমশাই, ছেলে দিয়ে আপনি কী করবেন?'

'কী আর করব, ছেলে থাকলে সেই তো আমাকে খাওয়াত। আমি এই বুড়ো বয়েসে আর কাউ কাটতে পারি না।'

কাঠঠোকরা বললেন, 'আপনি তো রোজ আমাকে খাওয়ান, এবার বরং আমিই আপনাকে খাওয়াব। আপনি আমার বাবা হবেন?'

কাঠুরে তো শুনে হেসেই বাঁচে না। বললে, 'ও পাখি, ও সোনামণি পাখি, তুই কেমন করে আমাকে খাওয়াবি বাছা? আমার কি পাখির আহার? আমার রুটি চাই, তরকারি চাই, ভাত চাই, ডাল চাই, চা চাই।'

'ও বাবা, এত?'

'হ্যাঁ বাছা, এত। মানুষের পেট বড় ভীষণ গর্ত। কিছুতে ভরে না। যাই হোক আজ থেকে বাছা তুমি আমার ছেলে।'

শুনে কাঠঠোকরার খুব আনন্দ হল। সে বনের রানি বনদেবীকে গিয়ে বললে, 'রানিমা, এই কাঠুরে আমার বাবা। এখন বুড়ো হয়েছে, তার সারাজীবন এই জঙ্গলে কেটেছে, তুমি এবার তাকে খাওয়াও। সে আর পারে না। দ্যাখো, সে খুব ভালো লোক, মরা শুকনো ডালপালাই কাটে, কচি ডালে কুড়ুল ছোঁয়ায় না।'

বনদেবী বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার ওই বুড়ো বাবাকে আর কাঠ কাটতে হবে না। সে বরং আমার বন সাফাই করুক। যত মরা ডাল, শুকনো পাতা, সুবিধে মতো পরিষ্কার করুক, তাকে আমার বনের বনমালি করে দিলুম।'

কাঠঠোকরা নাচতে নাচতে উড়তে উড়তে এসে বললে, ''বাবা, বাবা, আমি তোমাকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছি। তুমি এই বনের বনমালি হয়েছ, বনদেবী নিজেই এবার থেকে তোমার খাবার দেবেন।'

বুনো কাঠুরে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কাঠঠোকরার ঝুঁটিতে ডানাতে হাত বুলিয়ে আদর করে বললে, 'যাক, সত্যি সত্যিই একটা ছেলে পেলুম তাহলে।'

তারপর থেকে বুনো কাঠুরে আর ছোট্ট অনাথ কাঠঠোকরা একসঙ্গে বনে ঘুড়ে বেড়াত। একজন ঘুমোত গাছের কোটরে, একজন গাছের তলায়। একজন খেত বনদেবীর দেওয়া ভালো-ভালো প্রসাদ, আরেকজন তাতে ভাগ বসাত মনের আনন্দে। বনদেবী দেখে হাসতেন।

অনাথ ছানা বাবা পেল,
বুড়ো ঠাকুরের ছেলে হল,
আয়রে ছোটন, বনে যাই,
বনদেবীর প্রসাদ খাই।
বনদেবী না বনবিবি?
হাত পেতেছি, বর দিবি?
বর পাবি না কাঁচকলা—
ঠুক্‌রে দেব, যাঃ পালা!

স্বপ্ন কেনার সদাগর

হরিহর আর রামকেষ্ট দুই কাঠুরেতে খুব ভাব। দুজনে একসঙ্গে খাটে। দুই কাঠুরে কাঠ কাটতে বনে গেল। অনেক কাঠ কেটে খেয়েদেয়ে দুজনে শুলো। একজন ঘুমিয়ে পড়ল, আরেকজনের আর ঘুমই আসে না। হরিহর ঘুমুচ্ছে, তার এমনই ভয়ঙ্কর নাক ডাকতে লাগল যে অন্য কাঠুরে চুপচাপ একটা গাছে ঠেশ দিয়ে হুঁকো খেতে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল যে ঘুমন্ত কাঠুরের নাক থেকে একটা ভোমরা বেরিয়ে এসে উড়ে গেল। অমনি কাঠুরের অমন সর্বনেশে নাকডাকাও থামল, সে উঠে বসে বললে, 'ভাই, কী আশ্চর্য স্বপ্নই না একখানা দেখলুম!' রামকেষ্ট বলল, 'কী স্বপ্ন দেখলে ভাই?'

হরিহর বললে, 'দেখলুম, হস্তিনাপুর শহরে সবচেয়ে ধনী লোকের বাড়ির পেছনের বাগানে বটগাছের নীচে একটা ঢিপি মতন আছে, তার ওপর তুলসীগাছ হয়েছে। তার নীচে একটা কলসি ভরতি সোনার মোহর আছে। এতদূর দেখতেই ঘুমটা ভেঙে গেল।' রামকেষ্ট বললে, 'ভাই হরিহর, তোমার এই স্বপ্নটা আমাকে বেচবে? আমি দশটাকা দেবো।' হরিহর তো হেসে আকুল। 'স্বপ্ন কেউ কাউকে বেচে কখনও? তুমি অমনিই নাও না স্বপ্নটা।' রামকেষ্ট বললে, 'না স্বপ্নটা আমি কিনে নিলুম দশ টাকা দিয়ে। তুমি আর কাউকে এ স্বপ্নের কথা বলতে পারবে না। শপথ করো?' হরিহর হাসতে হাসতে শপথ করলে। সেদিন কাঠ বিক্রি করে যে বারোটাকা হল, তার দশ টাকাই সত্যি সত্যি রামকেষ্ট হরিহরকে দিয়ে দিল, স্বপ্নের দাম।

তারপর রামকেষ্ট বাড়ি গিয়ে বললে, 'বউ, বউ, আর আমাদের কষ্ট দুঃখু থাকবে

না। আমি দশ টাকা দিয়ে আজ হরিহরের কাছ থেকে একটা গুপ্তধনের স্বপ্ন কিনেছি।' বউ তো শুনে থ! কেউ কখনও এমন কথা শুনেছে? গুপ্তধনের স্বপ্ন কিনেছে তার বর? বউ হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না। কিন্তু মানুষটা ভালো বলে হেসে আর রামকেষ্টকে কষ্ট দিল না। বললে, 'বেশ বেশ, ভালো কথা। ভাতটা খেয়ে নাও তারপরে গুপ্তধনের স্বপ্ন শুনব।' রামকেষ্ট ভাত খেয়ে বউকে বললে, 'শোনো, বউ, হস্তিনাপুর শহরে যে সবচেয়ে ধনী লোক, তার পেছনের বাগানে একটা বটগাছের তলায় একটি ঢিপি আছে, তার ওপরে তুলসীগাছ আছে, তার নীচে কলসি ভরতি সোনার মোহর পোঁতা আছে। আমি হস্তিনাপুরে যাব গিয়ে কলসিটা খুঁড়ে নিয়ে আসব।'

বউ বললে, 'কিন্তু হস্তিনাপুরে যাবে কেমন করে? সে তো শত যোজন দূরে। অত হাঁটতে হাঁটতে বুড়ো হয়ে যাবে তো? তা ছাড়া ধনী লোকটার নাম কী তাও জানো না। খুঁজে পাবেই বা কেমন করে তার বাড়ি? পেলেই বা সে কেন তোমাকে তার বাগান খুঁড়তে দেবে? না বাপু, আমাদের গুপ্তধনে কাজ নেই। আমাদের একটা মাত্র ছেলে ঠিক মানুষ হয়ে যাবে।' কিন্তু রামকেষ্ট কিছুতেই শুনবে না। শেষ পর্যন্ত বউ উত্ত্যক্ত হয়ে তার বাপের বাড়ি গিয়ে একশো টাকা ধার নিয়ে এলো। হস্তিনাপুরে যেতে হলে পথ খরচ খাই খরচ তো চাই? কাঠুরে বললে, 'আমি কাঠ কাটতে কাটতে, কাঠ বেচতে বেচতেই বন দিয়ে বন দিয়ে চলে যাব। আমার বেশি টাকা লাগবে না। তবু সঙ্গে কিছু থাক।' এই বলে সে ঠাকুর-দেবতাকে মনে মনে নমস্কার করে ছেলে-বউকে আদর করে কুড়ুলটা নিয়ে গামছায় চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে কোমরে একশো টাকা গুঁজে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কে জানে কতদিনের জন্য চলল? হরিহর বললে, 'তুই যা, আমি তোর ছেলে বউকে দেখাশুনো করব। কিন্তু স্বপ্ন তাড়া করে বেড়িয়ে কেউ কখনও কিছু পেয়েছে? মিছিমিছি এত কষ্ট করিছস ভাই।' রামকেষ্ট শুধু একটু হাসলে। তারপর রামকেষ্ট তো বেরিয়ে পড়ল। সতি সত্যি সে বনে কাঠ বেচে রোজগার করতে করতে পথ চলল। মাঝে-মাঝে গরুর গাড়ি চড়ে যেতে লাগল, হাতে তো টাকার অভাব হচ্ছে না। এমনি করে সে ছ'মাসের মধ্যেই হস্তিনাপুরে পৌঁছে গেল। সেখানে পৌঁছে হল মুশকিল। কার বাড়িতে যাবে তাই জানে না। হস্তিনাপুরে সকলেই ধনী। কে যে সবার চেয়ে ধনী, তা অন্যেরা জানে না। একদিন রামকেষ্ট একটা কাঠুরেদের আড্ডাতে বসে আছে, সেখানে, অনেক মালিটালিরাও এসেছে চা, খেতে। রামকেষ্ট বললে, 'আচ্ছা ভাই, এই শহরে সবচেয়ে ধনী কে?' তারা সবাই বলল, 'ঠিক জানি না ভাই, হয় ওই সাহাবাবুরা, নয় ওই লালবাবুরা হবে। ওদেরই তো সবচেয়ে বোলবোলাও দেখতে পাই। আজ এ যদি পায়রার বিয়ে দিচ্ছে, কাল ও বেড়ালের বিয়ে দিচ্ছে। শহরসুদ্ধু নেমতন্ন খাওয়াচ্ছে। কেমন করে বলল কে বেশি বড়লোক? দুজনে আবার বেয়াই হয়।'

রামকেষ্ট বললে, 'আচ্ছা ভাই, তোমরা তো মালি? ওদের মধ্যে কার পেছনের বাগানে বটগাছের ঢিপির ওপর তুলসীগাছ আছে বলতে পারো?' মালিরা একবাক্যে বললে, 'ও সে তো সাহাবাবুদের বাগানে। তুলসীগাছ মানে? বনতুলসীর ঝোপ।' রামকেষ্ট মনে মনে ঠিক করে ফেলল সে তক্ষুনি সাহাবাবুদের বাগানে যাবে। রামকেষ্ট সাহাবাবুর কাছে গিয়ে

হাজির। কাঁধে গামছা, হাতে কুড়ুল—সাহাবাবু তো লোকটার সাহস দেখে অবাক! রামকেষ্ট বললে, 'সাহাবাবু, আমি একটা স্বপ্নের নির্দেশে আপনার বাড়ি আসছি, আপনার পেছনের বাগানে বটগাছের নীচে ঢিবি আছে। তার নীচে একটি কলসি ভরতি সোনার মোহর আছে। শত যোজন দূর থেকে ছমাস ধরে চলতে-চলতে আমি এসেছি ওই কলসিটা খুঁড়ে বের করব বলে। তারপর আপনি আদ্দেক নেবেন আর আদ্দেকটা আমি নিয়ে যাব। আমি তো একা একা খুঁড়তে পারব না, আপনার দুজন মালি সঙ্গে দেবেন মাটি খুঁড়তে।' সাহাবাবু তো রামকেষ্টর স্পষ্ট কথা শুনে একেবারেই হাঁ। 'আমার বাগানে মোহরের কলসি আছে আমি জানি না আর ওই লোকটা জানে? আর মোহর থাকেও বা যদি, ও কেন নেবে? সবটাই তো আমি নেব।' মনে মনে একই কথা ভেবে সাহাবাবু বললেন, 'বেশ বেশ, কাল সকালে উঠে ওসব হবে'খন। এখন তো রাত হয়ে গেছে। আপনি খাওয়াদাওয়া করে ঘুমতে যান, সকালে উঠে খোঁড়াখুঁড়ি করা যাবে।' এই বলে রামকেষ্টকে পেট ভরে খেতে দিলেন। এমনই পান্তা ভাত খাওয়ালেন যে বেচারা রামকেষ্ট মড়ার মতন ঘুমিয়ে পড়ল।

সাহাবাবু তখন সাতজন মালি নিয়ে বনতুলসীর ঝোপ তুলে ফেলে ঢিপি খুঁড়ে ফেলে কলসিটা বের করে আনলেন। যেই না কলসিটার ঢাকনি তোলা হয়েছে অমনি 'বুম' করে একটা ভোমরা উড়ে গেল। আর কলসি দেখা গেল শূন্য। ফাঁকা ঢনঢন করছে। সাহাবাবু তখন, 'দূর ছাই যত্তো বাজে স্বপ্ন!' বলে আবার কলসিটা পুঁতে রেখে দিলেন। বনতুলসী ঝোপটাও বসিয়ে দিলেন। কলসির ঢাকনিটাও আঠা দিয়ে শিলমোহর করে দিলেন।

সকালে উঠে রামকেষ্ট গেল সাহাবাবুর কাছে। তিনি দুজন মালি দিলেন খুঁড়তে। খুঁড়তে কোনওই কষ্ট হল না। গত রাত্তিরেই তো খোঁড়া হয়েছে। কলসি বেরুল। কিন্তু তার ঢাকনিটা সাহাবাবুরা এমনই এক আঠা দিয়ে সেঁটেছেন যে সে শিলমোহর ভাঙতে হলে কলসিটাই ভাঙতে হবে। সাহাবাবু তো জানেন কলসি ফাঁকা ঢনঢন করছে। তিনি বললেন, 'রামকেষ্টবাবু, আপনি বরং পুরো কলসিটাই নিয়ে যান, আমাকে একশো টাকা দিলেই হবে।' রামকেষ্টর মোটে একশো টাকাই ছিল বউয়ের দেওয়া। সে ভাবল, বেশ, আবার না হয় ছ-মাস ধরে কাঠ কাটতে কাটতে আর কাঠ বেচতে বেচতেই যাব, কিন্তু মোহরের কলসি নিয়ে সেটা করা কি ঠিক হবে? যদি ডাকাতে ধরে? সবাই তো জেনে গেছে আমি কলসি পেয়েছি। সে তখন বললে, 'সাহাবাবু, আপনি আমার গাড়ি ভাড়াটা দিন, বাকি সব টাকাই নিন।'

সাহাবাবু তো জানেন কলসিতে কিছুই নেই, তিনি ওকে তাই গাড়িভাড়া দিয়ে দিলেন। শহরের লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। 'সাহাবাবু কী ভালো লোক! কলসির মোহরের ভাগ তো নিলেনই না উলটে গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিলেন! মাত্র একশোটা টাকা নিলেন খোঁড়াখুঁড়ি খরচ।' রামকেষ্টও ধন্যি ধন্যি করতে লাগল। তারপরে খানিক রাস্তা জুড়িগাড়িতে, খানিক রাস্তা গরুর গাড়িতে, খানিক রাস্তা পালকি চড়ে বাকি রাস্তা দৌড়ে দৌড়ে বাড়িতে এসে গেল দুমাসের মধ্যে। এসে দ্যাখে বউ রোগা হয়ে গেছে, ছেলে রোগা হয়ে গেছে। হরিহর তাদের যত্ন করেনি। হরিহরের বউকে হরিহর স্বপ্ন বিক্রি কথা বলে দিয়েছে, আর বউ চটে গেছে।

হরিহরকে তার বউ ঢুকতে দেয়নি রামকেষ্টর বাড়িতে। রামকেষ্টকে দেখে হরিহর দৌড়ে এল, বলল সব কথা। হরিহরের বউ খুব রাগী সবাই জানে। রামকেষ্ট বললে, 'যাক গে, ভাবিস না। দেখি কলসি খুলে, ভেতরে যদি সোনা থাকে তোর বউকে দশটা মোহর দেব। এই ব'লে রামকেষ্ট কলসি ভেঙে দেখল আর অমনি কোত্থেকে ভোঁও করে একটা ভোমরা উড়ে গেল। আর মেঝে ভরতি ঝনঝন ঝনাৎ করে করে সোনার মোহর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ওইটুকু তো কলসি কিন্তু মোহর আর ফুরোয় না। ঘর ভরে গেল। রামকেষ্ট বললে, 'হরিহর, যত পারিস নিয়ে যা।' হরিহরও সৎ লোক। সে বলল, 'তা তে হয় না, স্বপ্ন আমি বেচে দিয়েছি। আমি কেবল দশ মোহর নেব বউকে ঠান্ডা করার জন্যে।' রামকেষ্টর বউ বাপের বাড়ির একশো টাকা ধার একশো মোহর দিয়ে শোধ করে এলো।

কাঠুরেদের পাড়ায় আজ বিরাট খাওনদাওন। রামকেষ্ট নেমন্তন্ন করেছে সবাইকে। খেয়েদেয়ে সবাই একটা করে মোহর উপহার নিয়ে বাড়ি যাবে। আর হরিহরের বউকে একটা সোনার মোহরের মালা গেঁথে উপহার দিয়েছে রামকেষ্টর বউ। হরিহরের বউয়ের আর রাগ নেই। চুপি চুপি রামকেষ্টর বউ আবিষ্কার করেছে, কলসিটা কখনও ফুরোয় না। ঢেলে ফেললেই আবার ভরতি হয়ে যায়। সে সেটাকে তাই উঠোনের তুলসীগাছের তলায় পুঁতে রেখে দিয়েছে। দেশে আর গরিব লোক থাকবে না। যার যখনই টাকা লাগবে রামকেষ্টর কলসি থেকে তাকে রামকেষ্ট মোহর দেবে। কোনও ভালো জিনিস একা একা ভোগ করলে ফুরিয়ে যায়। সবাইকে দিয়ে থুয়ে ভোগ করলে কোনওদিন ফুরোয় না।
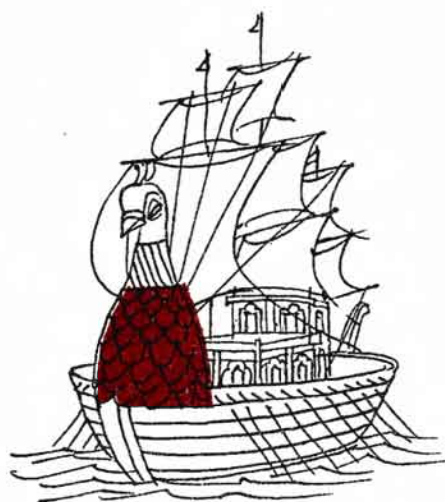
ভালো কুমোর আর রাজা বেয়াই

এক দেশে এক কুমোর ছিল। কুমোর কেবল চাক ঘোরায় আর পাত্র গড়ে। এই জলের পাত্র, এই অন্নের পাত্র, এই পুজোর পাত্র। গড়ছে তো গড়ছেই। গড়ার যেন আর শেষ নেই। তার যত বা ধরন, তত বা গড়ন। পিয়াসি মানুষের পিয়াস মেটাতে জলের কলসি, ভুখা মেটাতে ভাতের হাঁড়ি, আঁধার রাতকে আলো করতে পিদিম—পিলসুজ। আর রাগী দেবতাকে তুষ্ট করতে পুজোর ঘট। কুমোর কেবল চাক ঘোরায় আর গান করে, আর গান করে আর চাক ঘোরায়। ময়রা নিয়ে যায় দইয়ের ভাঁড়, কলু নিয়ে যায় তেলের জালা, গেরস্থ নিয়ে যায় ভাতের হাঁড়ি, মালি নিয়ে যায় জলের ঝারি, পুরুত নিয়ে যায় পুজোর ঘট। কুমোরের ঘরে সব্বাই আসে। কুমোর তাদের বলে—এসো ভাই বোসো ভাই, একটু তামাক খেয়ে যাও, গাঁয়ের খবর দিয়ে যাও। কুমোরের মিষ্টি কথায় বনের পশুরও মন ভোলে। গাঁয়ের একধারে তার কুটির, করবী গাছের ছায়ায়, ঠিক ফুলটিকুরি নদীর সরু কোমরটির বাঁকে। একদিকে বাঁশঝাড়, অন্যদিকে সোনাঝুরি গাছের বন, সামনে ফুরুসফুলের ঝোপ আর পেছনে মস্ত তেপান্তরের মাঠ চলে গিয়েছে সে-ই পশ্চিমের দেশে। —সুয্যি যেখানে পাটে নামেন, সেই ওপার পর্যন্ত।

কুমোরের কেউ নেই। তার বাবা নেই, মা নেই, বউ নেই, ছেলে নেই, কেবল সাধের চাকটি আছে। আর আছে সোনাঝুরি বনের সোনার রং ফুল ছড়ানো প্রাণ জুড়োনো ছায়া, আছে বাঁশের পাতার ঝিরিঝিরি ঝুরুঝুরু কান জুড়োনো, বাজনা, আর ফুলটিকুরি নদীর মিষ্টি মিঠেল ফুরফুরে হওয়ার সঙ্গে করবী আর ফুরুসফুলের বুক জুড়োনো সুবাস। কুমোর

প্রাণ ভরে ফুলের বাস নেয়, কান ভরে পাতার বাজনা শোনে, বুক ভরে বনের ছায়া আর নদীর বাতাস মাখে। আর গলা খুলে গান গায়। তার মতন পাত্র গড়তে সেই দেশের একশো গাঁয়ের আর কোনও কুমোরই পারে না।

পারবে কী করে? আমাদের কুমোর যে তার মাটি মাখে গানের সুরে ভিজিয়ে চাক ঘোরায় গানের তালে মজিয়ে। তার পাত্রগুলো তো শুন্যি থাকে না, তাতে ঘরভরতি ফুলের গন্ধ, পাতার ঝুমঝুম, নদীর হাওয়া, বনের ছায়া। অন্য কুমোররা এত সব জিনিস পাবে কোথায়? তারা তো কেবল খালি-হাঁড়ি বেচে! কুমোরকে তাই গাঁ সুদ্ধু সক্কলে খুব ভালোবাসে।

এমনি করতে করতেই কোনদিন তার সব চুলগুলো পেকে ধবধবে হয়ে গেল। যেই না চুলের রং বদলে যাওয়া অমনি কুমোরের হাসিখুশিও যেন চুলোয় গেল। গাঁ সুদ্ধু লোকের ভালোবাসা পেলে কী হবে—তবু কুমোরের প্রাণে আহ্লাদ নেই, মুখে হাসি নেই। তার বয়েস হয়েছে, প্রাণটা কেমন হুহু করে। সে বলে—'ভাই চাক, তুমিও বড় হয়েছ, আমিও বুড়ো হয়েছি। তুমিও একা একাটি ঘুরে মরছ, আমিও একা একাটি খেটে মরছি। তোমারও আমি ছাড়া কেউ নেই আমারও তুমি ছাড়া কেউ নেই!' বলে, আর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে চাকের মাটি এলে যায়। পাত্র যেন ঠিকমতন গড়ে উঠতে চায় না। এমনি করে করে আজকাল পাত্র গড়তে কুমোরের দেরি হয়ে যায়। কেবল মনে হয়—কী হবে এক পাত্র গড়ে?

একদিন সকালবেলায় কুমোরের খুব ক্লান্ত লাগল। তার উঠোন কলসিতে ভরা, জালায় বোঝাই। তার দালান ঘটে-হাঁড়িতে ঠাসা। তার ঘর-দুয়োরে পিদিম পিলসুজ উপচে পড়ছে। তিলটুকু রাখবার ঠাঁই নেই। কুমোর তখন চাককে ডেকে বলল—'ভাই চাক, আজকে তোমার ছুটি। আজ আর পাত্তর গড়ব না। আজ বরং পুতুল গড়ি।' এই বলে, সে তিলক চন্দনের মতো মিহিন করে একডেলা মাটি মাখল, সেই মাটি দিয়ে পুতুল গড়তে বসল। আহাহা, কী রূপ সেই পুতুলের! তার কোমরটি যেন ফুলটিকুরি নদীর বাঁকের মতো সরু, চোখ দুখানি সোনাঝুরি পাতার মতো টানাটানা, চুলগুলি ঠিক ফুরুস ফুলের মতো ঝুমরো, নাকটি হল বাঁশপাতার মতো টিকোল, আর ঠোঁটদুখানি ঠিক নদীর হাওয়ার মতো ফুরফুরে। কুমোর তার গায়ে যে রাঙা টুকটুকে শাড়িটি এঁকে দিল, আহা যেন করবীফুলের পাপড়ি। আর তার গাঁয়ের বর্ণ? ঠিক সোনাঝুরি ফুলের মতো। কাঁচা সোনার বরণ।

কুমোরের পুতুলটি দেখে দেখে আর চোখ যেন ফেরে না। সে কেবলই দেখে, আর দেখে। আর ভাবে—'আহা, এতদিন পুতুল না গড়ে কেন যে হাঁড়িকুড়ি গড়েছি!' একসারি ওইরকম পুতুল তৈরি করে কুমোর পরপর সাতদিন ধরে তার মাথায় শিয়রে সাজিয়ে রেখে দিলে। হাঁড়িকুড়ি নিতে যখন হাঁটুরেরা এলো, তারা তো পুতুল দেখে মুগ্ধ। তারা বললে—'পুতুলগুলোও আমাদের দাও, হাটে নিয়ে যাই, এমন পুতুল পেলে গেরস্থের বাচ্চারা কত খুশি হয়ে খেলা করবে। কী সুন্দর পুতুল গো! আহা, মরে যাই! যেন আকাশের পরি!' শুনে কুমোরের মনেও খুব আনন্দ হল। সে পুতুলগুলো হাটে পাঠিয়ে দিলে গেরস্থের বাচ্চাদের জন্যে। কেবল দুটি পুতুল রেখে দিলে নিজের কাছে।

এদিকে আবার উঠোন দালান খালি হয়ে গেছে। গাঁয়ের লোকের তো বাসন চাই, কুমোর আবার চাকে গিয়ে বসেছে। ঘট গড়ছে, কলসি গড়ছে, হাড়ি গড়ছে। আর গান গাইছে আপনমনে।

এমন সময় হয়েছে কি একদিন ছোট্ট চাষির মেয়ে ফুলটিকরি নদীতে জল নিতে এসে, পা পিছলে পড়ে গেছে আর তার কলসি-টলসি ভেঙে, জলটুকু সব গড়িয়ে গেছে। ছোট্ট মেয়েটি পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে লেগেছে। কান্না শুনে কুমোরের মনে খুব কষ্ট হল। সে বললে—'ওগো কচি মেয়ে, তুমি কাঁদো কেনো? তোমার কী হয়েছে?' চাষির মেয়ে বললে—'আমার কলসিটা তো ভেঙে গেছে! মা বকবেন! ঠাম্মা বকবেন!' কুমোর বললে—'ওমা, এই কথা। ওর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। এই নাও নতুন কলসি, এইটে ভরে জল নিয়ে ঘরে যাও, 'চাষির মেয়ে বললে—'কিন্তু এর দাম? আমার বাবার তো পয়সা নেই। আমরা যে খুব গরিব!' কুমোরের তখন আরও মায়া হল। সে বললে—'তোমাকে পয়সা দিতে হবেই না!' আমি অমন কত কলসি দিনরাত গড়ি। তুমি ওটা নিয়ে যাও, আর এই নাও একটা পুতুল। তুমি একে নিয়ে খেলা করবে।' বলে একটা পুতুল তাকে দিয়ে দিলে। আহ্লাদে আঠারো খানা হয়ে চাষির মেয়ে বললে—'ওমা, তুমি এত ভালো। দেখো, তুমি ঠিক রাজার বেয়াই হবে!' বলে হেসে হেসে নেচে নেচে কলসি কাঁখে, পুতুল কোলে বাড়ি গেল। কুমোর চেয়ে চেয়ে দেখে—মনে মনে বলল—'আহা, আমার যদি এমন একটি মিষ্টি মেয়ে থাকত!'

মা-সরস্বতী আকাশ থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে খুব ভালোবাসলেন কুমোরকে আর মুখ টিপে হাসলেন। সেদিন কুমোরের প্রতি মা সরস্বতী খুব প্রসন্ন। সময় পেলেই এসে মেঘের পরদার আড়ালে বসে কুমোরের মন ভোলানো গান শোনেন, আর তার সঙ্গে বীণা বাজিয়ে সঙ্গত করেন। সেই শুনে কুমোর ভাবে বুঝি বাঁশপাতায় ফুলটিকরির মিঠে বাতাস বইছে। এখন কুমোরের কাছে একটিমাত্র পুতুল বাকি। কুমোর তারই সঙ্গে কথা বলে, আর চাক ঘোরায়, আর গান শোনায়। পুতুল সে-গান শোনে কি না শোনে, গান মা-সরস্বতীর কানে গিয়ে ঠিক পৌঁছোয়!

একদিন কুমোর গাইছে—

—ও আমার পুতুল সোনাটা!
আমি তোমার গরিব বাবা,
দিতেথুতে পারি না!
তোকে সোনার বর্ণ হাত-পা দিলুম
খেলতে দিলুম না
তোকে কাজল পরা চক্ষু দিলুম
দিষ্টি দিলুম না
ও তোকে পরির মতন শরীর দিলুম
পরান দিলাম না।
ও আমার পুতুল সোনাটা।

আমি তো তোর গরিব বাবা,
(কিছুই) দিতেথুতে পারি না!

সেই গান শুনে মা সরস্বতীর খুব মায়া হল। তিনি 'আহা বাছা রে আমার' বলে কুমোরের তৈরি পুতুলের গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলেন। কুমোর শুধু দেখল, করবী ফুলের দোলন ছায়াটি পড়ল এসে পুতুলের ওপরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্যোছনার মতো জাদু এসে গেল পুতুলে, পুতুলটি আর মাটির পুত্তলি রইল না, মা সরস্বতীর পরশ পেয়ে তাতে প্রাণ এসে পড়ল। কুমোর অতশত জানতে পারল না। যে সুয্যি মাথার ওপরে উঠেছেন দেখে উনুনে ভাতের হাঁড়ি চড়িয়ে তাতে দুটো উচ্ছে আলু ফেলে দিয়ে নদীতে নাইতে গেল।

ফিরে এসে দ্যাখে, উঠোনটি কি পরিষ্কার ঝাঁট দেওয়া, দাওয়াটি কী চমৎকার নিকোনো, তাতে আসন বিছানো, আসনের সামনে ধোওয়া কলাপাতাটি পাতা, গেলাসভরা ঠান্ডা জল রাখা, পাতের কোণে নুন, লেবু, লংকা! পাতের গরমভাতে ধোঁওয়া উঠছে। কুমোরের তো চক্ষু স্থির! এই কুটিরে থাকতে থাকতে তার চুলগুলো শনের নুড়ো হয়েছে, কেউ কখনও তাকে আসন পেতে বাড়াভাত খাওয়ায়নি। সে ভাবল এ নির্ঘাত কোনও ঠাকুর দেবতার খ্যাপামি। কিংবা ভুতপিরেতে দুষ্টামিও হতে পারে। সে ভাবছে খাবে কি, খাবে না, এমন সময় শুনল বাঁশপাতায় বাতাস বইবার মতো ঝুমুরঝুম গলায় কে যেন বলছে—'বাবা, ভাত জুড়িয়ে গেল যে! খেতে বোসো?' কুমোর চমকে উঠে ইদিক তাকায়, উদিক তাকায়, কই, কাছেপিঠে কেউ তো নেই? তবে?

কুমোর খেতে বসতে ভরসা পায় না। শেষকালে কুমোর বললে—

'কে গো তুমি এমন আদর করে আমাকে খেতে ডাকো?'

'আমি তোমার মেয়ে, পুতুলসোনা!'

কুমোর অবাক হয়ে দ্যাখে—ওমা। কী হবে গো? সত্যি সত্যি তার হাতের তৈরি পুতুলটি ভাত বেড়েছে যে। শুধু কি তাই? একটা সোনাঝুরির পাতা হাতে নিয়ে পাকা গিন্নির মতো পাখা নেড়ে নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে! কুমোরের চোখে আহ্লাদে জল ভরে উঠল! সে আসনে বসে তেল-নুন-লংকা দিয়ে আলু ভাতে উচ্ছে ভাতে মাখল মুখে তুললো, আহা কী তার স্বোয়াদ! কী তার সুবাস! যেন রাজবাড়ির পরমান্ন! মোটা চাল তো নয়, যেন সরু সুগন্ধী গোবিন্দভোগ! উচ্ছেবিচি তো নয়, যেন গাওয়াঘিয়ে ভাজা। কিশমিশ! কুমোর বললে—'মেয়ে গো মেয়ে অ আমার পুতুলসোনা, অ আমার পুতুলমণি, তোমার হাতে কি জাদু আছে? আজকে উচ্ছে এমন মিষ্টি হল কেমন করে?' পুতুল বললে—'বাবা গো বাবা, জাদু আছে তোমার বুকের মধ্যে!' তারপর থেকে এমনি করে বাপেতে-মেয়েকে থাকে। কুমোর আর মন খারাপ করে না। এখন তাকে পায় কে? তার উঠোনে চাক আছে, ঘরে মেয়ে আছে, আর প্রাণে আহ্লাদ আছে। সে আরও সুন্দর করে গান গায়। আরও শক্ত করে পাত্র গড়ে। গাঁয়ের লোকেরাও খুব খুশি।

এদিকে, সেই যে হাটুরেরা কুমোরের তৈরি পুতুল নিয়ে হাটে গিয়েছিল না, গেরস্থের বাচ্চাদের জন্যে? তারই একটি কেমন করে যেন গিয়ে পড়ল রাজপুত্তরের হাতে। পুতুলটি

দেখে রাজপুত্তর তো মুগ্ধ! চেয়ে চেয়ে চেয়ে চেয়ে চোখ যেন আর ফেরে না। নেড়ে-চেড়ে নেড়েচেড়ে মন যেন আর ভরে না। মাটির পুতুলটি হাতে নিয়ে রাজপুত্তুর কেবল বাতায়নে বসে থাকেন—আর দিন নেই রাত নেই কী যেন ভাবেন। রাজপুত্তুর তাঁর পক্ষীরাজ ঘোড়াদের দিকে ফিরেও তাকায় না, তাঁর বিদ্যুতের মতো তরোয়ালের ফলায় মর্চে ধরে যায়। খাবার থালে পঞ্চান্নব্যঞ্জন পড়েই থাকে। রাজপুত্তুরের খেলা নেই, খিদে নেই, ঘুম নেই, কথা নেই। ব্যাপার কী? মন্ত্রীপুত্তুর বুঝতে পারেন না, কোটালপুত্তুর বুঝতে পারেন না। সোনার অঙ্গ কালি হল, আঁখির কোলে ছায়া পড়ল। শেষকালে রানিমা একদিন গিয়ে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—'বাছা, মায়ের কাছে কিছু গোপন করতে নেই, বল দিকিনি আমাকে কী হয়েছে?' রাজপুত্তুর মাথা নীচু করে হাতের নোখ খুঁটতে খুঁটতে লজ্জা লজ্জা মুখে বললেন—

—'মাগো, আমার ঠিক এই পুতুলের মতো দেখতে একটি মানুষ কন্যা চাই। তাকেই আমি বিয়ে করব সামনের পূর্ণিমা তিথিতে। নইলে সন্ন্যাসী হয়ে সারাজীবনের জন্যে বনবাসে চলে যাব।' রানিমা শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। কী সর্বনাশ! রাজপুত্তুর সন্ন্যাসী হবেন কি? কিন্তু অমন পুতুলের মতো মেয়েই বা এখন পান কোথায়? তবুও কারণটা জানা গেল এ-ও ভালো, চেষ্টা তো করা যাক?

মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিলেন—দেশে যত পুতুল তৈরির কারিগর আছে, প্রত্যেকের রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন। যে-যার তৈরি পুতুল নিয়ে যেন রাজসভায় আসে রোববার সকালে।

রবিবার সকালে রাজসভা কুমোরে কুমোরে ভরে গেল। সব্বার হাতে ঝুড়ি ঝুড়ি পুতুল। মোটা পুতুল, রোগা পুতুল, বেঁটে পুতুল, ঢ্যাঙা পুতুল, খোকা পুতুল, খুকি পুতুল, বরকনে, বুড়োবুড়ি, মা-ছেলে—পুতুলে পুতুল ছয়লাপ। এত পুতুল ছিল দেশে? বাপরে বাপ। রাজপুত্তুর পুতুল হাতে নিয়ে নাড়েন চাড়েন, ফেরত দেন। মন্ত্রী অমনি কুমোরের হাতে একটি মোহর আর একঝুড়ি মিষ্টি দিয়ে বিদেয় করেন। এমন করতে করতে বেলা গড়াল। সবার শেষে দাঁড়িয়েছিল আমাদের ভালো কুমোর। তার পুতুল মেয়েকে কোলে করে। সে প্রথম যেতেই চায়নি, কিন্তু রাজামশায়ের নেমন্তন্ন, না রাখলে যদি পেয়াদা পাঠান?

রাজপুত্তুর যেই তাঁর চেনা পুতুলটি দেখেছেন অমনি লাফিয়ে উঠেছেন—'এই তো আমার পুতুলের জোড়া। এই তো আমার বউ পুতুলের কারিগর। কুমোর ভাই, তুমি আমাকে এই পুতুলের মতো একটি বউ গড়ে দাও না? নইলে আমি সন্নেসী হয়ে যাব?' শুনে কুমোরের মাথায় বাজ পড়ল যেন। সে বললে—'রাজকুমার, আমি তো কেবল মাটির পুতুলই গড়তে জানি, মানুষ মেয়ে গড়ব কেমন করে?'

কিন্তু রাজার ছেলের গোঁ। তিনি শুনবেনই না! তখন কুমোর বললে—'রাজকুমার, আমার এই পুতুলমেয়ের সঙ্গেই আপনার বিয়ে দিতে পারি, যদি না কিছু মনে করেন। এই পুতুলসোনা কিন্তু ঠিক পুতুল নয়,...মানুষও নয় অবশ্য। তবে ও ভাত রান্না করতে পারে, কথা বলতে পারে, গান গাইতে পারে।' শুনে রাজামশাই বললেন,—'তাই নাকি?' আর রানিমা বললেন,—'কই দেখি?' আর রাজপুত্তুর হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন। কুমোর

তখন পুতুলসোনাকে মেঝেয় নামিয়ে দিল। পুতুল টুকটুক করে গিয়ে রাজাবাবুকে একটা পেন্নাম ঠুকল, রানিমাকে একটা পেন্নাম, মন্ত্রীমশাইকে একটা, আর কুমোরকে একটা; আর রাজপুত্তুরের দিকে তাকিয়ে, ফিক্ করে একটু হেসে দিল। সেই হাসিটি দেখে, রাজপুত্তুরও খিলখিল করে হেসে উঠলেন। ছেলের মুখে হাসি দেখে খুশি হয়ে আহ্লাদে গদগদ গলায় রাজার কানে কানে ফিসফিস করে রানিমা বললেন—'আহা, এমন সুন্দর মেয়ে, এ যদি মানুষ হত?' রাজাও বললেন—'সত্যি, কী ভালোই না হত।' তথাস্তুমুনি ঠিক তখুনি 'তথাস্তু তথাস্তু' বলতে বলতে আকাশগঙ্গায় নাইতে যাচ্ছিলেন—রানিমার কথার পিঠে পিঠে তাঁর তথাস্তুটি লেগে গেল! আর অমনি একসভা মানুষের মধ্যে হুউশ করে পুতুলসোনা দিব্যি মানুষ হয়ে গেল! হয়েই সে তার বাবার কোলে লজ্জায় মুখ লুকোল। তার গায়ে করবীফুল রঙের রাঙা রেশমের শাড়ি, সারা গায়ে ফুরুসফুলের সুবাস, তার চোখ সোনাঝুরি বনের ছায়ার মতো মায়াবী, ফুলটিকুরির হাওয়ার মতো ফুরফুরে আহ্লাদ লেগে আছে তার পাতলা ঠোঁটে। সেই দেখে রানিমা তো আনন্দে কেঁদে ফেললেন 'ভগবানের দয়ার সীমা নেই' বলে। আর রাজামশাই কেবল গোঁফ চুমরে হাঁকলেন 'হু-হুম্‌ম্‌ম্!' মস্ত বড় গোঁফের নীচে তাঁর চোরাগোপ্তা হাসিটা কেউই সভায় দেখতে পেল না, এক মন্ত্রীমশাই ছাড়া!

আর কুমোরের কী হল? রাজপুত্তুরের সঙ্গে তো কুমোরকন্যের খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। রাজার বাড়িটিও তো ফুলটিকুরি নদীর ধারেই। রাজা তাঁর ফুল বাগানের একটি কোণে কুমোর বেয়াইয়ের জন্যে শীতলপাটি বিছিয়ে চমৎকার একটি কুটির বেঁধে দিলেন, উঠোনে তার সেই চাকটি এসে বসিয়ে দিলেন। কুমোর সেখানে চাক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সারাদিন হাঁড়ি জালা তৈরি করে। আর দিনের মধ্যে দশবার সোনার মল ঝুমঝুম করে এসে রাজপুত্তুরের বউ দৌড়ে দৌড়ে এসে তার কোলটি ঘেঁষে বসে পড়ে, বলে—'বাবা, গান করো না? বাবা গল্প বলো না?' আর সূয্যি যখন মাথায় ওপরে ওঠেন, তখন সোনার থালে সপ্তব্যঞ্জ পরমান্ন বেড়ে দিয়ে, হিরের ঝালর দেওয়া রেশমের পাখা নেড়ে নিজের হাতে বাতাস করে, রাজামশাইয়ের পাশে বসিয়ে রানিমা স্বয়ং তাকে রাজভোগ খাওয়ান। আর মিষ্টি হেসে হেসে বলেন—'ওকি বেয়াই, চাঁপা ফুলের ক্ষীর অতটুকুনি খেলেন যে? আর এক চামচ চন্দনভোগ আপনাকে নিতেই হবে—কিন্তু।'

আর তবুও সোনাঝুরি বনের ছায়ায় জন্যে, করবীফুল আর ফুরুসফুলের গন্ধের জন্যে বাঁশপাতার বাজনার জন্যে কুমোরের যখন বেশি বেশি মন কেমন করে, সে তখন রাজভোগ ফেলে চলে যায় তার পুরানো বাড়িতে দু-চারদিন তাদের সঙ্গেও দেখাশুনো করে উচ্ছেভাতে ভাত খেয়ে আসে।
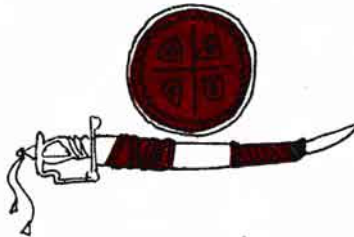
সোনা-রুপোর কদমফুল

এক দেশে এক রাজপুত্তুর আছেন।

রাজপুত্তুরের বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই। কেবল এক ধাইমা, আর এক মন্ত্রীমশাই। দুজনেই বুড়ো থুথুড়ো হয়েছেন। দুজনেই তাঁর ঠাকুরদাদার আমলের মানুষ কিনা।

ছোট্ট রাজপুত্তুর একলা একলাই খেলে বেড়ান রাজপ্রসাদের মস্ত মস্ত মর্মরপাথরের ঘরে, সাদাকালো চৌকো রুইতনের মতন পাথর সাজানো বিরাট বারান্দায়, পরির মূর্তি বসানো ফোয়ারার ধারে বাহাত্তর রকমের গোলাপ ফুলের বাগিচায়, ফলের ভারে নুয়ে পড়া আম বনে, জাম বনে, আপেল বনে, ডালিম বনে। রাজপুত্তুর একা-একাই নৌকো চালান নীল মেঝেওয়ালা গোলাপগন্ধী হাঁটু পর্যন্ত জল ভরা, লাল নীল মাছ সাঁতরানো চমৎকার লম্বা-চওড়া চৌবাচ্চায়, হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি বা নদীই! রাজপুত্তুর একা-একাই ধনুর্বাণ নিয়ে খেলা করেন, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ শিখে গেছেন তিনি। খেলার সঙ্গী তাঁর কেউ নেই। মন্ত্রীপুত্তুর নেই, কোটালপুত্তুর নেই, সদাগরপুত্তুর নেই। কী করে থাকবে? সে দেশের কোটালই নেই, সে দেশের সদাগরই নেই। রাজাই তো নেই। সবাই একসঙ্গে সেই যে বেরিয়ে গেছেন প্রায় দেড়যুগ আগে, সোনা-রুপোর কদমফুল আনতে, আর ফিরে আসেননি। দেশের লোকের তাই মনে খুব দুঃখ।

রাজামশাই সেই যে গেলেন আর ফিরলেন না। এদিকে বউরানির কোলে একটি দেশ-আলো-করা রাজপুত্তুর এলো। রাজামশাইয়ের মা, মহারানিমা, ছেলের শোক ভুলতে নাতিকে কোলে তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে কী যে হল একদিন পুজোর সময়ে, আকাশে নীল রোদ হাসছে, এলাচি নদীতে স্নান করতে গিয়ে মহারানিমা আর বউরানি, দুজনেই উধাও। দাসীরা কেউ তাঁদের খুঁজেই পেলে না। ঝড় নেই, ঝঞ্ঝা নেই, কোথায় গেলেন তাঁরা? দেশে নতুন করে শোকের ছায়া ঘনালো, পুজোর আকাশ, পুজোর বাজনা, সব মিথ্যে হয়ে গেল। ধাইমা তখন চোখের জলে রাজপুত্তুরকে বুকে তুলে নিলেন। আর বৃদ্ধ মন্ত্রীমশাই তুলে দিলেন অগত্যা রাজদণ্ডটি। রাজপুত্তুর বড় হলে, সেটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তবে তাঁর ছুটি।

কত সাধু সন্নিসি এল-গেল, কত জ্যোতিষী গণৎকার গুনল দেখল, অঙ্ক কষলো, কেউই সঠিক সংবাদ দিতে পারলে না। দেশের লোকের চোখের জল একদিন শুকিয়ে গেল। রাজারানির কথা তারা একেবারে ভুললে না বটে, কিন্তু সেসব মানুষগুলো আস্তে আস্তে গল্পকথা হয়ে গেল। মন্ত্রীমশায়েরও বুক খালি। কোটাল, সদাগর, মন্ত্রী, রাজা এই চার বন্ধুতে বেরিয়েছিলেন। কেউই ফেরেননি। আর কী করা? মন্ত্রীর বাবা বৃদ্ধ মন্ত্রীকেই ডেকে পাঠিয়ে মহারানিমা রাজ্যশাসন করছিলেন। সেই মহারানিমাও তো গেলেন। কচি বউরানি সুদ্ধু। বৃদ্ধ মন্ত্রী কিছুই ভুলতে পারেননি। তিনি অশেষ ধৈর্যে, প্রতীক্ষায় আছেন। রাজপুত্তুর কবে বড়ো হবেন, তাঁর হাতে রাজদণ্ডটি তুলে দিয়ে তিনি তীর্থে বেরিয়ে পড়বেন। ছেলেদের খোঁজে যাবেন। গেল কোথায় চার-চারজন টাটকা তাজা টগবগে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতন যুবক ছেলে? বৃদ্ধ মন্ত্রীর বুকের ভেতর গুমরে গুমরে কষ্ট হয়।

রাজপুত্তুর এদিকে বড় হচ্ছেন। তিরধনুক যেমন চালাতে পারেন, তেমনিই খেলাতে পারেন ঝকঝকে তরোয়াল, পারেন প্রায়-বুনো ঘোড়ার পিঠে চড়ে, তাকে বশ মানাতে। রাজপুত্তুরকে রাজপণ্ডিত প্রত্যহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়েছেন রাজপুত্তুর গুণীকে সমাদর করতে, দুর্বলকে রক্ষা করতে আর দোষীকে সাজা দিতেও শিখে গেছেন। মন্ত্রী ভাবলেন—'আর কী? প্রাপ্তে তু ষোড়শবর্ষে'—ষোলো তো হল, রাজপুত্তুরকে এবার রাজা করে দিই। ভেবে, রাজপণ্ডিতকে ডাকলেন দিনক্ষণ ঠিক করতে। রাজপণ্ডিত ছকটক পেতে লগ্নটগ্ন গুণে গেঁথে বললেন—'নাঃ, এখন তো রাজপুত্তুরের রাজা হবার কথা নয়। এখন তাঁর দীর্ঘ বিদেশভ্রমণে বেরুনোর কথা। রাজপুত্তুরের সামনেই সমুদ্রযাত্রা।

—'সে কী? সে কী? সমুদ্রযাত্রা করে যাবেন কোথায়? কোন বিদেশে? এই জম্বুদ্বীপের চেয়ে আরও ভালো দেশ আর আছে নাকি?'

—'রাজপুত্তুরকে যেতে হবে দারুচিনিদ্বীপের পাশে লবঙ্গদ্বীপে, পান্না সাগরের মোহানায়। যেখানে রক্তচুনির পাহাড়টি সোনা-রুপোর কদম্ববনে ঘিরে আছে। একটি কদমফুল চাই-ই।'

—'কিন্তু সে যে বড় ভয়ঙ্কর দেশ! সে যে বড় মৃত্যুময় গহীন গাং, পেরিয়ে যাওয়া। একবার মায়া অরণ্যে পথ হারালে, বাপের মতোই পুত্রেরও আর ফেরা হবে না। না। থাক, ছেলেমানুষ রাজপুত্রের গিয়ে কাজ নেই।' মন্ত্রীমশাই বাধ সাধলেন। সিংহাসনে বসতে হলে

কিন্তু কদমফুল আনতেই হবে। সেই ফুলে পুজো দিতে হবে কালভৈরবের। পিতৃসত্য অরক্ষিত রয়েছে যে! রাজা হবেন কী করে?

ধাইমা কেঁদে পড়লেন—'দরকার নেই বাবা তোর রাজা হয়ে? সারাজীবন না হয় যুবরাজই হয়ে রইলি। সেই ভয়ঙ্কর মায়া অরণ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই, বরং মিষ্টি দেখে বুদ্ধিমতী কোনও রাজকন্যেকে বউ করে এনে দিই। ঘরসংসার করো। রাজ্যপাট চালান মন্ত্রীমশাই। সোনা-রুপোর কদমফুলে নজর দিয়ে কাজ নেই, থাক না সে আপনমনে ফুটে, রক্তচুনির পাহাড় আলো করুক।'

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে।

রাজপুত্তুরের রক্তের মধ্যে যেন শিকারের শিঙা ফুঁকে দিয়েছে, বুকের মধ্যে যেন কাড়ানাকাড়ার বাদ্যি বাজিয়ে দিয়েছে। যাত্রার ডাকে রাজপুত্তুর উথালপাথাল, অস্থির চঞ্চল। না বেরুলে আর শান্তি কই? কোথায় আছ হে সোনা-রুপোর কদমফুল? ধরা দাও, দেখা দাও। আমি আসছি তোমাকে খুঁজতে। আমাকে এড়িয়ে পালিয়ো না যেন! এই এলুম বলে, পিতৃসত্য রক্ষা না করা চাই-ই চাই।'

পণ্ডিতমশাই বলেছেন, পিতৃসত্য রক্ষা না করে তো রাজ্যপাটে বসতে পারেন না রাজপুত্র! রাজামশাই কালভৈরবের মন্দিরে সোনারূপোর কদমফুল মানত করেছিলেন, তাই অতবড় দেশজোড়া মড়কটা সেবার বন্ধ হয়েছিল। সেই মানত এখনও রক্ষা হয়নি। রাজসিংহাসনে তো বসা হবে না! আগে ফুল চাই।

কারুর কোনও কথা না শুনে রাজপুত্তুর তৈরি হলেন। বেরুবেন তিনি এবার সোনা-রুপোর কদমফুলের খোঁজে। 'ফুল না নিয়ে ফিরব না—' প্রতিজ্ঞা শুনেই ধাইমা চোখে আঁচল চেপে লুটিয়ে পড়লেন মেঝেতে। আর মন্ত্রীমশাই বুকটা চেপে ধরে ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। কেবল পণ্ডিত বললেন—'মাভৈঃ। তোমার ঠাকুরদার মৃত্যুর কিছুকাল পরে কাল অশৌচের মধ্যেই তোমার বাবা জেদ করে শুভকাজে রওনা হয়েছিলেন। তিনি তাই বংশের দৈব কবচে হাত ছোঁয়াতে পারেননি। তোমার তো সে ভাবনা নেই। বুকে পরো সর্বসিদ্ধি কবচ, আর কাঁধে থাকুক তোমার প্রিয় বাজপাখি 'শ্যেনদেব।' ব্যাস, আর কীসের ভাবনা তোমার? তোমার নিজের পোষ মানানো ঘোড়া 'মারুতিই' তোমাকে নিয়ে যাবে হীরকবন্দরে। সেখান থেকে তো শুধু এলাচি নদীর মোহনা পার হওয়া আর লবঙ্গ দ্বীপে পৌঁছানো। এটুকু আর তুমি পারবে না? নিশ্চয় পারবে।'

'তবে বাবামশাই কেন...?'

'তার সঙ্গে তো এসব দৈব অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। দেবতাদের অমান্য করে তিনি গিয়েছিলেন পুরুষকার নির্ভর করে, কিন্তু তুমি হবে নির্বৈর। ফুল এনে কালভৈরবের মন্দিরে পুজো দিয়ে পিতৃসত্য পূর্ণ করলেই রাজমুকুট পরিয়ে দেব আমরা তোমার মাথায়।'

শুভদিনের শুভলগ্নে, ভোর হতে না হতে রাজ্যের এয়োস্ত্রীরা শাঁখ বাজালেন, উলু দিলেন। রাজপ্রাসাদে নহবতখানায় শানাই বাজলো। ধাইমাকে, মন্ত্রীমশাইকে, রাজপণ্ডিতকে প্রণাম করে রাজপুত্তুর রওনা হলেন লবঙ্গ দ্বীপের দিকে। ভোরের আলো তাঁকে পথ দেখাল।

পথ তো নাকের সোজা। লালে সাদায় আলপনা আঁকা আশ্চর্য সুন্দর ঘোড়া মারুতি,

যেন হাওয়ার বেগেই ছুটলো। কাঁধের ওপর বাজপাখিটি বাঁকা নোখ দিয়ে বর্ম আঁকড়ে বসে আছে। সোনালি উষ্ণীষ উড়ছে। রাজপুত্রকে যতক্ষণ দেখা গেল ধাইমা তাঁর বাতায়ন থেকে চেয়ে রইলেন। তারপর চোখে আঁচল চেপে, পুজোর ঘরে গিয়ে শ্বেতপাথরের মেঝেয় আছড়ে পড়লেন রাজবংশের কুলদেবতার সামনে। মন্ত্রীমশাই আর পণ্ডিতমশাই ফিরে গেলেন রাজসভায়। সভার কাজ শুরু হবে এবার। তাঁদের তো শুয়ে পড়লে চলবে না। পণ্ডিতমশাই হাসিমুখে আছেন। মন্ত্রীমশায়ের মুখ যেন কাল বোশেখির আকাশ। আবার সেই অলক্ষুনে সোনারুপোর কদমফুল! কী কুক্ষণেই যে মানতটা করা হয়েছিল। এসব মানত টানত করাই আর উচিত নয়, বড় অবৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানা ভাবলেন মন্ত্রীমশাই 'মানত অবৈধ করে একটা আইন চালু করতে হবে দেখছি!'

ওদিকে মারুতি উড়তে উড়তে, না ছুটতে ছুটতে, চলেছে। খেত-খামার, জল-জঙ্গল, বন-পাহাড়ি, গাঁ-গঞ্জ, হাট-বাজার—যাবার পথে কত কী পড়ে। সবাই হাতের কাজ বন্ধ করে থেমে দাঁড়ায়। দ্যাখে রাজপুত্র চলেছেন, সোনালি উষ্ণীষে সূর্যের আলো পড়ে ঝলসে উঠেছে, চমক দিচ্ছে তরোয়ালের হিরে মোতি, ঝলক দিচ্ছে সর্বসিদ্ধ কমচের ইস্পাত। শ্যেনদেব কখনও কাঁধে বসে আছে। কখনও-কখনও উড়ছে মাথার ওপর দিয়ে।

সন্ধে যখন নামে নামে, রাজপুত্র দেখলেন হীরকবন্দর এসে গেছে। সামনে সারি সারি সদাগরী জাহাজ হিরের বেসাতি নিয়ে খাড়া। দেখলেন পান্নাসাগরের রং ঠিক পান্নার মতোই সবুজ আর এলাচিনদীর স্বচ্ছ জল ছোট এলাচের মতন সাদা—মোহানায় দুয়ে মিলে কী চমৎকার বেনিবন্ধন হয়েছে। দেখে রাজপুত্রের চোখ জুড়িয়ে গেল। কিন্তু কই? দ্বীপ কোথায়? যতদূর চোখ যায় জল, শুধু জল। কোনও দ্বীপ-টিপের চিহ্ন নেই। অথচ থাকার কথা একটি নয়—একজোড়া দ্বীপের। দারু চিনিদ্বীপের পাশে লবঙ্গদ্বীপ। সেইখানে আছে রক্তচুনির পাহাড় আর তাতে কদম্ববনে সোনারুপোর কদমফুল ফুটে আছে। কিন্তু সামনে চাও, ডাইনে চাও, বাঁয়ে চাও জল শুধু জল। দ্বীপ কই?

—'শ্যেনদেব?' রাজপুত্তুর বললেন, 'তুমি দ্বীপ দেখতে পাচ্ছো ভাই?'

শ্যেনদেবের দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, বড় সুদূর প্রসারী। সে বললে, 'দাঁড়াও, তবে উপরে উঠে যাই।' বলেই সে গোঁত্তা মেরে ঘুড়ির মতো উড়ে গেল। মেঘটেঘ ছাড়িয়ে সেই কোনও অসীম শূন্যে। তাকে আর দেখাই গেল না। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার শ্যেনদেব নেমে এসে রাজপুত্রের কাঁধে বসে বললে—হ্যাঁ, দ্বীপ আছে। কিন্তু জলের তলায়।'

—'জলের তলায়? সে আবার কেমন দ্বীপ ভাই? দ্বীপের তো চতুর্দিকে জলবেষ্টিত হয়ে থাকার কথা। জলের নীচে লুকিয়ে থাকার কথা তো নয়?'

শ্যেনদেব বললে—'হয় তো এখন জোয়ার। এরকম মোহনার অনেক দ্বীপই ভাটায় ভেসে ওঠে, জোয়ারে ডুবে যায়। দেখি, ভাটার টানে জেগে ওঠে কিনা, উঠলেও দূর আছে কিন্তু ঢের।'

রাজপুত্রের খিদে পেয়েছিল, তিনি তাই মারুতিকে ছেড়ে দিলেন, চমৎকার ঘাসের জমি রয়েছে পাশেই, মারুতি পেট ভরে খাক। তাঁর সঙ্গে টিফিন আছে, ঠাঁইমার দেওয়া লুচিমণ্ডা। রাজপুত্র তাই খেয়ে, এলাচি নদীর মিঠে জলে তৃষ্ণা মেটালেন। আঃ, কী মিষ্টি

জল, যেন সত্যিই এলাচের সুবাস তাতে। এত চমৎকার আমার দেশ! এসব তো জানাই হত না, যদি সোনা-রুপোর কদমফুল আনতে না বেরুতাম? ভেবে রাজপুত্র খুশি হয়ে উঠলেন। শ্যেনদেবও ততক্ষণে ফলটল খেয়ে পেট ভরিয়ে এসেছে। সে বললে 'রাজপুত্র, ধরো দ্বীপ জেগে উঠল। কিন্তু তুমি সেখানে যাবে কেমন করে? মারুতি তো পক্ষীরাজ নয় যে উড়ে পার হবে নদী সাগর? আর আমি তো এই এতটুকুন, তোমাকে তো আর কাঁধে নিতে পারব না? এখানে জলে জলে বিনুনি বাঁধা, বড়ই অনিশ্চয়, উত্তাল এর স্রোত— সাঁতরে পার হওয়া অসম্ভব। কী করবে, ভাবো।' সামনেই তো সার সার জাহাজ। রাজপুত্র ভাবলেন ওদেরই একটিতে বসবেন—সওদাগর, আমাকে লবঙ্গদ্বীপে পৌঁছে দেবে? সে কি আর দেবে না?

কিন্তু কাছে গিয়ে দেখেন জাহাজ সবই বিদেশি নাবিকদের। তারা ওঁর প্রজা নয়, ওঁর অনুরোধ না মানতেও পারে। এমন ক্ষেত্রে অনুরোধ না করাই রাজপুত্রের উচিত কাজ। তাহলে?

এমন সময়ে ভাটা লাগল। জাহাজগুলো সব পাড় থেকে দূরে সরে গেল, জল নেমে গেল অনেক নীচে, আর দূরে, বহুদূরে ভেসে উঠল পাশাপাশি দুটি দ্বীপের ছায়া। রাত তখন ঢের, আকাশে মাঝপক্ষের আধখানা চাঁদ, তার আলো আঁধারিতে দেখা গেল একটি বৃদ্ধ জেলে, কাঁধে জাল নিয়ে আপনমনে গান গাইতে গাইতে উঠে আসছে। রাজপুত্র বললেন, ভাই ধীবর, তোমার নৌকো নেই? তুমি কী ভাবে মাছ ধরতে যাও?

জেলেটি অবাক হয়ে রাজপুত্র দেখছিল। সে বললে—'আছে বইকি, জেলে ডিঙি আছে আমার! তুমি কোন দেশের রাজপুত্তুর গো?'—'আমি তোমারই দেশের রাজপুত্র, ভাই।'

—অঃ মা গঃ। পেন্নাম হই রাজপুত্তুর মশাই! কী সোনার চাঁদ ছেলে! তা তুমি রাজধানী ছেড়ে এতদূরে কী করছ? তোমার সেপাই সান্ত্রী কই? লোকজন কই?

—সে সব তো সঙ্গে আনিনি, আমি যে সোনা-রুপোর কদমফুল নিতে এসেছি। আর এসেছি, আমার হারিয়ে যাওয়া বাবার খোঁজে।

—তোমার বাবা তো একা আসেননি রাজপুত্তুর, তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী ছিল। কোটাল ছিল, সদাগর ছিল। তুমি এরকম একলাটি যে? তোমাকে একা ছাড়লে কে?

—আরে? তুমি জানলে কী করে ধীবর? বাবার সঙ্গে কে কে ছিলেন?

—আমি তো তাঁদের দেখেছিলুম। তাঁরা আমারই নৌকা চড়ে লবঙ্গদ্বীপে গিয়েছিলেন না?

—তারপর? তারপর? তারপর তাঁদের কী হল তুমি জানো?

—না রাজপুত্তুর। আর আমি তাঁদের দেখতে পাইনি। অনেকবার নৌকো নিয়ে ফিরে ফিরে গেছি, যদি তাঁদের দেখা পাই, দেখা মেলেনি। তাঁরা যেন রক্তচুনির পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেলেন।

—ধীরব ভাই, আমাকে নিয়ে যাবে, লবঙ্গদ্বীপে?

—কেন নিয়ে যাব না? কিন্তু এখন তো ভাটা, জোয়ার আসুক, তখন নৌকো ভাসাব।

—কিন্তু জোয়ারের সময়ে তো সে দ্বীপ থাকবে জলের নীচে।

—আমরা অপেক্ষা করব, ভাটায় দ্বীপ যখন জেগে উঠবে তখন তুমি নামবে। আমিও কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব রাজপুত্তুর, একলাটি এমন সোনার চাঁদ ছেলেটাকে ছেড়ে দেব না। মায়া-অরণ্যে কত ভয়ডর, কত ফাঁদ-ফন্দি। পাকামাথা একজন সঙ্গে থাকা ভালো।

মারুতি পা ঠুকে ঠুকে বললে ঠিক ঠিক।

শ্যেনদেব চিল চিৎকার করে বললে, ঠিক ঠিক। বৃদ্ধ জেলে তার বাড়ি থেকে কাজকর্ম সেরে ঠিক জোয়ারের সময়ে ফিরে এল। —'চলো, রাজপুত্তর, দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়ি' রাজপুত্তুর বললেন, চলো। কালভৈরবকেও একবার স্মরণ করে নিই। তাঁর জন্যেই তো 'যাওয়া। সোনা-রুপোর কদমফুলে তাঁরই পুজো হবে। হে কলভৈরব তোমার ফুল তুমিই সংগ্রহ করে নাও আমার হাত দিয়ে।' বলে রাজপুত্তুর মারুতিকে তীরে রেখে শ্যেনদেবকে কাঁধে নিয়ে নৌকোয় উঠলেন। সে কী ভয়ঙ্কর যাত্রা! কী ঢেউ! কী স্রোত। আর বৃদ্ধ জেলের কী সাহস। কী শক্তি। আস্তে আস্তে এক জায়গায় এসে সে ভাটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক সময়ে দেখা গেল একটি সুগন্ধী দারুচিনিগাছ জলের ওপরে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। আস্তে আস্তে ভেসে উঠল পুরো দারুচিনিদ্বীপ। তার পাশে নৌকো নিয়ে চলল ধীবরভাই, সেখানে জলের ওপরে প্রথমে ভেসে উঠল—কী বলো তো? একটি কদমগাছের মগডাল। তাতে বড় বড় জল চিকচিক ঘনসবুজ পাতার আড়ালে ঝকঝক করছে একটি সোনার নিটোল কদমফুল, যেন সূর্য উঠছে—তার ওপর ঝিরঝিরে রুপোর কেশরের ঝালর—যেই না দেখা গেছে সেই কদমফুলটি, অমনি জেলে তার জাল ছুঁড়ে ফেলেছে ফুলের ওপরে, আর নৌকো তাড়াতাড়ি কাছে নিয়ে যেতে না যেতেই—শ্যেনদেব তক্ষুনি উড়ে গিয়ে শক্ত ঠোঁটে ভেঙে ফেলেছে ফুলের বোঁটা। এবারে ধীবর তাঁর জালটি এক ঝপটায় গুটিয়ে নৌকায় রাজপুত্রের কোলের ওপর এনে ফেলল সোনারুপোর দুর্লভ কদমফুলটি! সব ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই ভেসে উঠল কদম্ববনে ঘেরা রক্তচুনির পাহাড়সুদ্ধু লবঙ্গফুলের গন্ধে মাতালকরা লবঙ্গদ্বীপ। সেখানে প্রত্যেকটি গাছেই জড়িয়ে আছে লবঙ্গলতা, ঝরে পড়া লবঙ্গফুলে ছেয়ে আছে ঘাস। কিন্তু মানুষজন নেই। কেউ কেন যায় না? সদাগরের লোভী নজর কেন পড়ে না সেখানে? লবঙ্গের দাম তো সোনার মতন। রাজপুত্তুর একেবারে মোহিত হয়ে গেছেন লবঙ্গফুলের সুবাসে।

—'ধীবরভাই, চলো, নামি।'

—নামবে কেন, রাজপুত্তুর? চলো, ফিরি। এই তো তোমার ফুল। আশ্চর্য দ্যাখো, কত বচ্ছর এখানে আসছি, কদমগাছটিই শুধু উঠে আসে, দেখি। ফুলটি কখনও দেখিনি। আজ যেন তোমার হাতে ধরা দেবার জন্যেই ফুলটি দেখা দিয়েছে। আর ও দ্বীপে নেমে কাজ নেই। তোমার তো ফুল তোলা হয়ে গেছে। এবার ফেরা।'

—'কিন্তু বাবামশায়? মন্ত্রীমশায়? কোটালমশায়? সদাগরমশায়? তাঁদের খোঁজ নিতে হবে না?'

—'আগে তো তুমি ফুলটা পৌঁছে দাও কালভৈরবের মন্দিরে। তারপরে ইচ্ছে করলে

আবার বেরিও। এ ফুল নিয়ে ঘরে পৌঁছুনোও তো সোজা নয়? তোমার বাবাও ফুল তুলেছিলেন কিন্তু ঘরে ফেরেননি।'

—'তুমি কী করে জানলে, বাবা ফুল তুলেছিলেন?'

—'অতশত প্রশ্ন কোরো না তো বাপু। অত উত্তর জানিনে আমরা মুখ্যুসখ্যু মানুষ। আমাদের রাজামশাই মস্ত বীরপুরুষ—ফুল তোলেননি কি আর? যা চাইতেন তা পেতেনই।

—'লবঙ্গদ্বীপে সদাগররা ব্যবসা করে না কেন, ধীবরভাই? দারুচিনিলবঙ্গের তো বিশ্বের হাটে অনেক দাম।

—'বাবা রে! যত দামই হোক, প্রাণের চেয়ে তো বেশি নয়? বিদেশি সদাগররা মায়া-অরণ্যে অনেকবারই গেছে লোভে পড়ে, কিন্তু প্রাণ নিয়ে কেউ ফেরেনি। তাই আর যায় না। হীরক সদাগররা বড় লোভী। ওদের সঙ্গে কথা বলে কাজ নেই। সোজা বাড়ি ফিরে যাও।'

—'কিন্তু আমাকে তো লবঙ্গদ্বীপে যেতেই হবে, বাবার জন্যে!'

—'পরে হবে। আগে পুজোটা দিয়ে এসো।' ডাঙায় নামতেই মারুতি ছুটে এলো। রাজপুত্তুর উঠে বসলেন। বললেন, 'ধীবরভাই, আমি খুব শিগগিরই ফিরে আসছি। বাবাকে খুঁজে নিয়ে গিয়ে আমি সিংহাসনে বসাব। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ওঁরা মায়া-অরণ্যেই আটকে আছেন।'

—'সামনের পূর্ণিমায় এসো তাহলে। নিয়ে যাব।'

রাজ্যে কাঁসরঘণ্টা শাঁখ বাজছে, চারদিকে আনন্দ। কালভৈরবের মন্দিরের মানত রক্ষা হয়েছে। পিতৃসত্য রক্ষা করেছেন রাজপুত্র। কালভৈরবের সামনে মর্মরের ফুলদানিতে শোভা পাচ্ছে সোনা-রুপোর কদম্বফুল। দেশে আহ্লাদের বান ডেকেছে। কেবল রাজপুত্রের মনেই আনন্দ নেই। কোথায় আমার মা? কোথায় আমার বাবা? আমার ঠাকুরদাদা আমার ঠাকুমা? কোন অপরাধে আজ আমার কেউ কোথাও নেই? মনে মনে এইসব ভাবেন, আর ম্লান হয়ে যান। রাজপুত্রের অভিষেকের ব্যবস্থা হচ্ছে। মন্ত্রীর মুখে হাসি ধরে না, ধাইমার মুখে হাসি উপচে পড়ে। পরের পূর্ণিমায় রাজপুত্রের রাজ্য অভিষেক হবে।

পূর্ণিমার আগের দিনেই রাজপুত্র পালিয়ে গেলেন। মারুতিতে চড়ে শ্যেনদেবকে নিয়ে! হাজির হলেন সেই হীরকবন্দরে, ধীবর ভাই সেখানে অপেক্ষা করছেন ওর জন্যে। ঠিক সময়ে নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। আবার ভেসে উঠল কদমগাছ। এবারেও তাতে দেখা গেল সোনারুপোর কদম্বটি। কী মনে হল কালভৈরবের নাম করে বৃদ্ধ জেলে আবার জাল ছুঁড়লো, শ্যেনদেবও আবার উড়ে গিয়ে ডাঁটি ভেঙে দিলে, ফুলও এসে পড়ল রাজপুত্রের নৌকোয়। যত্ন করে ফুলটি দুহাতে নিয়ে রাজপুত্র বললেন,—'হে সোনারুপোর কদম্ব তোমার জন্যেই আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। তুমিই এবার তবে আমাকে পথ দেখাও, বাবার কাছে নিয়ে চলো।'—পূর্ণ চাঁদের আলোয় পান্না সুমুদ্রের ঢেউ, এলাচিনদীর সাদাজল লবঙ্গদ্বীপের খয়েরি মাটি, সবই যেন মায়াভরা—লবঙ্গের গন্ধে নেশা ধরে যায়। রাজপুত্র তো ফুল হাতে ডাঙায় লাফিয়ে পড়লেন। ডানহাত তরোয়ালের বাঁটে। সামনেই লবঙ্গবন। নৌকো বেঁধে ধীবর ভাইও এলেন সঙ্গে বাবা। বাবা। রাজামশাই। রাজামশাই।

কত ডাকাডাকি—কোনও সাড়া নেই! বন হঠাৎ ক্রমশ ঘন হয়, আরও ঘন হয়, রাজপুত্র তবু এগোন। হঠাৎ একটি গাছের লবঙ্গলতা যেন একটু বেশি বেশি দুলে উঠল। সাপ নাকি? রাজপুত্তুর এগিয়ে গেলেন, সর্বসিদ্ধি কবচ তাঁর বক্ষ ঢেকে রইলো সযত্নে, শ্যেনদেব চোখ পাকিয়ে নজর করে দেখে বলল—সাপ তো নেই! লবঙ্গলতা তবু দোলে। বাতাস নেই, তবু দোলে বাতাস যেন থমকে দাঁড়িয়েছে! রাজপুত্তুর কাছে গিয়ে যেই দাঁড়িয়েছেন মাথার ওপরে লবঙ্গফুল ঝরে পড়ল, যেন আশীর্বাদ, আর পড়ল শিশিরের দুটি ফোঁটা, যেন অশ্রুজল। রাজপুত্র আর একটু এগোতেই তাঁর হাতের সোনা-রুপোর কদমফুলটি লবঙ্গ লতার গায়ে লেগে গেল। আর অমনি একটা ম্যাজিক হল।

ধীবর তাড়াতাড়ি মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললে—'পেন্নাম হই, রাজামশাই—ভালো আছেন তো?' রাজপুত্র চেয়ে দেখেন চমৎকার এক রাজামশাই তাঁর সামনে। তাঁর চোখে জল হাতে অস্ত্র নেই। তিনি রাজপুত্তুরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর কদমফুলের ছোঁওয়ায় একে একে পাশাপাশি লবঙ্গলতাগুলি কোটাল, মন্ত্রী, সদাগর হয়ে উঠলেন, তাঁরা রাজপুত্তুরকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। তারপর সবাই মিলে ফিরে চললেন ধীবরের নৌকোয় চড়ে। ডাঙায় পৌঁছে ধীবর বললে—'একবার এলাচি নদীতে জাল ফেলে একটা রাঘব বোয়াল মাছের পেটে আশ্চর্য দুটি পুতুল পেয়েছিলুম। আমার জেলের ঘরে তা মানায় না, রাজামশাই আপনাকে আর কী ভেট দেব—আপনি সেইটিই নিয়ে যান। দেশের রাজাকে কিছু ভেট না দিলে পাপ হয়।

রাজা বললেন তুমি আমার যে উপকার করেছ, ধীবর, তোমাকে কিছুই দিতে হবে না, বরং তুমি যা চাইবে চিরকাল তোমাকে তাই দিয়ে যাবে আমার ছেলে।'

জেলে তবু শোনে না। 'না না, রাজামশাই, তাই কি হয়? দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি আনছি—'

বলে সে নিজের কুটিরে দৌড়োল। একটু পরেই ধীবর বেরিয়ে এলো। তার কোলে কাঁদ কাঁদ মুখে বসে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে। আহা। কী সুন্দরী, কী সুন্দরী। এলাচি নদীর মতন স্বচ্ছ সাদা তার চামড়ার রং, পান্নাসাগরের মতন সবুজ তার চোখ, আর দারুচিনি দ্বীপের দারুচিনির মতন গাঢ় বাদামি তার চুল, সারা গায়ে তাজা লবঙ্গফুলের গন্ধ। চোখদুটি জলে ভরা। একে আমি এই পান্নসাগরের ঢেউয়ে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। নাম রেখেছি লবঙ্গলতা। পুতুলদুটো এরই খেলাঘরের সম্পত্তি হয়ে গেছে কিনা ও ছাড়তে চাইছে না। কিন্তু এসব সোনার পুতুল কি আমাদের গরিব কুঁড়েতে মানায়? লবঙ্গলতা, দিদিভাই তুমি ও দুটি পুতুল রাজামশাইকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে অন্য দুটি পুতুল এনে দেব।'

মন খারাপ করে, মুখ ভারী করে, জল ছলছল চোখে শঙ্খের কাঁকন পরা সোনার মতন হাত দুটিতে পুতুল বাড়িয়ে ধরল লবঙ্গলতা। কথার অবাধ্য কী করে হবে?

রাজামশাই বলতে লাগলেন, 'আহা, বাছা, থাক থাক!' তখন সে মেয়ে পুতুল বাড়িয়ে ধরল রাজপুত্রের দিকে। রাজপুত্র কদমফুল-ধরা হাতেই ওকে বাধা দিতে গেলেন—থাক থাক। তোমার খেলার পুতুল তোমারই থাক।' এমন সময়ে কদমফুলটি পুতুলের গায়ে ঠেকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে, ম্যাজিক! সামনে দাঁড়ালেন ভিজে কাপড়ে মহারানি মা, আর বউরানি।

এত লোকের সামনে বউরানি লজ্জায় জড়োসড়ো কিন্তু মহারানি রাজামশাইকে—'খোকা রে!' বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এই না দেখে, ধীবরের মেয়ে আহ্লাদে হাততালি দিয়ে উঠল। তখন মহারানিমা লবঙ্গলতাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'ধীবর, তোমার ঘরে এতদিন আমাদের যেমন আদরে রেখেছিলে, আমার ঘরেও তোমার এই সোনার পুতুলটিকে আমি তেমনি আদর যত্নে রাখব। আমাদের খেলার সাথীটিকে ছেড়ে তো আমরা রাজপ্রসাদে ফিরে যেতে পারি না! তোমার নাতনিকে আমার নাতির জন্যে চেয়ে নিচ্ছি। তুমি এতে রাজি তো?'—ধীবরের তো মুখে কথাই ফুটছে না। সে মহারানির পায়ে উপুড় হয়ে বললে—'মা গো, এত সৌভাগ্যিও মানুষের হয়?'

তারপরে আর কী?

ধীবরের কুটিরটাকে শ্বেতপাথরের প্রাসাদ করে দিয়েছেন রাজামশাই, আর চন্দনকাঠের জেলে ডিঙি নিয়ে রুপোর সুতোর জাল ফেলে সে মাছ ধরতে বেরোয়।

রাজপুত্তুর মারুতিতে চড়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে রথ, পালকি, লোকলস্কর নিয়ে হীরকবন্দরে ফিরে এলেন, রাজরানি, মহারানি, লবঙ্গলতা, মন্ত্রী, কোটাল, সদাগর, সবাইকে নিয়ে সুখী প্রজাদের বিরাট মিছিল ফিরে চলল বাজি পোড়াতে, পোড়াতে, গান গাইতে গাইতে। রাজধানীতে পৌঁছে, একই সঙ্গে রাজপুত্রের অভিষেক উৎসব আর বিয়ে হল। ছোট্ট রাজপুত্র রাজা হয়ে গেলেন। আর একগাল হেসে হারামনি ছেলের হাতে আরেকবার মন্ত্রীত্বের ভার তুলে দিয়ে বৃদ্ধমন্ত্রী আবার রিটায়ার করলেন। আর ধাইমা? লবঙ্গলতা আর রাজপুত্তুরকে কোলে নিয়ে তাঁর ফোকলা মুখে যেন চাঁদের আলো উথলে উঠল।

কালভৈরবের মন্দিরে এখন দুটো জ্বলজ্বলে সোনারুপোর কদম্বফুল। সে ফুল কোনওদিন শুকোয় না। শুকোবে কী করে, সে ফুল শুধু রূপকথাতেই ফোটে কিনা?

বুদ্ধি বেচার সওদাগর

এক নাপিতের মনে খুব দুঃখু। তার ছেলেটা কেবলই খেলে বেড়ায়, কেবলই খেলে বেড়ায়, কাজকর্ম কিছু করে না। সে নাপিতগিরি করতে চায় না। তার ওই ক্ষুর কাঁচি সাবান ফিটকিরি এসব ভালোই লাগে না।

'তবে তুই কি হবি?'

'আমি কিচ্ছু হব না।'

'কিচ্ছু হবি না তো খাবি কী?'

'আমি কিচ্ছু খাব না' তো বলা যাবে না। নাপিতের ছেলের ভারি মুশকিল হল। সে তবু বলল, 'হাওয়া খাব।'

'হাওয়া খেয়েই বাঁচবি?'

'মানুষ তো হাওয়া খেয়েই বাঁচে, বাবা! হাওয়া বন্ধ করলে আমরা বাঁচব?'

'নাঃ, তোর সঙ্গে কথায় আমি পারি না। তুমি বকতিয়ারি করেই খাবি।'

শুনেই নাপিতের ছেলে নেচে উঠল।

'পেয়ে গেছি। পেয়ে গেছি! আমি কী হব, তার সমাধান পেয়ে গেছি। থ্যাংকিউ।'

নাপিত তো অবাক!

'কী আবার পেলি?'

'ওই যে তুমি বললে, বকতিয়ারি করেই খাবি? ঠিক তাই করব। কথা বেচে খাব।'

'সে তো উকিল মোক্তারের কাজ। কথা বেচে খায় তারা। তুই কি আইন পড়েছিস?'

'আমি তো আদালতে যাব না। আমি যাব হাটে। হাটের মাঝখানে একটা দোকান দেব। সেই দোকানে কথার বেচাকেনা হবে।'

নাপিত বড় বড় চোখ করে বলল, 'সত্যি বাপু! তুই কোনওদিন বড় হলি না। খালি খেলা-খেলা। খালি খেলা-খেলা।'

'খেলা নয় বাবা, সত্যি! দেখো তুমি।'

পরের হপ্তায় হাটে দেখা গেল ছোট একটা খড়ের চালা আর বাঁশের মাচা বেঁধে দিব্যি নাপিতের ছেলেটি দোকান দিয়েছে। তাতে মস্ত সাইনবোর্ডে লেখা: 'এখানে সুবুদ্ধি বিক্রয় করা হয়।'

সুবুদ্ধির আবার বিক্রিবাটা কী? হাটের লোক তো হেসেই বাঁচে না। ছেলেটার কেবল ইয়ার্কি-ঠাট্টা!

এদিকে হয়েছে কী, ওপাশের গাঁয়ের জমিদারের ছেলেটি এক সদাগর-কন্যাকে বিয়ে করতে চেয়ে পাগল। কিন্তু সেই মেয়ে একটি টাকা দিয়ে তাকে বলেছে—বাজার থেকে আগে কিছু খাদ্য, কিছু পানীয়, বাগানে পোঁতার জন্যে কিছু বীজ, আর গরুর খাবার—এই চারটে জিনিস কিনে আনতে। ছেলেটা দেখছে এক টাকাতে মোটে একটাই কিছু হতে পারে বড়জোর। চাররকম কেন, দু-রকম জিনিসও হয় না। সে তো জমিদারের ছেলে, আগে কখনও বাজারে যায়নি, তাই জানত না। হাটে এসে সে বেচারি খুব মুশকিল পড়েছে। কাঁদ-কাঁদ মুখে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নাপিতের ছেলের সাইনবোর্ড দেখে, সে ভারি খুশি। এসে বললে, 'আমি সুবুদ্ধি কিনব।'

'কিন্তু দু'টাকা দিতে হবে।'

'তা দেব। আগে আমার সমস্যার সমাধান করে দাও। এক টাকাতে চাররকমের জিনিস যদি না কিনতে পারি, সদাগর-কন্যে আমাকে বিয়ে করবে না বলেছে। আর ও যদি আমাকে বিয়ে না করে, আমি তাহলে প্রাণে বাঁচব না। আর আমি যদি মরে যাই, আমার মা-ও বাঁচবেন না। আর মা যদি মরে যান, তবে বাবাও—'

'আহা, থামো থামো। কেউ মরবে না, বিয়েও হবে। বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করে, ভালো করে খাওয়াবে তো?'

'আগে তো সমাধান—'

'একটা তরমুজ কিনে নিয়ে যাও। শাঁসটা খাদ্য, জলটা পানীয়, বিচিগুলো বীজ আর খোসাটা গরুর খাবার। এই তো সহজ ব্যাপার। এক টাকাতেই চার রকম!'

জমিদার পুত্তুর আহ্লাদে আটখানা হয়ে, তাকে দুইয়ের বদলে দশটাকা দিল। তরমুজটি কিনে নিয়ে, নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।

নাপিতের ছেলে বাড়ি এসে বাবাকে দশ টাকা দিলে। নাপিত অবাক!

'কী করে পেলি?'

'বুদ্ধি বেচে!'

নাপিতরা খুব বুদ্ধিমান হয়, এমন একটা কথা আছে বটে। নাপিতের বুদ্ধি নিয়ে অনেক গল্পও আছে, তা নাপিতও জানে। কিন্তু সত্যি-মিথ্যে প্রমাণ পায়নি। সে নিজে, তার

বাবা, কেউই ধূর্ত নয়। খেটে-খুটে রোজগার করে তারা। এই ছেলেই নাপিত-বংশের নাম রাখলে!

এদিকে হাটের লোকে তো খাবার জিনিস কেনে, পরার জিনিস কেনে, ব্যবহার করবার জিনিস কেনে, যা দেখা যায় না, ধরা যায় না, যার গন্ধ নেই, যাকে ছোঁয়া যায় না—এমন জিনিস তো কেউ কিনতে আসে না। বুদ্ধি তেমনি জিনিস।

এক বামুনের এক বোকা ছেলে ছিল। সে ওখান দিয়ে যেতে যেতে দোকানের নাম দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু বুদ্ধি কেমন করে কিনতে হয়, সে তো জানে না।

বামুনের ছেলে বললে, 'আমাকে আড়াইশো গ্রাম বুদ্ধি দাও।'

নাপিতের ছেলে বললে, 'আমি তো বুদ্ধি ওজনে বেচি না, মাপে বেচি। তুমি ক'পয়সার বুদ্ধি চাও?'

বামুনের ছেলে বললে, 'পঞ্চাশ পয়সার।' বলে একটা আধুলি দিলে।

তখন নাপিতের ছেলে একটা কাগজে তাকে লিখে দিল—'যখন দুজন লোকে মারামারি করছে কখনও সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে নেই।'

বামুনের ছেলে সেটি পকেটে পুরে বাড়িতে নিয়ে এসে, বাবাকে দেখাতে গেল।

'বাবা, তুমি বলো আমাকে, আমার নাকি বুদ্ধি নেই। তাই আজ আট আনার বুদ্ধি কিনেছি।'

বামুন বললে, 'তার মানে?'

ছেলে কাগজটা বাবার হাতে দিলে।

বামুন তো চটে লাল।

'কে না জানে মারামারি করলে সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে নেই? তার জন্যে পঞ্চাশ পয়সা? চল দেখি, তোর বুদ্ধিওয়ালা কে। ঠকিয়েছে তোকে।'

নাপিতের ছেলেকে গিয়ে বামুন বললে, 'লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি? দাও শিগগির পঞ্চাশ পয়সা ফেরত।'

নাপিতের ছেলের নাম মন্টু। মন্টু বললে, 'টাকা নিশ্চয়ই ফেরত দেব, আপনি আমার মাল ফেরত দিন।'

বামুন কাগজের টুকরোটা ছুঁড়ে দিল।

মন্টু বললে, 'এটা তো কাগজ। এটা তো সুবুদ্ধি নয়। আমার সুবুদ্ধিটা ফেরত দিতে হলে; আপনাকে উলটে আমাকে একটা কাগজ দিতে হবে সই করে এই লিখে, যে—আমার ছেলে কখনও এই বুদ্ধি ব্যবহার করবে না। দুজন লোকে মারামারি করলে, সে দাঁড়িয়ে দেখবে।'

হাটের লোকেও এবার মন্টুর পক্ষ নিলে। বামুন রেগে-মেগে কাগজে ওই কথা লিখে, দস্তখত করে দিলে আর পঞ্চাশ পয়সা ফেরত নিয়ে চলে গেল।

সেই রাজ্যের রাজার ছিল দুই রানি। আর দুজনের ভয়ানক ঝগড়া। রানিদের আবার

ছিল দুই দাসী। দাসীদের মধ্যে আরও বেশি ঝগড়া। ওফ্, তারা তাদের মনিবানিদের চেয়েও অনেক বেশি ঝগড়া করে। কী তাদের রেষারেষি!

সেদিন দুই দাসী হাটে এসেছে। এক চাষির কাছে চমৎকার একটি পাকা কুমড়ো দেখে, দুজনেই সেটা কিনতে চাইল। চাষি বেচারি পড়ল মুশকিলে। দুই দাসীর ঝগড়া এমন পর্যায়ে উঠল, যে তাদের চ্যাঁচামেচি হট্টগোলের চোটে হাটের কুকুর-বেড়ালেরা দৌড়ে পালিয়ে গেল। আর তাদের মুখের ভাষা শুনে চাষি বেচারি নিজেই ছুটে পালাল কুমড়ো-টুমড়ো ফেলে।

বামুনের বোকা ছেলেটি দেখলে এখানে মারামারি বাধতে চলেছে। বাবার সঙ্গে মন্টুর বন্দোবস্ত অনুযায়ী সে গেল মারামারি দেখতে। দাসীরা তো চুলোচুলি করলে, হাতাহাতি করল। এ ওর কাপড় ছিঁড়ে দিল। তারপর দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে বামুনের ছেলেকে বললে, 'বামুনদাদা, আপনি তো দেখলেন, ও আমাকে আগে মেরেছে। আপনি সাক্ষী রইলেন।' বলে তারা পুকুরে মুখ-চোখ ধুয়ে, কাপড় ঝেড়েঝুড়ে, অন্য কাজে চলে গেল। বামুনের ছেলেও বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

দাসীরা করেছে কী, প্রাসাদে ফিরে যে যার রানিমাকে নালিশ জানিয়েছে। আর দুজনেই বলেছে বামুনের ছেলেটা সাক্ষী, অন্যজন আগে তাকে মেরেছিল। আরও কত কী বাড়িয়ে বাড়িয়ে মিছিমিছি বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

শুনে দুই রানিমা খেপে গেল। তাঁরা রাজার কাছে নালিশ জানালেন। আর দুজনেই সেই বামুনের বাড়িতে দূত পাঠালেন, তার ছেলেকে সাক্ষী দিতে হুকুম করে। বড়রানিমাও। ছোটরানিমাও। যদি সে বড়রানির পক্ষে সাক্ষী দেয়, তবে ছোটরানিমা তার গর্দান নেবেন। আর যদি ছোটর পক্ষে সাক্ষী দেয়, তবে বড়রানিমা তাকে শূলে চড়াবেন।

বামুন আর বামুনের ছেলে তো ভয়ে কাঁটা! এবারে ছেলের প্রাণ যাবেই। আর রক্ষে নেই। শেষকালে ছেলে বললে, 'বাবা, আমি বরং সেই দোকানে যাই। কিছু সুবুদ্ধি কিনে আনি। ওর বুদ্ধিটা ফেরত না দিলে, আমার এই দশা হত না। দেখি, যদি ও আমাকে বাঁচাতে পারে।'

সন্ধেবেলা, তখন হাট উঠে যাচ্ছে, মন্টুও ঝাঁপ ফেলে বাড়ি যাচ্ছে, বামুনের ছেলে আর বামুন এসে তার কাছে বুদ্ধি কিনতে চাইল।

'বড় বিপদ! রক্ষা করো ভাই।'

মন্টু বললে, 'পাঁচশো টাকা লাগবে। এটা দামি বুদ্ধি।'

বামুন পাঁচশো টাকা দিলে।

মন্টু বললে, 'রাজসভাতে গিয়ে পাগলের অভিনয় করবে। এমন ভান করবে, যেন কারুর কোনও কথাই তুমি বুঝতে পারছ না।'

পরদিন রাজা তো সাক্ষীকে সভায় ডেকে পাঠালেন। বামুনের ছেলেকে মন্ত্রী অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ছেলেটা আবোল-তাবোল কথা বলল, হাসল, গান গাইল। কোনও প্রশ্নেরই জবাব দিল না। রাজামশাই চটে-মটে, অধৈর্য হয়ে, তাকে সভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মুক্তি পেয়ে, প্রাণ ফিরে পেয়ে, বামুনের ছেলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে, মহানন্দে সব্বাইকে

মন্টুর বুদ্ধির কথা বলে বেড়ালে। হাটের লোকজনও মন্টুর 'সুবুদ্ধির দোকানের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল।

বামুনের কিন্তু মনে শান্তি নেই। একেই বোকা ছেলে, তায় তাকে এখন সারা জীবন পাগলের অভিনয় করে যেতে হবে। নইলে রাজা জানতে পারবেন—তাঁকে ঠকানো হয়েছে। ব্যস! কচাৎ করে মুণ্ডু খসে যাবে।

কোনও উপায় ভেবে বের করতে না পেরে, বামুন হাটের দিনে আবার মন্টুর দোকানে গেল বুদ্ধি কিনতে।

মন্টু বললে, 'পাঁচশো টাকা আগে দাও। তারপর বলছি।'

টাকা নিয়ে সে বুদ্ধি দিলে, 'যখন রাজার মেজাজ প্রসন্ন থাকবে, তখন তাঁর কাছে ফিরে যাও। হাট থেকে শুরু করে সব সত্যি ঘটনা তাকে খুলে বলো। তিনি হেসে ফেলবেন। তোমাকে মাপও করে দেবেন।'

বামুন তক্কে-তক্কে থাকে। একদিন খবর এলো রাজা খুব খোশ-মেজাজে আছেন, বড়রানিমার ছেলে হয়েছে। তাড়াতাড়ি বামুন তার ছেলেকে নিয়ে সভায় গেল। আর সেই পঞ্চাশ পয়সার বুদ্ধি কেনা শুরু করে, সব গল্পটা বলে দিলে রাজাকে। শুনে রাজা যত হাসেন, মন্ত্রীও তত হাসেন, সভাসদ্‌রাও তত হাসেন। হাসির হররা পড়ে গেল রাজবাড়িতে। পাইক-বরকন্দাজরাও হাসতে লাগল।

রাজা বামুনের ছেলেকে মাপ করে দিলেন। মন্ত্রীকে তিনি বললেন, 'নাপিতের ছেলেটিকে সভাতে ডেকে আনো তো। দেখি, তার কাছে আর কী কী সুবুদ্ধি আছে বেচবার মতন।'

মন্টু এসে রাজাকে প্রণাম করল।

রাজামশাই বললেন, 'বলো দেখি বাছা, তোমার কাছে আর কী কী সুবুদ্ধি আছে?'

মন্টু বিনীতভাবে উত্তর দেয়, 'তা, আছে প্রচুর। বিশেষ করে রাজামশাইয়ের কাজে লাগবার মতন অনেক সুবুদ্ধি আছে। কিন্তু তার অনেক দাম। এক লক্ষ টাকা। মানে, মোট একশো হাজার টাকা।'

রাজা তক্ষুনি কোষাগার থেকে এক লক্ষ টাকা আনিয়ে, মখমলের থলেতে পুরে মন্টুকে দিয়ে দিলেন। মন্টুও তখন তাঁর হাতে একটা খাম দিল। খাম খুলে রাজা দেখেন—তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে ঃ 'কোনও কাজ করবার আগে গভীর ভাবে চিন্তা করে নেবেন।'

সুবুদ্ধিটা পেয়ে রাজামশাই খুব খুশি হলেন। বড় বড় করে লিখে, বাঁধিয়ে, টাঙিয়ে রাখলেন ঘরে। যাতে কখনও ভুলে না যান, তাই বালিশের ওয়াড়ে, জলের গেলাসের গায়ে, সর্বত্রই এটা লিখে রাখলেন। আর ভেবে-চিন্তে কাজ করতে থাকলেন।

কিছুকাল পরে রাজামশাইয়ের ভীষণ অসুখ করল। ছোটরানি আর মন্ত্রীমশাই ষড়যন্ত্র করলেন—এই বেলা রাজাকে মেরে ফেলতে হবে। তারপর বড়রানিকে আর তাঁর ছেলেকে

শূলে চড়িয়ে, রাজ্য শাসন করবেন ছোটরানি আর মন্ত্রী। এই ভেবে তাঁরা রাজার ওষুধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেবার জন্যে কবিরাজমশাইকে অনেক টাকা ঘুষ দিলেন।

কবিরাজমশাই তো লোভে পড়ে ওষুধে বিষ মিশিয়েছেন। রাজামশাই ওষুধ খাবার জন্যে যেই গেলাসটি মুখে তুলেছেন, তাঁর হঠাৎ চোখে পড়ল—'কোনও কাজ করবার আগে গভীরভাবে চিন্তা করে নেবেন।'

লেখাটি দেখে রাজার সেই গল্প, সেই বামুনের বোকা ছেলেটির কথা মনে পড়ল। তিনি মৃদু হাসলেন। এদিকে কবিরাজ তো অন্যায় কাজ করে আপন মনেই ভয়ে কাঁটা হয়ে ছিলেন, এখন রাজার মুখের মৃদু হাসিটি দেখামাত্র তাঁর মনে আর সন্দেহ রইল না যে—রাজামশাই ঠিক বুঝতে পেরেছেন ওষুধে বিষ! তিনি গেলাস কেড়ে নিয়ে, সাষ্টাঙ্গে রাজার পায়ে আছড়ে পড়ে মাপ চাইলেন।

রাজা প্রথমে অবাক হলেও, সবই বুঝলেন। দুষ্টু মন্ত্রী আর ছোটরানিকে হেঁটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার মতন এক বিচ্ছিরি জিনিস তো আর হয় না! কবিরাজমশাই মাপ চেয়েছেন বলে, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে দ্বীপান্তরে পাঠানো হল।

আর মন্টুর কাছে দূত গেল। নাপিত দরজাখুলে দ্যাখে রাজার পেয়াদা এসেছে।

'কী ব্যাপার?' নাপিত তো ভয়ে কাঠ। 'তখনই বলেছিলুম! রাজার কাছেও কিনা চালাকি! নাও, এবারে তবে সবাই মিলে জেলে যাই!'

বাবাকে শান্ত করে, পেয়াদার হাত থেকে চিঠি নিয়ে মন্টু দেখল—রাজা তাকে মন্ত্রীর পদে নির্বাচন করেছেন। আজ থেকেই সে রাজার প্রধানমন্ত্রী।

আর কী? তখন নাপিতের আহ্লাদ দেখে কে!

নাপিতের ছেলে মন্টুর
দোকান ছিল বুদ্ধির।
রাজ্যিসুদ্ধু তোলপাড়
মন্টু কেবল সুস্থির।।

(গুজরাতি লোককথা অবলম্বনে, প্রকাশকাল ঃ ১৪০৫ বঙ্গাব্দ)

আলো আর আঁধার

এক বুড়ো কাঠুরিয়ার দুটি নাতনি ছিল। তাদের মুখগুলো যেমন সুন্দর, তাদের মনগুলোও তেমনি সুন্দর। একটি চঞ্চল, একটি শান্ত। চঞ্চলটির নাম দিবা, আর শান্তটির নাম রাতি। কাঠুরিয়া বুড়ো হয়েছে, আর কাঠ কাটতে পারে না তেমন, কষ্ট হয়। দিবা-রাতি যায় বনে কাঠ কুড়োতে। খুব পরিশ্রমী মেয়ে তারা। কাঠ কুড়িয়ে, বান্ডিল বেঁধে, মাথায় করে হাটে নিয়ে যায়। সেই কাঠ বিক্রি করে চাল-ডাল-কাপড়, সবকিছু কিনে আনে।

একদিন তাদের হাট থেকে ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল। ভীষণ ক্লান্ত দুই বোন বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। সেটা পূর্ণিমা রাত্রি, তাই ভয় করল না। একটু পরেই বন আলোয় আলো হয়ে যাবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুই বোনই স্বপ্ন দেখল আকাশ থেকে একটা তারা নেমে এসেছে তাদের পাশে, আর সেই তারা থেকে রাজপুত্তুরের মতো সুন্দর এক নক্ষত্রপুত্র বেরিয়ে এসে তাদের ডাকাডাকি করছে, 'ওঠো ওঠো!' দুই বোন একই সঙ্গে জেগে উঠল। দেখল, তাই তো? সত্যি সত্যি পরম রূপবান একটি ছেলে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ডাকছে। ছেলেটি বলল, 'এখানে কেন, তোমরা ঘরের ভেতরে ঘুমোবে চলো।' বলে সেই তারার ওপরে বসিয়ে দুই বোনকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে চলল।

তারাটা যেন একটা ছ'কোণ বারান্দা। দিবা-রাতি তাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে নীচে অরণ্য প্রান্তর নদী পাহাড় সব চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। ছেলেটি ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে বলল, সে চাঁদের বুড়ির ছোট ছেলে। চাঁদের বুড়ির বড় ছেলে গেছে ম্যাজিক আগুন নিয়ে আসতে। সেখানে যাওয়া খুব শক্ত। কিন্তু চাঁদের বুড়ির বড় ছেলে সব

শক্ত শক্ত কাজ করে ফেলতে ওস্তাদ।

আকাশে পৌঁছে ওরা দ্যাখে চাঁদের বুড়ির বসে চরকা কাটছেন। মেয়েদের দেখে বললেন, 'আহা বাছারা, খালি পেটে ঘুমিয়ে পড়েছে! ওদের কত খিদে পেয়েছে!' বলে ছোট্ট একটা বাটিতে করে দশটা চাল ভাত বসিয়ে দিলেন। সেই দেখে দিবা বললে, 'ওমা! ওতে করে কারই বা পেট ভরবে?' রাতি বললে, 'চুপ চুপ এ কি আমাদের দেশ? এ চাঁদের দেশ। এখানে কি না হয়!'

সত্যি সত্যি সেই দশটা চালে এত ভালো হল যে ঘি দিয়ে মেখে খেয়ে দুই বোনে ফুরোতে পারল না। চাঁদের বুড়ি মিষ্টি হেসে বললেন, 'কী গো? পেট ভরেছে তো? এই বাটিটা আর এই দশটা চাল তোমরা নিয়ে যাও। তোমাদের কোনওদিন পেটে খিদে নিয়ে শুতে যেতে হবে না।'

তারপরে দিবা আর রাতিকে তিনি চমৎকার মেঘের বিছানা পেতে শুতে দিলেন, আর চরকার গান শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

তখনও পুরোপুরি সকাল হয়নি, আকাশের আঁধার একটু হালকা হয়েছে কেবল, আবার তাদের ডেকে তুলে দিলেন চাঁদের বুড়ি। চরকা থেকে একটা সুতো নিয়ে বললেন, 'এই সুতোটা শক্ত করে ধরে থাকো দুজনে, আমি তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।'

দিবা আবার বলে ফেললে, 'ওমা! সুতো তো ছিঁড়ে যাবে! আমাদের দুজনের ভার সইবে কেমন করে? যা সরু সুতো!' কিন্তু রাতি মনে করিয়ে দিলে, 'দেখলি না, দশটা চাল কত ভাত হয় এখানে? এই সুতো হয়তো নাইলনের দড়ির মতন শক্ত!'

তারপর সেই সুতো বেয়ে দুজনে তো নীচে নেমে এল। এসে দেখে, বাঃ! এক্কেবারে নিজেদের কুটিরে দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে। বুড়ো কাঠুরিয়ার এদিকে ভীষণ ভাবনা হয়েছে, সে বাইরে এসে বসে আছে, নাতনিরা কখন ফিরবে। এখন দুদিক থেকে দুজনে জড়িয়ে ধরে তাকে বললে, 'দ্যাখো দাদু, আমরা কী এনেছি!'

চাঁদের বুড়ির কল্যাণে তাদের আর কোনওদিন ভাতের অভাব হয় না। কিন্তু তেল সাবান তো চাই? কাপড়-গামছা তো চাই? বোনেরা তাই কাঠ কুড়োতে যায়। কাঠ কুড়িয়ে বান্ডিল বেঁধে হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে যখন যা দরকার কিনে আনে। আরেকদিন অমনি বাজার করে ফিরতে তাদের ভয়ানক দেরি হয়ে গেল। সেদিন ছিল অমাবস্যার রাত— তারার আলোয় পথ চলছে, কিন্তু বনের ভেতরে তাতে পথ দেখা যায় না। বড় বড় গাছের ছায়া, বড্ড অন্ধকার। কী করে? দুই বোন আবার গুটিশুটি বনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুজনে স্বপ্ন দেখছে একজন কালোকালো ষণ্ডাগুন্ডা মতন লোক এসে তাদের ডাকছে, 'ওঠো, ওঠো!' ভয়ের চোটে তো ঘুম ভেঙে দুই বোন লাফিয়ে উঠেছে। দ্যাখে সত্যি সত্যি একজন কালোকালো ষণ্ডাগুন্ডা মতন লোক! সে বলল, 'আহা, তোমরা এইখানে ঘুমুচ্ছো কেন, এখানে কত বিপদ-আপদ, চলো ঘরের মধ্যে ঘুমোবে চলো।'

বলতে না বলতেই সেখানে ঝুপ করে গাছ থেকে পড়ল এক বিষাক্ত সাপ। দিবা-

রাতি কিছু ভাববার আগেই লোকটা সাপের গায়ে আলতো একটা টোকা মারল। আর সাপ তক্ষুনি পুড়ে ছাই। অবাক কাণ্ড! দেখে বোনেদের গায়ে কাঁটা দিল।

লোকটি ওদের অভয় দিয়ে বলল, 'অবাক হবার কিছু নেই। আমার কাছে ম্যাজিক আগুন আছে কিনা? তাই আমার এত শক্তি।'

দিবা-রাতি কোরাসে বলে উঠেছে, 'আপনি বুঝি চাঁদের বুড়ির বড় ছেলেটি।'

এবার সেই লোকের অবাক হবার পালা। 'তোমরা কী করে আমাকে চিনলে?'

'আপনার ছোটভাই বলেছিল কিনা, আপনি ম্যাজিক আগুন আনতে গেছেন।'

'তোমরা তাহলে আমার ছোটভাইকেও চেনো?'

'চিনিই তো। আপনিও কি আমাদের তারায় চড়িয়ে আপনাদের বাড়িতে নিয়ে যাবেন?'

হো হো করে হেসে উঠে লোকটা বলল, 'তারা-টারা নয়, আমি এসেছি অন্ধকারের পিঠে চড়ে।'

অন্ধকার ঠিক একটা তেজি কালো পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতন—তার পিঠে দুই বোনকে বসিয়ে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেল সে। গিয়ে পৌঁছল অন্য একটা বাড়িতে। চাঁদের উলটো পিঠে। পৃথিবীতে যখন অমাবস্যার অন্ধকার হয়, তখন আসলে চাঁদের বুড়ি যান তার বড় ছেলের বাড়িতে চরকা কাটতে।

আঁধার বলল, 'মাগো, দ্যাখো কাদের নিয়ে এসেছি। এদের বিছানা পেতে দাও।'

চাঁদের বুড়ি দিবা-রাতিকে দেখে খুব খুশি। কিছুদিন আগে ছোটছেলে আলো গিয়েও তো এই মেয়ে দুটিকেই নিয়ে এসেছিল।

চাঁদের বুড়ি বললেন, 'এসো মা, বোসো মা, তোমাদের জন্যে ভাত চড়াই মা।'

কিন্তু মেয়েরা আজ বললে, 'আমরা খাব না, আমাদের বনের ফল খেয়েই খিদে মিটে গেছে, আমাদের বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

তখন তাঁদের বুড়ি একটা সুন্দর কাঠের সিঁদুরকৌটো নিয়ে এসে, মেয়েদের হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমরা এর মধ্যে ঘুমোও।'

অবাক হয়ে দুই বোন বলে উঠল, 'ও মা এর ভেতরে ঢুকবো কেমন করে আমরা?'

চাঁদের বুড়ি ফিক করে ফোকলা গালে হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট কৌটো একটা মস্ত ঘর হয়ে গেল, তাতে নরম, সুগন্ধী, ফরসা ধবধবে বিছানা পাতা। দিবা-রাতির ক্লান্ত শরীর। তারা শুলো, আর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে উঠে দ্যাখে কখন যেন ঘুমের মধ্যেই কোন ম্যাজিকে ফিরে এসেছে ওদের নিজেদের কুটিরে। কিন্তু কুটির আর সেই ভাঙা কুটিরটি নেই। নতুন খড়, নতুন মাটি, পাকা মেঝে, কী চমৎকার একটা কুটির, তাতে তক্তপোশে নতুন বিছানা পাতা, সেই বিছানা দাদুর পাশে তারা ঘুমিয়ে আছে। কেমন করে এমনটি হল?

তাই তো? তাই তো?

কিছু বোঝবার আগেই কুটিরের দরজায় এসে দাঁড়াল দুটি ছেলে। একজনের রং পূর্ণিমার আলোর মতন, আর একজনের রং ঠিক অমাবস্যার অন্ধকারের মতন। কিন্তু দুজনেই ভারি সুন্দর। আর তাদের মুখের হাসিদুটো খুব মিষ্টি, খুব চেনা চেনা।

কাঠুরিয়াদাদু বললেন, 'এসো বাছারা, বোসো বাছারা, একটু জল খাও, একটু বাতাসা খাও। তারপরে বলো দেখিনি তোমরা কে? কোত্থেকে এসেছ?'

দিবা জল আনল, রাতি বাতাসা আনল। জলবাতাসা খেয়ে, একটু জিরিয়ে নিয়ে তারা বললে, 'দাদু, আমরা চাঁদের বুড়ির দুটি ছেলে, আলো আর আঁধার। আমাদের আপনি চেনেন। আপনার দুটি ভালোমানুষ নাতনিকে আমরা বিয়ে করতে চাইছি। আপনি কি অনুমতি দেবেন?'

কাঠুরিয়া বললে, 'দাঁড়াও বাছারা, তাদের আগে মতামতটা জেনে নিই, তবে তো অনুমতি?'

নাতনিদের মুখ আহ্লাদে ঝলমল করছে দেখে কাঠুরিয়া হেসে বললে, 'নাঃ, আর জিগ্যেস করতে হবে না, মতটা জানতেই পেরে গেছি!'

হইহই করে দু-বোনের বিয়ে হয়ে গেল। তারার দল বরযাত্রী এসেছিল। কাঠুরিয়া তো খুব খুশি। সে এখন আকাশে গিয়ে চাঁদের বুড়ির সঙ্গে আড্ডা মারে আর তারাদের সঙ্গে লুডো খেলে। আর তার দুই নাতনি দিবা আর রাতি মনের সুখে আলো আর আঁধারের সঙ্গে ঘরকন্না করে। আর চাঁদের বুড়ি? চরকা কাটেন, আর গান করেন। গান করেন, আর চরকা কাটেন।

টুলুরাজকুমারী আর টুবান

টুলুরাজকুমারীর যেমন গুণ তেমনি রূপ, অথচ বর পাওয়া যায় না। টুলুরাজাটি বুড়ো থুখুড়ে হয়ে গেছেন, রাজ্যপাট সামলাতে পারেন না তেমন। পরমসুন্দরী ছোটরানিই সব দেখেন। তিনি রাজকুমারীর সৎমা। রাজকুমারীর বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। বহু রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্রেরা এসেছেন টুলুরাজ্যে, কিন্তু কেউই আর ফিরতে পারেননি। তারা যেন সবাই উবে যান।

টুলুরাজকুমারী ছাদে বসে চুল শুকোন, বাগানে বেড়াতে বেড়াতে ফুলের গন্ধ শোঁকেন। রাজ্যের লোকরা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। আর ভাবে—আহা, আমাদের এত চমৎকার রাজকন্যে, তার একটা বর জোটে না?

টুলুরাজ্যের পাশের রাজ্যে ছিলেন বুলু রাজা। বুলুরাজার তিন ছেলে। উবান, বুবান আর টুবান। উবান যেমন লম্বা-চওড়া, তার গায়ে তেমনি জোর। বুবান যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি পড়াশুনোয় ভালো। টুবান ছোট, টুবান রানিমার আদরে শুধু খেলে বেড়ায়। সে ব্যায়ামবীরও হল না, পণ্ডিতও হল না। কিন্তু সব ব্যাপারে তারই আগ্রহ সবার চেয়ে বেশি।

উত্তরের রাজ্যে একবার দৌড়-ঝাঁপের প্রতিযোগিতা হল। বুবান তো গেলই না, উবানও গেল না! দূর! দৌড়ঝাঁপ আবার রাজপুত্রের খেলা হল, কিন্তু টুবান গেল আর ঝুড়ি ঝুড়ি সোনার মেডেল নিয়ে ফিরল।

তারপর দক্ষিণরাজ্যে হল সমুদ্রে সাঁতার দেবার প্রতিযোগিতা। বুবান তো গেলই

না। উবান বলল,—দূর! সমুদ্রে তো যাবে জেলেরা, সমুদ্রে তো যাবে মাঝিরা। ওটা একটা রাজপুত্রের কাজ হল? টুবান কিন্তু গেল। আর সব্বাইকে হারিয়ে দিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মুক্তোর ঝিনুক নিয়ে ফিরল।

টুলুরাজকুমারীর কথা উবান-বুবান-টুবান জানে। টুবান বলল—মা, আমি টুলুরাজকুমারীকে বিয়ে করতে চাই। ওদিক দিয়েই ঘোড়ায় চড়ে আসছিলুম, ছাদে বসে চুল শুকোতে দেখেছি তাকে।

বুবান বলল,—সে কি! আমরা তোমার দুই দাদা থাকতে ছোট ভাই বিয়ে করবে—তা কি হয়? টুলুরাজকুমারীকে বিয়ে করলে করবে দাদা, উবান।

উবান খুব খুশি। তার মা তাকে বর সেজে সাজিয়ে দিলেন। তার বাবা তাকে তীক্ষ্ণ তরোয়াল দিলেন। উবান টগবগিয়ে ঘোড়ায় চড়ে টুলুরাজার দেশে চলে গেল।

দিন যায়, হপ্তা যায়, মাস যায়। উবান আর ফেরে না। তখন বুলুরাজা বললেন,—বুবান, তুমি যাও, উবানের কী হল একটু খোঁজ করো।

দাদার মতন সেজেগুজে বুবান গেল। কিন্তু গেল তো গেলই!

টুবান বললে,—মা, এবার আমি যাই টুলুরাজার দেশে।

মা বললেন,—না বাবা, যেও না। এমন বউ দিয়ে আমার কাজ নেই। আমার দুই ছেলে যার জন্যে জন্মের শোধ হারিয়ে গেল। কেউ তাদের আর বেরুতেই দেখেনি টুলুরাজার প্রাসাদ থেকে। তুই-ই আমার সবেধন নীলমণি। না টুবান, তুই যাসনি।

বাবা বললেন,—টুবান, তোমার মা ঠিকই বলেছেন। টুলুরাজ্যের ব্যাপার-স্যাপার আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। তুমি যেও না। আমি বরং মন্ত্রীমশাইকে জিগ্যেস করে চর পাঠাই। চর আগে খবর নিয়ে আসুক।

টুবান চঞ্চল ছেলে। সে বাবা-মার উপদেশ না মেনে লুকিয়ে ঘোড়া নিয়ে, তরোয়াল নিয়ে পালিয়ে গেল।

পথে যেতে যেতে বনের মধ্যে যে শোনে একটা গর্ত থেকে কেউ যেন কাঁদছে। টুবান গর্তের কাছে গিয়ে দ্যাখে এক দৈত্য তার মধ্যে পড়ে গিয়েছে। এতই গভীর গর্ত যে দৈত্য হয়েও সে উঠতে পারছে না। হাতি ধরবার ফাঁদ পেতেছে গ্রামের লোক, তাতে দৈত্য বেচারি ধরা পড়েছে। গ্রামের লোক তাকে এখনও দেখতে পায়নি তাই। দেখতে পেলেই তো গরম জল ঢেলে মেরে ফেলবে। তাই সে কাঁদছে।

টুবানের খুব দয়া। সে বললে,—দাঁড়াও দৈত্য, তুমি কেঁদো না। আমি আমার পাগড়িটা খুলে ঝুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি সেটা ধরে উঠে এসো।

তারপর পাগড়িটা খানিকটা ঝুলিয়ে দিয়ে টুবান ফের বললে,—কিন্তু তুমি যদি উঠে এসেই আমাকে মেরে ফ্যালো?

দৈত্য বললে,—উপকারী বন্ধুদের দত্যিদানবে কখনও ক্ষতি করে না। জীবজন্তুও না। ওই বদস্বভাব কেবল মানুষের। তুমি ভয় পেয়ো না। আমি তোমার চিরজীবনের বন্ধু হয়ে থাকব।

তখন টুবান নির্ভয়ে দৈত্যকে ওপরে তুলে আনল। উঠে এসে দৈত্য বললে,—টুবান,

তুমি কোথায় যাচ্ছ?

টুলুরাজকুমারীকে বিয়ে করতে, আর আমার দাদাদের উদ্ধার করতে।

দৈত্য বললে,—ও বাবা! টুলুরাজকুমারীর সৎমা তো একজন দানবী। সে অনেক কায়দা জানে—তার জন্যেই তো রাজকুমারীর বিয়ে হয় না আর রাজপুত্রেরা সবাই গায়েব হয়ে যায়।

—গায়েব হয়ে যায়? তার মানে?

—তার মানে, তাদের আর কেউ খুঁজে পায় না।

—আমার দাদারাও গায়েব হয়ে গেছে?

—তুমিও যাবে, যদি ওই প্রাসাদে ঢোকো।

—কিন্তু আমাকে তো যেতেই হবে।

—তাহলে চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

—তোমাকে কী করে নিয়ে যাব?

—কেন, তোমার পকেটে করে। আমি ছোট্ট এতটুকুনি হয়ে যেতে পারি।

—তুমি কি ইচ্ছারূপী? পাখি, পিঁপড়ে সব হতে পারো?

—তাই যদি পারতুম তাহলে তো পাখি হয়ে বেরিয়ে আসতুম গর্ত থেকে, তাহলে তো পিঁপড়ে হয়ে হেঁটেই পালিয়ে আসতুম গর্তের দেওয়াল বেয়ে। না, আমি রূপ বদল করতে পারি না। বড় দৈত্য থেকে, শুধু কুচো দৈত্য হতে পারি। কড়ে আঙুলের সমান।

—তবে তাই হও। তোমাকে দেখে কেমন ভয় ভয় করে। দৈত্য অমনি কড়ে-আংলা হয়ে টুবানের পকেটে ঢুকে বসল।

কড়ে-আংলা বলল,—প্রথমে জেনে নিতে হবে ঘটনাটা কী। চলো যাই প্যাঁচার বাড়ি।

বনেই থাকত হুতোম প্যাঁচা। তখন দিনের বেলা। সে ঘুমোচ্ছিল। কড়ে-আংলা খোঁচা মেরে তার ঘুম ভাঙিয়েই একটা গিরগিটি খেতে দিল। প্যাঁচামশাই গিরগিরিটা খেলে ভালো করে চোখ খুললেন।

—কী ব্যাপার? কী চাই?

টুলুরাজকুমারীর ব্যাপার কী, সেটা জানতে চাই। —বলতে বলতেই একটা ইঁদুর এগিয়ে দেয় কড়ে-আংলা।

ইঁদুর পেয়ে প্রীত হয়ে প্যাঁচামশাই বললেন,—সে অতি জটিল বিষয়। ওখানে যে যায়, সে যায়।

—তা তো জানি। কিন্তু কেন যায়?

—সৎমার ম্যাজিকে।

—কী ভাবে কাটানো যাবে সেই ম্যাজিক?

—আমি পারি। আমি সব জটিল বিষয়কে সরল করে ফেলতে পারি।—টুবান বলে।

বাঃ রে ছেলে এই তো চাই। —খুশি হয়ে হুতোম প্যাঁচা গড়গড় করে টুলুরাজ্যের পুরো কাহিনিটা ওদের শুনিয়ে দেয়।

—সৎমার ইচ্ছে তার ভাইপোর সঙ্গে টুলুরাজকুমারীর বিয়ে দেবে। কিন্তু সে ভাইপো

দানব, তার স্বভাবচরিত্তির ভালো না, বড়ই হিংস্র। তাই টুলুরাজার মত নেই এই বিয়েতে। এখন সৎমা কায়দা করে সব রাজপুত্তরদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দিচ্ছেন, তারপরে তাদের ফুলগাছ করে বাগানে রেখে দিচ্ছেন। এই হচ্ছে কথা।

—তার মানে উবান-বুবানও ফুলগাছ? তাতে উবানফুল আর বুবানফুল ফুটছে? কেমন দেখতে উবানফুল, বুবানফুল?

প্যাঁচা বললে,—দূর! উবানফুল বুবানফুল কেন হবে। ওরা তো দুজনেই হয়েছে গাঁদা ফুলের গাছ। উবান হয়েছে মোটাসোটা হলুদ গাঁদা, আর বুবান হয়েছে সুশ্রী রক্তচন্দন গাঁদা।

শুনে টুবানের মনে খুব দুঃখু। হবি তো হ, গোলাপ, পদ্ম, রজনীগন্ধা কিংবা কদমফুল, বেলফুল, কেয়াফুল—এসব না হয়ে কিনা গাঁদাফুল?

প্যাঁচা বললে,—শোনো, সমুদ্রতীরে আছে বুড়ো কাছিম। সেই বলে দিতে পারবে সৎমা-দত্যির ম্যাজিক কী করে কাটাতে হয়? কাছিমের তো অনেক বয়েস, তার আরও অনেক বেশি জ্ঞান। তোমরা তার কাছে যাও।

টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে টুবানরা পৌঁছোল সমুদ্রতীরে। তারপর ডাক দিল,—কাছিম দাদু! ও কাছিম দাদু!

কাছিমবুড়ো কাছেই রোদ পোয়াচ্ছিল একটা পাথরের পাশে বালির বেলায়। খুশি হয়ে বলল,—আমাকে কোন নাতিটা ডাকে রে?

—আমি টুবান।

—টুবান তোর কী চাই?

—আমার দুই দাদা চাই, আমার টুলুরাজকুমারী বউ চাই।

—তাহলে শোন। উবান যখন প্রাসাদতোরণে গেল, দাসী তাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে যত্ন করে সবুজ এক গ্লাস শরবত দিয়েছিল। সেই সবুজ শরবত খেয়ে ওর গায়ের সব শক্তি চলে গেল। ভিতরের ঘরে ওকে নিয়ে যে-চৌকিতে বসালো, তার চারদিকে আছে চারটে কাঠের বাঁদর! শরবত খেয়ে তো উবান ঝিমিয়ে পড়েছে। ঘুম ঘুম। ঝিম ঝিম। তখন কী হল? চারটের কলের বাঁদর এসে উবানের মাথায় এইসা গাট্টা মারল উবান অজ্ঞান হয়ে। ব্যস! সৎমা তাকে মন্ত্র পড়ে গাঁদাফুলের গাছ বানিয়ে দিয়েছে।

—আর বুবান? বুবানের কী হল?

—বুবানেরও ওই একই কাণ্ড।

—তাহলে আমার কী হবে?

—তোমারও তাই হবে, সব রাজপুত্তুরদের যা হয়েছে, যদি সবুজ শরবত খাও।

—যদি সবুজ শরবত না খাই?

—তাহলেও বাঁদররা তোমাকে পেটাবে। তুমি একা চারজনের সঙ্গে পেরে উঠবে না। বরং একফালি কলা নিয়ে যেও। বাঁদররা সেটা নিয়ে চলে যাবে।

—বাঃ, তবে তো ভালো। হয়েই গেল।

—না হয়ে গেল না। তারপর আছে সাতটা দরজা। দাসী তিনটে পার করে দেবে। বাকি চারটে তোমাকেই খুলতে হবে দাদাভাই।

—বেশ তো, খুলব।

—সেই তো বিপদ। খুললেই বিপদ। না খুললেও উপায় নেই।

—কীসের বিপদ কাছিম দাদু?

—প্রথমটা খুললেই একটা চিতাবাঘ লাফিয়ে আসবে। তোমাকে খেয়ে ফেলতে। অবশ্য যদি একটা বড় টুকরো মাংস নিয়ে যাও, সেইটে ওকে ছুঁড়ে দিলে মাংসটা নিয়েই সে চলে যাবে।

—বাঃ, এই তো হয়ে গেল।

—উহুঁ! বুড়ো কাছিম তার লম্বা গলাটা দোলায়; তার পরের দরজাটা যেই খুলবে, অমনি একটা বীভৎস ডালকুত্তা লাফিয়ে পড়বে। তাকে দেবার জন্যে একটা শক্ত মোটাসোটা হাড় নিয়ে যেতে হবে।

—তার পরেরটায়?

—ছ'নম্বর দরজা পাহারা দেয় একটা সাপ। সে ফোঁস করে ফণা তুলে তেড়ে আসবে। তার গায়ে মন্ত্রপড়া কর্পূর ছুঁড়ে দিতে হবে।

—মন্ত্রপড়া কর্পূর?—টুবান বলে : ও বাবা! সে আবার কোনখানে পাব?

—বেদেরা দিতে পারবে। ওই জঙ্গলের কিনারে বেদেদের তাবু পড়েছে। তাদের কছে গেলেই পাবে।

—আর সাত নম্বর?

—সাত নম্বর দরজা খুললে দেখবে সুগন্ধে ভরা একটা অপূর্ব শোবার ঘর। তুমি যেই ঢুকবে এক পরমাসুন্দরী রাজকুমারী এসে তোমাকে পান সুপুরি দিয়ে, গদিতে বসাবে। নিজেও পাশে বসবে। বলবে, সেই টুলুরাজকন্যে। তুমি তখন যেন তাকেই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বোসো না।

—কেন দাদু, কেন দেব না?

—সে যে দাসী। তুমি তাকে পরীক্ষা করবে। বলবে,—পান খেয়ে পিক ফেলবে কোথায়? পিকদানি কই? তক্ষুনি সেই মেয়ে দৌড়ে গিয়ে পিকদানি এসে দেবে। তুমি তখন বলবে, না বাপু তুমি তো রাজকুমারী নও। তুমি দাসী। সে তখন ছুটে পালিয়ে যাবে।

—তারপরে আমি কী করব, দাদু?

—তুমি উঠে পায়চারি করতে করতে বলবে,—রাজকন্যের বাড়িতে এলাম, রাজকন্যেরই দেখা নেই।—এ কী রে বাবা? তখন আরও সুন্দরী একটি রাজকন্যেবেশী মেয়ে আসবে ঘরে। এসে গদিতে তোমার পাশে বসবে। তুমি কিন্তু তাকেও বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বোসো না।

—তবে?

—সে-ও যে দাসী! তুমি তাকে বলবে,—রাজকন্যের শোবার ঘরে এত ধুলো? ঝাঁটপাট পড়ে না নাকি? বললেই সে উঠে গিয়ে দৌড়ে একটা ঝাঁটা নিয়ে এসে ঝাঁট দিতে শুরু করবে। তুমি তখন বলবে,—যাও তো দেখি, তোমার মনিবানিকে ডেকে আনো তো, আমি তাকেই বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছি। —বললেই সে ছুটে পালাবে। ঘরে এবার

আসবে আর এক পরমাসুন্দরী। এটি কিন্তু সৎমা নিজে। দেখে বুঝতেই পারবে না—সে রানি, না রাজকুমারী। সে মালা হাতে যেই এগিয়ে আসবে—তুমি ঝট করে নীচে হয়ে তাকে প্রণাম করে ফেলে বলবে,—প্রণাম হই ছোট রানিমা, আমি আপনার জামাই। সাত দুয়ার পার হয়েছি, এবার ওই মালাটি আমারই। আর এই মালাটি আপনার। বলেই তার পায়ে এই মণিরত্নের শেকলটা পরিয়ে দেবে।

বলে বুড়ো কাছিম তার খোলোর নীচে থেকে অপূর্ব একট শেকল বের করল। সেই শেকলটা সমুদ্রের মণিরত্ন দিয়ে তৈরি। তা থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। বুড়ো কাছিম বলল,—এই শেকলে যে বাঁধা পড়ে সে চিরকালের জন্য দাসী হয়ে যায়। তুমি বলবে, রানিমা এবার রাজকন্যেকে ডেকে আনুন। আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করুন। রাজ্যসুদ্ধু নেমন্তন্ন করুন। পাশের রাজ্যের লোকদেরও নেমন্তন্ন করুন। আর বাগানের গাছগুলোকে সব মুক্ত করে দিন। নইলে এ মণির শেকল কেউটে সাপ হয়ে কিন্তু আপনাকে ছোবল মারবে!

শেকল পরে রানি হাঁটবেন কেমন করে?—টুবান অবাক।

—সে কি যেমন তেমন শেকল? নূপুরের মতন জড়িয়ে থাকবে দু-পায়ে। অদৃশ্য বাঁধনে বাঁধা থাকবেন রানিমা।

—তারপরে? তারপরে কী হবে দাদু?

—তারপরে রানিমা টুলুরাজকন্যেকে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে মালাবদল করিয়ে দেবেন। তোমার ভাইদের মুক্তি দেবেন। রাজ্যে রাজ্যে ট্যাঁড়া পিটিয়ে নেমন্তন্ন করবেন। তুমি যা চাও তাই পাবে।

—কাছিম দাদু, কাছিম দাদু, তোমার এত দয়া? তুমি আমাকে সব বলে দিলে! আমি তোমাকে কী দেব, দাদু?

—আমাকে আবার কী দিবি? আমাকে যা দেবার সে তো আগেই দিয়েছিস। টুবান! তুই তো আমাকে দাদু ডেকেছিস, আমার নাতি হয়েছিস। বউ নিয়ে ফেরার সময়ে নাতবউয়ের মুখখানা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাস দাদাভাই। তাহলেই হবে!

ব্যস। তারপর কড়ে-আংলা আর টুবান ছুটল। টুলুরাজ্যের কসাই মশাইকে দশটা সোনার মোহর দিয়ে বলল,—ম-স্ত বড় মাংসের টুকরো চাই চিতাবাঘের জন্যে। আর খুউ...ব শক্ত হাড় চাই ডালকুত্তার জন্যে।

কসাই মশাই তাড়াতাড়ি সেসব জুগিয়ে দিলেন। এরপর টুবান ফলওয়ালাকে দশটা সোনার মোহর দিয়ে বললে,—এককাঁদি কলা চাই দাদা—বাঁদরদের জন্যে।

ফলওয়ালাদাদা কলা দিলেন।

ওদিকে দৈত্য চলে গেল দূরের জঙ্গলের কিনারে, বেদেদের তাঁবুতে। দশটা সোনার মোহরের বদলে মন্ত্রপড়া কর্পূর চাই বেদেনিদিদি। বলতেই বেদেনিদিদি মন্ত্রপড়া কর্পূরের কৌটো মানুষরূপী দৈত্যের হাতে তুলে দিলেন।

কলা, মাংস, হাড়, কর্পূর, মণিমালা আর কড়ে-আংলাকে তার পোশাকের নীচে লুকিয়ে

নিয়ে টুবান চলল।

আর রাজকন্যেকে দেবার জন্যে কী নিল টুবান? তার জন্যে নিল প্রাণভরা ভালোবাসা আর চোখভরা স্বপ্ন।

এক সময় টুবান গিয়ে টুলুরাজপ্রাসাদে ঘণ্টা নাড়ল।

দাসী এসে টুবানকে নিয়ে গেল বৈঠকখানায়। সবুজ শরবত এনে দিল। টুবান শরবতটা ফুলদানিতে ঢেলে দিল। অমনি ফুলগুলো সব ঢলে পড়ল ঘুমে।

দাসী এসে ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে গদিতে বসাল। টুবান বসে মাথায় ওপরে কলার কাঁদিটা ধরে রইল। অমনি বাঁদরগুলো এসে কলার কাঁদিটা নিয়ে পালিয়ে গেল। টুবান দেখল তারা মনের আনন্দে খোসা ছাড়িয়ে কলা খাচ্ছে।

খানিক পরে দাসী এসে দ্যাখে টুবান চোখ খুলে বসে আছে। দাসী তখন বললে,—আপনাকে সপ্ততোরণ পেরিয়ে রাজকুমারীর কাছে যেতে হবে। তিনটে দরজা আমিই খুলে দেব। বাকি চারটে আপনি খুলে নেবেন।

তিনটে দরজা একে একে খুলে গেল। বেতের, বাঁশের, আর কাঠের। তখন চারটে চাবি টুবানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে দাসী চলে গেল। টুবান লোহার দরজার হাতল ঘোরাতেই হালুম করে বাঘ যেমনি লাফ মেরেছে, চট করে কড়ে-আংলা মাংসের ডেলাটা ছুঁড়ে দিয়েছে বাঘের দিকে।

বাঘ মাংস মুখে নিয়ে দরজা ছেড়ে চলে গেল।

তারপরে টুবান আবার দরজার হাতল ঘোরাতেই খ্যাঁক করে ডালকুত্তা যেমনি তেড়ে এসেছে, কড়ে-আংলা ঝটপট হাড়টি ছুঁড়ে দিয়েছে।

কুকুর হাড় মুখে নিয়ে দোর ছেড়ে চলে গেল।

রুপোর দরজা টুবান খুলতেই ফোঁস করে উঠেছে রাজ-গোখরো! মন্ত্রপড়া কর্পূরটি যেই ছুঁড়ে দিয়েছে কড়ে-আংলা, অমনি সাপ কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আর শুধু সোনার দরজাটি বাকি।

হাতল ঘুরিয়ে টুবান দ্যাখে অপরূপ এক ঘর! আহা, কী নীল আর রুপোলি রঙের দেওয়াল! নীল রেশমের আর রুপোলি রঙের আসবাব। ঘরে চন্দনের সুবাস।

টুবান ঘরে ঢুকে গদিতে বসল। পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যে এসে এক মুখ হেসে, তাকে পানসুপুরি দিল সোনার বাটা থেকে। বলল,—স্বাগত আমার রাজপুরীতে।

টুবান বলল,—পিক ফেলবে, পিকদানি কই?

বলতেই সে ছুটে গিয়ে রুপোর পিকদানি নিয়ে এল।

পিক ফেলে টুবান বললে,—তুমি তো বাপু রাজকন্যে নও? রাজকন্যেকে ডাকো!

সে লজ্জায় পালিয়ে গেল।

তারপর এল দু-নম্বর রাজকন্যে।

তাকে দেখেই টুবান বলল,—ঘরে এত ধুলো কেন?

অমনি সে ঝাড়ু লাগাতে শুরু করে দিল।

টুবান হেসে বললে,—হয়েছে! এবারে যাও রাজকন্যেকে ডাকো।

মেয়েটা লজ্জায় অমনি দৌড়ে পালাল।

গোলাপফুলের মালা হাতে এবার এলেন চোখ ঝলসানো এক রূপসী, তাঁর সর্বাঙ্গে গোলাপফুলের গন্ধ। তাকালে আর চোখ ফেরে না। আহা, গায়ের রংটিও গোলাপফুলের, মুখের লাবণ্যও গোলাপফুলের! কিন্তু টুবান তাঁকে রাজকন্যে বলে ভুল করলে না। সে টিপ করে সুন্দরীকে এক পেন্নাম ঠুকে দিয়ে বললে,—ছোট রানিমা, আমি আপনার জামাই টুবান। সাত দুয়োর পার হয়েছি, ওই মালাটি আমারই। আর এই মালাটি আপনার।

বলেই তাঁর পায়ে মণিমালার শেকলটি পরিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে শেকল একজোড়া মণির নূপুর হয়ে গেল। রানিমাও টুবানের বশ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে মন্দ ভাবই রইল না।

রানিমা খুশি মনেই ওদের বিয়ের বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। বাগানের সব গাছকেই আবার মানুষ করে দিলেন। রাজ্যে রাজ্যে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে লোক নেমন্তন্ন করতে লাগলেন। উৎসব জমে গেল দুই রাজ্যে হইহই। বিয়ে বাড়ি।

ওই যে, উবান বুবান আর টুবান রাজকন্যেকে নিয়ে বুড়ো কাছিমের কাছে যাচ্ছে—ওকেই আগে বউ দেখানোর কথা কি না?

আর বর-বউয়ের সঙ্গে আহ্লাদ করে বাজনা বাজাতে বাজাতে রথ, ঘোড়া, হাতি নিয়ে শোভাযাত্রা করে যারা আসছে ওরা কারা?

ওরা সেইসব অভিশপ্ত রাজপুত্তুর—যাদের টুবান মুক্তি দিয়েছে। ওরা সবাই এখন টুবানের চিরবন্ধু।

আর সেই যে দৈত্য কড়ে-আংলা! তার আহ্লাদ দ্যাখে কে? সে এখন আবার দৈত্যরূপী। সেই তো আগে আগে মস্ত মোটা ভেঁপুদুটো বাজাতে বাজাতে মার্চ করতে করতে আসছে। সে এখন উবান বুবান টুবানের চার নম্বর ভাই, দুতান।

দুতানের গল্পটা পরের বার।

ছোট্ট বুবুল আর পরিরা

ছোট্ট বুবুলের মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, ছোট্ট বুবুলের এত বড় পৃথিবীতে কেউ নেই। একটা গাছের তলায় তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল এক চাষা। চাষার অনেক হাঁস-মুরগি ছিল, চাষা ভাবল ভালোই হবে ছেলেটা আমার হাঁস-মুরগি চরাবে। বুবুল সেই থেকে চাষার হাঁস-মুরগি চরায়। চাষার হাঁস-মুরগিদের এক বনবিড়ালে ধরে না। হাঁস-মুরগি বিক্রি করে চাষা এবার ছাগল ভেড়া কিনল। বুবুল এখন ছাগল ভেড়া চরায় আর (রাখাল ছেলের যেমনটি করা নিয়ে তেমনিই) গাছের নীচে বসে বাঁশি বাজায় সারাদিন। চাষার দুই ছেলে আছে, তারা বুবুলকে মোটেই দেখতে পারে না, ভাবে, 'এই ছেলেটা কোথা থেকে এসে জুড়ে বসল আমাদের বাড়িতে?' চাষিবউ বুবুলকে আদর করে গরম ভাত বেড়ে দেয় খেতে, নরম মাদুর পেতে দেয় শুতে কেন না বুবুলের মুখখানা যেমন মিষ্টি, ওর স্বভাবটিও তেমনি মিষ্টি। যে ওকে দেখে সেই তক্ষুনি ভালোবাসে। চাষার ছেলে দুটো দুষ্টু দুরন্ত। বাবা-মা-র কথা শোনে না। না খাটে তারা মাঠে, না যায় পাঠশালায়। সারাদিন এর বাগানে তার বাগানে দুরন্তপনা করে বেড়ায়। তাদের মাথায় কেবল দুষ্টু বুদ্ধি—তাই তাদের কেউ ভালোবাসে না। একদিন বুবুল বাঁশি বাজাচ্ছে, ভেড়া ছাগলরা মাঠে চরছে, আর বনের পাখিরা এসে বুবুলের বাঁশি শুনছে। এমন সময়ে একটা কেঁদো মতন নেকড়ে বাঘ এসে বললে, 'বুবুল তোকে খাই না তোর ছাগল খাই?' পাখিরা কিচিরমিচির করে বললে 'ছাগল খাও' কিন্তু ছোট্ট বুবুল বললে, 'দাঁড়াও, আমি চাষি বাবাকে জিগ্যেস করে আসি তুমি কাকে খাবে।' পথে চাষির দুই ছেলের সঙ্গে দেখা। তারা বললে, 'কিরে

বুবুল, এখুনি ফিরছিস যে। ছাগল-ভেড়া কই?' বুবুল বললে, 'আমি বাড়িতে যাচ্ছি চাষি বাবাকে জিগ্যেস করতে নেকড়ে কাকে খাবে, আমাকে না ছাগলকে।' অমনি চাষির ছেলেরা এক সঙ্গে বলে উঠলে, 'এ আর জিগ্যেস করার কী আছে? আমাদের বললে, আমরা বলতুম 'ছাগল খেয়ো না, আমাকে খাও। তোমাকেই তো ওর খাওয়া ভালো। ছাগল ভেড়া কত দামি জিনিস!'

তখন বুবুল ফেরত গেল। নেকড়ে বাঘ তখনও বসে আছে, বুবুল বললে, 'নেকড়ে ভাই নেকড়ে ভাই খিদে পেয়েছে খাবার চাই? ছাগল ভেড়া ছেড়ে দাও আমি এসেছি, আমায় খাও' শুনে নেকড়ে বাঘও অবাক। 'চাষি তাই বলে দিলে?' বুবুল বললে, 'দাদারা তো তাই বলে দিলে। ছাগল ভেড়া কত দামি জিনিস। ওদের খেও না আমার কোনও দাম নেই। আমায় খাওয়াই ভালো। শুনে পাখিরা কিচিরমিচির করে কেঁদে উঠল। এমনি কি নেকড়ে বাঘের মনেও কষ্ট হল। সে বললে, 'আজ খাওয়া থাকুক। আজ আমি বরং তোমাকে ধরে নিয়ে যাই। তুমি আগে একটু মোটা হও, তারপর খাব।' বুবুল তখন নেকড়ে বাঘের পিছু পিছু বনের দিকে চলল। নেকড়ে বাঘের ছিল চারটি ছানা। তারা তো মাকে ফিরতে দেখেই বললে, 'মা খিদে পেয়েছে, খাবার দাও।' বুবুল বললে, 'আমাকে খাও তোমরা, আমার দাদারা তাই বলেছে।'

নেকড়ে বাঘ, যে নেকড়ে বাঘ, এত নিষ্ঠুর প্রাণী, চাষির ছেলেদের নিষ্ঠুর কথা শুনে তার মনেও দয়ামায়া হল। সে ভাবল, 'এত সুন্দর সরল শিশুটিকে কী করে খাই? এ তো আমার ছানাগুলোর মতোই দুধের বাচ্চা। থাক। অন্য কিছু জন্তু ধরে আনি গে।' সে বলল, 'তোমরা অপেক্ষা করো, একে যেন খেয়ো না, এ তোমাদের দাদা হয়। আমি অন্য খাবার এনে দিচ্ছি।' বলে, সে অন্য জন্তু ধরতে গেল। বুবুল বসল বাঁশি বাজাতে। বাঁশির সুরে জঙ্গলের সব পাখপাখালি এসে নেকড়ের বাসার কাছ ভিড় করল। নেকড়ে বাঘ ফিরে এলো দুটো মুরগি নিয়ে। সেই দুটো সে সবাইকে রান্না করে খেতে দিল। বুবুল সেই থেকে নেকড়ে বাঘের বাসায় থাকে, তার ছানাদের সঙ্গে খেলা করে, নেকড়ে মায়ের দুধ খায়, আর আপনমনে সে বাঁশি বাজায়। বুবুলের বনজঙ্গলে থাকতে খুব ভালো লাগে। কী সুন্দর ঠান্ডা সবুজ রঙের অন্ধকার সেখানে, রোদ্দুর নেই, গরম নেই। শ্যাওলার বিছানা-পাতা ঠান্ডা গুহার মধ্যে সে ঘুমায়, ঝরনার জলে চান করে, ফুলমূল খায়। মাঝে-মাঝে নেকড়ে-মা হাঁসটা, মুরগিটা ধরে এনে রান্না করে দেয়। বুবুল দিব্যি আছে।

একদিন রাত্রে ফুটফুট করছে বন-জ্যোচ্ছনা! নেকড়ে-মা চরায় চরায় বেরিয়েছে। বাচ্চারা আছে। বুবুলের ইচ্ছে করল ঝরনার ধারে গিয়ে বাঁশি বাজাতে। সে আপনমনে বাঁশি বাজাচ্ছে আর যত রাত হচ্ছে পাখির দল এসে ঝাঁক বেঁধে ঝরনার ধারে বসছে। হঠাৎ বুবুল দেখলে, শুধু পাখি তো নয়, পরিও। এক ঝাঁক পরি এসেছে। বাঁশির সুরে তাল মিলিয়ে পরিরা নাচতে শুরু করে দিলে। ধবধবে তাদের ডানাগুলো, যেন রাজহংসের পাখনা, দুধারে মেলে দিয়ে কী চমৎকার নাচছে পরিরা। ক্রমে রাত গভীর হল, নেকড়ে-

মার ঘরে ফিরে আসার সময় হল, বুবুলও বাঁশি বাজানো বন্ধ করল। রাতপাখিরা হুউশ্ শব্দ করে উঠে গেল। আর পরির দলটি আকাশে ডানা মেলে দিয়ে যেন এক লহমায় উবে গেল। নেকড়ে-মা যেই ফিরেছে অমনি তার ছানারা তাকে বললে, 'মা মা, আজকে না ঝরনাতলায় পরির নাচ হয়েছিল। কী সুন্দর!' মা-নেকড়ে শুনে অবাক! সে তো এই বনেই জন্মেছে, বড় হয়েছে, কখনও পরি দ্যাখেনি। বুবুলের বাঁশির সুরেই আকাশ থেকে পরিরা নেমে এসেছিল, মা-নেকড়ে বুঝতে পারলে।

বুবুল রোজ রাত্রে বাঁশি বাজাতে লাগল। শুক্লপক্ষ। চাঁদ রোজ বড় হচ্ছে, আর জ্যোৎস্না কেবলই বাড়ছে। চাঁদ বাড়তে বাড়তে একদিন পূর্ণিমা হয়ে গেল। বুবুল ঝরনার ধারে চলে গিয়ে বাঁশি বাজাতে থাকে, যদি আবার পরির দল নামে? বাজাতে বাজাতে বাজাতে বুবুল বাঁশির সুরের মধ্যে ডুবে গেছে। হঠাৎ চোখ মেলে দেখে তার সামনে এক গুচ্ছ সাদা পদ্মফুল পড়ে আছে। বুবুল যেই ফুলগুলো হাতে তুলে নিয়েছে, অমনি ফুলগুলো একঝাঁক সাদা প্রজাপতি হয়ে ওর হাত থেকে উড়ে গেল। বুবুল প্রজাপতির ঝাঁকের পেছু পেছু ছুটল। প্রজাপতিরা উড়তে উড়তে একটা গোলাপ বাগানে ঢুকে পড়ল। বুবুলও সেখানে ঢুকল, ঢুকে দেখে প্রজাপতির ঝাঁক কখন হাওয়ায় মিশে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে এমন গোলাপ বাগিচা ছিল? কই, বুবুল আগে তো কখনও দ্যাখিনি? কী সুন্দর সাজানো বাগান, কত ফোয়ারা, তাতে গোলাপজল উথলে উঠছে। একটা মার্বেলের বেঞ্চিতে বসে পড়ে সে। বুবুল বাঁশি বাজাতে বাজাতে নূপুরের শব্দ শুনতে পেয়ে পেছন ফিরে দেখে একদল পরি এসে পড়েছে। পরিরা নাচতে নাচতে এ-ওর গায়ে গোলাপজল ছুঁড়ে দিচ্ছে। তাদের ডানায় ঝুমুর ঝুমুর শব্দ হচ্ছে যেন নূপুর বাজছে। পরিদের একজন রানি আছেন, তাঁর মাথায় একটি গোলাপ ফুলের মালা মুকুটের মতো জড়ানো, পরিরানিকে দেখলেই রানি বলে ঠিক চেনা যায়। বুবুল পায়ে পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরিরানি বললেন, 'এই যে বুবুল! কী সুন্দর তোমার বাঁশি, শুনলেই মন কেমন করে ওঠে। বাঁশির সুরে তুমি কাকে যেন ডাকো, অস্থির হয়ে কাকে এত ডাকো বলো তো?' বুবুল একটু চুপ করে থেকে বললে, 'বাঁশি বাজিয়ে আমি আমার মাকেই ডাকি। আমার ছেলেবেলার মাকে, মার মুখটা দেখবার জন্যে আমার খুব মন কেমন করে। চাষি-মা, নেকড়ে-মা, এদের মধ্যে তো আমি মাকেই খুঁজি। আর পরিমা, তোমার মধ্যেও।' পরিরানি বুবুলকে কোলে টেনে নিয়ে বললে, 'তুমি দেখবে তোমার মাকে? কিন্তু মাকে চোখে একবার দেখতে পেলে তারপর তুমি আর মানুষ থাকতে পারবে না? তোমার মা স্বর্গে গেছেন। স্বর্গের মানুষদের দেখতে পাবার পরে মানুষ আর মানুষ থাকে না।'

বুবুল বললে, 'ভারি তো! মানুষ থেকে আমার কী হবে? এই জঙ্গলে তো কত প্রাণী আছে, একজনও মানুষ নেই আমি ছাড়া। মানুষ দাদারা তো আমাকে নেকড়ে বাঘের জলখাবার হতে পাঠিয়ে দিয়েছিল, নেকড়ে-মা-ই তো দয়া করে আমাকে খায়নি। তুমিও মানুষ নও, পাখিরাও মানুষ নয়, পাখিরা সবাই আমার বন্ধু। যা হয় হবে, আমি মাকে একবার চোখে দেখতে চাই। তারপর বরং তুমি আমাকে একটা পাখি করে দিও।' পরিরানি বললে, 'তথাস্তু'— মানে, তাই হোক। তখন বুবুল হঠাৎ দেখল—তার মা, লাল ডুরে শাড়িটি

পরে কাঁখে জলের কলসি নিয়ে বনপথে যাচ্ছেন। চান করে, ভিজে চুল পিঠে খোলা। দূরে ওদের গ্রামের ঘরবাড়ি দেখা যায়। কোথায় গেল গোলাপ বাগিচা, কোথায় গেল পরির দল, বুবুল ছুটে গেল, 'মা! মা!' মা এক গাল হেসে অমনি কলসি নামিয়ে রেখে ছোট্ট বুবুলকে দুহাতে জড়িয়ে কোলে তুলে নিলেন আর অনেক আদর করলেন, 'আমার সোনার বুবুলবাবু, বুব্‌লাইধন, বুবুল, বুবুল, বুলবুলি।' বুবুল প্রাণ ভরে মা-র গন্ধ নিল, মা-র নরম কোলে বসে মা-র কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল আরামে, ঠিক সেই খুব ছোটবেলার মতো—আর তারপর বুবুল এক মুহূর্তের মধ্যে একটা বুলবুলি পাখি হয়ে উড়ে গেল। বুলবুলি পাখি হয়েও ছোট্ট বুবুলের বাঁশি বাজানোর নেশা গেল না। তাই তো বাঁশির মতো মিষ্টি সুরেলা ডাক বুলবুলি পাখির গলায়। বুলবুলি পাখি গান গেয়েও কেবলই তার হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজে বেড়ায়।

বুলবুলি পাখি তো আসলে ছোট্ট বুবুলই। তাকে তোমরা যে-কোনও কোথাও দেখলেই ঠিক চিনতে পারবে।

মনময়ূরীর গল্প

মা, মনময়ূরীর গল্পটা বলো না।

তবে শোন—রাজারানির একটিমাত্র মেয়ে। বড্ডই সে আদুরি। বড্ড আহ্লাদি। সবাই তাকে এত ভালোবাসে বলে, সে-ও সব্বাইকে ভালোবাসে। রোজ সকালে মনময়ূরীর আইমা যখন ইস্কুলে নিয়ে যায়, মনময়ূরী সারাটা রাস্তা ভাব জমাতে জমাতে যায়। বাগানের কদম গাছকে ডেকে বলে—'ও কদম গাছ গুড মর্নিং, আমি ইস্কুলে চললুম। তুমি সব ফুল ফুটিয়ে দিয়ো না যেন।' বাগানের ময়ূরদের ডেকে বলবে—'ময়ূর ও ময়ূর, আমি চলে যাচ্ছি ইস্কুলে, সেই বিকেল বেলাতে দেখা হবে। আমি না ফিরে এলে নেচো না যেন! মেঘ উঠলেও না! ঠিক তো! পুকুরপাড়ের ব্যাং বাবাজিকেও বলবে—'ব্যাংবাবাজি, দু-চারটে লাফ মারো তো দেখি? লংজাম্প না হাইজ্যাম্প কোনটা তুমি ভালো পারো, দেখাও তো। লালমাছেদের সঙ্গেও তার কথা বলা চাই। 'লালমাছুয়া, লালমাছুয়া মুড়ির দানা চাই?' মাছেরা বলে—'মনময়ূরী যা দেবে তাই সোনামুখে খাই'! মনময়ূরী যেতে যেতে কাঠবিড়ালকেও ডেকে ঠাট্টা করে—'দেখি দেখি, কত বাদাম জমালে তুমি তোমার কোটরের মধ্যে? শীত আসতে তো এখনও অনেক দেরি, আমাকে দুটো ভালো বাদাম দাও না।'

ওকে দেখতে পেয়ে খরগোশ গর্ত থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে—মনময়ূরী তাকেও বলে—

'আয় আয় খরগোশছানা
কোলে উঠবি আয়—

তোদের ফেলে ময়ময়ূরী
ইস্কুলেতে যায়!'

মনময়ূরীকে ভালোবাসে না কে? এমনকী আকাশে মেঘ উঠলে, ময়ময়ূরীর যে তার সঙ্গেও কথা বলা চাই!

'মেঘ মেঘানি মেঘের রানি
বৃষ্টি এনেছ
জল-ঝমঝম গা-ছমছম
বিজলি হেনেছ
মেঘ মেঘানি মেঘের রানি
ভয় দেখিয়ো না
দোহাই তোমায় লক্ষ্মী মেয়ে
বান ডাকিয়ো না!'

ভ্রমর-ভ্রমরী ফুলে ফুলে দুলে দুলে গান গেয়ে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে—মনময়ূরী তাদের কখন বলবে—

'ও ভোমরা ও ভোমরা
একটু মধু দে না।'

ভ্রমর-ভ্রমরী গুনগুনিয়ে উত্তর দেবে—

'আমরা কি আর দিতে পারি?
ফুলের কাছেই নে না!'

চাঁপাফুল, গন্ধরাজ ফুল, মধুমালতী, রঙ্গন সবাই তখন মনময়ূরীকে বলবে—

'আয় আয় মনময়ূরী মধু খাবি লো?'

মনময়ূরীও হেসে হেসে বলবে—

'আমার সঙ্গে তোরা কি ইস্কুলে যাবি লো?'

এইভাবে ঠাট্টা ইয়ারকি করে সে গোটা পাড়ার সক্কলকে বন্ধু করে ফেলেছে। গুবরে পোকাকেও সে অবহেলা করে না—

'গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ গুবরে পোকাটি
আপন মনে ঘুরছ দেখো মাটির খোকাটি।'

গঙ্গাফড়িংকেও খ্যাপায়—

'তিড়িং মিড়িং গঙ্গাফড়িং
আয় তো এবার তোকেই ধরিং!'

মনময়ূরীকে গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, রোদ-বাতাস, সকলেই ভালোবাসে। হাওয়া বইলে মনময়ূরী বাতাসে চুল উড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়ার সঙ্গে গল্প করে। শীতের রোদ্দুর উঠলে মনময়ূরী ভিজে চুল শুকোতে শুকোতে রোদের কাছে ছায়ার কথা বলে। আর গ্রীষ্মের রোদে সে ছায়ার কাছে গিয়ে রোদের কথা শোনায়।

রাজরানির মনে বড় আরাম। ভগবান তাদের কত সুন্দর মেয়ে দিয়েছেন। লেখাপড়া

শিখছে, ছবি আঁকছে, নাচ, গান, অস্ত্রশিক্ষা, রান্নাবান্না, সবকিছুই ভারি সুন্দর করে শিখছে সে। রাজা ঠিক করেই রেখেছেন পাস করলেই, একশো বছর পার করলেই, মনময়ূরীকে যুবরাজকুমারী ঘোষণা করে দেবেন—সে রাজসভায় বসবে। রাজ্যশাসনের বিদ্যাও শিখতে হবে তো তাকে? রাজার পরে এ রাজ্যে তো সেই সিংহাসনে বসবে।

এদিকে বজ্রকীট নামে রাজামশাইয়ের একজন শত্রু ছিল দৈত্যপুরীতে, কবে যেন রাজা তার শিকারের লক্ষ্য হরিণটাকে মৃগয়া করে ফেলেছিলেন। সে তক্কে তক্কে ছিল রাজাকে শাস্তি দেবে। বজ্রকীট একদিন করলে কী, খপ করে মনময়ূরীকে ধরে দৈত্যপুরীতে নিয়ে পালাল। সেদিন বিকেল পার হতে চলল, বাগানসুদ্ধু পশুপাখি, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ সবাই অস্থির—

কই মনময়ূরী তো ফিরল না?
কই মনময়ূরী তো ফিরল না?
আইমা একা একা ফিরে এল কেন?
আইমা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল কেন?

রাজা অস্থির হয়ে উঠলেন। রানি আকুল হয়ে পড়লেন। ইস্কুলে মেয়ে নেই!! খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ—কোথায় গেল, মনময়ূরী, শেষে ঈগলপাখি বললে, সে দেখেছিলে বটে দৈত্যরাজ বজ্রকীট কাকে যেন ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওই ধূম্রপাহাড় পেরিয়ে। ও যে মনময়ূরী জানলে সে কি ছেড়ে দিত? নীলমাছিও বললে—সে-ও দেখেছিল বটে দৈত্যরাজ বজ্রকীট একটা নীলমাছি সেজে ইস্কুলে ঘুরঘুর করছিল। নীলমাছি কাছে যেতে ঠিক চিনতে পেরেছে, নীলমাছি না দৈত্যরাজ ছদ্মবেশে আছে, কিন্তু তার পরটা সে জানে না।

তাই তো তাই তো তাই তো?

মনময়ূরী প্রাণময়ূরী কোথায় তাকে পাই?

বনবাদাড় বাগানটাগান সব উজাড় করে উদ্‌বেগের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। রাজা বললেন, 'যে আমার মেয়েকে খুঁজে এনে দেবে, তাকেই আমার জামাই করব।'

(কেন না রূপকথায় রাজাদের ঠিক এইরকম বলা নিয়ম) শুনে তো মনের আনন্দে ভ্রমর-ভ্রমরী, নীলমাছি, লালমাছি, পাখ-পাখালিরা, খরগোশরা, কাঠবিড়ালিরা সক্কলেই বেরিয়ে পড়ল ধূম্রপাহাড়ের পথে। ফুলগাছ, ফলগাছ, লতাগুল্মরা বললে—'ভাইবোনদের কাছে খবর নিয়ো, তারা খবর দিতে পারবে।'

ধূম্রপাহাড়ের ওপারে দৈত্যপুরী। সেখানেই একটা মস্ত পুকুরের মধ্যে বিরাট মিনার আছে। সেই মিনারের চুড়োয় দৈত্যদের রাজা মনময়ূরীকে বন্দি করে রেখেছে। সে ঠিক করেছে, নিজের ছেলে দৈত্যরাজপুত্র হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। খরগোশ, কাঠবিড়ালি, ভ্রমর, মাছি, ব্যাং, টিয়াপাখি, ময়ূর, ঈগলপাখি এরা তো চলেছে। পথে চাঁপাফুলের একটি গাছকে দেখে জিগ্যেস করতে, সে বললে—'হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। ওই ওপরে ধরে নিয়ে গেছে তাকে।' মালতীলতাকে জিগ্যেস করতে সেও বললে, 'হ্যাঁ দেখেছি, আহা গো! কচি মেয়েটা।' আকাশের মেঘও বললে, 'দেখেছি। বাতাসও বললে, 'দেখেছি।' খরগোশ বললে—'তবে আটকালে না কেন।'

'আমরা কি আটকাতে পারি?'

'কেন পারো না কেন?' কাঠবিড়ালি বলে—

'আমরা তো মেঘ, বাতাস, চাঁপাফুল, আমাদের কি অত জোর আছে?'

ছোট্ট খরগোশ বললে—'জোর নেই বা কেন? মেঘ, তুমি তো বৃষ্টি নামাতে তো পারতে। বান ডাকাতে পারতে পাহাড়ি ঝরনাগুলোতে। দৈত্যরাজ পেরুতে পারত না'—

মেঘ বললে—'তাই তো, তাই তো, তাই তো?'

এবার ব্যাং বললে—'চাঁপাফুলের গাছ, তুমি তো উপুড় হয়ে দৈত্যরাজের পথ আটকাতে পারতে।'

'তাই তো, তাই তো, তাই তো?'

এবার ভোমরা বললে—'আর বাতাস, তুমি তো প্রচণ্ড ঝড় তুলে দৈত্যরাজের হাত থেকে মনময়ূরীকে উড়িয়ে নিয়ে ওর বাড়িতেই পৌঁছে দিতে পারতে। বাতাসের ক্ষমতা কি কম?'

'তাই তো, তাই তো, তাই তো?'

বাতাস লজ্জা পেল, সবাই বললে—'বলো তো আমরা এখন কী করি?' মিটিং-এ ঠিক হল, যে, মেঘ ভীষণ বিষ্টি দেবে, বাতাস প্রবল ঝড় তুলবে, দৈত্যপুরী একেবারে বেসামাল হয়ে পড়বে ঝড়জলে, সেই ফাঁকে নীলমাছি গিয়ে খবর দেবে মনময়ূরীকে যেন সে ঝড়ের মধ্যেও বারান্দায় এসে দাঁড়ায় ভয় না পেয়ে। ঈগল পাখিটি তাকে পিঠে তুলে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। বাতাস তখন ঈগলের ডানায় ঝড় দেবে না বলে কথা দিল যাতে মনময়ূরী ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছোতে পারে। তারপর যেন কথা তেমন কাজ! ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল দৈত্যপুরীতে, প্রবল মেঘ জমে অন্ধকার হয়ে গেল, দিনের বেলাতে যেন রাত্রি ঘনিয়ে এল দৈত্যপুরীর আকাশে। ভীষণ ভয় পেয়ে সবাই জানলা দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বালিয়ে রইল। নীল মাছিটি এক ফাঁকে উড়তে উড়তে মিনার চুয়োয় গিয়ে মনময়ূরীকে কানে কানে বললে—

'মনময়ূরী প্রাণময়ূরী
বাইরে এসো ভাই—
পক্ষীরাজা ঈগলপাখির
সওয়ার হওয়া চাই—'

মনময়ূরী তো বেচারি কাঁদছিল। তাকিয়ে দেখে আকাশে মেঘ আর বাতাস, তার দুই বন্ধু আর ডানামেলা ঠিক পক্ষীরাজের মতো ঈগলপাখিটি তার সামনে, বারান্দায় নেমে এসেছে।

মনময়ূরী তাকে বলে—

ঈগলভাই ঈগলভাই
ভালো আছ তো?'

ঈগল বললে,

'সেসব কথা হচ্ছে, আগে
পালিয়ে বাঁচো তো!'

ঈগলপাখির পিঠে চেপে যেই মনময়ূরী আকাশে উড়ল অমনি বাতাসকে 'স্ট্যাচু' বলে কে যেন থামিয়ে দিল। আর বৃষ্টিকেও। কিন্তু দৈত্যপুরীতে তখন বান ডেকেছে, সব নদীনালা দিয়ে বন্যার জল গর্জন করে সমুদ্রের দিকে ছুটছে। দৈত্যরাজ আর তার সৈন্যসামন্ত বানের জল সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জানতেও পারলে না যে মনময়ূরীকে তার বন্ধুরা উদ্ধার করে নিয়ে গেল।

মনময়ূরীকে ফিরে পেয়ে রাজারানির খুশি যেন আর ধরে না। তেমনই খুশি সব্বাই!

'ধরার খুশি ধরে না কো, ওই যে উছলে,
মরি হায় হায়'—

বাগানসুদ্ধু গান গাইছে, সুরভি বিলোচ্ছে, আর খুশি ছড়াচ্ছে—ওই উৎসব হচ্ছে, যে আলো—বাতাস—পশুপাখি—কীটপতঙ্গ—ফুলফল—বৃক্ষলতা—কেউ বাকি নেই। সকলেই যেন মনময়ূরীর ফ্রেন্ড কিনা!

কিন্তু এখন জামাই কে হবে? সবাই মিলেমিশেই তো একসঙ্গে উদ্ধার করেছে মনময়ূরীকে? রাজামশাইয়ের সমস্যা শুনে মনময়ূরী হেসে বললে, 'ধুৎ এরা আমার বর হবে কি? এরা তো সবাই আমার বন্ধু! বর খুঁজতে হবে আরেকবার। আরেকটা কোনও পরীক্ষা দিতে হবে তাদের। একুশের অনেক দেরি আছে এখনও। এরা আমরা সখা-সখী, এরা আমার খেলার সাথি। এরা তো আমার চিরজন্মের বন্ধু গো? তাই না?'

বনজঙ্গল কাঁপিয়ে, বাগান দাপিয়ে, উত্তর এল—'হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো, তাই তো।'

রাজা হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। তাহলে জামাই খোঁজা এখন তোলা থাক। তোমার বন্ধুদেরই একদিন ভালো করে নেমন্তন্ন খাওয়াই। সেই বেশ হবে।'

'মা, মনময়ূরীর গল্পটা বলবে?'

'কতবার শুনবি? এই তো সেদিন শুনলি।'

'আবার বলো। আর একবার।'

চাঁপার গন্ধে ঘর ভরেছে
আকাশে ওই মেঘ করেছে
মা আমাকে বলো গো
মনময়ূরীর গল্প!
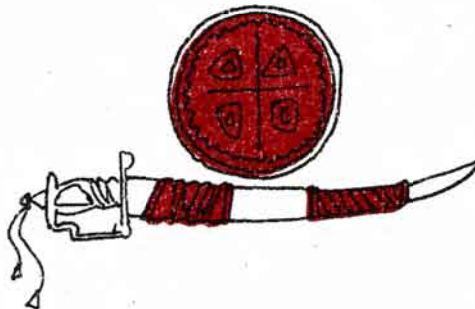
সাইক্লপের জয়-বাংলা

টুমটুম অর পিকপিক একদিন বারান্দায় বৃষ্টির জলে নৌকো ভাসাচ্ছিল, এমন সময় একটা নৌকো বারান্দার বড় নালিটা দিয়ে গলে গেল। 'ধর ধর' করতে করতে টুমটুমও জলের সঙ্গে নলের ভেতর পড়ে গেল। পড়েই ভ্যানিশ! পিকপিক তো একটু বড়, 'হায় হায়' করতে করতে সে তখন দিম্মার কাছে ছুটল, কেন না নালির পাইপ দিয়ে সে গলতে পারল না। বড্ড রোগা বলে টুমটুম সিধে গলে গেছে!

জলের তোড়ের সঙ্গে ভেসে গিয়ে টুমটুম পড়ল মাটির তলার নীল সমুদ্রে। দ্যাখে, তাদের নীল কাগজের নৌকোটা আগে-আগে ভেসে যাচ্ছে। টুমটুম কোনওরকমে সাঁতরে গিয়ে সেটা ধরে উঠে বসল। ভয় পেলে তো আর বাড়ি পৌঁছুতে পারবে না, গালে হাত দিয়ে টুমটুম কেবল ভাবতেই লাগল আর ভাবতেই লাগল। এমন সময় নৌকো এসে ঠেকল একটা সুন্দর দ্বীপে। টুমটুম নেমে পড়ল, নৌকোটাকেও তুলে ডাঙাতে একটা শুকনো জায়গা দেখে শুকোতে দিল। কাগজটা ভিজে নৌকো প্রায় খুলে এসেছে। সঙ্গে দিদিও নেই, কে আবার গড়ে দেবে এমন সুন্দর নীল সিলোফেন কাগজের নৌকো? টুমটুম ফ্রকের কোণায় চোখের জল মুছে নাকের জল মুছে হাঁটতে লাগল। একটা মস্ত উঁচু পেয়ারা গাছের নীচে এসে তার মনটা একটু ভালো হল। কী সুন্দর ডাঁশা-ডাঁশা পেয়ারা ঝুলে আছে। টুম্টুম ভাবলে, আহা, আমি যদি চড়তে পারতুম!

এমন সময়ে কে যেন তাকে মুঠোর মধ্যে ধরে শূন্যে তুলে নিলে। ও বাবা রে! এ কী রে! টুমটুম চমকে চেয়ে দেখে, একটা বিশাল একচোখওয়ালা দৈত্যের হাতে সে

ধরা রয়েছে। টুমটুম তাকে চিনতে পারলে ঃ 'সাইক্লপ!' বাবা যে গ্রিসের রূপকথার বই দিয়েছেন, তাতে এদের গল্প আছে—ইউলিসিস এদের দেশে গিয়ে পড়েছিলেন।'

তার হাতে একটা ডাঁশা পেয়ারা তুলে দিয়ে সাইক্লপ হেঁড়ে গলায় হুংকার দিয়ে বললে ঃ 'হুম! হুম! তুমি আমার পেয়ারা কাঁচাই খাও, আর আমি বরং তোমাকে ভেজে খাই!'

টুমটুম প্রায় কেঁদে ফেলে আর কী। তার বাঁ-চোখে একেই ভয়ানক 'জয়-বাংলা' অসুখ করেছে, ফেঁপে ফুলে লাল জবার ফুল, আর ডানচোখেও হল বলে—কুটকুট করতে শুরু করেছে বহুক্ষণ, তার ওপর সাইক্লপ বলে কিনা ভেজে খাবে? হঠাৎ একটা দুর্বুদ্ধি তার মনে উদয় হল। সে বললে, 'তোমার সঙ্গেই তো দেখা করতে এসেছি। ইউলিসিস রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন। নমস্কার।' বলে সে সাইক্লপের চোখের খুব কাছাকাছি চলে গিয়ে নমস্কার করলে। সাইক্লপের বিরাট চোখের মণিতে তার লাল ফ্রকপরা পুরো শরীরটার রঙিন ছায়া পড়ল। টুমটুম ভাবল ঃ 'তোমার চোখটা একটু লাল-লাল মনে হচ্ছে? আমার মতন জয়-বাংলা হয়নি তো?'

সাইক্লপের তো ইউলিসিসের নাম শুনেই গায়ের রক্ত জল হয়ে গেছে। তার ওপর 'জয়-বাংলা'—'জয় হিন্দ' এসব ভালো ভালো বীরত্বপূর্ণ কথা শুনলে তার দৈত্যের রক্ত আরও জল হয়। সে ভিতু-ভিতু নরম গলায় বললে, 'সেটা আবার কী? আমার চোখ তো এইরকমই।'

টুমটুম বুঝলে, ভেজে-টেজে খাবার কথা আর তার মনে নেই, তখন বললে, 'উঁহু, বেশ বুঝেছি, তোমার জয়-বাংলাই হয়েছে। তুমি নিশ্চয় জয়-বাংলাওয়ালা কোনও লোককে খেয়েছিলে সম্প্রতি?'

সাইক্লপ একটু ভেবে বললে, 'পরশু অবশ্য একজন ভুঁড়িওয়ালা লোক তার গুপ্তধন লুকিয়ে রাখবে বলে মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে এখানেই এসে পড়েছিল, তাকে দই-কচৌড়ি করে খেয়েছিলাম।'

টুমটুম বললে, 'ঠিক এখানেই এসে পড়েছিল? তবে আর বলতে হবে না? নির্ঘাত কোনো কালাবাজারি, কলকাতার লোক! আর সেখানে প্রত্যেকেরই 'জয়-বাংলা'। তোমারও 'জয়-বাংলা'ই হয়েছে। চোখ কটকট করছে না? ইশ কী লাল! ওই তো দেখেছি বেশ জলও পড়ছে।' বলেই টুমটুম তার কোঁকড়া চুলের একগাছি ছিঁড়ে সাইক্লপের চোখে ফেলে দিল।

অত বড় চোখ দিয়ে তো সে চুলের মতো সূক্ষ্ম জিনিস দেখতে পায় না, সাইক্লপ কিছুই বুঝল না। কিন্তু কোঁকড়া চুলের জ্বালায় চোখ কুটকুটনি শুরু হল। সাইক্লপ বলল, 'সত্যি তো, চোখটা কেমন-কেমন করছে!'

টুমটুম বললে, 'হয়েছে আর কী, জয়-বাংলা। স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে ধোও, আরাম পাবে।' স্যালাইন ওয়াটার কাকে বলে? সাইক্লপ বাহাদুর তো জানেন না। 'সেটা আবার কী?'

এমন সময় টুমটুম দেখে সত্যি-সত্যিই সাইক্লপের মস্ত চোখটা ভোরের সুয্যির মতো

টকটকে লাল হয়ে উঠল, চোখের কোণে মেঘের মতো পিচুটি জমতে লাগল। আরে আরে আরে, সত্যি-সত্যিই যে সাইক্লপের জয়-বাংলা হয়ে গেল? তার মানে টুমটুমের থেকেই ছোঁয়াচটা লাগল বোধহয়? টুমটুম বললে, 'ও সাইক্লপ, তোমার সত্যি সত্যি জয়-বাংলা হয়েছে। ইউলিসিস তোমাকে যে জরুরি কাজের জন্য পাঠালেন, সেটা কি তুমি আর পেরে উঠবে?'

সাইক্লপের এক মুঠোতে টুমটুম, আর অন্য মুঠোতে সে চোখ কচলাচ্ছে। 'তুমি কী যেন ওষুধ বললে? সেটা শিগগির দাও তো দেখি, আমার যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে!'

টুমটুম বললে, 'এই যে নীল সমুদ্রের জল, এটাই স্যালাইন ওয়াটার—তুমি এই দিয়ে চোখ ধোও।'

সাইক্লপ কি এ কথা বিশ্বাস করবার পাত্র? সে বললে, 'ইয়ার্কি রাখো, শিগগির এনে দাও স্যালাইন ওয়াটার—নইলে তোমাকে বিটনুন দিয়ে কাঁচাই খেয়ে ফেলব।'

টুমটুম দেখল আচ্ছা মুশকিল। তখন বললে, 'বেশ তো, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, সেখানে লক্যুলা থার্টি আছে, আমি তোমাকে দিচ্ছি।'

সাইক্লপ বললে, 'আমি কী করে তোমায় নিয়ে যাব, রোদ লেগে আমার চোখ ব্যথা করছে যে।'

টুমটুম বললে, 'কুছ পরওয়া নেই। চশমা বানিয়ে দিচ্ছি।' বলে তার নীল সিলোফেন কাগজের নৌকোটা খুলে ফেলে পেয়ারা গাছের সরু সরু কাঠি দিয়ে বেঁধে একটা চশমা মতন তৈরি করে ফেললে সাইক্লপের কানের মাপে। ঝাঁকড়া চুলে সেটা ভালো করে আটকে দিলে।

সাইক্লপ দেখলে, সারা পৃথিবীটা যেন জুড়িয়ে গেল। আকাশ বাতাস যেন নীল! আহ্, এমন আরাম সে জীবনে পায়নি। সে বললে, 'এই বুঝি স্যালাইন ওয়াটার?'

টুমটুম বললে, 'না, এটা সানগ্লাস। এবার আমার বাড়ি নিয়ে চলো, তোমাকে ওষুধ দেব।'

সাইক্লপ তখন ওপর দিকে তাকিয়ে ওকে এক হাত দিয়ে খুব উঁচুতে তুলে ধরল। টুমটুম দেখলে, ওমা! সে বারান্দায় রেলিঙে পৌঁছে গেছে। এক দৌড়ে ঘর থেকে লক্যুলার শিশিটা নিয়ে এসে দেখে, ভোঁ ভোঁ—কই, বারান্দায় তো কারুর হাতটাত নেই? এমন সময় বৃষ্টিজলের নল দিয়ে গুমগুম করে শব্দ হল। 'হুম হুম—কই, ওষুধ কই?'

টুমটুম অমনি 'এই যে ওষুধ' বলে শিশিটা নালির মধ্যে ফেলে দিলে। হুড়হুড় করে কিছু সেটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। টুমটুম ঠিক জানে, সাইক্লপ যেখানে চশমা পরে হাত মেলে বসে আছে, সেইখানে, তার মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়বে শিশিটা।

এমন সময়ে দিম্মাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে পিকপিক এসে দেখে, টুমটুম উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে নালির ফুটো দিয়ে কী যেন দেখছে। পিকপিক অবাক হয়ে চোখ গোল গোল করে বললে, 'কী করে উঠে এলি?'

টুমটুম বললে, 'ম্যাজিক!'
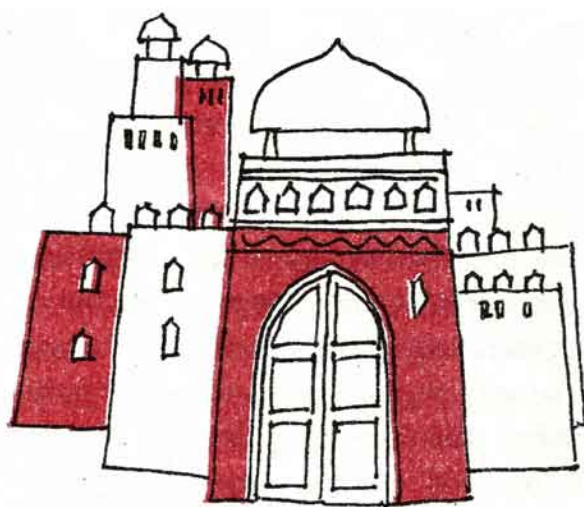
রঙিন রাজার দেশে বুবাই

বুবাই সেদিন পিসিমার বাড়ির পিছনের বাগানে খেলা করছিল। পিসিমার বাড়িটা ওর অদ্ভুত ভালো লাগে। এটা যেন অন্য একটা দেশ। সরু সরু গলি দিয়ে হেঁটে হেঁটে তবেই পিসিমার বাড়িতে আসতে হয়, বাবা গাড়িটা মোড়ে সুবোধের দোকানের সামনে রেখে আসেন। সুবোধের দোকানে ঝুড়িতে ঢেলে ঢেলে কতরঙের ডাল বিক্রি হয়। থলির মধ্যে থাকে নানারকমের চাল আর ড্রামের ভেতরে কেরোসিন তেল। লোকে লাইন দিয়ে সেই তেল 'ধারে' নিয়ে যায় বড় বড় প্লাসটিকের জার ভরতি করে। বুবাইদের হেঁটে হেঁটে আসতে হয় গজেনদার দোকান পর্যন্ত। গলিটা অন্ধকার, লাল ইটের তৈরি মেঝে রাস্তাগুলোর। তিনজন মা, বাবা আর বুবাই পাশাপাশি হাঁটলে, সেই গলিতে আর কেউই হেঁটে যেতে পারবে না। একজনকে সরে গিয়ে জায়গা দিতে হবে। গজেনদার দোকানটা অন্যরকম। সেখানে সাদাচুলওয়ালা গজেনদা, আর তাঁর নাতি নেড়া বসে বসে আগুন জ্বেলে, তাতে বাতাস দিয়ে কীভাবে যেন সোনার গয়না তৈরি করেন। লোহার জাল দিয়ে চারিদিকে ঘেরা। ঘরটা আধা অন্ধকার। ওই মোড় থেকেই আরও সরু গলিটায় ঢুকতে হবে। তার পরেই পিসিমার হাত গলিয়ে বাবা দরজার ছিটকিনি খুলে ফেলতে পারেন। যদি খিলটা না দেওয়া থাকে তাহলে বাড়িতে ঢুকে পড়া যাবে। কিন্তু খিল দেওয়া থাকলে ওতে হবে না। তখন কড়া নাড়তে হবে। খটাখট খটাখট।

'যাই'—বলে বিনুদিদি আসবে খিল তুলে দরজা খুলে দিতে। প্রথমে একটু বারান্দা। তারপর দালান। তারপর উঠোন। তুলসীমঞ্চ। কুমড়োর মাচা। খিড়কির দরজা। ওই খিড়কির

দরজার এপাশেই আরেকটা দরজা আছে। সেইটে খুললে, পিসিমাদের এই পেছনের বাগানে যাওয়া যায়। উঠোনটাও খুব সুন্দর, বাঁধানো চাতাল। উঠোনে পিসিমা আর বিনুদিদি ডালাতে কাপড় পেতে বড়ি শুকোতে দেয়, কতরকমের বড়ি। পিসিমা আমসত্ত্বও শুকোতে দেয় ডালার ওপরে। বৈয়ামে করে আর হরলিকসের বোতলে করে আচার রোদে দেয়। সব ওই উঠোনে। তার ওপরে তারের জালের ঢাকনা চাপা দেয়া থাকে। মাঝে-মাঝে বিনুদিদি বুবাইকে মোড়া দিয়ে ছড়ি হাতে বসিয়ে দেয়।—'কাকপক্ষী বসতে দিওনি, শালিক সবক'টাই লুভিষ্টি।' বুবাই বড়ি পাহারা দেয় আর ওপাশে বাগানের দিকে তাকায়। পেছনের বাগানের দরজাটা খুলে ওখানে বেড়াতে যেতে মানা নেই। বুবাই, রুবাই পর্যন্ত যেতে পারে। ওটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা কিনা, খুব রহস্যময়। ওখানেও অনেক পাখি আসে। ছোড়দা দেখিয়ে দিয়েছে। মৌটুসীপাখি ফুলের মধু খায়। বুলবুলিপাখি ঝুটি নেড়ে শিস দেয়। ফড়িং, প্রজাপতি, কেঁচো কত কি থাকে। বুবাইয়ের ভীষণ ভালো লাগে—জায়গাটা খুবই সুন্দর—কাদাকাদা মাটিটা ঠান্ডা, উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বলে বাগানটাকে বাইরে থেকে দেখাই যায় না, বাগানের লোকজনকেও না। পাঁচিলের ওপরে সারা দিন শুধু ম্যাও পুষিটা রোদে গা-টা এলিয়ে শুয়ে শুয়ে আয়েশ করে।

বাগানে শুধুই ফুলের গাছ। কত যে ফুল। টগর, শিউলি, কাঠচাঁপা, সূর্যমুখী, জুঁইফুল, বেলফুল। কতরঙের যে শুধু জবাফুলই! লাল, মেটে লাল, কমলা জবা, হলুদ জবা, সাদা জবা, গোলাপি জবা, লংকা জবা, পঞ্চমুখী জবা। এতরকমের জবাফুল কী বুবাই দেখতে পেত কোনওদিন গড়িয়াহাটে? বুবাইদের ফ্ল্যাট দশতলার ওপরে, গড়িয়াহাটের মোড়ের কাছেই। বুবাই ক্লাস থিতে পড়ে। সে জানে সে যথেষ্ট বড় হয়েই গেছে—কিন্তু বড়রা সেটা কিছুতেই মানতে চায় না। রুবাই অবশ্য মানে। রুবাই ওর ছোট বোনটি। সে এখনও স্কুলটুলে পড়ে না। "দাদ্দা' বলে ডাকতে ডাকতে পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়। পিসিমার পিছনের বাগানে রুবাইকে নিয়ে আসা বারণ নেই—এখানে ও কোথাও পড়েটড়ে যাবে না, সবই সমতল। সিঁড়ি নেই, জল নেই, গাড়িঘোড়া নেই, কুকুর নেই, ভয়ের কিছুই নেই। খিড়কির দরজা খুললেই আর একটা রাস্তা আছে, আর সেটার ওপরেই গঙ্গা।

এই গঙ্গানদীটা হাওড়া ব্রিজের গঙ্গানদী নয়। এ খুব রোগা মতো, এতে জাহাজ কেন, সরু নৌকোও ভাসতে দেখেনি বুবাই। শুধু ঘাটের পর ঘাট। ভাঙা ভাঙা, শ্যাওলাপড়া সিঁড়িতে মেয়েরা বাসন মাজছে। কেউ গামছা নিয়ে স্নান করছে। কোনও ঘাটে বাঁধানো চাতাল আছে, ছাদওয়ালা—সেখানে 'পাঠ' হয়। দাদু, দিদিমাদের দল বসে 'পাঠ' শোনেন।

'গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর।
লক্ষ্মীসহ সেখানে আছেন গদাধর।।
সেথায় আশ্চর্য বৃক্ষ দেখিতে সুচারু।
যাহা চায় তাহা পায় নাম কল্পতরু।।'

পিসিমার সঙ্গে মাঝে মাঝে যায় বুবাই, 'পাঠ' শুনতে। পিসিমা আসলে বুবাইয়ের পিসিমা নন, বুবাইয়ের বাবার পিসিমা। বাবার দেখাদেখি বুবাইও তাঁকে ডাকে পিসিমা বলে,

আর বাড়িটাকে তো সবাই বলে 'পিসিমার বাড়ি'। বুবাইদের মাঝে-মাঝে পিসিমার কাছে এসে ডে-স্পেন্ড করতে খুব ভালো লাগে। শুধু তো ডে-স্পেন্ড করাই না এখানে উইক অ্যান্ড কাটিয়ে যেতেও রাজি বুবাই। এক, ওই খিড়কির বাগান। আর ওই গঙ্গার ঘাট। পিসিমার হাত ধরে গঙ্গার ঘাটে যেতে যে কী ভালো লাগত বুবাইয়ের ছোটবেলায়। এখন বড় হয়ে গেছে। ক্লাস থ্রি। রুবাইয়ের 'দাদ্দা' এখন হাতটাত ধরে না। শুধু রাস্তা পেরুনোর সময়ে হাত ধরতে হয়।

'কল্পতরু কী পিসিমা?'

পিসিমা পান সাজতে বসেছেন। সামনে পানের বাটা খোলা। রেকাবিতে পানের পাতা আধখানা করে সাজানো। পিসিমা প্রথমে সবগুলোতে চুন তারপর সবগুলোতে খয়ের তারপরে সবগুলোতে সুপুরি মশলা দেবেন। তারপর মুড়ে মুড়ে পান সেজে ফেলবেন। বুবাইয়ের ভীষণ ভালো লাগে এটা দেখতেও।

'কল্পতরু মানে হচ্ছে ইচ্ছাপূরণের গাছ।'

'ইচ্ছাপূরণের গাছ সেটা কী পিসিমা?'

পিসিমা হেসে ফেলেন।

'সে এক রূপকথার গাছ। বৈকুণ্ঠের বাগানে আছে। তার কাছে গিয়ে তুমি যা চাইবে, সেটাই পাবে।'

নন্দিনী গাইয়ের মতন? তাই তার নাম কামধেনু। কামনা থেকে কামধেনু মানে গরু। না পিসিমা?

বুবাইয়ের কথা শুনে খুশি হয়ে পিসিমা বললেন, 'বাঃ, তোমার মনে আছে' এ-ও অবিকল তেমনি। কল্পতরু মানে ওই কল্পনা থেকে কল্প, আর তরু মানে গাছ, ইচ্ছের গাছ। কল্পনার গাছ। ওইটি যেমন কামনার গাভি। যা চাইবে তাই দেবার গাভি, এইটি তেমনি কল্পনার বৃক্ষ—যা চাইবে তাই দেবার বৃক্ষ। বৃক্ষ মানে গাছ। 'জানো তো?'

'এখানেও অমন গাছ আছে পিসিমা? না, বৈকুণ্ঠেই কেবল থাকে?'

পিসিমা পান মুড়তে মুড়তে মিষ্টি মুখে হাসলেন। সোনালি চশমার মধ্যে তাঁর হাসি ঝিকিয়ে উঠল। ফিসফিস করে, গলা নামিয়ে মুখখানাও নীচু করে বুবাইয়ের কাছাকাছি এনে পিসিমা বললেন, 'আছে আছে। এমনি গাছপালার মধ্যেই এক একটা কল্পতরু গাছ হয়, তারা সাধারণ গাছ সেজে লুকিয়ে থাকে বনেবাদাড়ে।'

'বাগানে থাকে না?'

'হ্যাঁ বাগানেও।'

সেই থেকে বুবাই ছদ্মবেশী কল্পতরু গাছকে খুঁজে বের করতে লেগে গেছে।

গড়িয়াহাটে ওদের দশতলার ছাদেও একটা সুন্দর বাগান আছে। টবে তৈরি গাছের বাগান। সেখানেও ফুল হয়। বোগেনভিলিয়া। কাঠচাঁপা। কিন্তু ছাদে ছোটদের ওঠা বারণ। বড়রা নিয়ে গেলে, তবে। বুবাইদের ছাদে যাওয়া খুব কমই হয়। মা-বাবার সময় কই? মায়ের অফিস, বাবার কলেজ, ছাদে কে নিয়ে যাবে? আর দুপুর বেলাতে ছাড়া অন্যসময়

কেউ ছাদে যায়? পিসিমার বাড়িটা একতলা। ঠিক ওদের বাড়ির উলটো। আর পাশাপাশি অনেকগুলো পুরোনো একতলা বাড়ির ছাদে ছাদে জোড়া, ছাদটাও যেন একটা রাস্তা—অনেকদূর চলে যাওয়া যায়।

ছাদে বাচ্চারা ক্রিকেট খেলে। ঘুড়ি ওড়ায়। ক্রিকেটের বল সর্বক্ষণই নীচে পড়ে যাচ্ছে এদের উঠোনে। ওদের বাগানে। গলিতে। এপাশের বাড়িতে ওপাশের বাড়িতে। ছুটে ছুটে, কুড়িয়ে আনতে হয় নীচে থেকে। ছাদে বল খেলা ভালো না। আচ্ছা, গড়িয়াহাটে দশতলার ছাদের বাগানেও কী কল্পতরু গাছ আছে? কে জানে? থাকতেও পারে। বা। ছদ্মবেশী তো। ওই যে মস্ত বড় একটা ক্যাকটাসের গাছ আছে, কাঁটা ওঠা আঙুল, একশোটা হাতের মতন সব ডাল তার। হলুদ হলুদ ফুল ফোটে। সেই গাছটা একটু অদ্ভুত। ওটা কল্পতরু গাছ হলেও হতে পারে। কিন্তু ছাদে তো ওঠাই বারণ। তাই বুবাই পিসিমার খিড়কির বাগানে ঘুরতে ভালোবাসে। ঘুরে ঘুরে এক-একটা গাছকে ভলো করে নিরীক্ষণ করে দ্যাখে। এটা কী কল্পতরু? জবাফুলের ছদ্মবেশে?

খিড়কির দরজা খুলে রাস্তায় বেরুনো নিষেধ। ওখানে একটা তালা মারা আছে। পিসিমাও সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাশের গলি দিয়ে ঘুরে গঙ্গার ঘাটে যান। তবু পিছনের দরজা খোলেন না। ওটা বন্ধ রাখাই নাকি ভালো। ওখান দিয়ে হটহট করে গাড়িঘোড়া যায়। আর রাস্তাটুকু ডিঙোতে পারলেই গঙ্গা! এত কাছে। ছাদ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। শুয়োর মা তার ছানাদের নিয়ে আরাম করে গঙ্গার পাড়ে কাদার মধ্যে শুয়ে ছানাদের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছে। বুবাই স্পষ্ট দেখল শুয়োর মা সেদিন ওকে Wink করল। আটটা ছানা হয়েছে বলে শুয়োরানির যেন অহংকারে মাটিতে পা পড়তে চায় না। শুয়োররানি যেন সুয়োরানির মতো করে হাঁটছে। দুলে দুলে। আর গা এলিয়ে শুয়ে শুয়ে যখন লাইনবন্দি ছানাগুলোকে দুধ খাওয়ায়, সে এক অপূর্ব দৃশ্য! শুয়োর ছানারা খুবই সুইট দেখতে! ঠিক পুতুলের মতন। খিড়কি দরজা বন্ধ থাকলেও খিড়কির বাগানের দরজাটা কিন্তু খোলা যায়। ছোট একটা কাঠেরই হুড়কো টানা থাকে ওর দরজায়। বুবাইয়ের ওটা খোলায় বারণ নেই।

বুবাই সেদিন দুপুরবেলাতে খিড়কির বাগানে ঘুরছিল, রুবাই আসেনি। সে মার সঙ্গে মামাবাড়ি গিয়েছে ভাগলপুরে। বুবাইয়ের বাড়িতে রেখে গেছেন। বুবাইয়ের তো মজা। সে তার কাজে মন দিল। কল্পতরুর খোঁজ করা। ফুলগাছ ছাড়াও কয়েকটা পাতলা ছাল গাছটার গায়ে। ছোট ছোট পেয়ারা হয়েছে, কসুটে এখনও। গাছটাতে ওঠা খুব সোজা। আরেকটা আছে বেলগাছে। ওরে বাবা! কী বড় কাঁটা। বেলগাছে চড়া বুবাইয়ের সাধ্যি নয়। আর একটা আছে রোগা লিকলিকে, ভিতু মতো, সিড়িঙ্গে মতো, পেঁপেগাছ। তাতে পেঁপে ধরেছে এর মধ্যেই। ছোট্ট খাট্টো বেঁটে গাছ। কত আর বয়েস হবে? বেশি নয়। বড়ই হয়নি এখনও। এখনই অতি পাকা বাচ্চাদের মতন, ফল ধরিয়ে বসে আছে। পেঁপেগাছটা বেশ সুন্দর দেখতে। বুবাই তার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলো ছোট্ট গাছের ফলগুলো যখন পেকে যাবে তখন কেমন দেখাবে? ভাবতেই, চোখের সামনে ফলগুলো

হলদে রং হয়ে গেল। ছোট্ট গাছে একগুচ্ছ ছোট্ট ছোট্ট পাকা পেঁপে। বুবাই অবাক। —'একী? এটাই কী তবে কল্পতরু? এ তো মনের কথা শুনতে পায়।' ওমনি পেঁপেগাছের পাতায় হাওয়া উঠল, পেঁপেগাছটি ফিসফিসিয়ে মাথা দুলিয়ে বলল, 'তাই তো, তাই তো, পাই তো, পাই তো।'

—'আরে...রে? যা বলব তাই হবে? আমি যে কালকে রঙিন রাজার দেশের গল্পটা পড়লুম, নিয়ে চলো তো দেখি আমাকে রঙিন রাজার দেশে?' পেঁপেগাছ থেকে একটা পাতা খস পড়ল। ফিসফিস করে পেঁপেগাছ বলল, 'এই পাতাটা ছাতার মতন মাথায় দিয়ে, চোখ বুজে বোসো তো একটু। তারপরে রঙিন রাজার দেশের কথা ভাবো।' বুবাই পাতাটি ছাতার মতন ধরে চোখ বুজে বসে পড়ল গাছের পাশে। অমনি বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল শ্যাওলাধরা পাঁচিলটার ভাঙা চোরা একটা অংশ, সেখানে ইটের গা থেকে একখানা কড়া বেরিয়ে রয়েছে। বুবাই চোখ খুলে ফেলল। তাড়াতাড়ি পাঁচিলের ধারে গিয়ে সেই কড়াটা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দ্যাখে, আরে এইতো সেই ভাঙা চোরা কোনটা? আর এই তো সেই কড়া? কী করব এখন আমি? কড়াটা দিব্যি পরিষ্কার, ঝকঝকে লোহার তৈরি। কড়াটা কী নাড়ব? যেমন দরজার কড়া নাড়ে? নাকি কড়া ধরে টানব? বুবাই প্রথমে নাড়ল, খটখট করে। তারপরে সাবধানে একটু টেনে দেখল। যেই না টানা, অমনি ওর হাতে কড়াশুদ্ধু ইটটা উঠে এলো। তার ভেতর গর্ত থেকে উঁকি মারছে সবুজ রঙের একটা ফচকে গিরগিটি। বুবাই গিরগিরিকে ভয় পায় না।

সে জুরাসিক পার্ক দেখেছে। কত বড় বড় গিরগিটির ঠাকুরদারা ছিল সেখানে! গিরগিরিটা বড় বড় চোখ মাথায় তুলে বুবাইকে বলল,

'পাসপোর্ট আছে?'

'কীসের পাসপোর্ট?'

'রঙিন দেশে যাবার?'

বুবাই বললে, 'সেটার কথা তো জানি না?' বলতে বলতেই ওর হাতের পেঁপেগাছের পাতাটি দেখতে পেয়ে গেল গিরগিটি।

'ওই তো পাসপোর্ট, কাম ইন।'

বলেই সে জোরে একটা ফুঁ দিল। ফুঁ দিতেই ওই গর্তটা মস্ত চৌকো একটা ফুটো হয়ে গেল, যার ভেতর দিয়ে অনায়াসেই হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে যেতে পারল বুবাই। হাতে পেঁপেগাছের পাতাটি শক্ত করে ধরা। গিরগিটি বলল, 'সামনেই সিধে রাজার বাড়ির রাস্তা।'

বুবাই, 'থ্যাংকিউ' বলে হাঁটতে শুরু করল। গিরগিটি হেসে ডাকল, 'ওয়েলকাম। এটা তো আমার ডিউটি। কিন্তু তোমার এত তাড়া কেন ভাই? একটু গল্প করে যাবে না? তা ছাড়া আমার ধাঁধার জবাব না দিলে তুমি তো ওই গেটটা পেরুতেই পারবে না। বুবাই নজর করে দেখল, তাই তো? একটা গেট রয়েছে।

'কী ধাঁধা ভাই?'

গিরগিটি খিটখিট করে হেসে বলল,

'রঙিন দেশের দারোয়ানির
কাজটা বড়ই অল্প
রাজার বাড়ির রাস্তা দেখাই
আর করি গাল গল্প।
আর কী করি, দাদা?
বানাই একটা দুটো ধাঁধা—
সঠিক জবাব দিলেই তোমার
কাটবে পথের বাধা।'

'বলো, বলো, আমি খুব ধাঁধার উত্তর দিতে ভালোবাসি।' বুবাই বলল।

'সেই ফুল সেই পাখি, সেই রাক্ষস। চেনো নাকি?'

গিরগিটি এক চোখ বন্ধ করে জিব লুকলুক করে, ধাঁধা জিগ্যেস করে ল্যাজ নাচাতে থাকল।

বুবাই ভাবল। ভাবল। ভাবল। পাখির নামে আবার রাক্ষস কে?

তক্ষুনি মনে পড়ল মহাভারত। বক! বকরাক্ষস। আর বকফুল-ভাজা তো খেতেও ভীষণ ভালোবাসে!—'বকপাখি, বকফুল, বকাসুর।' শুনেই গিরগিটির সবুজ রঙটা থিরথির করে কেঁপে উঠে বদলে যেতে থাকল। তার সরু সরু হাত পাগুলো মানুষের হাত-পা হয়ে গেল। এখন সবুজ ফ্রক পরা একটা ছোট্ট মেয়ে বুবাইয়ের সামনে। একমুখ হেসে সে বলল, 'রঙিন রাজার দেশের গল্পে তুমি আমার কথাই পড়েছিলেন বুবাই। আমি মিঠি!'

'তুমি গিরগিটি হয়েছিলে কেন?'

'সে গল্প পরে হবে। চলো এখন রাজবাড়িতে যাই।'

বুবাইয়ের হাত ধরে মিঠি নাচতে নাচতে চলল। তার পায়ে ঝুমুর ঝুমুর করে নূপুর বাজছে। তার কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ লাফাচ্ছে কাঁধের ওপরে। রাজবাড়িটা কী সুন্দর! ঠিক যেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতন। অমনিই চমৎকার বাগান সামনে, আর পেছনে, দু-পাশে বড় বড় দিঘি। ওপাশে ঘোড়াশালে ঘোড়া। হাতিশালে হাতি। আর গাড়িশালে গাড়ি ভরতি।

কিন্তু সারাটা পথ একটিও মানুষ দেখা গেল না। শুধু রং। শুধু রং। কী রংয়ের বাহার! গাছপালার রং এখানে সবুজ নয়। সব গাছই যেন পাতাবাহার। নানান রংয়ের বাহারে পাতায় সেজে ঝলমল করছে। তার মধ্যে ফুটছে ফুলও। গুচ্ছ গুচ্ছ। যেন জড়োয়ার গয়নার মতন ঝকঝকে। এমনকি আকাশটাও এখানে আলাদা নীলরং। অনেক গাঢ়। ঘন। পেন্টিং বক্সের রঙের চাকতির মতন। কলকাতার আকাশের মতন স্বচ্ছ নয়। এখানে মনে হয় আকাশে হাত দিলে, তাকে ছোঁয়া যাবে, সলিড একটা মস্ত ঢাকনার মতন।

বকুলতলা দিয়ে যেতে গিয়ে বুবাইয়ের পায়ে কী ফুটলো। নীচু হয়ে দেখে বিছিয়ে

থাকা অজস্র বকুলফুলের মধ্যে একটি বকুলফুল নরম নয়, কঠিন! যেন কাচের তৈরি। কিন্তু ভাঙবে না। শক্ত খুব। 'এ কেমন বকুলফুল, মিঠি? এ তো শক্ত?'

'এটা তো হিরের বকুলফুল।' মিঠি বলল। 'হিরে কি ভীষণ কঠিন, জানো না? কাচ কাটতে পারে।'

'এ কী? রঙিন দেশে এমন কেন? গল্পে তো এসব পড়িনি?'

'এই গল্পটা তো এখনও লেখাই হয়নি!' মিঠি বলল। 'তুমি তো আগের গল্পটা পড়েছ। এরপরের দিন এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন দরজাতে। রানি তাঁকে ভিক্ষে দেননি—রানি তখন টিভিতে গয়নার বিজ্ঞাপন দেখছিলেন, ওঠেননি। সন্ন্যাসী তাই অভিশাপ দিয়ে গেছেন। রাজ্যের সব গাছপালাই হিরে জহরত হয়ে গেছে। আর সমস্ত মানুষ পোকামাকড়। কিছু একটা করার দরকার ছিল। তুমি এসেছ খুব ভালো হয়েছে। আমি যেমন আবার মিঠে হয়ে গিয়েছি, বাকিরাও নিশ্চয় এবারে ঠিকঠাক হয়ে যাবেন। তুমি সব ঠিক করে দিয়ে যাবে তো বুবাই?'

বুবাই তো হতভম্ব। কোথায় বেড়াতে এলো রঙিন রাজার দেশে। সেখানে কত মজা।

কোকোকোলার কুঁয়ো, রাবড়ির পুকুর। আর ক্যাডবেরির বেড়া বাগানে বাগানে। তা না, এ সবই দেখছি সোনা-রুপো-হিরে-পান্না। এ কে চায়? ক্যাডবেরি কই? কোকোকোলা? আর পথের ধারে বালির টিপির মতন ডালমুটের টিপি থাকবার কথা ছিল।

'সে তো এখন চুনি-পান্নার টিপি হয়ে গেছে। তোমাকে তো এখন ডালমুট খাওয়ানো যাবে না। ক্যাডবেরির বদলে সোনার বিস্কুটের বেড়া এখন। রাজা-রানিরও মনে খুব কষ্ট।'

'তা তো হবেই। তোমরা খাও কী?'

'আমি তো গিরগিটি ছিলুম। রাজা রানি দুজনে ব্যাং হয়েছেন। সোনা ব্যাং রানি আর কোলা ব্যাং রাজা। ওঁরা কিছুই খান না। কী খাবেন? ছোট্ট ছোট্ট পোকারাও তো মানুষ ছিল! ওঁরা প্রজাদের খাবেন কী করে? রাজারানি তাই অনাহারেই আছেন। কাদা খেয়ে।'

'কোথায় তাঁরা?'

'এই তো প্রাসাদে।'

প্রাসাদে কেউ কোথাও নেই। বাগান ফাঁকা পড়ে আছে। গেটে প্রহরী নেই। ঘরে, সোনার খাটের ওপর মখমলের তাকিয়ায় হেলান দিয়ে একটি সোনাব্যাং আর একটি কোলাব্যাং। দুজনেরই মাথায় সোনার মুকুট। একজনের হাতে রাজদণ্ড। মিঠিকে দেখেই তারা গ্যাঙোর-গ্যাং গ্যাঙোর-গ্যাং করে ডাকতে শুরু করে দিল। ডুয়েটে। ডাক শুনলে কোলাব্যাং আর সোনাব্যাং তফাত করা যায় না। থুপ থুপিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দুজনে বিছানার ধারটিতে এল, মিঠি ওদের নমস্কার করে বললে, 'রাজামশাই পেন্নাম হই, রানিমা, পেন্নাম হই। এই যে বুবাইকে এনেছি। আমার চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে, এই ছেলে ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়ে। খুব লক্ষ্মী ছেলে।'

শুনেই থপথপ করে লম্বা লম্বা লাফ দিতে থাকল দুই ব্যাং। দেখে মনে হল তাদের খুব আনন্দই হয়েছে। কোলাব্যাং হঠাৎ মোটা গলায় বলল, 'নীল গানে লাল সুর হাসি হাসি গন্ধ—মানে কী?'

বুবাই একটুক্ষণ মন দিয়ে ভেবে, বলল, 'নীল আকাশে লাল সূয্যি উঠেছে, সেই আলো—আলো ভাবখানার নামই হাসি হাসি গন্ধ। সকালবেলার আলোতে সারা পৃথিবী হেসে উঠবে এবার। আমার এই মনে হচ্ছে রাজা মশাই।'

মিঠি বলল, 'বাঃ। কী সুন্দর। আগে তো বুঝিনি? হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে।' কোলাব্যাং খুশি হয়ে বলল, 'গ্যাঙোর-গ্যাং।' আর সোনাব্যাং সরু গলায় বলে উঠল, 'খড়, তাল, হোগলা, নইলে ভাত ফোগলা। বলো তো দেখি এ ধাঁধার মানেটা কী?'

মিঠি বলল, 'তাড়াতাড়ি বলো বুবাই, বলে ফেলো—তুমি ঠিক পারবে।'

বুবাই বলল, 'আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন রানিমা, চট করে বলতে পারছি না, এটা বেশ একটু কঠিন ধাঁধা।'

ইতিমধ্যে কোলাব্যাঙের শরীরটা রিমঝিম বদল হচ্ছে। আস্তে আস্তে বুবাই দেখল সোনার মুকুট মাথায়, রাজদণ্ড হাতে, সিল্কের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক রাজামশাই গোঁফে তা দিচ্ছেন খাটে বসে—পাশে একটি সোনারং সোনাব্যাং।

রাজামশাই বললেন, 'আমি তোমাকে সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছি বুবাই। ভাত কী দিয়ে হয় ভাবো দেখি।'

'চাল।'

'তবে? এবার ভাবো? ভাতের বদলে চাল দিয়ে ধাঁধাটা ভাবো?'

'খড়, তাল, হোগলা, নইলে চাল ফোগলা।'

ওহো, 'চাল মানে খড়ের চাল? চালাঘরের চাল? তাই তো! খড় দিয়ে তালপাতা দিয়ে, হোগলার পাতা দিয়ে মাটির চালাঘরের চাল তৈরি হয়। চালই যদি না থাকে, তবে তো ঘরের মাথা ফাঁকা, যেমন দাঁত না থাকলে মাটি ফোগলা। থ্যাংক ইউ রাজামশাই। ধাঁধার মানে—খড় দিয়ে, তালপাতা দিয়ে, হোগলাপাতা দিয়ে কুটিরের ছাউনি তৈরি হয়। ছাউনি বিনা কুটির ফাঁকা।'

আহ্লাদে সোনাব্যাং 'গ্যাঙোর-গ্যাং' বলে ডেকে উঠে থুপথুপিয়ে একটু নেচে নিলেন ঘুরে ঘুরে। তারপর হঠাৎ সামনে দেখা গেল বালুচরী শাড়ি পরা একগা গয়না পরা সোনার মুকুট মাথায় একগাল হাসি মুখে, রানিমা বসে আছেন।

দেখতে দেখতে ঘর ভরতি হয়ে গেল মানুষে। তাঁদের দু-পাশে চামর দোলাতে লাগল চামর ঢুলুনিরা। বর্শা হাতে খাড়া হয়ে গেল প্রহরীরা। রাজামশাই বললেন, 'রানি তুমি বুবাইকে কিছু খেতে দাও, আমি রাজসভায় যাই। অনেকদিন সভা বসেনি।'

বুবাই বললে, 'এটা তো রঙিন দেশ। আমি তো রাস্তায় বেরুলেই খেতে পাব। গাছে গাছে ঝুলছে পান্তুয়া, সন্দেশ। রাবড়ির পুকুর, ক্যাডবেরির বেড়া দেওয়া আপনাদের বাগানে, রাস্তার ধারে ডালমুটের ঢিপি।

রানিমা বললেন, 'কেমন করে তুমি জানলে? তুমি এসব দেখতে পাওনি?'

বুবাই বললো, 'পড়েছি। গল্পের বইতে পড়েছি। মিঠি, চলো, আমরা বাইরে যাই। এবার আমার আর ধৈর্য ধরছে না। পেপসি কিংবা—কোকোকোলার কুয়ো থেকে আমাকে আগে এক বালতি ঠান্ডা শরবত তুলে দাও, আর বেড়া থেকে দুখানা ক্যাডবেরি।'

'আর আমাদের ক্রিমের কুয়োও তো আছে। কেভেন্টারের ক্রিমও তাহলে এক বাটি খেয়ে যাও।'

রানিমা বললেন, 'মিঠি, বুবাইকে আমার খিড়কির বাগানে নিয়ে যাও, ওর যা খুশি তাই খাওয়াবে।'

ছোড়দার কথায় বুবাই উঠে পড়ল। পাঁচিলের ধারে ভাঙা সিঁড়ির ওপরে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। কোলে একট পেঁপেগাছের পাতা।'

'সরে আয়, সরে আয়', ছোড়দা চেঁচালো, 'তোর পাশেই একটা সবুজ রঙের গিরগিটি পাঁচিলের ফাটল থেকে উঁকি মারছে।'

'ও তো মিঠি।' বুবাই হেসে বলল।

'তোর হাতে ওটা কী? ক্যাডবেরি? কে দিল?'

বুবাই হাসল।

বলল, 'মিঠি দিল।'

ছোড়দা বলল, 'যাঃ—তুই এখনও ঘুমোচ্ছিস। জেগে ওঠ জেগে ওঠ। বাড়ি যেতে হবে না?'
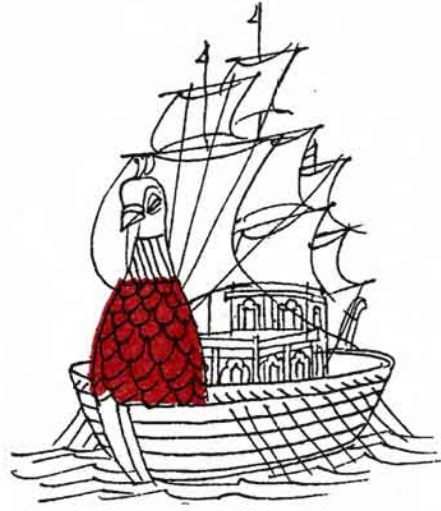
বদ্যিবুড়োর তিন নাতনি

এক দেশে এক বদ্যিবুড়ো ছিল। নদীর ধারেই তার বাড়ি। ঝকঝক তকতক করছে যেন ছবিটি। আম-কাঁঠালের ছায়ায়, নিমগাছের হাওয়ায় সে বাড়ি তৈরি। মাচায় লাউকুমড়ো ধরে আছে, নিকোনো উঠোনের মাঝখানে প্রদীপ জ্বলা তুলসীর বেদিটি, আর একপাশে চাটাইয়ের ওপর নানারকমের ওষুধবিষুধের গাছগাছালি শুকুচ্ছে। দেখতে ঘাসপাতার মতো হলে কী হবে? কত বড় বড় শক্ত শক্ত সংস্কৃত নাম তাদের। বাড়ির পিছনেই মস্ত এক ভেষজ-উদ্যান, তাতে ওষুধ-উদ্ভিদের চাষ হয়। বদ্যিবুড়োর খুব নামডাক। সে নাকি 'ধন্বন্তরী, নাকি প্রায়ই মরামনিষ্যি বাঁচায়ে দেন।' এত নাম এত ডাক এত ধন এত মান তবু বুড়োর প্রাণে সুখ নেই। কেন নেই? কেন না বুড়োর তিনভুবনে কেউ নেই। মা নেই, বাবা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, বউ নেই, শালা নেই, নাতি নেই, নাতনি নেই, কেউই নেই। বুড়ো একেবারে একা। বুড়োর কিন্তু সব ছিল। সবাই ছিল। একবার সবাই মিলে কুটুম বাড়িতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পদ্মানদীতে নৌকোডুবি হয়ে একসঙ্গে সপরিবারে সবাই খতম। কেবল বদ্যিবুড়োই সেবার সঙ্গে যায়নি, এক রুগির এখন-তখন অবস্থা, তাকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বদ্যিবুড়ো যখন খবর পেল তখন সব শেষ। বদ্যির করণীয় আর কিছুই নেই। সেই থেকেই বদ্যিবুড়ো একা।

একা একা থাকে, আর রুগিদের সারাবে কী করে তাই ভাবে। ভেষজ-উদ্যানের যত্ন নেয়, রুগিদের জন্য বড়ি, গুলি, পাউডার, সিরাপ তৈরি করে। মন-প্রাণ ঢেলে রুগিদের সেবা, চিকিৎসা করে। গ্রামসুদ্ধ সব্বাই বদ্যিবুড়োকে খুব ভালোবাসে। শুধু একটা গ্রাম?

আশপাশের সব ক'টা গ্রামে তার ভক্ত ছড়ানো। সন্ধেবেলা বুড়ো বসে বসে হামানদিস্তেতে ওষুধ গুঁড়ো করতে করতে কী সুন্দর গান করে। নিজেই বাঁধে, নিজেই সুর লাগায়। গ্রামের লোকেরাও প্রায়ই আসে, ওর দাওয়ায় বসে হুঁকো খেয়ে আড্ডা মেরে, গান শুনে যায়। বুড়োর গলায় সাতটা সুর যেন সাতটা পোষা পাখি।

একদিন গ্রামে হইহই পড়ে গেল, নদীর ঘাটে নাইতে গিয়ে একটা হাঁড়ি পেয়েছে, গণেশ মুদি। হাঁড়ির ভেতরে নেতিয়ে আছে ছোট্ট জুঁইফুলের মতো ফুটফুটে তিনটি শিশু। কিন্তু তারা মরা না জ্যান্ত, বোঝাই যাচ্ছে না। হাঁড়িসুদ্ধু নিয়ে আসা হল বদ্যিবুড়োর কাছে। তাড়াতাড়ি বদ্যিবুড়ো নাড়িটাড়ি টিপেটুপে বললে, 'আঃ, বেটিরা এখনও বেঁচেই আছে, পেরানপিদিপ টিমটিম করি জ্বলতিচে। দেখি, চেষ্টা করি।' শুরু হল যমে-মানুষে টানাটানি। যত বিদ্যে জানে সব লাগিয়ে, বদ্যিবুড়ো দিনেরাতে চেষ্টা করে তিনটি শিশুকে বাঁচিয়ে তুললে। 'জীইয়ে তুলেছে রে! জিইয়ে তুলেছে! বদ্যিবুড়ো, না স্বয়ং ধন্বন্তরী!' বলে গাঁয়ের লোক দু-হাত তুলে নাচতে লাগল। বুড়ো বললে, 'এরা আমার ঘরেই থাক, এরা বেশ আমারই নাতনি।' তিনকন্যে বদ্যিবুড়োর ঘরে মানুষ হয়। আসলে গাঁসুদ্ধু মানুষ তাদের ভালোবাসে, গাঁসুদ্ধু মানুষের আদরেই তারা বড় হয়।

মা না থাকলে কী হবে, সবাই তাদের মা। গয়লানি ঘন দুধটি খাইয়ে যায়, ময়রানি সেরা মিঠাইটি খাইয়ে যায়, তাঁতিনি মিহি শাড়িটি পরিয়ে যায়, জেলেনি টাটকা মাছটা দিয়ে যায়—দেখতে দেখতে তিনকন্যে ডাকসাইটে সুন্দরী, আর পেল্লায় কাজের মেয়ে হয়ে উঠল। সত্যি বই মিথ্যে কথা বলতে জানে না, মিষ্টি বই রুক্ষু কথা কইতে পারে না। হলে কী হবে, একটা করে কিন্তু খুঁত হয়েছে তাদের জিভে। ওই যে, কচি বয়সে যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছিল তো? সেই টানাহেঁচড়ায়, অত অসুখবিসুখ গিলে একজন হয়ে গেছে খোনা, নঁ নঁ দিয়ে নাকি-সুরে কথা বলে, আরেকজন টরটরি ট ট দিয়ে সব কথা বলে, আর বাকি একজন হয়েছে প্লেন তোৎলা।

এত সুন্দরী, এত শর্মিষ্ঠা, এত সৎ, এত মিষ্টি, অথচ একটা খুঁত বলে ওদের পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে বদ্যিবুড়ো সবাইকে বলেছে, 'পণ-টন কিছু দেব না বাপু, মেয়ে দেখে, মেয়ে নিয়ে যাবে তো যাও। না নেবে তো নিও না। আমার নাতনিদেরও আমি ওস্তাদ বদ্যি বানাব। আট্টু বড়-সড়টি হোক!'

মেয়েরা রাঁধে বাড়ে, দাদুর ওষুধ তৈরি করে দেয়, ওষুধের বাগানটির দেখাশুনো করে, নিজেদের বাগানে ফুল ফল, তরিতরকারি ফলায়, বইখাতা নিয়ে পড়তে বসে, একজন সেতার বাজায়, একজন এসরাজ বাজায়, আরেকজন বাঁশি বাজায়। বুড়োর মতো গান তারা গাইতে পারে না কিনা! জিভের দোষ!

একদিন সেই দেশের রাজা তাঁর দলবল নিয়ে নদী দিয়ে, বজরা করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনলেন চমৎকার বাজনার সুর। শুনেই তাঁর মন কেমন করে উঠল। যেন ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। রাজা বললেন, 'মন্ত্রী, নৌকো তীরে ভিড়াও। কে বাজনা বাজায়, তাকে দেখব।' নৌকো থেকে নেমে মন্ত্রী তো খুঁজতে খুঁজতে গাঁয়ে গিয়ে দেখেন, ওমা! তিনজন ছোট্ট ছোট্ট পরমা সুন্দরী যমজ কন্যে। মস্ত এক ছাতিম তলার ঠান্ডা ছায়ায় বসে,

পরনে লাল, নীল আর হলদে রঙের শাড়ি। তারা এক মনে সেতার, এসরাজ আর বাঁশি বাজাচ্ছে। যেন গান গাওয়া তিনটি রঙিন পাখি। তাদের ডিস্টার্ব না করে মন্ত্রী চুপি চুপি নৌকোতে ফিরে এলেন। রাজা তো শুনেই তক্ষুনি নেচে উঠলেন, 'বাঃ, এই তো আমার তিন রাজপুত্তুরের জন্য মনের মতো বউমা পেয়েছি। চলো, ওদের বাবাকে বলি। তার আগে এক্ষুনি গ্রামে গিয়ে এদের সম্বন্ধে খোঁজখবর নাও।'

রাজামশাইয়ের প্রস্তাব শুনে বদ্যিবুড়োর গ্রামের সবাই তো খুবই খুশি। কিন্তু ভয়ে ভয়ে কেউই রাজাকে বললে না মেয়েদের কার কী খুঁত আছে! বদ্যিবুড়ো নিজে সেদিনই আবার গ্রামে, রুগি দেখতে অন্য গ্রামে গেছে। গ্রামের মোড়ল বললে, 'রাজামশাই, বদ্যিদাদু না থাকলেও আমরাই আজই আপনাকে কন্যে দেখিয়ে দিচ্ছি। এমন লক্ষ্মীমেয়ে সত্যিই বিশ্বসংসারে আর নেই।' পাছে দেরি করলে পরে রাজার মুড মেজাজ বদলে যায় তাই এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলেন না গ্রামবাসীরা। এই গাঁয়ের কন্যেরা কিনা যুবরানি হবে? তার মানে কালে-দিনে রাজরানি হবে। মোড়লের বাড়িতে বদ্যিবুড়োর নাতনিদের ডেকে এনে মোড়লমশাই বললে, 'মা গো, তোমরা ওদের যত্নআত্তি আদর আপ্যায়ন করো, খেতে দাও, বসতে দাও বাঁশি-বাজনা শোনাও। কিন্তু খবরদার, ভুলেও যেন কথাটি বোলো না! একটি কথাও যেন না বেরিয়ে পড়ে মুখ থেকে। কেমন?' এই বলে মেয়েদের বেশ করে তালিম দিয়ে, রাজামশাইকে তো মোড়ল নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। সেখানে মেয়েদের রাজা যতই প্রশ্ন করেন, সব উত্তর মোড়ল দিয়ে দেন। মেয়েদের আর মুখ খুলতেই হয় না।

এদিকে হয়েছে কী, অতি উৎকৃষ্ট শালিধানের তৈরি সূক্ষ্ম সাদা পাতলা কাগজের মতো ফুরফুরে চিঁড়ে, মোটা মোটা মাখলের দলার মতো হলুদ মর্তমান কলা, মধু, আর ক্ষীর দিয়ে রাজামশাইকে ফলার জলখাবার দেওয়া হয়েছে। রাজা তো খুব খুশি। বারবার প্রশংসা করেন, 'এত ভালো খাবার জীবনে কখনও খাইনি' ঘুরে ফিরেই বলছেন। রাজ-রাজড়ারা তো চিঁড়ে, মুড়ি খান না, পোলাও কালিয়া খাওয়াই তাঁদের অভ্যেস। এক কথা অনেক বার শুনতে শুনতে হঠাৎ ভুলে একটি মেয়ে কথা কয়ে ফেলেছে। সে খোনা কন্যে। সে বললে, 'ভাঁনো ধাঁনেন ভাঁনো চিঁনা, ভাঁনো খাঁইবেঁন নাঁ?' শুনে তাড়াতাড়ি টরটরি বোন বললে, 'টিনি টিনটু টইয়া ডিছেন, টঠা টইটে না!' তখন তিন নম্বর বোন বললে— 'ততোস্মা-ত্‌তোস্মা ক্বইল্লে ক্বথ্‌থা আ-আ-আম্মি ক্বইল্লাম্‌ ন্না!' আর সেই শুনে, রাজামশাইয়ের মুখ চুন, মাথায় হাত। মন্ত্রীমশাইয়ের মুখ কালি, মাথায় হাত। গাঁসুদ্ধু মানুষের চোখে জল এসে গেছে। ফস্কে গেল। রানি হওয়া আর হল না, হল না! যাঃ!

কেবল এগিয়ে এলেন পক্ককেশ বৃদ্ধ রাজবৈদ্য। রাজবৈদ্য হেসে বললেন—'নিয়ে আপনার ভাবনার কিছুই নেই, ও রোগ আমিই সারিয়ে দেব, রাজামশাই। এর খুব ভালো দৈব ওষুধ আছে, আমি জানি।' বলে আর একটু হেসে বললেন 'যদি অভয় দেন তবে বলি, আপনার শৈশবে আপনি স্বয়ং এই তিনরকম রোগেই ভুগেছেন। কিন্তু এখন তার কোনও চিহ্ন আছে কি?' এবার রাজার মুখে হাসি ফুটল, যেন মেঘের মুখে সূয্যি উঠল— 'সত্যি?' তিন কন্যেকে কোলে নিয়ে, আশীর্বাদ করে রাজামশাই বললেন, 'তবে ট্যাঁড়া

পিটিয়ে দেওয়া হোক?'

ইতিমধ্যে রাজার পালকি গিয়ে ভিনগাঁ থেকে বদ্যিবুড়োকে নিয়ে এসেছে। রাজবৈদ্যও গিয়ে নৌকো থেকে তাঁর ওষুধের বাক্সটি এনেছেন। হজমিগুলির মতো একরকম গুলি তিনি মেয়েদের একটি একটি খাইয়ে দিলেন। কী গুলি, কে জানে? খেয়েই তিন মেয়ে একসঙ্গে পাখির মতো মিষ্টি গলায় স্পষ্ট বলে উঠল, 'রাজামশাই পেন্নাম হই। আমি রুমা, আমি ঝুমা, আমি টুমা। আর ইনি আমাদের দাদুভাই।' বদ্যিবুড়ো তো নাতনিদের পরিষ্কার বাক্যি শুনে হা! আহ্লাদে বুঝি বাঁচে না। তারপর রাজা যখন বদ্যিবুড়োর নাতনিদের বউমা করে রাজবাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন, তখন বুড়োর খুশি আর গর্ব দ্যাখে কে? সারা গ্রাম আনন্দে মেতে উঠলো। কেবল বদ্যিবুড়ো বললে, 'কিন্তু রাজামশাই, বড় হলে আমার নাতনিদেরও যে বদ্যি বানাবার ইচ্ছে ছিল?' রাজামশাই বললেন, 'তাদের সে ইচ্ছেয় বাগড়া দেবে কে? বড় হয়ে আলবাত বদ্যি বনবে আমার বউমারা।'

সাত কন্যের দেশ

সেই দেশে কোনও রাজা ছিল না, রানি ছিল না, রাজপুত্তুরও ছিল না। ছিল কেবল রাজকন্যে। একজন নয় দুজন নয় সাত-সাতজন রাজকন্যে। প্রত্যেকেই জুঁইফুলের মতো সুন্দর। বড় রাজকন্যের বয়েস ষোলো। মেজো-রাজকন্যের পনেরো। সেজো-রাজকন্যের চোদ্দো। ন'রাজকন্যের তেরো, রাঙা-রাজকন্যের বারো, ফুল-রাজকন্যের এগারো আর ছোট-রাজকন্যের সবে দশবছর। তাদের গার্জেন আছেন দুজন। বুড়োমানুষ মন্ত্রীমশাই। আর তাদের ধাইমা। এখন কথা হচ্ছে রাজকন্যেদের বাবা-ই বা কোথায়, মা-ই বা কোথায়?

সাত সাতজন রাজকন্যে,
প্রত্যেকে জুঁইফুল
যেমন রূপে তেমনি গুণে
নেই কো তাদের তুল।।

সে তো হল। কিন্তু মা-বাবা? মা-বাবা কেন নেই? রাজ্য আছে, রাজামশাই নেই। রাজকন্যেরা আছে, রানিমা নেই—এ কেমন ধারা?

সে এক কাহিনি। রাজামশাইয়ের রাজকন্যেদের নিয়ে মনে সুখ ছিল না। তাঁর কেবলই এক কথা রাজপুত্তুর আর রাজপুত্তুর। রাজপুত্তুরদের জন্য ছোঁকছোঁক।

রানি যত বলেন, সাত কন্যে যেন সাতটি তারার মতো জ্বলজ্বল করছে, রাজামশাই, তোমার মন ভরছে না কেন?

রাজা উত্তর দেন, রাজপুত্তুর চাই-ই, নইলে আমার রাজ্য দেখবে কে?

রানি বললেন, কেন? এ আবার কেমন কথা! সাত-সাতজন মেয়ে যদি তোমার রাজ্যের দেখাশুনো করতে না পারে, তবে মাত্র একজন ছেলে এসেই সেটা পেরে যাবে? তুমি একাই যা পারছ, ওরা সাতজনে তা পারবে না, তা কখনও হয়?

রাজামশাই বললেন, আহা, ওরা যে মেয়ে!

মেয়ে তো কী হয়েছে? মেয়ের কি চক্ষু নেই, কর্ণ নেই, বুদ্ধি নেই, বাক্যি নেই, মগজ নেই, কলজে নেই? রানিমা বললেন, না রাজামশাই এটা তোমার ঠিক কথা হল না কিন্তু!

রাজামশাই ছেলে-ছেলে করে খেপে উঠেছেন শুনতে পেয়ে দেশ-বিদেশ থেকে হাকিম-বদ্যি-ডাক্তার-কবরেজ-জাদুকর-দরবেশ-ফকির-সন্ন্যাসী-সাধু অবধূত...হাজারো রকমের মানুষ সেই দেশে আসতে শুরু করল। সবাই বলে রাজপুত্তুরের ব্যবস্থা করে দেবে। মন্ত্রীমশাই রাজ্যের সব তোরণ বন্ধ করে দিলেন। নইলে যে রাজার রাজ্যপাঠ শিকেয় উঠবে! এমন সময়ে এক কাপালিক এসে ঘণ্টা বাজালো। তার ভীষণ পাহাড়ের মতো চেহারা। জবাফুলের মতো চোখ। আর মাথায় বটগাছের মতো জটা। পরনে লাল টকটকে ধুতি। কাপালিক বললে, 'জয় মা পিশাচিনী জয় মা সর্বনাশিনী! রাজার পুত্র হোক! দোর খোল ব্যাটা মন্ত্রী! 'নইলে তোর কী করি দ্যাখ!' ভয়ে ভয়ে তোরণদ্বার খুলে দিলেন মন্ত্রীমশাই। কাপালিক এসে রাজা-রানিকে নিয়ে পুজোর ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করলেন।

তারপর? তারপর আর সেই দোর কেউ খুলতেই পারে না! লোহার হুড়কো দিয়ে ধাক্কা মেরেও না। শেষে হাতি দিয়ে ধাক্কা দেওয়া হল, দোর ভেঙে পড়ল, দেখা গেল ঘর ফাঁকা। রাজা নেই, রানি নেই, কাপালিক নেই। কেবল বেচারি ঠাকুররা মন খারাপ করে সারি সারি সিংহাসনে বসে আছেন। মেঝেয় সুড়ঙ্গ কাটা রয়েছে।

তখন ছোট রাজকন্যের মোটে তিন বছর বয়েস। তারপরে আরও সাত বছর কেটে গেছে। রাজ্যে রাজ্যে কত দূত গেছে, দিগ্বিদিকে কত খোঁজ করা হয়েছে, না মিলেছে রাজা-রানির খবর, না কাপালিকের। এ রাজ্যে রাজমুকুটও নেই রাজদণ্ডও নেই!

মন্ত্রী বলেছেন বড় রাজকন্যের আঠারো বছর হলেই তার অভিষেক করে, তাকেই সিংহাসনে বসানো হবে। দুবছর দেরি আছে এখনও। খুব যত্ন করে সাত রাজকন্যেকে সব রকমের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, শাস্ত্র শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে। সাতকন্যেই যুদ্ধবিদ্যা শিখছেন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কাব্য, দর্শন, অঙ্ক, বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিখছেন নৃত্যগীত, শিখছেন রন্ধনশিল্প। মন্ত্রীপত্নীও তাদের খুব স্নেহ করেন, আর ধাইমা তো আছেনই।

মেয়েরা চুপিচুপি ঠিক করল, রাজত্বের ভার নেবার আগেই তারা একবার বাবা-মাকে খুঁজতে বেরুবে। যেই কথাটা মন্ত্রীকে জানাল, মন্ত্রী বললেন, 'ওসব ভাবনা ছাড়ো। কোথায় খুঁজতে যাবে আনতাবড়ি? এতদিন ধরে এত লোকজন, গুপ্তচর, পুলিশ, সৈনিকরা যাদের খুঁজে পেল না, বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা তাদের পাবে? শেষে তোমরাও হারিয়ে যাবে! না বাবা আমার এতে মত নেই।'—কিন্তু রাজকন্যেরা রোজ রাত্রে একটা বিরাট বড় খাটে বিশাল মস্ত বিছানা পেতে শুয়ে শুয়ে পরামর্শ করে। কবে তারা যাবে মাকে খুঁজতে, বাবাকে খুঁজতে।

কী ভয়ানক এক কাপালিকের পাল্লায় পড়েছিলেন তাঁরা। হয়তো কোনওদিনই ফিরে আসতে পারবেন না, উদ্ধার করে ধরে নিয়ে না এলে। সাতবছর পেরিয়ে গেছে, পারলে কী ফিরে আসতেন না?

তারপর এক বাসন্তী পূর্ণিমায়, ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে দক্ষিণের সমুদ্র থেকে, আকাশে মস্ত বড় হলুদ চাঁদ, বাগানভরতি রূপুলি চাঁদনি, সাত রাজকন্যে চুপি চুপি বিছানা থেকে উঠে সুড়ঙ্গ পথের দিকে চলল। প্রথমে বড়, তারপর মেজো, তারপর সেজো। এমন করতে করতে সব শেষে ছোটকে কোলে করে নামিয়ে নিল দিদিরা। প্রত্যেকের হাতে একটি করে সোনার প্রদীপ।

এবার কোথায় যাব?

সাতবোনে শক্ত করে ধরে রইল এ-ওর হাত। তারপর খুব সাবধানে সুড়ঙ্গের মধ্যে পা ফেলে পা ফেলে, এগোতে লাগল।

ঠান্ডা শীতল সুড়ঙ্গ পথ
নিঝুম আঁধার করে
সাতকন্যে এ-ওর কোমর
শক্ত হাতে ধরে।

উঃ! কী লম্বা পথ! সুড়ঙ্গ যেন ফুরুতেই চায় না। মাঝে-মাঝে ফোঁটা ফোঁটা কী যেন পড়ছে ছাদ থেকে। 'ও কিছু না'; বড়ো কন্যে বললে, 'ও জলের ফোঁটা। ওপরে তো ভিজে মাটি!' মাঝে-মাঝে পায়ের ওপর দিয়ে কী যেন চলে যাচ্ছে সড়সড় করে। বড়োকন্যে বলে, 'ও কিছু না। ওরা কেঁচো, কেন্নো। এখানটাতে তো ওদেরই বাড়ি-ঘর, আমরা ওদের বিরক্ত করছি কিনা?' তাড়াতাড়ি সাতবোন বললে, 'ভাই কেঁচো, ভাই কেন্নো, কিছু মনে কোরো না, আমরা মা-বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি। তোমরা পথ দেখিয়ে দাও।'

এখন হয়েছে কী, কেঁচো ছিল, কেন্নো ছিল, ঠিকই। আরেকজনও ছিল, সে হচ্ছে ওই রাজবাড়ির বাস্তুসাপ। তারও ওই সুড়ঙ্গে বাসা কিনা। রাজকন্যেদের পায়ের শব্দে তারও ঘুম ভেঙে গেছে। সে শুনতে পেল রাজকন্যেরা বলছে,

'রাগ কোরো না, রাগ কোরো না
সুড়ঙ্গনিবাসী—
বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে
আমরা ফিরে আসি।'

শুনে বাস্তুসাপের মনে খুব আহ্লাদ হল। রাজা-রানি নেই বলে তারও তো খুব মনে কষ্ট।

সাতশো বছর ধরে সে রাজসিংহাসনে পাহারা দিচ্ছে মাটির নীচে বসে বসে। হঠাৎ কী যে হল কাপালিকটা এসে মন্ত্র পড়ে আগেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলে, রাজা-রানি, মুকুট, দণ্ড নিয়ে পালিয়ে গেল। জেগে উঠে বাস্তুসাপ কিছু করতেই পারলে না। এজন্য তো প্রাণে

বড় আপশোশ। রাজকন্যেদের কথা শুনে সে খুব খুশি, 'আহা বাছারা একা একা যাচ্ছে,' বলে সে-ও চললো রাজকন্যেদের পিছু পিছু পাহারাদার হয়ে, 'আমিও যাই সঙ্গে।'

আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গের শেষে আলোর চাকতি দেখা গেল। সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠে এসে জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়ল সাতবোন।

'সোনার প্রদীপ জ্বলজ্বল
পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।'

অমনি সাত প্রদীপের সাতটি শিখা হঠাৎ বাঁ-দিকে হেলে পড়ল। দেখে আহ্লাদে বড়োকন্যে বললে, 'ও, বাঁদিকে যাব? থ্যাংক ইউ!'

সাতবোন বাঁদিকে চলল। সাবধানে। আস্তে। তখনও সূর্য ওঠেনি, জঙ্গলে কতরকম শব্দ হচ্ছে, পোকামাকড়ের কুটকুট কুরুর কুরুর...রাত পাখিদের টিট্টি...টিট্টি...হায়েনার হা হা হাসি...শেয়ালের হুক্কা হুয়া...বাঘের হালুম...।

ওই জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা মন্দির আছে। তারই মধ্যে সেই কাপালিকের বাস। সে একটা মহা পিশাচীব্রত করেছিল। যাতে এক রাজা-এক রানিকে ধরে এনে দাস-দাসী করে রাখতে হবে দশবছর—তারপরে বলি দিতে হবে। তাহলেই সে জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হয়ে যাবে। সে যা চাইবে তাই হবে। তার যা ইচ্ছে করবে বিনা প্রশ্নে সবাই সেটা মানবে। তাই সে রাজা-রানিকে ধরে এনে দাস-দাসী করে রেখেছে। সাত বছর হয়েছে। আর তিনবছর পরে তাদের রাজবলি দেওয়া হবে। রাজবলি দিলেই কাপালিকের মহাপিশাচীব্রত উদ্‌যাপন হয়ে যাবে। তারপর থেকে সে এই পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজা।

এসব কথা তো মেয়েরা জানে না। কিন্তু প্রদীপরা জানে। জানে বাস্তুসাপও। জানে মাটি, জানে বাতাস, জানে জলের ফোঁটা। তারা সবাই ব্যাকুল মেয়েরা যাতে মা-বাবাকে উদ্ধার করে আনতে পারে।

প্রদীপরাই পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। বাতাস তাদের সাহায্য করল। মাটি নরম হয়ে রইল, জল নিজেকে সামলে রাখল। আর বাস্তুসাপ চলল পিছনে পিছনে পাহারা দিতে দিতে।

মন্দিরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ভোর হয়ে গেল। রাজা-রানি উঠেছেন সূর্য ওঠার আগে। বন থেকে কাঠ কুড়োচ্ছেন, উঠোন ঝাঁট দিচ্ছেন, কুয়ো থেকে হেঁইও হেঁইও করে জল তুল্‌ছেন। তাঁদের এক পায়ে কিন্তু লম্বা শেকল বাঁধা। তাতে চালাচাবি দেওয়া। সেই চাবি কাপালিকের পইতের সঙ্গে বাঁধা। কাপালিক কখনও ঘুমোয় না। চব্বিশ ঘণ্টা জেগে থাকে। নানারকমের ভয়ঙ্কর সব পুজো-আর্চা করে, ভগবানের পুজো নয়, মহাপিশাচীর পুজো।

বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে রাজকন্যেদের হাতের প্রদীপগুলি হঠাৎ ঝুপ করে নিভে গেল। ছোটোরা ভয় পেয়ে কেঁপে উঠল, 'দিদি কী হবে?' বড়কন্যে বললে, 'কিচ্ছু হবে না। সূর্য উঠেছেন তাই দীপ নিভে গেছে। আলোর মধ্যে প্রদীপ দিয়ে কী হবে?' মেজোকন্যে বললে, 'দিদি, ওই দ্যাখো, একটা ভাঙা মন্দির! আমরা বোধহয় কাপালিকের আস্তানায় এসে গিয়েছি।

তাই দীপ নিভে গেল।'

সেজোকন্যে বললে,—'দিদি, চলো আমার বরং লুকিয়ে লুকিয়ে যাই।' এবারে প্রত্যেকে বড় বড় একটা করে গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে মুখের সামনে ধরে, তার পিছনে লুকিয়ে এগোতে থাকল। ওদের দেখা যাচ্ছে না। শুধু গাছই দেখা যাচ্ছে। বনের মধ্যে একটা গাছ থেকে আরেকটা গাছকে তফাত করবে কে?

রাজামশাই রানিমা তখন কাঠ কুড়ুতে মন্দিরের পিছনে এসেছেন। একপায়ে ভারী শেকল ঝনাত ঝনাত করে টানতে টানতে।

বড়মেয়ে চট করে ছোট্টবোনকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, বোনদের বললে—'চুপ! চেঁচিও না যেন! ওই দ্যাখো বাবা-মা বেঁচে আছেন। আমরা ওঁদের উদ্ধার করব। তার আগে যদি নিজেরাই ধরা পড়ে যাই, তাহলে তো হবে না?' বোনেরা খুব সুবুদ্ধিমতী। তারা দিদির কথা বুঝল। যতই ইচ্ছে করুক ছুট্টে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতে, বাবার কোলে উঠতে, তারা কিচ্ছুটি করল না। মেয়েরা চুপি চুপি একটা গাছের পিছনে গিয়ে গোল হয়ে বসল। এবার ঠিক করতে হবে কী করা!

হঠাৎ তারা দ্যাখে সামনেই ভীষণ লম্বা আর ইয়া মোটা, দুধের মতো ধপধপে সাদা এক সাপ। সেই সাপের কিন্তু চোখ দুখানি সাপের চোখের মতন নিষ্ঠুর নয়, নরম, স্নেহ-মমতায় ভরা। সেই দুধ-অজগরই আসলে রাজবাড়ির বাস্তুসাপ। বাস্তুসাপ মেয়েদের সামনে এসে মাথা খাড়া করে বললে, 'রাজকন্যেরা ভয় পেও না। আমি তোমাদের রক্ষা করছি। বনে-জঙ্গলে আমি কাছে থাকলে তোমাদের কোনও ভয় নেই। আমার গন্ধ পেলেই বাঘ-সিংহী সব দূরে পালিয়ে যাবে। আমি তোমাদের রাজবংশের বাস্তুসাপ। তোমাদের দাদু হই। তোমাদের মা-বাবাকে উদ্ধার করতে সাহায্য করতে এসেছি। আমি আগে গিয়ে দেখছি কাপালিক কী করছে, তারপর কী করতে হবে বলছি। ততক্ষণ তোমরা আমার মাথার এই মণিটা ধরো, এই মণিই তোমাদের রক্ষা করবে। এখান থেকে যেন কোথাও যেও না!' বলে তাদের সেখানে লুকিয়ে রেখে মাথার মণিটা বড়কন্যের হাতে দিয়ে সাপদাদু চলে গেলেন। মেয়েরা পাতার ফাঁক দিয়ে দেখছে, আহা, রাজামশাই-রানিমা কত রোগা হয়ে গেছেন, তাঁদের পরনের পোশাক ছিন্নভিন্ন, তাঁরা কষ্ট করে নীচু হয়ে হয়ে কাঠকুঠো কুড়োচ্ছেন! মেয়েদের চোখে জল বাঁধ মানছে না!

খানিক পরে সাপদাদু ফিরে এলেন।

—সব দেখেশুনে এসেছি। বুঝলে? কাপালিক রাত্রে যখন পুজোয় বসবে তখন সে বারো ঘণ্টা আসন ছেড়ে উঠবে না। আমি তখন গিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরব। সে বাঁধন খোলবার শক্তি তার নেই। তখন তোমরা তার পৈতে থেকে চাবি নিয়ে মা-বাবার শিকলির তালা খুলে দেবে। তারপর বাবা-মাকে নিয়ে সুড়ঙ্গ দিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে যাবে। সন্ধে হলেই সোনার প্রদীপেরা আপনি জ্বলে উঠবে।'

'আর দাদু, তুমি।'

'আমি? তোমরা মহাভারতের গল্প জানো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'লৌহভীম চূর্ণ করার গল্প জানো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'কী হয়েছিল?'

'ধৃতরাষ্ট্র রেগে গিয়ে ভীমকে এত জোরে জাপটে ধরেছিলেন যাতে তাঁর হাড় সব গুঁড়ো হয়ে যায়। কিন্তু পাণ্ডবরা জানতে পেরে লোহার ভীম তৈরি করে ধৃতরাষ্ট্রের সামনে পাঠিয়ে ছিলেন।'

'তারপর? সেই লোহার ভীমের কী হল?'

'ধৃতরাষ্ট্রের প্রবল আলিঙ্গনে লৌহভীম চূর্ণ-বিচূর্ণ, মানে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।'

'আমি কাপালিককে ঠিক তাই করব। এমন জোরে জড়িয়ে ধরব, যে তার সবগুলো হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো ঝুরঝুরে হয়ে যাবে। সে আর দুষ্টুপনা করতে পারবে না। মানুষের ক্ষতি করতে পারবে না। পৃথিবী রক্ষা পাবে।'

'তারপর?'

'তারপরে আবার আমি রাজবাড়িতে ফিরে আসব।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

'ঠিক?'

'ঠিক!'

সাত রাজকন্যের কাছে সাতবার কথা দিতে হল বাস্তুসাপদাদুকে।

ঠিক ফিরবে তো?

'ফিরব, ফিরব। এখন একটু ফলমূল খেয়ে ঘুমোয় তোমরা।' বলতেই গাছেরা টুপটুপ করে পাকা-পাকা, সুগন্ধি, মিষ্টি-মধুর ফল ফেলে দিল। সেই ফল খেয়ে রাজকন্যেদের খিদে-তেষ্টা মিটে গেল। কন্যেরা একটু ঘুমিয়ে পড়ল। সারারাত হেঁটেছে, ক্লান্ত।

একসময়ে সাপদাদু এসে তাঁদের জাগিয়ে দিলেন। ফোঁস, ফোঁস, ফিসফিস করে বললেন, 'চলো দিদিরা, সময় হয়েছে। তোমার মা-বাবা ঘুমিয়েছেন। আর কাপালিক পুজোয় বসেছে। এবার চাবি চাই। আমি আগে যাব। যেই আমি শাঁখ বাজানোর মতন শব্দ করব, তোমরা আসবে। তার মানে, অল ক্লিয়ার।'

মেয়েরা আকুল হয়ে কান পেতে রইল। একটু বাদে শাঁখ বেজে উঠল। ছুটে ছুটে মন্দিরে ঢুকে তারা দ্যাখে কী দুষ্টু কাপালিককে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বেঁধে ফেলেছেন সাপদাদু। সে আর নিশ্বাস ফেলতে পারছে না। বড়কন্যে গিয়ে খুব সহজেই চাবিটা খুলে নিল পইতে থেকে। সবাই শুনতে পেল মুড় মুড় মুড় মুড় করে কাপালিকের হাড়গুলো ভাঙছে।

ওদিকে মন্দিরের চাতালে তো রাজা-রানি ছেঁড়া মাদুরে বিনা বালিশে দীনহীন হয়ে ঘুমিয়ে আছেন। সারাদিন পরিশ্রমের পরে ক্লান্তিতে তাঁদের ঘুমের অভাব হয় না। রাজশয্যার দরকার নেই, ভূমিশয্যাই ঢের। মেয়েরা গিয়ে চাবি খুলে শেকল খুলে আগে তাঁদের মুক্ত করে দিলে।

তারপর, 'মা গো!'

তারপর, 'বাবা গো!'

তারপর, 'ওরে আমার সোনামণিরা! তোরা কোত্থেকে এখানে এলি? পালা, পালা,

শিগগিরি পালা!'—

মেয়েরা বলল, 'পা নেড়ে দ্যাখো।'

রাজা পা নাড়লেন। আঃ কী হালকা! কই শেকল কই? বাঃ! রানিমা পা নাড়লেন। আঃ, কী হালকা! আরে শেকল তো নেই? বাঃ।

মেয়েরা কোলে চড়ল, পিঠে উঠল, হাসল, কাঁদল, আর তক্ষুনি হাতের প্রদীপগুলি দপদপ করে জ্বলে উঠল। ডানদিকে হেলেছে এবারে শিখাগুলি। 'চল, চল, চল।'

রাজা-রানিকে নিয়ে সাতমেয়ে ফিরে চললো সুড়ঙ্গের দিকে। ডানদিকের পথ ধরে।

সেদিন সকালে তো রাজবাড়িতে ধুন্ধুমার কাণ্ড পড়ে গেছে। রাজকন্যেরা উধাও। মন্ত্রীমশায়ের মাথায় হাত! ধাইমা কেঁদে কেঁদে সারা। দিগ্বিদিকে চর পাঠানো হল, পুলিশ পাঠানো হল। সারাদিন সারারাত রাজ্যে কারুর ঘরে উনুন জ্বলল না, কারুর চোখের দু-পাতা এক হল না। রাজ্য জুড়ে হাহাকার। একদিন, একরাত এমনি করেই কাটল। পরের দিন সকালে উঠে শুকনো মুখে রাজসভায় এসে মন্ত্রীমশাইয়ের আরেকবার মাথায় হাত।

সিংহাসনে রাজামশাই বসে আছেন। মাথায় মুকুট ঝলমল করছে। হাতে রাজদণ্ড জ্বলজ্বল করছে। পাশে রানিমা। পরনে লালপাড় গরদের শাড়িটি যেন মা লক্ষ্মী। আর কোলে কাঁখে সাত-রাজকন্যে যেন সাতশো অলঙ্কার হয়ে আলো করে আছে সভাঘর।

এইখানেতেই গল্প শেষ

সভাশুদ্ধ 'বেশ! বেশ!'

রাজামশাই আর রাজপুত্তরের কথা মুখেও আনেন না। সাতকন্যে তাঁদের উদ্ধার করে এনেছে। রাজ্য তারা দিব্যি চালাতে পারবে। মেয়েরা কিন্তু বললে,

'আমরা না। উদ্ধার করেছেন সাপদাদু।'

এমন সময়ে সুড়ঙ্গ থেকে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ উঠল, 'তোমরা নিজেরা সাহস করে ছুটে না গেলে ভাই—আমি একলা কিছুই পারতুম না! তা পারলে তো কত আগেই উদ্ধার করে ফেলতুম আমার রাজামশাই আর রানিমাকে। আমি না, একাজ তোমাদেরই! রাজামশাই যেন ভুলো না, এই মেয়েদের নেই তুলনা!'

তারপর? তারপর—

সাতকন্যের সোনার দেশে
কেবল খুশির আলো।
সবাই খাটে, সবাই খেলে,
সবাই বাসে ভালো।
রাজামশাই রানিমায়ের
কোলভরা সাতকন্যে
রাজ্যে হাসির ঢল নেমেছে
এই মেয়েদের জন্যে।।

হিয়ামন, দিয়ামন, আর খুশি পাখির গান

অনেক, অনেক দূরের এক দেশে একটি দীনদুঃখী গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের লোকেরা বড় গরিব। তারা চিরদুঃখী, খুশি কাকে বলে তারা কোনওদিনই জানতে পারেনি। তাদের আকাশ ছিল সারাক্ষণ ধোঁয়াটে, কুয়াশায় ছাওয়া, রোদ্দুর উঠত না, আর হিমেল বাতাস বইত সারাক্ষণ। তাদের মাঠে ঘাস ছিল সব শুকনো, ফ্যাকাশে, সবুজ ঘাস দ্যাখেনি তারা কেউ কোনওদিন। খেতে বাজরা ছাড়া আর কোনও শস্য হত না, ধান, গমের নামই শোনেনি ওরা। বেচারিদের গাছে ফল ছিল না, ফুল ছিল না। ওরা কেউ ফুলের গন্ধ শোঁকেনি, ফুলের মালা গাঁথেনি। ওরা কেউ ফলের বাগিচা দ্যাখেনি, পাকা ফলের সুবাস জানেনি, স্বোয়াদ চেনেনি।

ওদের গ্রামের পাশে একটা ছোট গর্ত থেকে বুড়বুড়ি কেটে মাটির তলার জল উঠে এসে সরু নালার মতো জলের ধারা হয়ে বয়ে চলেছে। সেটাই ওদের নদী। ওখানে ঝরনা নেই, নদী নেই, রং নেই, সুর নেই, গান নেই, নাচ নেই। ওখানে সবুজ ঘাস নেই, ঘাসফড়িং নেই, ফুল নেই, প্রজাপতি নেই, পাখপাখালি নেই, আমোদ-আহ্লাদ নেই। সাধে কী তার নাম দুঃখী গ্রাম?

ওদের শিশুরাও খুশি জানে না। কেউ হাসে না, কেউ ফুর্তি করে না। সবারই ভুরু দুঃখে কুঁচকে আছে। প্রকৃতি মা-ও ওদের মায়াদয়া করেন না। বরফ ঝড় দেন মাঝে-মাঝে।

ওদের সারা বছরের খাদ্য, সামান্য বাজরার খেতটুকু ধ্বংস করে দিয়ে বর্ষা নামান। পাথরের চাঁই-এর ধস নামিয়ে রাস্তা বন্ধ করে, পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে নিজের ভার নিজে সামলাতে না পেরে আলুথালু, পাহাড়ে বর্ষা আসে। ওই সরু নালাতে তখন হঠাৎ বান ডাকে। বাজরার খেতটাও নষ্ট করে দেয়।

কে জানে কবে, কেউ জানে না কার অপরাধে এই গ্রাম দেবতাদের কোপে পড়েছিল। সেই থেকেই ওরা দীন দুঃখী। এমনকী ওদের কোনও গ্রাম-দেবতাও নেই যিনি ওদের রক্ষা করবেন। বুড়োমানুষরাও হাসিখুশি মানুষ দ্যাখেনি, হাসিখুশি জীবন জানেনি, কেউই জানতে পারেনি কাকে বলে খুশি থাকা।

খুব বুড়ো দাদু আর বুড়ি দিদিমারা অবিশ্যি বলতেন, অনে-ক দূরে, সে-ই পুব পাহাড়ের দেশে এক খুশি পাখি আছে, তার গান শুনতে পেলে জীবনে খুশি আসে। কিন্তু কেউ তাকে দ্যাখেনি। প্রতি বছর ওদের গ্রাম থেকে কেউ না কেউ একজন অল্পবয়সি ছেলে জেদ করে বেরিয়ে পড়ে খুশি পাখির খোঁজে, কিন্তু ফিরে আসেনি কেউ।

দিয়ামন আর হিয়ামন দুই বোন ছিল সেই গ্রামে। একদিন দিয়ামনের খুব অসুখ করল। সে সারাক্ষণ শুয়ে থাকে, কোনও কথা বলে না, কিছুই খেতে চায় না, উঠে বসতে পারে না। হিয়াদিদি যত চেষ্টা করে বোনের অসুখ সারাতে, কিছুতেই সারাতে পারে না। কবিরাজ, হেকিম, ডাক্তার সবাই হার মেনে গেল। দিয়া কেবলই রোগা হয়ে শুকনো হয়ে দুর্বল হয়ে যেতে থাকল।

একদিন রাতে হিমায়ন বসে বসে কাঁদছে, দিয়ামনের কষ্ট সারাতে পারছে না বলে। দিয়া কথা বলল। দিয়া বলল, 'হিয়াদিদি, আমাকে খুশি পাখির গান শোনাবি? আমি তাহলেই সেরে উঠব।'

হিয়ামন তো লাফিয়ে উঠেছে। 'নিশ্চয়ই। এ আর এমনকী? এক্ষুনি যাচ্ছি ওকে ধরে আনতে। পুবের পাহাড়ে, খুশি গ্রামে তার বাসা, কে না জানে?'

সেটা জানলে কী হবে, পথের সন্ধান কেউ জানে না। আর পথের মধ্যে যে তিনজন দৈত্য বসে আছে খুশি পাখিকে পাহারা দিয়ে, সেটা সবার জানা। যারা তাকে খুঁজতে যায়, দৈত্য তাদের ধরে খুশিগ্রামের প্রহরী করে রেখে দেয়। মানুষের ভাষা তাদের আর মনেই থাকে না।

হিয়াদিদি বিপদের কথা সবই জানে। তাও ছোট্ট রুগ্ণ বোনটার শখ সে না মিটিয়ে পারবেই না। একটা পুঁটলিতে বাজরার রুটি আর গুড় নিয়ে বেরিয়ে পড়ল হিয়ামন। যাত্রা পুবের পাহাড়ে, খুশি গ্রামের দিকে।

এদিকে খুশি পাখিকে যে কেমন দেখতে, তা কেউ জানে না। সে টুনটুনির মতো, না টিয়াপাখির মতো, না ঈগলপাখির মতো, কেউ বলতে পারে না। কেউই তো তাকে দ্যাখেনি ওদের গ্রামে, লোকে তার খোঁজ করবেটা কোন উপায়ে?

হিয়াদিদি সুয্যি ওঠামাত্তর বেরিয়ে পড়ল, সুয্যির দিকে মুখ করে হাঁটছে তো হাঁটছে, পুবের পাহাড় আর আসেই না। এল ভয়ানক এক অরণ্য। তার মধ্যে ঢুকে পড়ল হিয়া,

অরণ্যের শেষে নিশ্চয় পুবের পাহাড়। কিন্তু তার মাঝামাঝি গিয়ে সে দ্যাখে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে এক দত্যি বুড়ো, তার সব চুলদাড়ি সবুজ জট পাকানো। সে কটমট করে তাকিয়ে বললে, 'তুই তো কম বেয়াদব নোস, পুব পাহাড়ে যাবি? আমি তোকে চাবি-ই দেব না পাহাড়ের। লাল দত্যির মাকে মেরে আমাকে তার মুণ্ডু এনে দে, তবে চাবি পাবি।'

হিয়ামন শিউরে উঠে বললে, 'সে কী? ছিছি, না না না, আমাদের মা নেই, কত কষ্ট! আমি কারুর মাকে মারতে পারব না, আমি ঠিক চাবি বের করে ফেলব।'

সবুজ রং-এর বনদত্যি রেগেমেগে বললে,—তবে রে? তোকে মজা দেখাচ্ছি, ন'শো নিরানব্বুই মাইল হাঁটাব কাঁটা বিছানো পথে! পায়ের দফারফা করে দেব।'

বলেই সে একটা ফুঁ দিল।

ব্যস, বনের পথে অমনি লক্ষ লক্ষ তীক্ষ্ণ কাঁটা বিছিয়ে গেল। একশো মাইল, খালি খালি ছুঁচের মতো কাঁটা ফুটল হিয়ামনের পায়ে। পাঁচশো মাইলে ছুরির মতো কাঁটা। বেচারি হিয়াদিদির কচি পা কেটে রক্ত বেরুতে লাগল, তবু সে বোনের জন্যে সব কষ্টে রাজি।

ন'শো নিরানব্বই মাইলে পা দুটো ফালাফালা হয়ে গেল। বনের বাইরে এসে দাঁড়াল হিয়া। সেখান দিয়ে এক নীল ঝরনা বইছে। ঝরনার শীতল জলে হিয়া যেই পায়ের রক্ত ধুয়ে নিয়েছে, অমনি পায়ের সব কষ্ট সেরে পা যেমন কে তেমন। অবাক কাণ্ড! তাহলে জলটাই কি ম্যাজিকের?

জলের ধারে একটু রুটি গুড় খেয়ে নিয়ে হিয়া দেখল এবারে সামনে এবড়ো-খেবড়ো এক পাথুরে পোড়ো জমি পড়ে আছে—যতদূর চোখ যায়। হিয়াদিদি কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। খোঁচা খোঁচা পাথরে আবার তার পা কেটেকুটে একাকার। হঠাৎ সামনে এল এক লাল দাড়িগোঁফওয়ালা দত্যি বুড়ো।

'খুশি গ্রাম? ইয়ার্কি পেয়েছ? আগে সবুজ দত্যির বোনকে মেরে তার মুণ্ডুটা আমাকে এনে দে, তবে তো গ্রামের চাবি পাবি?'

শিউরে উঠে হিয়া বলে, 'তোমরা কি সবাই পাগল? আমার ছোট বোনের জন্যে আমি এত কষ্ট স্বীকার করছি, আমি কখনও আরেকজনের বোনকে মেরে ফেলতে পারি? চাইনে তোমার চাবি, আমি ঠিক ঢুকতে পারব।'

শুনে লাল দত্যি বললে, 'এত বড় আস্পদ্দা? দাঁড়াও তোমাকে আস্পদ্দার শাস্তি দিচ্ছি। ন'শো নিরানব্বই মাইল তুমি অনাহারে আর বিনা জলে কষ্ট পাবে।'

বলেই সে একটা ফুঁ দিল, আর হিয়ার হাত থেকে রুটি গুড়ের পুঁটলিটা সেই দমকা বাতাসে উড়ে বেরিয়ে অনে-ক দূরে চলে গেল। আর দেখাই গেল না ওটাকে। আর পায়ের নীচে পাথুরে রাস্তাটা কী গরম! হিয়া তো চলছে, চলছেই। একশো মাইলে তার গলা শুকিয়ে প্রবল তেষ্টা পেল, খালি পেট গুড়গুড় করতে লাগল। চারিদিকে শুকনো পাথুরে মরুভূমি, জলের চিহ্ন নেই, পা এদিকে আবার ছুঁচলো পাথরে কেটেকুটে একাক্কার হচ্ছে! পাঁচশো মাইলে তার খিদেয় পেটব্যথা করতে থাকল। ন'শো নিরানব্বুই মাইলে খিদেয় তেষ্টায় হিয়ামনের মাথা ঘুরছে, পা টলছে, সামনে দেখল সাদা ধবধবে রুপোর

মতো রং-এর এক পাহাড়!

এই তাহলে পুব পাহাড়! ভাবল হিয়ামন। পাহাড়ের পায়ের কাছে মস্ত এক আয়নার মতো জলের দিঘি, আর তার চারিপাশে, আম, জাম, পেয়ারা, সফেদা, লিচু, জামরুল, আপেল, নাশপাতির বাগান, আঙুরের লতা, কত ফল ফলে আছে। আর তার মাঝে মাঝে ফুলের বাগিচা, কত ফুটন্ত ফুলের গাছ, দোলন্ত ফুলের লতা, টাটকা ফুলে ছেয়ে রয়েছে, যেমন রং তার তেমনি সুগন্ধ। প্রজাপতিরা উড়ছে, ভ্রমর গুনগুন করছে, কতরকমের পাখি গাছ থেকে গাছে উড়ে বসছে।

হিয়ামন তো কোনওদিন ফলও দ্যাখেনি, ফুলও দ্যাখেনি, প্রজাপতিও দ্যাখেনি, ভ্রমরও দ্যাখেনি, এত রংচঙে পাখিও দ্যাখেনি, তার তো চোখে চমক লেগে গেছে। এখানে প্রকৃতি-মা খুব খুব সুন্দর, শান্তি আর আরাম আছে, সে বুঝল এটাকেই হয়তো খুশি গ্রাম বলে। কিন্তু সেখানে একটা সাদা দাড়ির দত্যি দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। দত্যি বললে 'খুব খিদে? আমার এইসব ফল এই জল, সব তুই পেট পুরে খেতে পাবি, আগে বলো আমার দাড়িতে কতগুলো চুল? হিসেবে ভুল হলেই কিন্তু আমি তোকে গিলে খেয়ে নেব।'

হিয়ামন ভাবে এ কী কাণ্ড? একে বেচারির মাথা ঘুরছে পা টলছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, তার ওপরে দত্যি বলছে তাকেই গিলে খাবে? হিয়ামন কেমন করে গুনবে ওর দাড়িতে ক'টা চুল? তার হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। হিয়ামন খানিকক্ষণ ধরে গোনার ভান করে বললে, 'গুনে ফেলেছি, আকাশে যত তারা তোমার দাড়িতে ঠিক ততগুলো চুল। তুমি আমার উত্তরটা মিলিয়ে নাও।'

শুনে সাদা দত্যি বললে, 'তা-ই তো? তা-ই তো উত্তর! নাও চাবি নাও, প্রাণ ভরে জল খাও, পেট পুরে ফল খাও।'

ভিতরে গিয়েই হিয়ামনের শরীর ভালো হয়ে গেল। সে পেট ভরে ফল খেল, আঁজলা ভরে জল খেল, আর মনের সুখে নানারকমের ফল কুড়িয়ে চুন্নিতে বেঁধে নিল দিয়ামনের জন্যে। তারপরে একটা গাছের ছায়াতে বসল বিশ্রাম নিতে। তার দুই চোখে একটু বুঝি ঘুম লেগেছে, অমনি তার পাশেই আপেল গাছের ডালে বাঁশির মতো মিষ্টি সুরে কেউ গান করে উঠল, 'এইবার, খুশিপাখির গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ো, লক্ষ্মী দিয়ামনের সোনার দিদি হিয়ামন।'

চমকে ওঠে হিয়ামন। 'খুশিপাখি? তোমার গানই তো আমার বোনকে শোনাব বলে এত কষ্ট করে এতদূরে এসেছি, কই, কোথায় তুমি? দেখতে পাচ্ছি না তো?'

সেই মিষ্টি গলা বলল, 'আমাকে তো দেখা যায় না, শুধু আমার গান শোনা যায়। তুমি বাড়ি ফিরে চলো, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি।'

'আবার তো অনেক কষ্ট হবে আমার ফিরতে, তুমিও কষ্ট করে সঙ্গে সঙ্গে আসবে তো? দেখতে তো পাব না?'

খুশিপাখি বলল, 'হিয়ামন, তুমি শুধু চোখ বুজে মনে মনে বলো, ''খুশি পাখি, আমাকে দিয়ামনের কাছে নিয়ে চলো।'' তারপরে দ্যাখো না কী হয়? আমি না বললে কিন্তু চোখ খুলবে না!'

বলেই খুশিপাখি আড়াল থেকে মিষ্টি একটা সুরে শিস দিল, তার পরে বলল, 'হিয়ামন, চোখ খোলো।'

হিয়ামন চোখ খুলতেই দেখতে পেল দিয়ামন তার সামনে একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একগোছা রঙিন বনফুল, সুগন্ধে বাতাস ভারি। তার সঙ্গে খুশি পাখির গান এসেছে, খুশি এসেছে। মাঠে মাঠে সবুজ ঘাস, বাগানে বাগানে ফলের গাছে ফল ধরেছে, ফুলের গাছে ফুল ফুটেছে, প্রজাপতি উড়ছে, সেই সরু নালাটা চওড়া সুন্দর নদী হয়ে গিয়েছে, তাতে পালতোলা নৌকো ভাসিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে। খেতে খেতে নানা রং-এর শস্য, ধান, গম, যব, আর কতরকমের ডাল!

গ্রামসুদ্ধু সবাই হাসিখুশি, সবাই নাচ গান করছে। আর সবচেয়ে বড় ম্যাজিক, খুশি পাখির খোঁজে বেরিয়ে যেসব ছেলেরা হারিয়ে গিয়েছিল তারা সবাই যে যার মায়ের কোলে ফিরে এসেছে।

গ্রামের সকলে হিয়ামনের জন্যে একটা মস্ত খাওনদাওন করল। অন্য অন্য গ্রামের অনেক লোক নেমন্তন্ন খেতে এল। বিশাল নাচ-গান উৎসব হল। এখন ওদের দুঃখী গ্রামের নাম বদলে রাখা হয়েছে খুশি গ্রাম। সে গ্রামে কারুর দুঃখু নেই। হিয়ামন-দিয়ামনের গ্রামের আশেপাশে গেলেই হাসিখুশির বাতাস লাগে গায়ে।

খুশি পাখিকে তো চোখে দেখা যায় না, সে যে কেমন দেখতে কেউ আজও জানে না, কিন্তু সে আমাদের আশেপাশেই থাকে। আমরা যদি মন্দ কাজ না করি, কারুর ক্ষতি না করি, লোকজনকে ভালোবাসি, তবে কান পাতলেই নিশ্চয়ই খুশি পাখির মিষ্টি সুরের গান শুনতে পাব।

খুশি পাখির সুরে
দুঃখু গেল দূরে
দীনদুঃখীর গ্রামে
খুশির জোয়ার নামে
হিয়ামন আর দিয়ামন
সবচে' খুশি দুই বোন!

(তিব্বতের উপকথার হালকা ছায়া অবলম্বনে)
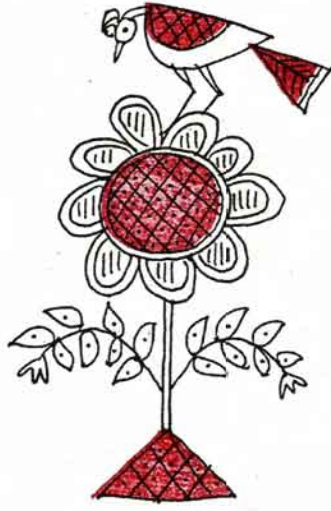
টুই টুই পাখির ডাক

রুবাই-এর মন খারাপ।

জানালার ধারেই ওর খাটটা, বাইরে বাগান। কী সুন্দর একটা ছোট আতা গাছে কত আতা ফলে আছে। কলকাতাতে রুবাই কখনও গাছে আতা ঝুলতে দ্যাখেনি। কী নীচু-নীচু ডাল, ইচ্ছে করলেই পেড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু মালি বলেছে পাকেনি, এখনও শক্ত। শুধু আতা? পেয়ারা গাছ, পেঁপে গাছ, আম গাছ। আমগাছে এখন অবশ্য ফুল-ফল কিছুই নেই। কিন্তু পেয়ারা আর পেঁপে গাছে অজস্র ফল ধরেছে। একটা ছোট কালো রং-এর পাখি ওই আতা গাছে বসে লেজ নাচাচ্ছে আর টুই টুই করে ডাকছে। যেন রুবাইকেই ও বাইরে খেলতে যেতে ডাকছে। কিন্তু রুবাই তো বন্দিনি রাজকন্যের মতো ঘরের মধ্যে আটকে আছে। যাবে কী করে?

তিন দিনের জন্যে শিমুলতলাতে বেড়াতে এসে এরকম জ্বর বাধিয়ে বসলে চলে? অগত্যা টুবাইকে নিয়েই বাবা গেলেন বেড়াতে, আর বেচারি মা বসে রইলেন বাড়িতে রুবাইকে আগলে।

কত কিছু আছে কাছাকাছি, নতুন-নতুন যত বেড়াবার জায়গা, কী সুন্দর নাম সব! যেমন এই শিমুলতলা নামটা। শিমুল ফুলের রং টুকটুকে লাল, এখানকার মাটির রংও টুকটুকে লাল। শিমুলতলা নামটাতে কেমন একটা মায়া মাখানো আছে। এখানে আসা হবে

শুনেই মন খুশি হয়ে গিয়েছিল রুবাই-এর। হলে কী হবে টুবাইটা যা দুষ্টু, একটু আগে এই নিয়ে একরকম ঝগড়াই হয়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলে। রুবাই শুধু বলে ফেলেছে,

—এখানেই কি শিমুল ফুলের বন ছিল, মা?

—দূর বোকা, টুবাই হেসে উঠল, মধুপুরের নাম তো মধুপুর, ওটা কি মৌমাছিদের দেশ?

—কিন্তু দেওঘর মানে তো দেবতার ঘর, সেখানে সত্যি-সত্যি একজন দেবতা আছেন, বদ্যিনাথ! মা রুবাইএর দলে চলে আসেন।

—বদ্যিনাথ আবার কোন ঠাকুর, মা?

রুবাই কথাটা বলামাত্র খিলখিল করে হেসে উঠে টুবাই বলল,

—এ মা, তাও জানিস না, শিবঠাকুরের নাম তো বদ্যিনাথ। মানে বৈদ্যনাথ।—এখানকার সব নাম ভালো না ছাই, জোশিডি জং? মিনিংলেস নাম। শুনতেও ভালো না একটুও। রুবাই-এর যত বাড়াবাড়ি, না মা?

মা উত্তর দেন না, নিজের মনে চাল বাছতে থাকেন চশমা পরে।

—বড্ড বোর করছিস কিন্তু টুবাই। কেন, রিখিয়া নামটাও তো ভারি সুন্দর। ওটারও তো কোনও মানেই নেই। রুবাই হাল ছাড়ে না।

—অবশ্য জোশিডি জং নামটা রুবাইয়ের ভালো লাগতেই পারে, না মা? ও তো কবি। মানে টানের ধার ধারে না। টুবাই আবার ফোড়ন কাটে। টুবাই কেবল মাকে দলে টানার চেষ্টা করছে। কিন্তু এবারেও মা জবাব দেন না।

—সুন্দর শব্দের যে মানে থাকতেই হবে তা না কিন্তু, টুবাই।

—সেটা ঠিক। এই তো রুবাই-টুবাই কী সুন্দর নাম, অথচ কোনও অভিধানেই পাবে না। পাবে কেবল আমাদের বাড়িতে। এতক্ষণে মা কথায় যোগ দেন, দুজনকেই আদর করে বলেন। কিন্তু এই কথাটার মানে, যে মা আসলে এখন রুবাই-এর দলে। তার জ্বর হয়েছে কিনা?

জোর পেয়ে রুবাই বলে ওঠে,—সেবারে যে আমরা সুবর্ণরেখার তীরে ঘাটশিলাতে গিয়েছিলুম, যেমন সুন্দর নাম সুবর্ণরেখা, তেমনি সুন্দর দেখতে নদীটা। ওখানে আগে সত্যি-সত্যি সোনা পাওয়া যেত। গামছা করে জল ছাঁকলেই গামছাতে গুড়ো গুড়ো স্বর্ণরেণু পাওয়া যেত নাকি দিম্মার ছোটবেলাতে। তাই না মা? যেমন নাম, তেমনিই নদী। এখানে তেমন সুন্দর কিছু গল্প নেই?

—আর ঘাটশিলা নামটাও একদম ঠিকঠাক, কত বড়-বড় শিলা পাথর, মানে বোল্ডার আছে নদীর জলে। তাই না মা? তার মানে ঝগড়া ভুলে এবারে টুবাইও মা-রুবাই-এর দলে চলে এল, আর ঝগড়ার চান্স নেই।

রুবাইটা দুবলা, বড্ড ভোগে, টুবাই দুরন্ত।

রুবাই কবিতা লেখে, ছবি আঁকে, টুবাই টেনিস খেলে। তবু দুজনে অন্য সময়ে এক সঙ্গে সব কিছু করে।

ঘাটশিলাতে সুস্থ ছিল রুবাই, সেবারে দুজনে মিলে খুব মজা করেছিল। সে-ও তো

এমনি তিন দিনের ছুটি ছিল। বাবা বেচারার ওর চেয়ে বেশিদিন ছুটি হয় না।

তারই ফাঁকে ওদের নিয়ে একটু কোথাও ঘুরে আসেন। মা-র আর রুবাই-টুবাই-এর লম্বা-লম্বা গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি, বড়দিনের ছুটি থাকে, তার কোনও একটাতে বাবাও ছুটি নিয়ে নেন, সবাই মিলে দূরে কোথাও পাহাড়ে কিংবা সমুদ্রে বেড়াতে যাওয়া হয়। কিন্তু এই তিন দিনের ছুটিগুলোর মজাই আলাদা। কেমন যেন লম্বা একটা পিকনিকের মতো। এখানে বাবা আর মা দুজনেই আলাদা রকমের হালকা হয়ে যান, শুধু টুবাইটা যে কে সেই দুষ্টু থেকে যায়, সারাক্ষণ রুবাই-এর পিছনে লাগে। অথচ বড় তো রুবাই, পুরো একঘণ্টার বড় সে টুবাই-এর চেয়ে।

টুই টুই, টুই টুই,

ওই শোনো, পাখিটা আবার ডাকছে। কালো ডানা, কিন্তু বুক আর পেটের রং লালচে হলুদ, কোন পাখি কে জানে? মা কি চেনেন পাখিটাকে? কেবল রুবাই-এর জানালার কাছে এসেই ওর যত ডাকাডাকি।

বাবার সঙ্গে টুবাই গেছে কী একটা পাহাড়ে বেড়াতে। অদ্ভুত মতো নাম, লাট্টু পাহাড় না কি যেন। রুবাই সেরে গেলে মায়ের সঙ্গে যাবে সেখানে। আজই তো কালকের চেয়ে ঢের ভালো আছে রুবাই। মাথা ব্যথা নেই, জ্বরও কমে গিয়েছে। কাল ও নিশ্চয়ই বেরুতে পারবে, মা বলেছেন। আজ বিশ্রামে থাকলেই সেরে যাবে জ্বর। টুবাই বেরুনোর সময়ে রুবাইকে ওর প্রিয় ভিডিয়ো গেমগুলো ধার দিয়ে গিয়েছে, এমনিতে হাতছাড়া করতে চায় না। কিন্তু রুবাই-এর খেলাতে মন নেই ও বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। আর ওই ছোট্ট কালো পাখিটা তাকিয়ে আছে রুবাই-এর দিকে।

টুই টুই টুই টুই,

কী বলছিস তুই আমাকে? আমি কি তোর ভাষা বুঝি?

মা রান্নাঘরে। এখানে মা-র কলেজ নেই, মলিনা মাসির রান্নাও নেই। মায়ের হাতের রান্না তো খুব একটা খাওয়া হয় না কলকাতাতে। বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকলে তখন মা দুয়েকটা পদ রান্না করেন।

আর এখানে এসে মা আলাদা লোক। রোজ-রোজ মা-ই তো রান্না করেন। সালোয়ার কুর্তা পরে মনের আনন্দে মা লাল মাটির রাস্তাতে সাইকেল চালিয়ে ঘোরেন। রুবাই-টুবাই-এরও বারণ নেই রাস্তায় সাইকেল চালাতে, এখানে গাড়িই নেই যে। বাইরে এলে মা যেন ওদের মতোই একজন ছোট মেয়ে হয়ে যান। আজ মাংসের স্টু হচ্ছে, সঙ্গে জিরে ভাত, আর স্যালাড। বাগান থেকেই স্যালাডের জিনিসপত্তর সব পাওয়া গিয়েছে, এই বাড়ির

কেয়ারটেকার যদুয়া মালিই সকালবেলায় টাটকা সবজি তুলে এনে দিয়েছে। ডিমও বাড়িতে হয় এখানে, সে-ও যদুয়া এনে দেয়। কী সুন্দর ব্রাউন রং-এর ডিমগুলো। যেন কেউ ডিমগুলিকে রং করেছে। অনেকগুলো পোষা মুরগি আছে মালির। কী সুন্দর যে দেখতে না মুরগিগুলোকে? ছ'টা মুরগির প্রত্যেকটা ধবধবে সাদা রং আর মাথায় টুকটুকে লাল ঝুঁটি। কক কক করে ঘুরে বেড়ায় বাগানে, পোকা ধরে-ধরে খায়।

একটা মাত্র মোরগ, সেটা কিন্তু বিচিত্র বর্ণের, ঝলমল করছে তার নানান রং-এর পালকে সাজানো শরীর আর সগর্বে উঁচিয়ে রাখা জলপ্রপাতের মতো পুচ্ছটি। সে প্রচণ্ড চালিয়াত, তার সব হাবভাব এমন যেন সেই এখানকার আসল মালিক, কী তার চলনবলন, যেন কোনও রাজারাজড়া। আর মেজাজটিও বড় রাগী, আর ঝগড়াটে। কথায়-কথায় তেড়ে আসে। মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্যই করে না। ওকে তাই আগে-আগে খাঁচাতে ভরে দেয় মালি।

সকালবেলাতে ওদের বড় খাঁচার দরজা খুলে মালি মুরগিদের ছেড়ে দেয়, ওরা ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়ায় বাগানে। সন্ধেবেলাতে ঠিক খাঁচাতে ফিরে আসে। উড়ে পালিয়ে যায় না কেউ। রুবাই-এর আশ্চর্য লাগে। ওদের তো ডানা আছে, ওদের উড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না? কী রে বাবা। খাঁচাতে থাকতে ওদের দিব্বি ভালো লাগে তার মানে। অত মোটাসোটা বড়-সড় মোরগটারও পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। ঠিক ফিরে আসে। মালি বলে, আসবে না? ওর সব তো রাতকানা। খাঁচাতে না ঢুকলে তো ওদের শিয়ালে, কিংবা বনবিড়ালে ধরে খেয়ে নেবে। খাঁচাতে ওরা নিরাপদ, ওরা সেটা বোঝে। বাবা বলেন জীবজন্তুরা সবাই নিজের ভালোটা বোঝে, কেবল মানুষই বোঝে না। তাই মানুষ যুদ্ধ করে, দাঙ্গা করে, খুনোখুনি করে।

এখানে মাছ বিশেষ পাওয়া যায় না, কিন্তু পাঁঠার মাংস, পাখির মাংস, এই সব আছে। সাঁওতালরা নিয়ে আসে বাড়িতে, বগেরি। ছোট-ছোট, জ্যান্ত, পালক-টালক সমেত, কী সব অচেনা পাখি, চড়াই পাখির মতন। এত ছোট ওরা, যে এক-একজনের এক-একটা আস্ত পাখি খেতে লাগে। পাখিগুলোকে কি জাল পেতে ধরে, পাখিওয়ালারা? না কি গাছে উঠে বাসা থেকে চুরি করে আনে ওদের? আহা কতটুকু-টুকু পাখি। ওদের ধরে রান্না করে খেতে রুবাই-এর কেমন যেন পাষণ্ড-পাষণ্ড লাগে নিজেদের। মন কেমন করে। শুনে টুবাই বলল, বাঃ, ছোট পাখি খেলেই পাষণ্ড? আর বড় বলেই বুঝি মরতে ব্যথা লাগে না? কিন্তু বাজার থেকে যে মাংস, বা ছাল ছাড়ানো চিকেন কিনে আনা হয় সে তো একেবারে অন্যরকম দেখতে, সেটা খাওয়ার বেলায় রুবাই-এর এরকম লাগে না।

লাট্টু পাহাড়ে চড়ে খুব ক্লান্ত আর খুব উত্তেজিত হয়ে ফিরল। টুবাই, রুবাই কাল যদি পারিস একবার যাস। কী মজাই যে হল? তোকে আর মাকে দারুণ মিস করছিলাম। হাট থেকে বাবা এক রকম মিষ্টি এনেছেন, প্যাঁড়া নয়, ছানার মুড়কি। প্যাঁড়া কালকেই এসে গিয়েছে স্টেশন থেকে আসার পথেই। এখানকার প্যাঁড়া নাকি অসাধারণ।

চমৎকার স্টু রেঁধেছেন। মা।

বাগানের সুগন্ধী লেবু দিয়ে এত ভালো লাগল, রুবাই-এর অরুচি কেটে গেল, সে-

ও দিব্বি হাম-হাম করে অনেকখানি জিরে ভাত খেয়ে ফেলল টুবাই-এর সঙ্গে-সঙ্গে। আর দুজনে মিলে ঘ্যান-ঘ্যান করতে লাগল, তিনদিনে কি শিমুলতলা, রিখিয়া, মধুপুর, দেওঘর, জোশিডি দেখা হয়? এবারে সব তোলা থাকল, পরের বারে আমাদের নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।

দুপুরে একটু বিশ্রাম করে বিকেলবেলায় টুবাই বাগানে বেরুল। রুবাই গিয়ে সামনের ঢাকা বারান্দাতে বসল। ওর এখন যদিও গায়ে জ্বর নেই, মা থার্মোমিটার দিয়েছিলেন, তবু বিকেলের দিকে খোলা আকাশের নীচে না যাওয়াই ভালো। কিন্তু বিকেলবেলা হলেই ওই যে মালি গিয়ে ডাকে, আর অমনি মুরগিগুলো সুড়-সুড় করে খাঁচাতে ফিরে আসে সেটাও একটা দেখবার জিনিস বলে মনে হয় রুবাই-এর। কী আশ্চর্য অভ্যাসের দাস পশু পাখি মানুষ?

বাগান থেকে টুবাই বলল,—একটা মুরগি বোধহয় আজ উড়ে গিয়েছে রে রুবাই, পাঁচটা মুরগি খাঁচায় ফিরল, মোরগটার সঙ্গে। তবু দেখি, একটু খুঁজে দেখি বাগানে। পেটুকটা বোধহয় এক্ষুনি একটা পোকা ধরেছে। তাই লেট।

সত্যি-সত্যি উড়ে গেছে তা হলে একটা মুরগি? রুবাই এতদিন অবাক হয়ে ভাবছিল ওরা কেন উড়ে যায় না। যায় তাহলে। সবাই না হোক এক-একটা মুরগি তবে খাঁচার বাইরে খোলা মেলাতে থাকতে ভালোবাসে। একজন তো তবু স্বাধীন জীবন বেছে নিয়েছে। রুবাই-এর বেশ আনন্দ হল। এটাই তো জীব জগতে স্বাভাবিক। খাঁচাতে ঢুকতে চাওয়া কখনও স্বাভাবিক হতে পারে?

টুই টুই টুই—সেই পাখিটা এদিকেও কোথায় যেন ডাকছে। রুবাই-এর পিছু-পিছু ঘুরছে নাকি? গাছে গাছে চোখ পেতে ওকে খোঁজে রুবাই। টুই টুই টুই—আড়াল থেকে ডেকেই চলেছে পাখিটা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ওকে আর।

হঠাৎ টুবাই চিৎকার করে উঠল, রুবাই, রুবাই দেখে যা! ওর কণ্ঠস্বরে ভয়, আওয়াজটা অনেকটা আর্তনাদের মতো শোনাল। যেন কান্নার শব্দ।

কী হল টুবাই, কী হল? রুবাই দৌড়ে বাগানে বেরিয়ে যায় জ্বরের কথা ভুলে গিয়ে। পেঁপে গাছটার সামনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টুবাই। চোখে আতঙ্ক।

ও শুধু আঙুল বাড়িয়ে গাছের নীচেটা দেখল। ওইখানে ছাই ফেলা হয় আর সবজির খোসাটোসা, রুবাই দেখল, সবজির খোসার সঙ্গে পড়ে আছে অনেকগুলো সাদা ধবধবে পালক, আর একটা লাল টুকটুকে ঝুঁটি।

পশ্চিমের আকাশটাকে কাঁচা রক্তের রং-এ টকটকে লাল করে দিয়ে সুয্যি ঠাকুর তখন পাটে নামছেন। রুবাই, ভিতরে এসো, মা ডাকলেন, সন্ধেবেলার ঠান্ডা বাতাস দিয়েছে।

*

ওঃ হো, জানালায় এসে সেই জরুরি খবরটাই কি তাহলে বলছিল রুবাইকে ওই ছোট্ট কালো টুই টুই পাখিটা? রুবাই ওর ভাষা বোঝেনি!

কই, মা তো কিছু বলেননি? মা কী করে কান্না করলেন? বাড়ির মুরগিটাকে? আর মালি ওকে কাটলই বা কেমন করে? ওরই তো পোষ্য ওগুলো। পোষা পাখিকে কেটে খায় কেউ? আমরা কি রাক্ষস?

অভিমানে মায়ের সঙ্গে কথাই বলতে পারল না ওরা। রাত্তিরে কিছুতেই কিছু খাওয়ানো গেল না রুবাই-টুবাইকে। শিমুল তলার স্মৃতিটা কেমন মন খারাপের স্মৃতি হয়ে গেল।

কলকাতাতে ফিরে এসেও অনেক বচ্ছর রুবাই-টুবাই মুরগি খেতে পারত না। এখন ওরা বড় হয়ে গেছে, কলেজে পড়ে, চিকেন কাবাব, চিকেন রোল, সবই খায়।

কিন্তু পেঁপে গাছের নীচে ওই সাদা পালকগুলো আর লাল ঝুঁটিটা আজও চোখ বুঝলে দেখতে পায় দুই বোন। আর বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

সোনাইয়ের খেলার সাথী

সোনাই বড় একা। বেচারির মোটে খেলার সঙ্গীসাথী নেই। বাবা অফিসে মা স্কুলে চলে গেলে শুধু ঠাম্মার সঙ্গে খেলাধুলো আর কত করা যায়? ঠাম্মা একদিন বললেন সোনাইয়ের বাবাকে,—খোকা, তুই সোনাইয়ের একটা খেলার সাথীর ব্যবস্থা কর এবার। ছেলেটা একা-একা খেলা করে। বাড়িতে ছোট ছেলেপুলে কেউ নেই।

বাবা বললেন,—দাঁড়াও। হচ্ছে।

কিছুদিনের মধ্যেই বাবা এলেন কোলে ছোট্ট একটা লোম তুলতুল পুতুল-পুতুল কুকুরছানা নিয়ে। সাদা আর বাদামি ছোপছোপ, সাদাই বেশি। মুখখানা ভারি মিষ্টি। সোনাই খুব খুশি। কুকুরছানার নাম হল রুপাই। সোনাই এখন হাঁটতে পারে, কথা বলতে পারে, কিন্তু আধো-আধো। রুপাইয়ের বয়েস তিনমাস। সোনাই প্রায় দু-বছর। তবু তার মনে হল রুপাইকে সে দাদা ডাকবে। বাড়িশুদ্ধ লোক তাকে রুপাই ডাকে। সোনাই কেবল 'বাপ্পিদাদা' বলে তার নামকরণ করেছে। বাপ্পিদাদা তার প্রাণ। সর্বক্ষণ খেলছে দুজনে। সোনাই আর রুপাই। ঠাম্মা বললেন,—যাক বাবা, খোকা আমাকে বাঁচালি। রুপাই খুব লক্ষ্মী কুকুরছানা হলেও মাঝে-মাঝে হিসি করে ফ্যালে ভুলভাল জায়গায়। সেটা মাকে মুছতে হয়। আর ঠাম্মা এখন একটু রুপাইকে কম-কম ভালোবাসেন। আস্তে-আস্তে রুপাই আর ঘরে হিসি করে না। সোনাই আরেকটু বড় হয়েছে। ইস্কুলে যাবে। সোনাই সত্যি-সত্যি একদিন ইস্কুলে যেতে শুরু করল।

ইস্কুলে গিয়েও তার বাপ্পিদাদার জন্যে মন কেমন করে। আর ঘরে বসে রুপাই

তো কেঁদে-কেঁদে ঘুরে বেড়ায়। ছাদে, বারান্দাতে, দালানে, উঠোনে, কোথাও সোনাইকে খুঁজে পায় না। তারপরে ইস্কুল থেকে যখন সে ফিরে আসে, তখন দুই বন্ধুতে সে কী রি-ইউনিয়ন, পুনর্মিলনের উৎসব। দুজনেই লাফাচ্ছে দুজনেই চেঁচাচ্ছে। কিন্তু যত বেশিক্ষণ রুপাই একা-একা থাকে, ততই সে মন খারাপ করে। রোজ চেয়ারের কুশন ছেঁড়ে। নতুন-নতুন কুশনের সর্বনাশ করছে রোজ-রোজ। ঠাম্মা বললেন,—খোকা, রুপাইটা বড্ড একা হয়ে গেছে। ওর একটা সঙ্গীসাথীর ব্যবস্থা কর। সোনাই ওকে সময় দিতে পারে না।

বাবা বললেন,—দাঁড়াও, হচ্ছে! কয়েকদিন পরে বাবার সঙ্গে অফিস থেকে একটি লোক এল তার নাম হরিপদ। হরিপদর হাতে একটা চটের থলি। থলির মধ্যে ছিল দুটি অসম্ভব মিষ্টি বেড়ালছানা। একটা পুরোপুরি হলদে সোনালি রঙের, আরেকটা সাদা হলুদ ছোপছোপ। দুটো ছানাকেই খুব চটকাতে ইচ্ছে করবে দেখলেই।

রুপাইকে দেখে ওরা একটুও ভয় না পেয়ে তার কোলের দিকে চলে গেল। রুপাই এরকম আজবজীব জীবনে দেখেনি। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে-ঘুরে ওদের শুঁকতে লাগল সে। শুঁকে-শুঁকে-শুঁকে-শুঁকে, অবশেষে ঠিক করল, ওরা নিরাপদ। ওরা শত্রু নয়। তারপর থেকে ওরা তিনজনে খেলতে থাকে। বিল্লি আর চিল্লি ক্রমশ বড় হয়ে উঠল। আর রুপাই একটু বুড়ো মতন হয়ে পড়ল—সে আর অত খেলাধুলো পছন্দ করে না। বিল্লি-চিল্লিকে নিয়ে অত আদিখ্যেতা করা তার আর পোষাচ্ছে না। এমন সময়ে পাশের বাড়িতে একটা কুকুর এল তার নাম লিসা। রুপাই বিল্লি-চিল্লিকে ত্যাগ করে এখন লিসার ভক্ত হয়ে পড়ল।

একদিন ঠাম্মা বললেন,—খোকা, বিড়ালছানা দুটোর বড় একা লাগে। ওদের জন্যে কোনও খেলার সাথী এনে দে। ওরা মন খারাপ করে ঘোরে,—ওদের স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়ে যাচ্ছে—রান্নাঘরে ঢুকে পড়ছে। ওদের খেলবার জন্যে কিছু এনে দে।

শুনে বাবা বললেন,—দাঁড়াও, হচ্ছে। কয়েকদিন বাদে রথের মেলা থেকে বাবা এক খাঁচা চিনিয়া মুনিয়া পাখি নিয়ে বাড়ি এলেন। তিনি বললেন,—এগুলো বিল্লি আর চিল্লির খেলার জন্য। সোনাই বলল,—কেন? ওরা বুঝি আমার হতে পারে না?

ঠাম্মা বললেন,—ওরে বেড়াল কখনও পাখির বন্ধু হয়? ওরা তো পাখিদের আট্যাক করবে। প্রকৃতিতে ওরা বন্ধু-জাতি নয়। দ্যাখো তুমি যদি ওদের খেলাতে পারো।

কিন্তু মা বললেন,—বেড়াল-ইঁদুরে যেমন বন্ধু হয় না, চিনিয়া-মুনিয়াও তেমনি, বেড়ালের শিকার হবে, বন্ধু হবে না। ওদের খেলানোর চেষ্টাই করতে দেব না আমি। বরং রুপাই আর চিনিয়া-মুনিয়া থাকুক, বিল্লি-চিল্লিকে হরিপদ ফেরত নিয়ে যাক। রান্নাঘরে মাছ রাখতে দিচ্ছে না দুজনে। বাবার বিশেষ অনিচ্ছে সত্ত্বেও একদিন হরিপদ এল, থলি নিয়ে এসে বিল্লি-চিল্লিকে নিয়ে গেল। ও খুশি হয়েই বলল,—ওদের বাড়িতে ইঁদুর হয়েছে। এখন এই বেড়ালই ওদের খুব দরকার! বিল্লি-চিল্লি চলে গেল।

চিনিয়া-মুনিয়া পাখিদের এমনিতেই বেশিদিন বাঁচানো গেল না। সোনাই বোর্ডিং স্কুলে চলে গেল। রুপাই এখন একা। তার খুব মন খারাপ। ঠাম্মা বললেন,—বউমা, খোকা বড্ড

ভুলভাল খেলার সাথী আনে তুমি একটা ঠিকঠাক সঙ্গী এনে দাও দিকি। রুপাইটা খুব একা পড়ে গেছে।

মা বললেন,—ঠিক আছে, দেখি কী করা যায়।

কিছুদিন পরে মায়ের কোলে এলো টুকাই। বাপ্পি-দাদা রুপাইয়ের ছোট ভাই। আর সোনাইয়ের ছোট্ট ভাইটি হাত-পা নেড়ে দাদার কোলে খেলা করতে লাগল। রুপাই তাকে পাহারা দিচ্ছে ২৪ ঘণ্টা। সবাই খুশি সবাই ব্যস্ত। ঠাম্মা বললেন,—বাঃ! এইবার সব ঠিকঠাক হয়েছে! সোনাই রুপাই টুকাই সেই থেকে মনের আনন্দে আছে।

সত্যি-মিথ্যে মিথ্যে-সত্যি

একদেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর সবই আছে। ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি, কোষখানাতে ধনরত্ন, আর প্রাসাদে লক্ষ্মীর মতো মহারানি, আর সরস্বতীর মতো রাজকন্যা। তাঁর রাজ্যে শান্তি আছে। প্রজাদের দেহেমনে সুখস্বাচ্ছন্দ্য আছে, স্বাস্থ্য ভালো, রোগ বালাই নেই। যুদ্ধবিগ্রহে মন নেই। রাজামশাইয়ের প্রতিবেশী রাজ্যদের সঙ্গে খুব সদ্ভাব। প্রজাদের খেতে ধান, গোয়ালে গরু, ছেলেমেয়েরা পাঠশালাতে যায় নিয়মিত। রাজাকে ধন্যি-ধন্যি করেন সব দেশ-বিদেশের রাজরাজড়ারা, পণ্ডিত-মশায়েরা। কিন্তু হলে কী হবে রাজারানির সে সুখও নেই, শান্তি নেই।

—কেন? কেন? কেন নেই?

ওহো, রাজপুত্তুর নেই বলে বুঝি?

—ঠিক তা নয়, এখন তো রাজকন্যেরাও রাজ্যশাসন করতে শিখছে—তারাও শাস্ত্র পড়ে। অর্থশাস্ত্র থেকে অস্ত্রশস্ত্র—সবেতেই তারা পটু হয়ে ওঠে—রাজার মেয়েটিরও পড়াশুনোয় মন আছে—সে মোটেই বোকাসোকা নয়।

—তবে? তবে? তবে কেন দুঃখ রাজার মনে?

—কেন রাজকন্যে বড্ডই বানিয়ে-বানিয়ে কথা বলেন। রাজকন্যে এমন করে মিথ্যে কথা বলেন, যে কেউ বুঝতেই পারে না। গল্প বানিয়ে কল্পনার রাজ্যে বাস করে যে, তার হাতে তো রাজ্য শাসনের ভার দেওয়া যায় না। সাহস আর সততা হল রাজাদের প্রধান গুণ। প্রজারা নইলে বিশ্বাস করবে কেন? রাজকন্যাকে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব দেওয়া কেমন

করে হবে? অসম্ভব। রাজারানির তাই মনে শান্তি নেই। কী হবে?

মন্ত্রীমশাই বললেন, 'রাজামশাই, আমরা বরং এমন একজন লোককে ধরে আনি, যে রাজকন্যের চেয়েও বেশি মিছে কথা বানিয়ে বলতে পারে। যার কাছে রাজকন্যে হার মেনে বলে উঠবেন—'যাঃ ওটা মিথ্যেকথা।' দুজনেই দুজনকে বানিয়ে নানান কথা বলে যাবে, আর কেউ কাউকে—'ওটা মিথ্যেকথা' বলতে পারবে না। রাজকন্যার মুখ দিয়ে যদি—'যাঃ! ওটা মিথ্যে কথা'—বেরিয়ে যায় তাহলে তিনি আস্তে-আস্তে সত্যি-মিথ্যের তফাতটা বুঝতে পারবেন। কল্পনার রাজ্যে বাস করে বানিয়ে-বানিয়ে গল্প বলতে-বলতে রাজকন্যা বোধ হয় সত্যি-মিথ্যের তফাতটা আর ধরতে পারেন না।'

রাজা ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিলেন।

ভিনরাজ্য থেকেও গল্প-বানিয়েরা আসতে লাগল। রাজকন্যা হাবার মতন সিরিয়াস মুখ করে সবার সব গল্প শুনলেন। কক্ষনও বললেন না—'যাঃ! এইসব গুলবাজি!'

শেষে তিনভাই এল। তারা ওদেরই প্রজা। আস্ত রাজকন্যা, আর অর্ধেক রাজত্বের লোভে কে না আসবে বলো?

কিন্তু বড়ভাই ফিরে গেল। হার মেনে।

মেজোভাইও ফিরে গেল। হার মেনে।

এবারে ছোট ভাইটি এল। সে মস্ত গুলবাজ ছেলে। তার হাসিভরা চোখে-মুখে দুষ্টুবুদ্ধি ঠিকরে বেরুচ্ছে। তার নাম বুলটু।

রাজকন্যে তখন উঠোনে। জবাগাছের গোড়ায় জল দিচ্ছেন।

—'নমস্কার।' বুলটু বললে।

—'আপনাকেও নমস্কার। দেখেছেন, আমাদের এই অপূর্ব জবাগাছটা? সদ্য-সদ্য আমি চারাটা আজই সকালে এখানে লাগিয়েছি।—আর দেখুন, এর মধ্যেই কত বড়টি হয়েছে। সুন্দর ফুল ফুটে গেছে চারটে-পাঁচটা? দারুণ না?'

—'বাঃ কী সুন্দর! সত্যি দারুণ!' বুলটু বলল। 'তবে আমি আসবার আগে রুটি খেয়ে এলাম। কালই গমচাষ করেছি, আজ গমের ফসল তুলে, চাক্কিতে আটা ভাঙিয়ে রুটি করে খেয়ে এসেছি। ওঃ! বেজায় পেট ভরে গিয়েছে।'

শুনে রাজকন্যে মিষ্টি করে হাসলেন। হেসে বললেন, 'চলুন যাই। আমাদের গোয়ালে গোয়ালা কি গরু দুইছে। গয়লা যদি গোয়ালের এদিক থেকে ভেঁপু বাজিয়ে তার ছেলেকে ডাকে গোয়ালের ওপাশে, তার ছেলে বেচারি শুনতেই পায় না। এতই বিশাল সেই গোয়ালঘর।'

—'সে হতেই পারে। আমাদের গোশালায় দু'লক্ষ গরু দোয়ানো হয় একসঙ্গে।—বাবাঃ সে যা শব্দ করে দু-লক্ষ গরু আর তাদের বাছুররা মিলে! ওঃ!'

—'ওঃ তাই? সেটা আর অসম্ভব কি? আমাদের ষাঁড়গুলোকে ট্রেনিং দেওয়া হয় যখন, তখন কী যে মুশকিল হয়—দুটো শিং-এর ওপর দুজন ট্রেনার বসেও বিশফুট লম্বা বাঁশ দিয়ে এ ওকে ছুঁতে পারে না—এমনই বিশাল বড় ষাঁড়গুলো আমাদের গোয়ালে। বাপ্‌ রে! তোমাদের নিশ্চয় এই সমস্যা নেই!'

বুলটু বলল, 'ঠিক ওটা সত্যিই নেই অবশ্য, কেননা আমাদের ষাঁড়ের দুটো শিং-এর ওপরে যখন দুজন ট্রেনার বসেন তখন দূরবিন দিয়ে পরস্পরকে দেখতে হয় কিনা ওদের?'

রাজকন্যে বললে, 'যাক! তবুও দেখতে তো পায়? সেটা মস্ত বড় কথা। আমাদের সমস্যা আছে। আমার বাবা যখন সিংহাসনে বসেন তখন সভাস্থ মানুষকেই দূরবিন নয় টেলিস্কোপ নিয়ে বাবাকে দেখতে হয়—রাজসভাটি বড্ড বড়সড়ো তো? গ্রহ-নক্ষত্রগুলো দৃষ্টিপথে ভীষণ বাগড়া দেয়।'

বুলটু বলল, 'জানি জানি, ওই টেলিস্কোপটা তো? ও তো আমারই ভাইপোর তৈরি। ওটা তোমার বাবার কাজে লাগছে তো? বছর চারেক বয়েস এখন। খেলতে-খেলতে তৈরি করেছে। যাক—বাঁচা গেল, ওটা তোমার বাবার কাজে লাগছে তো? গোটা রাজ্যের ওপর নজর রাখবার জন্যে আরেকটাও বানাতে বলেছেন, তো সেটা আমার ঠাকুমা বানাচ্ছেন। বড়ি দিতে-দিতে একটু হাতে সময় পেলেই তোমার বাবার জন্যে টেলিস্কোপটা বানাচ্ছেন ঠাকুমা। আসলে তোমার বাবা সেই যখন আমার ঠাকুরদার জুতো পালিশ করতেন, তখন থেকেই ঠাকুমা ওঁকে স্নেহ করেন। ঠাকুরদা খুব খুশি হয়ে ওঁকে একটা বর দিয়েছিলেন।—এতই ঝকঝকে জুতো পালিশ করেছিলেন তোমার বাবা, যে সেই জুতোর গায়ে গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য সমস্ত দেখা যেত! ঠাকুরদার জুতোয় তোমার বাবা অসাধারণ পালিশ লাগাতেন তো? এই রাজ্য আমার ঠাকুরদাই তোমার বাবাকে তাই খুশি হয়ে—'

'যাঃ—মিথ্যে কথা—' রাজকন্যে চেঁচিয়ে ওঠেন, থামো। থামো, মিথ্যেবাদী কোথাকার! চুপ করো, আমার বাবার নামে মিথ্যে কথা বলা? দেখাচ্ছি তোমাকে মজা! সত্যি আর মিথ্যের তফাত জানো না? অসভ্য ছেলে! জানো না সম্ভব-অসম্ভবের তফাত?' রাজকন্যার রাগে চোখমুখ লাল হয়ে গেল, সুন্দর, কোঁকড়া চুলগুলো সব খাড়া খাড়া হয়ে উঠল—চোখে জলভরতি রাজকন্যা চ্যাঁচালেন, 'ও বাবা! বাবা দ্যাখো, এই লোকটা কী ভীষণ বানিয়ে-বানিয়ে মিথ্যেকথা বলছে! সত্যি-মিথ্যের জ্ঞান নেই—'

ব্যাস! দেশে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল। শঙ্খ-ঘণ্টা, ঢাকঢোল, বাঁশি, সেতার, সানাই, গিটার, ড্রাম, যে যা পারে সে তাই আহ্লাদে বাজাতে শুরু করে দিলে। এতদিনে সমস্যা মিটেছে! পথে-পথে ফুলের মালা দিয়ে তোরণ হল, রং-বেরঙের সিল্কের পতাকা উড়ল। থালা-থালা মিষ্টান্ন বিলি হতে লাগল রাস্তাঘাটে। রাজকন্যে এতদিনে সত্যি-মিথ্যের তফাতটা বুঝতে পেরেছেন। বাস্তব আর কল্পনার রাজকীয় ফারাকটা এবার শিখে ফেলেছেন। রাজকন্যে এতদিনে বড় হয়েছেন। সত্যি-সত্যি আমাদের সবার মতন স্বাভাবিক মানুষ হয়েছেন তিনি! দেশে নাচগান-ফুর্তি শুরু হল। আর ভাবনা নেই। রাজকন্যের তো এবার বিয়েও দিতে হবে কিনা? বুলটুর সঙ্গে। রাজার ঘোষণা মতন আস্ত রাজকন্যে, আর আধখানা রাজত্ব তো সেই পাবে এক্ষুনি।

বুলটু গিয়ে রাজকন্যের হাতটি আস্তে করে ধরে, মিষ্টি সুরে বললে, 'রাজকন্যে, আমাকে বিয়ে করতে তোমার মত আছে তো? সত্যি কথা বলবে কিন্তু!'

রাজকন্যা হেসে ফেললেন। লম্বা সাদা ঘাড় বাঁদিকে হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বোঝালেন, লজ্জা-লজ্জা মুখে। এখন সেটা সত্যি, না মিথ্যে, সেটা বুলটুকেই বুঝতে হবে। আমরা কী করে ওসব জানব বলো? ওদের ব্যাপার!

টগরদিদির ডালিমবোন

এক গরিব চাষির উঠোনে একটা টগরফুলের গাছ ছিল। তাতে প্রচুর ধবধবে সাদা গোলগাল টগরফুল ফুটত। আর তার উঠোনে একটা ডালিমগাছও ছিল, তাতে না হত ফুল, না ধরত ফল।

চাষির ছিল এক মেয়ে। আদর করে তার নাম দিয়েছিল তারা টগর। টগর নিজের মনে মাঠেঘাটে খেলা করে ছুটে বেড়াত, গান গাইত, গাছে চড়ত, ঝপাঝপ নদীর জলে সাঁতার কাটত—শূন্য পাখির বাসা পাড়ত, পাখির ডিম কিন্তু কখনও চুরি করত না—টগর দুরন্ত ছিল বটে—কিন্তু তার প্রাণে খুব মায়া। কোনও জীবজন্তুকে সে কষ্ট দিত না। প্রজাপতির পাখা ছিড়ত না, ফড়িংয়ের পায়ে সুতো বাঁধত না। ডানপিটে মেয়ে টগর আজ কাবাডি-কাবাডি খেলছে, কালকে খো-খো, পরশু সাইকেল প্রতিযোগিতায় এ জেলা থেকে ও জেলায় চলে যাচ্ছে।

একদিন চাষি বউয়ের আরও এক মেয়ে হল। মেয়ের রাঙা টুকটুকে রংটি দেখে টগর নিজেই বোনের নাম দিয়েদিল ডালিমফুল। ডালিমফুল সত্যি-সত্যি সুন্দরী হয়ে উঠল ডালিমের মতনই। সে গাছে চড়ে না, পুতুল খেলে, জলে ঝাঁপায় না, রান্নাবাড়ি খেলে, ফুল তুলে মালা গাঁথে। আবার দিদির সঙ্গে এক্কাদোক্কা খেলে, কুমির-কুমির খেলে, লুকোচুরি খেলে। দুই বোনে মিলে কুলের আচার খায়, পেয়ারা পাড়ে। বোনে-বোনে খুব ভাব। আর রোজ সকালে পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে শেলেট, পেনসিল, বর্ণ-পরিচয় বগলে করে দুই বোন বেণি দুলিয়ে ইস্কুলে যায়। অ আ শেখে, দুয়েক্কে দুই—দুই দুগুনে চার শেখে।

চাষি বউয়ের খুশি আর ধরে না। সে লিখতে-পড়তে না শিখলে কী হবে, তার দুই মেয়ে বিদ্যের দিগ্‌গজ হচ্ছে। এমনি করতে-করতে মেয়েরা বড় হয়ে উঠছে।

দুই বোনেতে খুব ভাব
টগরফুলটি দুষ্টু যেমন
তেমনি ডালিম চুপচাপ।

টগর হচ্ছে ডানপিটে, আর ডালিম শান্তশিষ্ট। ডালিম সেলাই করে, আলপনা দেয়। গান গায়। আর টগর? সে দস্যিপনা করে বেড়ায়। যেই টগরের ক্লাস এইট পুরোলো অমনিই তার ইস্কুল যাওয়াও শেষ! কী করবে? ওদের গ্রামের ইস্কুলে নাইন-টেন ক্লাসই নেই যে! পড়বে কোথায়?

এখন তাই ডালিম একলাটি ইস্কুলে যায়। টগর বেচারি বাড়িতেই থাকে, ঘরের কাজকর্ম করে। পাড়ার বাচ্চাদের পড়া দেখিয়ে দেয়। আর কী করে?

আর বড়ি দেয়, পাঁপড় তৈরি করে, ঠোঙা বানায়।

কেন?

কেন না—

একটা সাইকেল যদি থাকত, তাহলেই টগর ওই দূরের ইস্কুলে পড়তে যেতে পারত। সেখানে নয় দশ কেন, এগারো, বারো পর্যন্ত সব পড়ানো হয়। কিন্তু গরিব চাষি—চাষিবউয়ের যে সাইকেল কিনে দেওয়ার মতন অত টাকা নেই। টগর তাই মন দিয়ে বড়ি দেয়, পাঁপড় তৈরি করে, ঠোঙা বানায়। তারপর দুই বোনে মিলে সেগুলো হাটে বেচে টাকা এনে সাইকেলের ফান্ডে মাটির লক্ষ্মীর ভাঁড়ে জমা করে।

পাঁচ পয়সা
দশ পয়সা
বিশ পয়সার খেল্
একদিন ঠিক পৌঁছে দেবে
ইস্কুলে, সাইকেল!

সাইকেল একটা যে চাইই! হাইস্কুলে যেতে হবেই।

সেদিন টগরের জ্বর হয়েছে খুব। হাটের দিনে জ্বর হলে চলে? বড়ি-পাঁপড় হাটে নিয়ে যেতে হবে না? টগর অস্থির যাওয়ার জন্য। ডালিম বললে,

টগরদিদি ভাই
আমি একাই হাটে যাই?
বড়ি বেচব
ঠোঙা বেচব
সাইকেলটি চাই!

'দিদি, তুমি কিচ্ছু ভয় পেয়ো না—আমি হাটে গিয়ে ঠিক সব বেচে আসতে পারব। পথ তো চিনেই গেছি। হাটের মানুষজনও আমাদের চিনেছে।'

চাষি-চাষিবউ বললে, 'তবে যাও, সাবধানে যেও। আর সন্ধের আগেই ঘরে

ফিরে এসো।'

কিন্তু ডালিমফুল সেই যে হাটে গেল, আর কোনওদিনই বাড়িতে ফিরল না। কাঁদতে-কাঁদতে টগর কতদূর বনে-বাদাড়ে খুঁজে এল। কাঁদতে-কাঁদতে চাষি কতদূর গ্রামে-গঞ্জে খুঁজে এল। কাঁদতে-কাঁদতে চাষিবউ কতদূর হাটে-মাঠে-ঘাটে খুঁজে এল।

সবাই বললে, হ্যাঁ, ডালিম তো হাটে এসেছিল। বড়ি-পাঁপড় বেচেছিল। সে তো কখ-ন ফিরে গেছে।

কিন্তু, নাঃ, ডালিমের খোঁজ মিলল না। মেয়ে যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গেছে। চাষির, চাষিবউয়ের, টগরের চোখে জল শুকোয় না। মুখে হাসি নেই। কেউ পেটভরে খায় না। পাড়ার লোকেদের পর্যন্ত মন ভালো নেই। এত মিষ্টি মেয়ে ডালিম, সে গেল কোথায়? কেউ তাকে দেখেনি!

হঠাৎ একদিন চাষিবউ দ্যাখে, তাদের ডালিমগাছে ফুল ধরেছে। চমৎকার ফুল। ফুল প্রায় ফুটব-ফুটব করছে—কিন্তু পুরোটা ফুটছে না। ফুটছে না বলে সে ফুল ঝরেও না। তাতে ফলও ধরে না।

চাষিবউ অবাক হয়ে চাষিকে ডেকে দেখাল—'দেখো-দেখো আমাদের ডালিমগাছে ফুল ধরেছে—সেই ফুল ঝরছে না, পড়ছে না, দিনের পর দিন যেমনকে তেমনটিই রয়েছে।' চাষি দেখল।

'তাই তো?'

টগরও দেখল। তাই তো?

ডালিমগাছে ফুল ধরেছে, করছে ফুটি-ফুটি
ফুটছেও না, ঝরছেও না, নাড়ছে কেবল ঝুঁটি।

এত অবাক কাণ্ড! মাসের পর মাস সেই একটি লাল ফুল, হাওয়ায় হেলে-দোলে। পাপড়ি তার পুরোপুরি খোলেও না, ঝরেও না। রোজই মনে হয় সদ্য ফুটেছে যেন!

রাত্তিরবেলা লুকিয়ে-লুকিয়ে চাষিবউ বলে চাষিকে, 'শোনো, একটা কথা বলি। ফুলটা দেখে আমার কেমন যেন মনে হয়, বুঝি আমাদের ডালিমফুলটিই ঘরে ফিরে এসেছে। কেন বলো তো?' চাষি বলে বউকে, 'আমারও ঠিক এমনটিই মনে হয় বউ! ওই ফুলটির দিকে চেয়ে-চেয়ে মনটা যেন ঠান্ডা হয়, প্রাণটা যেন জুড়োয়। কেন বলো তো?'

প্রাণটা জুড়োয়, মনটা জুড়োয় ফুলের পানে চেয়ে।
ফুলের ভেতর লুকিয়ে যেন ডালিম সোনা মেয়ে।।

দূর দূর! তা কি হয়? তা কি হয়?

আবার মনের দুঃখু মনেই নিয়ে চাষি, চাষিবউ পাশ ফিরে শোয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মেয়েকে হারিয়ে হুতোশে চাষি আর চাষিবউ হয়ে পড়েছিল যেন পাগল-পারা, দিশেহারা। না ভালো লাগে লোকজনের মুখ দেখতে, না রোচে মুখে কোনও খাবার, শীতল বাতাসকেও মনে হয় বুঝি আগুনের হলকা। তোশক যেন কণ্টকশয্যা। কেবল টগরই তাদের মনে একটু শান্তির ছিটে।

একদিন দুপুরবেলা।

চাষি আর চাষিবউ খেতে কাজ করতে গেছে। টগর উঠোনে বসে বড়ি দিচ্ছে, আর মনে-মনে দুঃখু করছে—'আমার ডালিমফুল বোনটিরে!'

হঠাৎ—'দিদি?'

কে ডাকল? কে ডাকল? কে ডাকল? টগরের হাত কেঁপে গেল। বড়ির-নাকটি থেবড়ে গেল। টগর কান খাড়া করে চারিদিকে চাইল। কেউ তো নেই!

'দিদি?'

'কোথায় তুই? ডালিমরানি? কোথায় তুই?' টগর চেঁচিয়ে উঠল।

'আস্তে! আমি এখানে। এই গাছে।'

টগর ওপরদিকে চেয়ে দ্যাখে তার মাথার ওপরে রাঙা টুকটুক ডালিম ফুলটি যেন তার দিকে চেয়ে-চেয়েই দুলছে। টগর বললে,

'বোনটি?'

ফুল বললে,

'দিদি!'

'তুই ফুল হলি কেমন করে বোনটি?'

ডালিমফুল বললে, 'দাঁড়াও। বলছি।'

তারপরেই ফুলের পাপড়িগুলো সব খুলে গেল আর তার ভেতর থেকে টুপ করে খসে উঠোনে নেমে পড়ল ডালিমফুল। পরনে সেই রাঙা ডুরে শাড়িটি, কপালে কাজলের টিপ, চুলে দুই বিনুনি ঝুলছে। তাতে সবুজ ফিতের ফুল। বড়িটড়ি চুলোয় গেল, টগর লাফিয়ে উঠে বোনকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

'এভাবে ফুলের ভেতরে ঢুকে কেন বসে আছিস বোনটি? বাবা-মাকে কষ্ট দিয়ে?'

কিন্তু একি! বুকে তো কেউ ধরা দিল না।

ডালিমফুল বললে,

'কেমন করে জড়াবে দিদি? ধরবে কাকে? আমি যে এখন আমার ছায়াটি! আমাকে ডাকাতে ধরেছিল। তাই ডালিমফুলটি হয়ে ফিরে এসেছি বাড়িতে, তোমাদের কাছে। মাকে দেখি, বাবাকে দেখি, মিনিবেড়ালকে দেখি, তোমাকে দেখি, মনে কত শান্তি পাই।'

টগর বললে—

'কিন্তু ওতে আমাদের শান্তি নেই। তুমি আমাকে বলো কেমন করে তোমাকে কোলে জড়িয়ে ধরতে পারি। তোমাকে ফিরিয়ে আনার কোনওই কি রাস্তা নেই, ডালিমফুল? যত কঠিনই হোক আমি সেটা ঠিক করতে পারব। আমাকে বলো।'

'রাস্তা আছে। কঠিন খুব। তবে তুমি হয়তো পারবে। ডাকাতদের হাত থেকে চুপিচুপি পালাতে গিয়ে আমি একটা ইঁদারার মধ্যে পড়ে গেছি। সেই ইঁদারায় এক বিশাল অজগর সাপের বাসা ছিল, তারই পেটের মধ্যে আমি এখন আছি। তুমি যদি অজগরের পেট থেকে আমাকে বের করতে পারো, আমি আবার বাড়িতে ফিরে আসব।'

'ইঁদারাটা কোথায়?'

'এখান থেকে সাতক্রোশ দূরে পশ্চিমপুরায়।'

'পশ্চিমপুরায় ইঁদারা কি একটাই? না অনেকগুলো?'

'এটার নাম বিষ-কুয়ো। অজগরের বাসা কিনা? সবাই চেনে। কেউ কাছে যায় না।

সাতক্রোশ পথ পেরিয়ে দিদি
পশ্চিমপুরায় যাবি
বিষ ইঁদারায় সাপের পেটে
আমায় খুঁজে পাবি।'

'ঠিক আছে বোনটি। কালই আমি বেরিয়ে পড়ব। তুমি ধৈর্য ধরো। সাপের পেট থেকে বের করে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই বাড়িতে ফিরিয়ে আনব।'

পরদিন ভোরবেলাতে চাষি-চাষিবউ যেই খেতে বেরিয়েছে, অমনি টগরও বেরিয়ে পড়ল। গামছায় চিড়ে, গুড় বেঁধে নিয়ে।

যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। পশ্চিমপুরা আর আসেই না। হাঁটতে, হাঁটতে, হাঁটতে শেষকালে টগরের খুব খিদে পেয়ে গেল। সুয্যি ততক্ষণে ঠিক মাথার ওপরে। টগর একটা পুকুরের পাড়ে, বুড়ো আমগাছের ছায়ায় বসে চিড়ে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খেতে যাচ্ছে— এমন সময় সে দ্যাখে, কী-একটা নাম না-জানা পাখির ছানা বাসা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে ভয়ের চোটে আপ্রাণ চি-চি করে কাঁদছে আর তার কান্না শুনে এক দুষ্টু শেয়াল চুপি-চুপি গুটি-গুটি এগিয়ে আসছে তাকে ধরবে বলে!

টগর তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া ফেলে উঠে দৌড়ে গিয়ে শেয়ালটাকে তাড়িয়ে দিল। তারপরে যত্ন করে পাখির ছানাটাকে আঁচল দিয়ে জড়িয়ে খুব সাবধানে ধরল, যাতে তার গায়ে নোনা হাতের ছোঁয়া না লাগে। তারপরে গাছে চড়ে, বাচ্চাকে তার বাসার মধ্যে রেখে দিল। টগর গাছে উঠে দ্যাখে বাসাতে আরও তিনটি বাচ্চা চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কাঁদছে খিদেয়। টগর কী করে? সে তখন তাদের শালিধানের চিড়ে খেতে দিল, আর সোনালি আখিগুড় খেতে দিল। তারপর বলল,

'খুব সাবধানে থাকবি! আর যেন মারামারি করে নীচে পড়ে যাবি না! দেখলি তো জঙ্গলে কত বিপদ-আপদ? মা যতক্ষণ না ফিরে আসছেন, চুপটি করে বসে থাকবি বাসাতে! হ্যাঁ!'

বাচ্চাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে গাছ থেকে নেমে, টগর আবার খেতে বসতে যাচ্ছে, হঠাৎ থপ্ করে টগরের পায়ের ওপরে থলথলে-হড়হড়ে কী যেন একটা জিনিস এসে পড়ল, কাদার ভেতর থেকে। 'ওরে বাব্বা' বলে লাফিয়ে উঠল টগর!' 'কী ওটা পিছ্‌লা মতন জিনিস আমার পায়ের ওপরে পড়ল?' বলতে-বলতেই ছিপটি তুলেছে, টগরের হাতে ছিপটি ছিল একটা, সেই যেটা দিয়ে শেয়াল তাড়াল। গ্রামের রাস্তায়, বনজঙ্গলের পথে চলতে হলে ছিপটি একটা কাজে লাগে। টগর ছিপটি দিয়ে জিনিসটাকে যেই সরাতে গেছে, থুপুস্ করে লাফিয়ে নেমে গেল পা থেকে সেই পিছ্‌লা জিনিস। আর ঘাসের মধ্যে কে যেন বলে উঠল,

'টগর দিদি, টগর দিদি, আমি তোমার বন্ধু হই
আমার বড় ইচ্ছে করে, আমি তোমার সঙ্গে রই।'

'কে কথা বলছে আমার সঙ্গে?' টগর ভালো করে তাকিয়ে দেখে।

আরে? এ তো একটা কোলাব্যাং! ব্যাঙকে কেমন করে সঙ্গে নেওয়া যায়? টগর উবু হয়ে ঘাসে বসে পড়ল, বলল,

'ভাই কোলাব্যাং, তোমাকে সঙ্গে নিতে আমার একটুও আপত্তি নেই, কিন্তু নেব কেমন করে? আমার সঙ্গে কোনও থলি নেই, ঝুড়ি-চুপড়ি কিছুই নেই। শাড়িতে পকেটও থাকে না—কীসে করে নেব?'

কোলাব্যাং বললে, 'আমাকে তোমার আঁচলে বেঁধে নাও।' 'আঁচলে ব্যাং? এম্যা! তবুও টগর মায়া করে আঁচলের এক কোণে সেই পিছ্‌লা কোলাব্যাঙকে বেঁধে নিল। সঙ্গে-সঙ্গে বললও, 'আমি কিন্তু যাচ্ছি পশ্চিমপুরাতে, বিষ-কুয়োর অজগরের পেটের ভেতর থেকে আমার বোন ডালিমফুলকে উদ্ধার করতে। তুমি ভয় পাবে না তো? সাপ কিন্তু ব্যাং ধরে খায়।'

ব্যাং বললে, 'আমি জানি। চলো তো!'

তখন?

টগর দিদির কোলে।
কোলাব্যাংটি দোলে।

চলতে, চলতে, চলতে অবশেষে পশ্চিমপুরা এসে গেল। টগর যাকেই জিগ্যেস করে, বিষ-কুয়োটি কোথায়, তারা উত্তরদিক দেখিয়ে দেয়। মুখে কিছু বলে না। এমনি উত্তরে হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ আঁচলের মধ্যে থেকে কোলাব্যাং বলে উঠল, 'আমি এখানেই অজগর সাপের গন্ধ পাচ্ছি। টগর দিদি সাবধান! ইঁদারা কাছাকাছিই আছে, দেখো পড়ে যেয়ো না যেন!' একটু পরেই দেখা গেল লতাপাতায় ঢেকে যাওয়া মস্ত একটা ইঁদারার মুখ। ব্যাং না বলে দিলে হয়তো টগর পড়েই যেত তার মধ্যে। যেমন ডালিম পড়ে গিয়েছিল। কৃতজ্ঞ হয়ে টগর বললে, 'ভাই ব্যাং, ভাগ্যিস তুমি সঙ্গে এলে! বল তো এবারে এখন আমার কী করা উচিত? ইঁদারাতে তো এসে গেছি!'

ব্যাং বললে, 'তুমি কিছুই করবে না। চুপচাপ দেখো না ভগবান কী করেন।'

এই বলে ব্যাং থুপথুপিয়ে নেমে পড়ল টগরের আঁচল থেকে। নেমেই সে 'গ্যাঙোর গ্যাং' করে ডাকতে শুরু করে দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে এ-গর্ত, সে-গর্ত, ও-গর্ত থেকে গাদা-গাদা ব্যাং বেরিয়ে আসতে লাগল তো আসতেই লাগল। কোলাব্যাং, সোনাব্যাং, গেছোব্যাং, মেঠোব্যাং, ঝুনোব্যাং, কুনোব্যাং, আরও ক-ত্‌-তো ব্যাং! কোলাব্যাং তখন একটা ব্যাঙের ছাতায় উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করল ঃ ভাইরা আর বোনেরা, আমাদের প্রিয় টগরদিদিকে সাহায্য করতে আজ আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। এই ইঁদারার মধ্যে এক দুষ্টু অজগর সাপ থাকে, টগরদিদির বোন ডালিমফুল তার পেটের মধ্যে আছে। কী করে তাকে বের করা যায়?'

তখন পশ্চিমপুরার ব্যাঙদের নেতা বললে,

'কিন্তু দাদা, আমরা তো ব্যাং। সাপের খাদ্য। আমরা কেমন করে সাপকে জব্দ করব? সাপের সঙ্গে লড়তে পারে কেবল নকুল, মানে বেজি! তা, এপাড়ার সব বেজিরা

ওর কাছে হার মেনে নিয়েছে। অজগরটা এমনই মোটা যে, বেজি কেন, বাঘেও তার সঙ্গে লড়তে পারবে না।'

'তাছাড়া সে তো ইঁদারা ছেড়ে বেরুবেই না। বাঘেই বা তাকে পাবে কী করে?'

এমন সময় বিশাল একটা কালো ছায়া উড়তে-উড়তে এসে পড়ল সেই মাঠের ওপরে।

তারপর টগরের সামনে নেমে এল হেলিকপ্টারের মতো বিরাট এক পাখি।

'তুমি কি ঈগলপাখি?' অবাক টগর জিগ্যেস করল।

'আমি গরুড়পাখি? তুমি তো টগর? আমি তোমাকেই খুঁজছি।'

'আমাকে? কেন ভাই?'

'আমার ছানারা বললে তুমি ওদের প্রাণ বাঁচিয়েছ। শেয়াল তাড়িয়ে আমার ছোট ছেলেটাকে বাসায় পৌঁছে দিয়েছ, নিজের খাবার ভাগ করে আমার ছানাদের খিদে মিটিয়ে দিয়েছ। চিঁড়ে-গুড়ের মতো সুখাদ্য তো ওরা আগে খায়নি। এমন অপূর্ব নেমন্তন্ন খেয়ে তারা খুব খুশি। এখন আমি এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে। বলো কী করতে পারি?'

'তুমি কি অজগরের সঙ্গে লড়তে পারবে? অজগর তো অনেক বড়! আর তুমি তো পাখি?'

হো-হো করে হেসে উঠে পাখি বললে,

আমরা হলুম গরুড় পক্ষী
সাপ আমাদের খাদ্য
অজগরকে হজম করা
নেহাত সহজসাধ্য!

সে তো হবে, কিন্তু ইঁদারাতে নামবে কে? আমি তো পারি না!'

'কাউকে ইঁদারাতে নামতে হবে না। সাপকেই বাইরে বের করে আনব আমরা।' ব্যাং বললে, 'সে ব্যবস্থা আমরা করেছি, কিন্তু বেরুনোর সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে না মারলে, সে আমাদের খেয়ে ফেলবে। একটুও দেরি করলে চলবে না। হ্যাঁ! বিষম বিপদ হবে কিন্তু!'

গরুড় বললে, 'একটুও দেরি হবে না, তুমি ওই নিয়ে একদম ভেবো না! দেখো না কী হয়!'

এবারে সমস্ত ব্যাঙেরা একত্র হয়ে কী যেন পরামর্শ করল ফিসফিস করে। মিটিং শেষ হতে ব্যাং বন্ধু বললে, 'টগরদিদি, গরুড়দাদা, এবারে প্রস্তুত হও, অজগর কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরুবে। বেরুলেই তাকে ধরে ফেলবে কিন্তু! চটপট!' তারপরেই রাজ্যের যত ব্যাং সবাই মিলে গলা ফুলিয়ে চোখ বড় করে কোরাসে গান ধরল,

গ্যাঙোর গ্যাং গ্যাঙোর গ্যাং
বীরবাহাদুর আমরা ব্যাং
একটা আছে কুয়োর সাপ
ব্যাং দেখলেই বাপ্‌রে বাপ্‌
গ্যাঙোর গ্যাঙ গ্যাঙোর গ্যাং

এই অজগর ড্যাডাং ড্যাং
ব্যাঙকে এমন ভয় পায়
লুকিয়ে থাকে ইঁদারায়।
এই অজগর ধরবি ব্যাং?
গাঙোর গ্যাং গ্যাঙোর গ্যাং।

এমন অপূর্ব গান কানে যাওয়ামাত্রই অজগর তো রেগে আগুন, তেলে বেগুন। ব্যাং হয়ে কিনা এত আস্পর্দা! দলে-দলে বাড়ি বয়ে এসে কিনা তাকেই খ্যাপাচ্ছে? প্রাণের ভয় নেই? অজগরকে কিনা গলা ছেড়ে এমন মন্দ কথা বলা? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। অজগর রেগেমেগে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল।

ইঁদারার নরম ঠান্ডা কাদার বিছানা ছেড়ে উঠে, রাগে হিস্-হিস্ করতে-করতে কুণ্ডলীটা পাকে-পাকে খুলতে-খুলতে ফণা তুলে বেরিয়ে এল ওপরে, মাঠে। সেখানে উঠে এসেই সামনে হাজার-হাজার সুইসাইড স্কোয়াডের ব্যাং দেখে তো তার মাথা খারাপের জোগাড়, কাকে ছেড়ে কাকে খাবে? মনোস্থির করবার আগেই গরুড়পাখির বাঁকা ঠোঁট তরোয়ালের ফলার মতন আছড়ে পড়ল নিষ্ঠুর অজগরের মাথায়।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই হিস্-হিস্ করে অজগরের প্রাণটা বেরিয়ে গেল। তখন গরুড়পাখি তার ধারালো ঠোঁট দিয়ে খুব সাবধানে সাপের পেটটি চিরে দিল। ঠিক যেন নিপুণ সার্জেনের ছুরি।

তারপর?

তারপর সবাই কী দেখল? দেখল, অজগরের পেটের মধ্যে এক পরমা সুন্দরী কন্যে ঘুমিয়ে আছে। রাঙা ডুরেটি পরনে, কাজল টিপটি কপালে, দুই বিনুনিতে দুটো সবুজ রেশমিফিতের ফুল দুলদুল করছে। টগর দৌড়ে গিয়ে বোনকে জড়িয়ে ধরল। এবারে দিব্যি জড়ানো গেল। এ তো ছায়া নয়?

'ডালিমফুল? ডালিমফুল? চোখ মেলো বোনটি।'

ডালিমফুল চোখ মেলল। দেখল। হাসল।

'দিদি? এসেছিস্?'

শুনে ব্যাঙেরা আনন্দে হেসে উঠল ঘ্যাং-ঘ্যাং করে। এমন অপূর্ব ব্যাঙের হাসি এর আগে কেউ দেখেনি। কেউ শোনেনি।

টগর বললে, 'কোলাব্যাং ভাই—তোমরা আমার কত যে উপকার করলে, সত্যি—কীভাবে ধন্যবাদ দেব জানি না!'

কোলাব্যাং বললে,

'তাহলে এবারে বলি? এইটেও আসলে কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়াই। আমরাই তো তোমাকে ধন্যবাদ দিলুম। জানো কি, তোমার কাছে আমরা কত কৃতজ্ঞ? আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে?'

'ওমা, সে আবার কেমন? জানি না তো?'

ওদিকে গরুড়পাখি মন দিয়ে সাপভোজন শুরু করেছে, আর টগর ততক্ষণে

ডালিমবোনের হাতটি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরেছে। কোলাব্যাং বললে, 'তবে শোনো। যখন তুমি খুব ছোট ছিলে, পাড়ার দুষ্টুছেলেরা একবার এক গাদা ব্যাঙাচি ধরে এনে হাঁড়ির মধ্যে পুরে রেখে দিয়েছিল। তুমিই আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে ছেড়ে দিয়েছিলে। তোমার মনে অনেক দয়ামায়া। সেই ব্যাঙাচি থেকেই তো আমরা জন্মেছি, আমাদের ছেলেপুলেরা-নাতিপুতিরা জন্মেছে। আজ তোমার একটা উপকারে লাগতে পেরে আমরা খুব খুশি।'

টগরের মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ, একবার সেই বেচারি খুদে-খুদে ব্যাঙাচিগুলোকে হাঁড়িতে ছটফট করতে দেখে সে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিয়েছিল বটে!

'ওমা, তোমরা সেই ব্যাঙাচির ব্যাং? কী মজা!'

এবারে গরুড় বললে, 'সন্ধে হয়ে গেল, সবটা সাপ খেতে পারব না, খানিকটা বরং থাকুক। কাল আমার ছানাদের জন্যে নিয়ে যাব। এখন তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

টগর, চলো, আমার পিঠে উঠে বোসো, আমি তোমাদের দু-জনকে গ্রামে পৌঁছে দিই। সন্ধে হয়ে গেছে, এখন সাতক্রোশ রাস্তা হেঁটে যাবে। আবার যদি ডাকাতে ধরে?'

ব্যাঙের দল তক্ষুনি গ্যাঙোর-গ্যাঙোর করে তাকে মত দিল, আর গাঁই-গাঁই করে বাইবাই করে দিল। টগরদিদি তার ডালিম বোনকে নিয়ে বন্ধু গরুড়ের পিঠে চড়ে বসল, ততক্ষণে আকাশে সুয্যিঠাকুর পাটে নেমেছেন।

আর চাষি-চাষিবউ কী দেখল? দেখল যে তাদের উঠোনের ডালিমফুলটার পাপড়িরা খসেছে, এতদিনে তাতে প্রথম ফুল ধরেছে। ডালিম ফিসফিস করে টগরকে বলল,

'আরে দিদি। আমরা যে উড়তে না উড়তেই বাড়ি পৌঁছে গেছি!'

'হবে না। গরুড়পাখি যে মনপবনে ভেসে যায়! একি এমনি-এমনি বাতাস?' উত্তরটা দিল গরুড়পাখি নিজেই।

আমরা না বিষ্ণুর বাহন।

'তা বটে। তা বটে।'

পরের দিন সকালে চাষিদের পাড়ায় হইহই রইরই। কী ব্যাপার? ব্যাপার কী? সব্বাই সব্বাইকে নাডু খাওয়াচ্ছে কেন?

কেন? কেন না—

এক তো ডালিমফুলকে খুঁজে এনেছে টগর। আর গাঁয়ের মানুষের মুখে এতদিনে ভাত রুচল। মনের আঁধারটি ঘুচল।

আর দুই? এই গাঁ জেলার মেয়েদের সাইকেল প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়েছে।

কী আনন্দ! কী আনন্দ!

কোন মেয়েটি হল? কোন মেয়েটি হল?

আবার কে? ডানপিটে দস্যি মেয়েটি।

টগর। আবার কে?

তারপর একদিন এল পুরস্কার বিতরণী উৎসব। মাঠে সামিয়ানা টাঙানো হল। সভা হল, উৎসব হল, রঙিন পতাকায়, গাঁদাফুলে, আমপাতায় সাজানো হল মঞ্চ—জেলাশাসিকা অগ্নিহোত্রী দিদিমণি এসে ফার্স্ট প্রাইজ দিয়ে গেলেন টগরফুলকে।

কী প্রাইজ? কী প্রাইজ?

নতুন গয়নার মতন চকচকে-ঝকঝকে বেনারসি শাড়ির মতো বেগ্‌নিরঙের একটা চমৎকার সাইকেল!

গাঁসুদ্ধু লোকের আহ্লাদ দেখে কে? আর সবচেয়ে খুশি হল ডালিমফুল, এই জন্যেই না বেচারার ডাকাতের হাতে পড়া! তারপর? তারপর—

টগরদিদি, ডালিমফুল
রোজ যাচ্ছে দূরের স্কুল
সাইকেল নয়, পক্ষীরাজ
গপ্‌পো আমার সাঙ্গ আজ!

লাজুকলতা আর সবুজপাতা

এক চাষা, আর চাষিবউ। মনে বড় দুঃখ তাদের। এমন গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, তবু কেন দুঃখু? তবু দুঃখু, কেন না এত মাছ-ভাত খাবে কে?

আহা, চাষা আর চাষিবউয়ের যে ছেলেপুলে নেই।

তাদের তাই কতরকমের চেষ্টা—ডাক্তার-বদ্যি-হেকিম-কবরেজ-পির-সন্নিসি, তীর্থযাত্রা, জলপড়া-তেলপড়া, মানত-টানত, কিছু বাকি নেই। কোথাও কোনও সাধু সন্নিসির খবর পেলেই ওরা দৌড়য়।

সেদিন এক সাধুর কাছ থেকে ফুল নিয়ে ফিরছে। পথে দেখে কী, এক সাপিনী যাচ্ছে, তার পেছনে-পেছনে কিলবিল করে একগাদা কুচো-কাচা সাপের ছানা-পোনারা চলেছে মাঠ দিয়ে মায়ের সঙ্গে।

দেখে চাষিবউ বললে,—দেখো-দেখো, সাপ-ব্যাঙেরও বাচ্চা হয়, কেবল আমাদেরই হয় না! অমনি একটা যদি সাপের ছানাও হত আমার।

সাধুর দেওয়া মন্ত্রপড়া করবী ফুলটা ওর হাতে ছিল। বাড়ি গিয়ে সেটি কুলুঙ্গিতে আরও অনেক প্রসাদী ফুলপাতার সঙ্গে তুলে রাখল চাষিবউ।

কিছুদিন পরে চাষিবউয়ের একটি মেয়ে হল। টুকটুকে করবীফুলের মতোই দেখতে। কিন্তু তার ঘাড়ে ওটা কী? লাল সুতোর মতন জড়িয়ে আছে? আরে, এটাযে একটা লাল টুকটুকে রোগা লিকলিকে সাপের ছানা!

চাষিবউ আস্তে-আস্তে মেয়ের ঘাড় থেকে সাপের ছানাটিকে তুলে নিয়ে বললে,—

আহারে, তুইও তো আমার পেট থেকেই জন্মেছিস। তুইও আমার সন্তান। কিন্তু তোকে আমি দুধ খাওয়াব কেমন করে? আমি তো মানুষ।

সাপের ছানাটি বললে,—আমার জন্যে ভাবতে হবে না মা, আমি বাগানেই থাকব, আপন মনেই বাড়ব। বোনের কোনও দরকার হলেই আমাকে ডেকো, আমি আসব।

চাষিবউ বললে,—তাহলে দুই বোনের নাম হোক লতা আর পাতা—তুই লাজুকলতা, আর ও সবুজপাতা।

ঠিক আছে,—বলে লতা চলে গেল।

চাষিবউয়ের আহ্লাদ আর ধরে না। চাষাকে বললে,—আমাদের একটাও বাচ্চা ছিল না। সাধুর দয়ায় এখন দুটি মেয়ে। লাজুকলতা বাগানে দোলে, সবুজপাতা মায়ের কোলে।

চাষি বললে,—সাপটাকে মেরে ফেলতে হবে। কেউ বাড়িতে সাপ পুষে রাখে? যদি বিষাক্ত হয়?

শিউরে উঠে চাষিবউ বললে,—কক্ষনও না! তাহলে তো সবুজপাতারও বিষ আছে। ওরা দুজনে যমজ বোন। একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আমার কোলে জন্মেছে। ওকে তাড়ালে আমিও বনে চলে যাব কিন্তু, সবুজপাতাকে নিয়ে।

বাগানে ঝোপঝাড়ে বসে লাজুকলতা মায়ের কথাগুলি শুনতে পেল। মায়ের প্রাণ, তা সে সাপ-ব্যাং যেমনই হোক, সন্তানের জন্যে আকুল তো হবেই। লতার মনটা ভরে গেল।

এদিকে মায়ের কোলে সবুজপাতা বড় হচ্ছে। তার যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। সবই ভালো কেবল ঘাড়ের কাছে একটা অদ্ভুত লাল জড়ুল আছে। ঠিক যেন একটা লতানে লাল টুকটুক সাপের ছানা। ওর জন্মদাগটুকু বাদে পাতার সবই নিখুঁত। চাষি-চাষিবউ মাঠে খাটতে যায়। পাতা যায় পাঠশালায় পড়াশুনো করতে। পাতা লেখাপড়াতে খুব ভালো, পণ্ডিতমশাই তাকে খুব ভালোবাসেন। পাঠশালার পড়া শেষ করেছে, আরও পড়তে ইচ্ছে। ঠিক তক্ষুনি চাষি-চাষিবউ বললে,—তোমার এবার বিয়ের বয়েস হয়েছে যে! শ্বশুরবাড়িতে যেতে হবে। পাত্তর খুঁজি? পাতা বললে,—এখনই বিয়ে কেন? আরেকটু দেরি করো।

কিন্তু চাষা রাজি হল না। পাতা মনের দুঃখে বাগানে গিয়ে কাঁদতে বসল।

হঠাৎ শোনে কে যেন ওকে নাম ধরে ডাকছে!

সবুজপাতা বোনটি আমার,
চক্ষু মোছো সে
লাজুকলতা বোনটি তোমায়
দেখতে এসেছে!

পাতা তাড়াতাড়ি ফ্রকের আঁচলে চোখ মুছে দেখে, তার সামনে টুকটুকে লাল, ঠিক যেন প্রবাল দিয়ে তৈরি একটি ছোট্ট-খাট্টো সাপ। কী সুন্দর! করবী গাছের ডাল থেকে ঝুলে আছে।

সাপ বললে,—সবুজপাতা, আমি তোমার যমজ বোন লাজুকলতা। সাপ বলেই বাগানে থাকি। তুমি কাঁদছ কেন বোনটি? বাবা বিয়ে দিচ্ছেন? পড়াশুনো করতে দিচ্ছেন

না? দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি। তুমি কেঁদো না।

ঘাড়ের জড়ুলটিকে সবুজপাতা সবসময়ে চুল দিয়ে ঢেকে রাখে বটে, কিন্তু সাপটিকে সে দেখেই চিনেছে।

—এরই ছবি আঁকা আছে বটে আমার অঙ্গে। হ্যাঁ এ আমারই আপন বোন।

একটুও ভয় না পেয়ে পাতা তার হাত বাড়িয়ে দিল লতার দিকে। লতাও বোনের হাত জড়িয়ে উঠে এল। পাতা বললে,—তুমি বলবে মাকে আর বাবাকে, 'এমন ছেলে দেখে বিয়ে দাও যে আমার ঘাড়ের জড়ুলটা দেখে ভয় পাবে না। সেই ছেলেই তোমাকে ভালোবেসে যত্ন করে রাখবে। কান্নাকাটির দরকার হবে না।

চোখ মুছে ঘরে গিয়ে পাতা তার মাকে বললে,—ঠিক আছে। পাত্র দেখো, কিন্তু এমন ছেলে চাই, যে আমার ঘাড়ের জড়ুলটাকে দেখে ভয় পাবে না।

চাষি-চাষিবউ ভেবেছিল জড়ুলটা ঢেকেঢুকে বিয়ের সম্বন্ধ করবে। তা হবে না আর। মেয়ে উঁচু করে খোঁপা বেঁধে ঘাড় বের করে রাখছে।

আর ওই সাপের চিহ্ন দেখেই পাত্রপক্ষ 'ও বাবা! এ যে নাগিনীকন্যা!' বলে ছুটে পালাচ্ছে। কোনও সম্বন্ধটাই লাগছে না। আর সেই সুযোগে সবুজপাতার পড়াশুনোও অনেকখানি এগিয়ে যাচ্ছে।

পণ্ডিতমশাইয়ের যা কিছু শেখানোর ছিল, তিনি প্রায় সবই তাকে শিক্ষা দিয়ে ফেলেছেন।

এমন সময়ে ওদের গ্রামে একজন পথিক এলেন। পথিকের একমাথা উড়োচুলে ধুলো ভরতি, পায়ের জুতোয় কাদা, জামা-কাপড় ময়লা হয়ে এসেছে। পথিকের চোখে হাসি, মুখে ক্লান্তির ছাপ। তিনি এসে গ্রামের শিবমন্দিরের পাকা দালানের ছায়ায় বসলেন।

ঠিক তক্ষুনি মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরুচ্ছিল সবুজপাতা। পথিক ওকে দেখে বললেন,—একটু জল দেবে গো?

পাতা ঘটি থেকে তাঁকে জল দিলে। পথিকের অঞ্জলিতে জল ঢালতে-ঢালতে পাতা দেখলে আঙুলগুলি যেন চাঁপার কলি। তাতে হিরের আংটি দু-হাতে দুটো। হাত দেখে মনে হয় না কোনওদিন কোনও খাটনির কাজ করেছে। মাখনের মতো মোলায়েম হাতদুটি। কড়াপড়া নয় চাষা-ভুসেরি মতো। কেবল ডানহাতের তর্জনীতে, মধ্যমাতে আর বুড়ো আঙুলে কালির ছোপ।

তার মানে কিছু লিখছিলেন। সঙ্গে একখানা পুঁটুলিও আছে। পুথিপত্তর বলেই মনে হয়।

জল দিতে-দিতে পাতা বললে,—দুটো গুঁজিয়াও খান। আপনার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।

পথিক আহ্লাদ করে প্রসাদের গুঁজিয়া খেয়ে নিয়ে বললেন,—দুটি ভাত জুটবে?

—নিশ্চয়ই। সম্পন্ন চাষির বাড়িতে অন্ন জুটবে না? তাহলে আমাদের বাড়িতে চলুন। মা আপনাকে ভাত খাওয়াবেন নিশ্চয়ই। আমাদের অন্নের অভাব নেই।

চাষি-চাষিবউ তো অতিথি পেয়ে অবাক। তারা যত্নআত্তি করলে যথেষ্ট। অতিথি

দুপুরে বিশ্রাম করে উঠে বিকেলবেলায় চাষি, চাষিবউকে বললেন,—আপনাদের যত্নে আমি অভিভূত। আমি আপনাদের মেয়েটিকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে চাই।

চাষি-চাষিবউ তখন দুজন-দুজনের মুখের দিকে চাইছে। অতিথিটির বাড়ির অবস্থা তো ভালোই মনে হচ্ছে। দেখতেও সুন্দর। স্বভাবটিও শান্ত।

চাষি বললে,—সে তো ভালো কথা। কিন্তু আমার মেয়েকে কি আপনি ভালো করে দেখেছেন? ওর যে একটা জড়ুল আছে! সেটা দেখে আর কেউ ওকে বিয়ে করতে চায় না।

অতিথি অবাক হয়ে বললেন,—তাই নাকি? কই, দেখি তো? কোথায়?

সবুজপাতা তখন চান করে এসে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ভিজে চুলে উঁচু করে ঝুঁটি বেঁধে উঠোনের তারে ভিজে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল।

চাষিবউ পিছন থেকে তাকে দেখিয়ে দিয়ে অতিথিকে বললে,—ওই যে, ঘাড়ের কাছে, ওই দেখুন। লালচে দাগটি? লতানে মতন?

তারপর চাষি-চাষিবউ আর অতিথি, তিনজনেরই অবাক হওয়ার পালা? কই? জড়ুলটা গেল কোথায়? নেই তো! মেয়ের ঘাড়টি যেন শাঁখের মতন ধবধব করছে।

অতিথি বললেন,—কোথায় জন্মদাগ?

চাষি-চাষিবউ কলকলিয়ে বললে,—ওই তো, ওইখানেই তো ছিল এতদিন। কেমন করে মিলিয়ে গেল, কিচ্ছুটি জানি না! পাতা, ও পাতা, তোর জড়ুলটা গেল কোথায় মা?

পাতা ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দেখে বললে,—কী জানি? নেই বুঝি? আমি তো জানি না মা।

—সে কী? চানের সময়ে ধুয়ে গেল নাকি?

হেসে অতিথি বললেন,—আমার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে বলে, ওই জড়ুলটা এতদিন ছিল মনে হচ্ছে! তাঁর কথাটি শুনে আর হাসিটি দেখে, কী বুঝল কে জানে, লজ্জায় দৌড়ে সবুজপাতা বাগানে চলে গেল।

লাজুকলতা বোনটি আমার
দৌড়ে এসো হে
জন্মজড়ুল কোথায় গেল,
খুঁজে পাই না যে?

লতা উঁকি মারল করবী গাছের ডালে। হেসে বলল,—কাল যখন তুই আমাকে আদর করছিলি কোলে করে, তখন আমি আস্তে-আস্তে জড়ুলটা নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি। তাই ওটা উঠে গেছে—আর নেই!

ভয় পেও না বোনটি আমার,
জামাই এসেছে
জন্মজড়ুল ফুড়ুৎ করে
মিলিয়ে গিয়েছে!

সবুজপাতা বোনকে জড়িয়ে ধরে বললে—বোনটি, তবে তৈরি হও।

আমি একা-একা শ্বশুরবাড়ি যাব। কিন্তু—তোমাকেও যেতে হবে সঙ্গে। যেতে হবে, বলে দিলুম!...

তারপর? তারপর সেদিন যখন পালকি করে বউ নিয়ে রাজপুত্তুর প্রাসাদে ফিরে চলল তখন বোনের হাতের সিঁদুর কৌটার মধ্যে শুয়ে সঙ্গে-সঙ্গে চলল লাজুকলতা বোনটিও।

চাষিবউ খুশি হয়ে চাষিকে বললে,—যাক দু-বোনে একসঙ্গে থাকলে আমিও নিশ্চিন্দি।

চাষি বললে,—হুম!

টাপুর, টুপুর আর বনদেবী

এক বিশাল অরণ্যে, একটা ঝিরঝিরে নদীর ধারে, টাপুর আর তার বউ টুপুর কুটির বেঁধে বাস করত। দুজনে খুব ভাব, গাছের ফল খেয়ে, মাটি আর মূল খেয়ে, হরিণ মায়ের দুধ খেয়ে, পদ্মফুলের মধু খেয়ে টাপুর আর টুপুর আপনমনে গান গাইত, নদীর জলে সাঁতার দিত, ময়ূরের সঙ্গে-সঙ্গে নাচত।

একদিন হল কী, টুপুর অন্য একটা পাহাড়ি ঝরনার জলে চান করে এসেছে। সেই জলে কী যে বিষ ছিল কে জানে, টুপুরের খুব অসুখ করল। টুপুর মরেই গেল। বেচারি টাপুরের খুব মনখারাপ। টুপুর না থাকলে তার কিছুই ভালো লাগে না। একা-একা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। আর মনের দুঃখু গান গেয়ে-গেয়ে গাছপালাদের জানায়। সেই বনের জীবজন্তুরা সবাই টাপুর-টুপুরের বন্ধু, গাছপালারা সবাই টাপুর-টুপুরের সখা-সখী। তাদেরও খুব মনখারাপ হয়েছে। টুপুরের জন্য সারা অরণ্যেই যেন হাওয়া নেই, আলো নেই, খুশি নেই। গাছে ফুল ফুটছে না। শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি বেরোচ্ছে না। বনদেবীর খুব মুশকিল হল। এমন করলে বনরাজ্য চলবে কেমন করে?

বনদেবী টাপুরের কাছে এলেন।

'টাপুর, তোমার মনখারাপ?'

'হ্যাঁ, আমার টুপুরের জন্যে মন কেমন করছে।'

'তুমি যদি আমার কথা শুনে আমি যা বলব তাই করো, তা হলে টুপুরকে ফেরত পেতে পারো। আমি যা বলব তা না করে অন্যকিছু করলে কিন্তু হবে না।

ঠিক পারবে তো?'

'কেন পারব না? আপনার কথা না শুনে অন্য কাজ কেন করতে যাব? আপনি বনদেবী, আমার টুপুরকে ফিরিয়ে দেবেন, আমি কি আপনার অবাধ্য হতে পারি?'

'তা হলে চলো আমার সঙ্গে।'

টাপুর তো চলল বনদেবীর পিছু-পিছু। বনদেবী তখন একটা দীর্ঘ সবুজ আলো হয়ে আগে-আগে যাচ্ছেন, তাঁর দেবীমূর্তি তখন নেই। দেবী বললেন, 'টাপুর, বাছা, আমার কথা ঠিক শুনবে তো? অবাধ্যতা কোরো না কিন্তু!'

'আরে? আচ্ছা মজা তো! কেন শুনব না?'

বনদেবী বন ছাড়িয়ে একটা উপত্যকা দিয়ে চলেছেন। সেই সবুজ আভার পিছু-পিছু টাপুরও হাঁটছে। একটা মাঠের মধ্যে বনদেবী বললেন, 'ওঃ, কত ঘোড়া! দেখো, দেখো কেমন বুনো ঘোড়ার দল ছুটে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, অনেক ঘোড়া বটে!' টাপুর বলল। যদিও টাপুর ঘোড়াটোড়া কিছুই দেখেনি। বনদেবী বললেন, 'বাঃ, কী চমৎকার আম ধরেছে এই গাছে! কয়েকটা আম পেড়ে আনো তো টাপুর।' এদিকে না আছে আমগাছ না আম! টাপুর কী করে? সে অন্য একটা গাছে উঠে ডাল নামিয়ে ধরে আম পাড়বার ভান করতেই দেখে তার হাতে পাকা-পাকা আম এসে পড়েছে, বনদেবীর ম্যাজিকে। বনদেবীকে আম দিয়ে নিজেও খেতে-খেতে চলল টাপুর।

'বাঃ, চমৎকার আম! কী মিষ্টি!' বনদেবী বললেন।

টাপুরও বলে, 'খুব মিষ্টি, সত্যি!' কিন্তু আমটা ছিল বেজায় টক!

কিন্তু বনদেবী যা বলবেন, ওকেও তাইই বলতে হবে। অন্য কথা বললে তো চলবে না।

খানিক বাদে আর-একটা বন এসে পড়ল। বনদেবী বললেন, 'এই যে আমরা এবার মৃত্যুর শহরে এসে পড়েছি। এখানেই টুপুরকে কোথাও রেখে দিয়েছে যমদূত। এই প্রাসাদটাতে ঢুকে পড়া যাক। ঠিক আমি যেমন করে ঢুকছি, তুমিও তেমনি করে এসো আমার পেছন-পেছন। আমি প্রথমে কড়াটা ধরে দরজা খুলব। পরদাটা তুলে, ঘরে ঢুকব ডান পা তুলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে; মাথা নীচু করে, যাতে ওপরে চৌকাঠে মাথা ঠুকে না যায়।' সবুজ আলোটি এসব কিছুই করল না। কিন্তু টাপুর এমন ভান করল, যেন কড়া ধরে দোর খুলছে, তারপর পরদা তুলে, মাথা হেঁট করে, চৌকাঠ ডিঙিয়ে ডান পা তুলে, সাবধানে ঘরে ঢোকার অভিনয় করল। সামনে ঘরবাড়ি কিছুই নেই। ঘন বন। 'ওই যে তোমার বউ বসে আছে। ওর পাশে গিয়ে বোসো।'

টাপুর তাকিয়ে দেখে, সত্যি-সত্যি একটা গাছের তলায় টুপুর বসে আছে। টাপুর তার পাশে গিয়ে বসল। টুপুর কিন্তু ওকে দেখতেই পেল না। টাপুর ভালো করে দেখল, এটা টুপুর নয়, টুপুরের ছায়া। বনদেবী বললেন, 'এবার তোমার বউ রান্না করবে, আমাদের খেতে দেবে।'

টাপুর দেখল পাশে কেউ নেই। টুপুরের ছায়া মিলিয়ে গেছে।

বনদেবী বললেন, 'এই যে, টুপুর কী সুন্দর গরম-গরম লুচি, আলুর দম করেছে!

ভালো করে খাও।'

টাপুর দেখল সামনে কিছুই নেই। ঘাস, মাটি, নুড়িপাথর। বনদেবী তো আলোর শিখা হয়ে আছেন। কী আর করে? টাপুর লুচি ছিঁড়ে আলুর দম দিয়ে খাওয়ার ভান করতে লাগল। এবার বনদেবী বললেন, 'আহ, চমৎকার খেলুম!'

টাপুরও বলল, 'আঃ! চমৎকার খাওয়া হল!'

বনদেবী বললেন, 'এটা মৃত্যুর শহর, এখানে নিয়মকানুন সব আলাদা টাপুর। যখন এখানে রাত্রি হয়, তোমাদের তখন সকাল। আর মৃত্যুর দেশে যখন সকাল, তখন তোমাদের রাত্রি নামে।'

একটু বাদেই অন্ধকার হয়ে গেল। তখন টাপুর দেখল, সত্যি-সত্যি একটা প্রাসাদে সে বসে আছে। চারদিকে ফিসফাস কথা বলছে কারা যেন। অনেক ছায়ামূর্তি ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। ভয় করছে না একটুও। এদিকে-ওদিকে অনেক প্রদীপ জ্বলছে। একদিকে রান্নাঘরে উনুন জ্বলছে—রান্নাবান্না হচ্ছে। টাপুর দেখল টুপুরের ছায়া আবার তার পাশে এসে বসেছে। টুপুর এখন বেশ হাসিখুশি, দুজনে অনেক গল্প করল সারারাত। চারদিকে আরও অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারাও মরে-যাওয়া মানুষ। এটা মৃত্যুর শহর, এখানেই তাদের বসবাস। টাপুরই এখানে বাইরের লোক। আস্তে-আস্তে রাত ফুরিয়ে গেল, আকাশ ফরসা হয়ে গেল। বনদেবী এসে বললেন, 'টাপুর, এবার সবাই চলে যাবে, তোমার বউও। তুমি এখন সারাদিন এখানেই বসে থাকো। কোথাও যেন চলে যেয়ো না। সন্ধেবেলা সবাই আসবে, তখন তোমার বউও আসবে। কোথাও যেয়ো না যেন!'

'না, না, এখানে আর আমি কোথায়ই বা যাব? চুপচাপ বসে থাকব। আপনাকে কথা দিচ্ছি।'

সকাল হতে, টাপুর দেখে সে এক বিশাল তপ্ত মরুভূমিতে পড়ে আছে। সূর্য মাথার ওপর জ্বলছে। পায়ের নীচে গরম বালি। ছায়া নেই কোনওদিকে। একফোঁটা জল নেই, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। মাথায় রোদের তাত, পায়ে বালির তাত, টাপুরের অবস্থা কাহিল। তবু টাপুর নড়ল না। টুপুরকে ফিরে পাওয়ার আশায় টাপুর সব সহ্য করে সেই মরুভূমিতে বসে রইল। জলের খোঁজে, কী ছায়ার খোঁজে কোথাও গেল না। সন্ধেবেলা আবার সেই ছায়াপ্রাসাদ ভেসে উঠল, ভালো ভালো খাবারদাবার, শরবত নিয়ে টুপুর এল, আনন্দে-আহ্লাদে রাত্রি কেটে গেল।

এমনি করে পুরো এক মাস কাটল, অমাবস্যা-পূর্ণিমা পার হল। বনদেবী বললেন, 'টাপুর তোমার ওপর আমি খুশি হয়েছি, কাল সকালে টুপুরকে নিয়ে বনে ফিরে যেয়ো! পাঁচটা পাহাড়, পঞ্চপর্বত পেরিয়ে, তবে তোমার বন। যতক্ষণ না পাঁচ নম্বর পাহাড়টা পার হয়ে যাচ্ছ, টুপুরকে যেন ছুঁতে যেয়ো না। পাঁচ দিন, পাঁচ রাত পরে, তুমি তোমার বউয়ের হাত ধরতে পারো। তার আগে নয়। এইটে মনে রেখো।'

বনদেবীকে প্রণাম করে টাপুর রওনা হল। আবছা ছায়া-ছায়া টুপুরও চলল তার সঙ্গে-সঙ্গে। প্রথম পাহাড় সবুজ রঙের। সবুজ পাহাড় ডিঙোনোর পরে টুপুরের ছায়াটি যেন একটু ঘন হয়েছে মনে হল। দ্বিতীয় পাহাড় নীল রঙের। নীল পাহাড় ডিঙোনোর পরে

আর-একটু ঘন। প্রত্যেকটা পাহাড় পেরনোর পর টুপুরের গায়ে যেন একটু করে গত্তি লাগছে, আস্তে-আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, অশরীরী থেকে শরীরী হয়ে আসছে ক্রমশ। তৃতীয় পাহাড়টি গোলাপি রঙের। চতুর্থটি হলুদ। হলুদ পাহাড় পেরিয়ে এসে টুপুর যেন ঝলমল করছে। গোলাপি পাহাড়ের গোলাপফুল রং তার গালে, ঠোঁটে, হলুদ পাহাড়ের সোনা তার হাসিতে, সবুজ পাহাড়ের শ্যামলছায়া তার সারা গায়ে—আর নীল পাহাড়ের ঘন নীলচে-কালো রং তার চোখের মণিতে। এবার আসছে পঞ্চম পাহাড়। এটার নাম ধূম্রপাহাড়, ধোঁয়া রং, কুয়াশাঘেরা পাহাড়। হঠাৎ টুপুরের পায়ে হোঁচট লাগল, আর বনদেবীর উপদেশ ভুলে গিয়ে টাপুর তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গেই টুপুর আবার ছায়া হয়ে, ধোঁয়া হয়ে ধূম্রপাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেল, আর-একটা হরেক রঙের নাম-না জানা পাখি করুণ কান্নার সুরে ডাকতে-ডাকতে উড়ে চলে গেল টাপুরের সামনে দিয়ে। টাপুর কেঁদে উঠল, 'এটা খুব অন্যায়! এটা কিন্তু ঠিক হল না!' কিন্তু সে কান্না কে শুনছে?

হঠাৎ একটা ইঁদুরনি বেরিয়ে এল ধূম্রপাহাড়ের গর্ত থেকে। সে বলল, 'টাপুর, এটাই পৃথিবীর নিয়ম। তুমি কেঁদো না। দেখো না, ঘাসেরা শুকিয়ে যায়, আবার গজায়। ফুলেরা ঝরে যায়, আবার ফোটে। শুকনো পাতার জায়গায় কচিপাতা জন্মায়, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, মানুষ-টানুষ সবার বেলাতেই এই নিয়ম। এই যে সেদিন আমার পাঁচটা কচি ছানাকে উদ্‌বেড়ালে খেয়ে ফেলল, ওদের কি আমি ফিরে পাব? উদ্‌বেড়ালের ওপরেই বা রাগ করে কী হবে? সে তো তার খাবারই খেয়েছে! টাপুর, তুমি কেঁদো না। তুমি বরং টুপুরের খুব সুন্দর একটা ছবি আঁকো। যেটা দেখলে তোমার মনে আনন্দ হবে।'

ইঁদুরনির কথায় টাপুরের মন শান্ত হল। সে নিজের বনে ফিরে গিয়ে, একটু একটু করে পাঁচ পাহাড়ের রং মিশিয়ে অনেক দিন ধরে অতি অপরূপ একটা ছবি আঁকল টুপুরের, সেই ছবিতে টুপুর হাসছে। টাপুর বলল, 'টুপুর, আহা—তুমি যদি এখন আমার সঙ্গে নদীর কূলে এসে বসতে; এত সুন্দর সূর্যাস্তটা দেখতে একা-একা কী ভালো লাগে?'

তক্ষুনি আকাশ দিয়ে তথাস্তমুনি যাচ্ছিলেন, 'তথাস্তু' 'তথাস্তু' বলতে-বলতে। যেই টাপুর কথাটি বলেছে, অমনই তিনিও 'তথাস্তু' বলে ফেলেছেন। আর তখনই ছবির টুপুর জ্যান্ত হয়ে এসে টাপুরের হাতটি ধরেছে! যেই না ধরা, অমনই কে যেন হাততালি দিয়ে, 'বাঃ! বাঃ! এই তো কী সুন্দর,' বলে উঠল। টাপুর-টুপুর দেখে গাছের গোড়ায় এক গর্ত থেকে উঁকি মারছে এক মোটাসেটা ইঁদুরনি! ইঁদুরনি একগাল হেসে বলল, 'টাপুর, আমার আবার ছ'টা ছানা হয়েছে!' ছোট্ট-ছোট্ট গোলাপি ছানাগুলোও তার পেছনে।

টাপুর-টুপুর বলে উঠল, 'আমরা ওদের খুব করে পাহারা দেব, উদ্‌বেড়াল আর ধরতেই পারবে না।'

বনদেবী এদের কথাবার্তা শুনে হাসলেন।

বুম্বা আর রাক্ষসমশাই

নাকের বদলে নরুন পাওয়ার গল্পটা তো সবাই জানে। কিন্তু বুম্বার গল্পটা? বুম্বা বলে এক রাজপুত্তুর ছিল। রাজামশাইয়ের কী দুর্মতি হল, তিনি বুড়ো বয়েসে হঠাৎ একটি পরমাসুন্দরী গয়লানিকে বিয়ে করে বসলেন। বুম্বার মা মনের দুঃখেই বোবা-কালা হয়ে গেলেন। মহারানিও বোবা হয়ে গেলেন, বুম্বাও পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়। সৎ-মা তাকে ডেকে খেতেও বলে না, শুতেও বলে না। বুম্বা চান করে না, খায় না, যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে থাকে। মহারানি কিছু দেখেও দেখেন না। রাজামশাই নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত, কিন্তু করবেনটা কী? কেবলই পেয়াদা পাঠিয়ে বুম্বাকে ধরে নিয়ে আসেন। দাসীদের বলেন, ভালো করে রাজভোগ খাওয়াও, সোনার পালঙ্কে শুইয়ে পাখার বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। কিন্তু বুম্বা আবার পালায়। মহারানি যেন পাথর।

একদিন রাস্তায় বুম্বার সঙ্গে এক সন্ন্যাসীর ভাবসাব হল। তিনি বুম্বার দুঃখের কথা শুনে বললেন, 'এক কাজ করো। লাল-নীল গোলাপফুল ফুটে থাকে তিনমুখো রাক্ষসের বাগানে। সেটা এনে তোমার মাকে তার গন্ধটি শোঁকাও, মা আবার কথা বলবেন। বোবা-কালা হয়ে থাকবেন না। একটিই ফুল, তার পাপড়ির একটা পিঠ লাল, আরেকটা পিঠ নীল।'

বুম্বা তো অবাক। একই ফুলে লাল-নীল পাপড়ি! একই পাপড়ি লাল-নীল দু-রঙা! আবার একটা রাক্ষসের তিনটে মাথা! হলেই বা সে রাজপুত্র, সে তো রাম নয় যে, দশমুণ্ড রাবণকে মারবে। তিনমুখো রাক্ষসের ফুল চুরি করা সোজা কথা? কোথায় থাকে সে রাক্ষস?

সন্ন্যাসী বললেন, 'বিন্ধ্যপাহাড়ে।'

বুম্বা চলল বিন্ধ্যপাহাড় খুঁজতে। যেতে-যেতে পথে একটা মরো-মরো জন্তু দেখতে পেলে বুম্বা। জন্তুটাকে কেউ তীর মেরেছে। বুম্বার খুব দয়ামায়া। সে তীরটা খুলে নিয়ে সেখানে লতাপাতা চিবিয়ে ওষুধ তৈরি করে লাগিয়ে দিয়ে রক্ত বন্ধ করলে। তার মুখে-চোখে জলের ছিটে দিলে, তাকে খাওয়ার জল এনে দিলে। আস্তে-আস্তে মরো-মরো প্রাণীটার জ্ঞান হল। সে একটা শিশু শম্বর হরিণ। শিকারিদের খুব লোভ ওদের ওপর। বুম্বার যত্নআত্তিতে হরিণছানাটা বেঁচে উঠল। তখন বুম্বা বললে, 'তোমার মা কোথায়? চলো তোমাকে পৌঁছে দিই।'

হরিণছানাকে কোলে করে তার মায়ের কাছে নিয়ে চলল বুম্বা। হরিণী-মা'ও এদিকে বাচ্চাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। বুম্বার কোলে বাচ্চাকে দেখে খুব খুশি। সব শুনে বললে, 'তবে শোনো, আমি অনেক রকম বনের ম্যাজিক জানি। তোমার যখনই দরকার হবে, আমাকে বোলো, আমি চলে যাব তোমাকে সাহায্য করতে।'

বুম্বা বললে, 'তবে এক্ষুনি সাহায্য করো না। তিনমুখো রাক্ষসের বাগান থেকে আমার লাল-নীল গোলাপফুলটি চাই।'

হরিণী বললে, 'তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার পিঠে বোসো। আমি তোমাকে তার দোরগোড়ায় নামিয়ে দেব। রাক্ষসকে একটুও ভয় না পেয়ে তুমি বলবে, 'আমি আপনার ফুল-বাগিচার মালির কাজটা চাই।' তারপর একদিন সুযোগ বুঝে ফুলটি তুলে পালাবে। কিন্তু দেখো, যেন পালাবার সময়ে হোঁচট খেয়ো না। তা হলেই কেলেঙ্কারি হবে।'

বুম্বাকে হরিণী রাক্ষসের দোরে নামিয়ে দিল পিঠ থেকে। বুম্বা কড়া নাড়তেই তিনটে ঘাড়ে তিনটে মুণ্ডু নিয়ে বিশাল রাক্ষসমশাই দরজা খুললেন। তারপর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী চাই?'

সেই বাজ পড়ার মতন আওয়াজে তো বুম্বার ভয়ে বুক একদম মুঠোয়-ধরা চড়াইপাখির বুকের মতো ধুকপুক ধুকপুক...। তবু বুম্বা একটুও ভয় পাওয়া ভাব প্রকাশ না করে বুক ফুলিয়ে দুইহাত জোড় করে রাক্ষসমশাইকে এক নমস্কার ঠুকে দিলে। রাক্ষস তো খুব খুশি। তিনিও প্রতি-নমস্কার করলেন। রাক্ষস নমস্কার করছে দেখে বুম্বা বুকে একটু বল পেল। তবে তো সে তেমন বুনো জংলি নয়! সভ্য সমাজের আদবকায়দা জানে। তা হলে ভয়ের কী আছে? যতগুলোই মুণ্ডু থাক না কেন। কত লোকের তো হাতে-পায়ে ছ-সাতটা আঙুল থাকে। সেটা কি ভয়ের? সাত-পাঁচ ভেবে বুম্বা বললে, 'রাক্ষসমশাই, আমি বুম্বা। আমি গাছপালার খবরদারি করি। আমাকে কি আপনার বাগানের মালি করবেন?'

রাক্ষসের হাতে তখন খুরপি। তিনি মাটি খুঁড়ে গাছের পরিচর্যা করছিলেন। রাক্ষস বললেন, 'বেশ, বেশ। আমি সত্যিই আর একলা পেরে উঠছি না, কত যে গাছাগাছালি বেড়েছে বাগানে। পেশোয়ারের সোনালি খেজুরগাছ, কাবুলের গোলাপি ডালিম, কাশ্মীরের আপেলগাছ, হায়দরাবাদের আঙুরলতা, বাংলাদেশের বাতাবিলেবু, শ্রীলঙ্কার লঙ্কাগাছ, করবী, দোপাটি, গাঁদা, গন্ধরাজ, বেল, জুঁই, মালতী, মাধবী...কী নেই। এমনকী পদ্মাপারের পদ্মফুল

আর গান্ধারের গন্ধলেবু পর্যন্ত আছে। তা তুমি যদি দেখভাল করতে চাও তো ভালোই হয়। দেখো, আমার দু-একটা বড় আহ্লাদি ফুলগাছ আছে কিন্তু, তাদের যেন যত্ন হয়। তার মধ্যে ওলন্দাজ দেশের ডোরাকাটা টিউলিপের ঝাড় আর পারস্যের লাল-নীল গোলাপফুলের গাছদুটি বিশেষ প্রিয়। তুমি পারবে তো বুম্বা?'

বুম্বা ঘাড় নাড়লে, 'নিশ্চয় পারব স্যার।' স্কুলে ওদের সবসময়ে মাস্টারমশাইকে স্যার বলে ডাকতে হত কিনা, তাই ওটাই মুখে এসে গেল।

রাক্ষসমশাই তো আরও খুশি। একেই নমস্কার, তার ওপরে স্যার। তিনি বুম্বাকে ভারি যত্ন করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। দুধ খাওয়ালেন, রসগোল্লা খাওয়ালেন। তারপর বাগান দেখাতে বেরোলেন। গাছগুলো রাক্ষসমশাইকে দেখে খুব খুশি, ডালপালা দুলিয়ে পাতা নেড়ে-নেড়ে আদর-আনন্দ জানাতে লাগল। মোটা থাবা দিয়ে রাক্ষসও হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন তাদের। দেখেশুনে বুম্বা বুঝল, রাক্ষসমশাই নিশ্চয় একদম মন্দ লোক নন। তা হলে গাছেরা ঠিক টের পেত। তাদের ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। বাগানে ঘুরে রাক্ষসমশাই অনেক যত্ন করে বুম্বাকে সব গাছপালাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবশেষে এল একটা শ্বেতপাথরের জাফরিকাটা পাঁচিলঘেরা সবুজ মখমলের রুমালের মতো জমিতে একটিই গোলাপ গাছ।

রাক্ষসমশাই বললেন, 'এটি লাল-নীল গোলাপফুলের গাছ। আমার বড্ড আদরের গাছ। একেই সবচেয়ে সাবধানে রাখবে।'

বুম্বার তো বুক ধড়ফড় শুরু হয়েছে। সে তো চোর নয়। কেমন করে চুরি করবে সে রাক্ষসের এত সাধের ফুলটি? বুম্বার খুব মন খারাপ।

পুরো সাতদিন ধরে খুব মন দিয়ে বুম্বা বাগানের যত্ন করলে। তারপর বলেই ফেললে, 'রাক্ষসমশাই, আপনাকে আমি একটু বিরক্ত করছি। আমার একটা জিনিস জানবার দরকার আছে আপনার কাছে। ওই লাল-নীল গোলাপফুলটি যদি কেউ তুলে নেয়, ওখানে কি আরেকটি ফুল জন্ম নেবে?'

রাক্ষস গাঁক-গাঁক করে বললেন, 'কেউ যদি ফুলটি তোলে, আমি তক্ষুনি তার হাতটি জন্মের মতন ভেঙে দেব।'

বুম্বা বললে, 'তা না হয় দিলেন। কিন্তু আরেকটা ফুলের কী হবে?'

'আরেকটা ফুল ফুটতে আরেকটি বসন্ত এসে পড়বে।'

'কিন্তু ফুটবে তো?'

'তা ফুটবে। বছরে একটিই ফোটে, বছরে একটিই ঝরে। তা বলে কিন্তু ছিঁড়তে আমি দেব না।' রাক্ষসমশাই একসঙ্গে তিনটে গোঁফে তা দিয়ে তিনখানা মুণ্ডু নাড়তে লাগলেন। আর ছ'টা চোখের কোনা দিয়ে টেরিয়ে-টেরিয়ে বুম্বার দিকে কেমন-কেমন করে চাইতে লাগলেন।

বুম্বা সে চাউনি দেখে বুঝলে, রাক্ষসের মনে সন্দেহ হয়েছে। বুম্বা সরল ছেলে। সে বললে, 'রাক্ষসমশাই, আপনার মনে যেন ধন্দ লেগেছে? আপনি ঠিকই ভেবেছেন। ওই ফুলটিকেই একজন চায়। আমি তার কথাই আপনাকে জানাতে চাইছি, দয়া করে শুনুন।

আমি কথা দিচ্ছি, আপনার ফুল আমি কাউকে তুলতেও দেব না, চুরি করতেও দেব না। আপনার ফুল আপনি যদি নিজে হাতে তুলে দেন, তবেই সে নেবে।'

শুনে তো রাক্ষস হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে বললে, 'দূর! পাগল হয়েছ বুম্বা? আমি কখনও প্রাণে ধরে ও-ফুল বোঁটা থেকে ছিঁড়তে পারি? যাই হোক, ফুলটা কে চায়? কেন চায়? শুনি তো। সে জানলই বা কেমন করে আমার ফুলের গোপন কথা? কেউ তো কোনওদিনও আমার বাগানে বেড়াতে আসে না?'

বুম্বা তখন সন্ন্যাসীর কথাটা বললে। সন্ন্যাসীরা ধ্যানে মনে-মনেই সবকিছু জানতে পেরে যান। বুম্বার মা বোবা-কালা হয়ে গেছেন মনের দুঃখে, এ-কথা শুনে রাক্ষসমশাইয়ের তো চোখে জলই এসে গেল! তিনি কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছে নিয়ে, একটু কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে বললেন, 'দেখো বুম্বা, আমি তো রাক্ষস, মা-বাবার মর্ম বুঝি না। রাক্ষসি-মা জন্মমুহূর্তেই সন্তানকে ছেড়ে চলে যান। আমরা জন্মেই হাঁটতে পারি, ছুটতে পারি, জীবজন্তু ধরে খেতে পারি, কিন্তু তোমার মায়ের কথা শুনে আমার মন কেমন করছে। মা কেমন জিনিস তা আমি জানিই না। কিন্তু তিনি যদি হঠাৎ বোবা-কালা হয়ে যান, সে যে খুব কষ্টের হবে সেটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি আছে আমার। চলো, তোমাকে ফুলটি তুলে দিই। কিন্তু তার বদলে তুমি আমাকে একটা জিনিস দেবে। দেবে কিনা বলো?'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বুম্বা বললে, 'কী চান রাক্ষসমশাই? যা চাইবেন তাই দেব।'

রাক্ষস বললেন, 'তা হলে তোমার মা'কে আমাকে দিতে হবে।'

এবার বুম্বার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। মা-বেচারি এত ভিতু মতন, শান্ত মতন, লাজুক মতন, দুঃখী মতন, তিনি তো রাক্ষস দেখলেই মূর্ছা যাবেন। এই রাক্ষস তাকে ধরে এনে করবেটা কী?

বুম্বা বললে, 'রাক্ষসমশাই, আপনি মা'কে ধরেই আনবেন যদি, তবে আর মাকে মূক-বধিরতা থেকে মুক্ত করি কেন? উনি যেমন আছেন তেমনি থাকুন। ফুলটুলে আর দরকার নেই। ওখানে তবু রানি হয়ে আছেন। এখানে চাকরানি হয়ে থাকবেন।'

রাক্ষস এবার সত্যি-সত্যি ছয় চোখে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললেন, 'তা কেন? তাঁকে আমি চাকরানি করব কেন? তোমার মাকে এখানে নিয়েই বা আসব কেন? আমি কি যেতে পারি না? তুমি কেমন করে এমন কথা ভাবতে পারলে? দেখো তো টগর, জবা, জুঁই, দেখো দিকিনি, চামেলি, শেফালি, কৃষ্ণকলি। আমি কখনও এমন কাজ করতে পারি?'

তিন মুণ্ডু ঝেঁকে তিনি প্রশ্ন করলেন কাতরভাবে। তখন ফুলেরা মাথা নেড়ে, গাছেরা মাথা ঝাঁকিয়ে তাড়াতাড়ি বললে, 'না, না, না, তুমি এমনটি করতে পারোই না।'

বুম্বা তখন রাক্ষসের ছয় চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, 'তা হলে তুমি তখন কী বলছিলে? তুমি যে বললে আমার মা'কে তোমার চাই। বললে না?'

'সেই তো। আমার মা নেই বলে তোমার মাকে আমারও মা হতে বলছি আমি। আমি কি তাঁর রাক্ষস-ছেলে হতে পারি না?'

'অ। তাই বলো। নিশ্চয়। আমার মা তো তোমারও মা হতেই পারেন। মা কখনও কারও ফুরিয়ে যায় নাকি?'

'তা হলে আমি লাল-নীল গোলাপফুলের বদলে নতুন মা পেয়ে যাচ্ছি।' ভালো-রাক্ষস তিনগাল হেসে বললেন।

হেসে বুম্বা বললে, 'বাবাও পেতে পারো, রাজামশাই যদি রাক্ষস-ছেলে দেখে খেপে না যান!'

তারপর রাক্ষসমশাই বুম্বাকে কাঁধে নিয়ে, লাল-নীল গোলাপফুলটি হাতে নিয়ে সোজা হাজির হলেন বড়-রানিমায়ের প্রাসাদে। গোলাপফুলটি রানির পায়ে রেখে, পেন্নাম করে রাক্ষস বললেন, 'মা, আমি তোমার রাক্ষস-ছেলে। আমাকে কোলে নাও।'

রাক্ষসের বিশাল শরীর, মাথা ঠেকছে প্রাসাদের ছাদে, দালানের থামগুলো তার পায়ের চেয়ে ঢের রোগা-রোগা, তার হাতের থাবাগুলো রাজার যজ্ঞিবাড়ির রান্নার পরাতগুলোর মতন, সে রানিমা'কে পেন্নাম করে কোলে চড়তে চাইছে! রানিমা ছোট্টখাট্টো মানুষ, রাক্ষসের কড়ে আঙুলের সমান। রাক্ষসের কথা শুনে প্রাসাদসুদ্ধ রানিমা'র সখীরা ভয় পেয়ে গিয়ে হেসে উঠল। কিন্তু হঠাৎ রানিমা তাদের ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর দিকি তোরা। এতে এত হাসির কী আছে? মা ছেলেকে কোলে নেবে না?'

মা সেরে গেছেন দেখে বুম্বা হাততালি দিয়ে হেসে উঠে রাক্ষসকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার সাধ্যি কী? অত প্রকাণ্ড রাক্ষস কি তার ছোট্ট হাতের বেড়ে ধরা পড়ে? কিন্তু রানিমা অতশত না ভেবে বিরাটবপু রাক্ষসকে কোলে তুলতে হাত বাড়াতেই রাক্ষস হঠাৎ মায়াবলে ছোট্ট হয়ে গেলেন, যেন ঠিক একটা তিনমাথাওয়ালা পুতুল, নরম-নরম হাত, নরম-নরম পা, রানিমা সহজেই তাঁকে কোলে নিয়ে আদর-আশীর্বাদ করলেন। রাক্ষসরা যে মায়া জানে, এ তো সেই রাবণের যুগ থেকেই সবাই শুনেছিল। এবার দেখল। এইসব কাণ্ডকারখানা যখন হচ্ছে, এতদিন পর রানিমা আবার কথা বলেছেন, রাক্ষসকে কোলে নিয়েছেন, এই খবর রাজসভায় পৌঁছল। রাজামশাই মন্ত্রীর দিকে তাকালেন, মন্ত্রী রাজার দিকে। তারপর রাজামশাই বললেন, 'সভা ভঙ্গ হল।'

রাজা আর মন্ত্রী একসঙ্গে বড়-বড় পা ফেলে লেফট রাইট করে বড়-রানিমার প্রাসাদে চললেন। রানিমা তখন বুম্বা আর রাক্ষসকে দু-কোলে নিয়ে কার্তিক-গণেশজননী হয়ে সিংহাসনে বসে আছেন। রাজাকে দেখে মিষ্টি করে হাসলেন। রানির খোঁপায় লাল-নীল গোলাপফুল। ও-ফুল দেখবামাত্র সবরকম রোগ সেরে যায়। রাজাও সুস্থ হয়ে উঠলেন। বললেন, 'কী লজ্জা!'

ওদিকে ছোট রানিমাও শুনেছেন, রাক্ষস এসেছে প্রাসাদে শুনে তিনিও রাক্ষস দেখতে ছুটে এলেন। দেখেননি তো কখনও। রাক্ষস তখন রাজাকে দেখে মা'র কোল থেকে নেমে আবার স্বমূর্তি ধারণ করেছেন। রাজামশাইকে একটা সেলাম করে বজ্রগম্ভীর স্বরে রাজ্য কাঁপিয়ে বললেন, 'আমার মা'কে আপনি আর অবহেলা করবেন না তো রাজামশাই?' বলতে না বলতেই হঠাৎ গয়লানি-রানিমা সেখানে এসে পড়েন আর রাক্ষসের বিকট মূর্তি দেখে আর বাজের মতো গলা শুনেই অজ্ঞান হয়ে উলটে পড়লেন।

তারপর? রাক্ষস-ছেলের দাপটের চোটে রানিমাকে রাজা আর অবহেলা করতে সাহস পেলেন না। গয়লানি-রানিমা আবার গিয়ে রাজ-গোশালায় গরু-বাছুরের যত্ন করতে লাগলেন,

আগে যেমনটি করতেন। রানিমা রাজপ্রাসাদে রানিমহলে নিজের চেনা ঘরে ফিরে গেলেন।

রাক্ষস-ভাই পেয়ে বুম্বার আর গর্ব ধরে না। রাজামশাইও ঠিক করলেন, এমন শক্তিশালী একটা ছেলে থাকলে তো তাঁরই ভালো। তিনিও ভালো-রাক্ষসের বাবা হয়ে গেলেন খুশি মনে। এখন?

বুম্বার ভাই রাক্ষসকুমার। রাক্ষসমশাই কাউকে ভয়ডর কিছুই দেখান না। আপনমনে রাজবাড়ির সাতটা মালিকে সঙ্গে নিয়ে প্রাণভরে বাগান করেন। কত ফুল! কত ফল! যেন বাগানে চিরকাল ইন্দ্রধনু ফুটে আছে।

সেই বাগানে বুম্বার হাসিখুশি মুখখানিও সকাল-বিকেল ফুটে থাকে, কখনও মা'র হাত ধরে, কখনও বাবার। আর সবচেয়ে বেশি ভাইয়ের হাত ধরে। বাগান আলো করে রাজবাড়িতে একটি লাল-নীল গোলাপফুল ফুটেছে। তারই চারপাশে ঘুরে-ঘুরে নেচে-নেচে বুম্বা একটা গান গায় :

হরিণছানার মা
ছানার বদলে পিঠে চড়াল
তাই রে নাই রে না।
রাক্ষসমশাই,
ফুলের বদলে মা পেয়েছেন
তাই রে নাই রে নাই!
আর বুম্‌বা?
মায়ের বদলে ভাই পেয়েছি
তাই রে তাই রে না!
রাজামশাই রে
গয়লানির বদলে রাজরানি পেলেন
তাই রে নাই রে নাই রে!
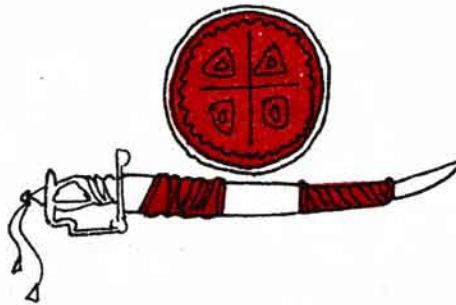
পদ্ম কদম

একদিন এক জেলে নদীতে জাল ফেলেছে, মাছের বদলে উঠল এক পেতলের হাঁড়ি। হাঁড়ির ভেতরে কী আছে? হাঁড়ির ভেতরে কী আছে? দেখবার জন্য জেলেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। কেউ বলে আছে সোনার মোহর, কেউ বলে কিছু নেই, কার হাঁড়ি মাজতে গিয়ে ডুবে গেছে, কাদায় মুখটা বুজে গেছে। কিন্তু যে জেলে হাঁড়িটা পেয়েছে, সে আর হাঁড়িটা খুললেই না। সে বললে, আমি আমার মাকে গিয়ে হাঁড়িটা দেব। মা কত খুশি হবেন।

অন্য জেলেরা বললে, হাঁড়িটা বেচে দে, অনেক টাকা দাম পাবি।

জেলে বললে, না। আমরা গরিব, মাটির হাঁড়িতেই মা ভাত রেঁধেছেন। কাঁসা-পেতল চোখে দেখেননি। মাকে দেব।

জেলে তো বাড়ি গিয়ে মাকে হাঁড়ি দিয়েছে। তার মা হাঁড়ি নিয়ে খুব খুশি। পুকুরঘাটে গেছে কাদা ধুয়ে পরিষ্কার করে মেজে আনতে। মাজতে গিয়ে দেখে হাঁড়ির মধ্যে পদ্মফুল। জেলের মা জেলেনি পদ্মফুলটি যেই হাতে নিয়েছে, সে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে হয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলে। জেলেনির মেয়ে ছিল না। একটাই ছেলে। সে বললে, কেঁদো না মা, কেঁদো না। চলো, আমার ঘরে চলো। কিছু খেতে দিই। বলে, সে হাঁড়ি আর মেয়ে নিয়ে বাড়ি এল। জেলে তো অবাক—এ কার মেয়ে গো?

জেলেনি বললে—এ তোমার বোন। হাঁড়ির ভেতরে করে তুমি একে ঘরে এনেছ।

তখন সেই কন্যে বললে—মা, আমি এক অপ্সরার মেয়ে। অপ্সরা আর মুনি-ঋষিদের

ছেলেমেয়েরা হাঁড়ি কলসিতে জন্মায় কিনা। আমি অপ্সরা মায়ের কাছে নাচগান শিখেছি, আর ঋষি বাবার কাছে মন্ত্রতন্ত্র, শাস্ত্র, কাব্য। এসব জ্ঞান আর গুণ নিয়েই আমার জন্ম হয়েছে।

জেলেনি আর জেলে তো মহাখুশি। তারা লেখাপড়াই জানে না, শাস্ত্র পড়বে কি? তবে জেলেদের গান জেলেদের নাচ তারাও জানে। পদ্মফুলের তৈরি মেয়ে বলে তার নাম হল পদ্মকুঁড়ি। জেলের ঘরেই সে বড় হতে থাকে।

এদিকে রাজ্যের মন্ত্রীটি ছিল অতি দুষ্টুলোক। সে চাইত রাজার মৃত্যুর পরে রাজ্যটি তার নিজের ছেলেকে দিতে। রাজার ছেলেপুলে ছিল না, কিন্তু এক ভাগনে ছিল। রাজা তাকে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন। ভাগনেটি আপনভোলা, সে বাঁশি বাজিয়ে গান গেয়ে মাঠেঘাটে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াত। গরিব-দুঃখীদের সঙ্গে মিশত। রাজার তাকেই রাজ্য দিয়ে যেতে ইচ্ছে। রানিও তাকে সন্তানস্নেহ করেন। কিন্তু সেই ছেলে কদমকুমার না গেছে পাঠশালায়, না গেছে অস্ত্র শিখতে, না বসেছে রাজসভায়। সে ঘোড়ায় চড়তে জানে, কিন্তু শিকার করে না। পশুপাখি মারতে তার বুক দুঃখে গলে যায়। যুদ্ধ করার নামে সে আঁতকে ওঠে। সে কী? মানুষ মারব? আমরা কি রাক্ষস খোক্কস? সে চাষিদের সঙ্গে মিশে লাঙ্গল দিতে শিখেছে, ধান রুইতে শিখেছে, ধান কাটতে শিখেছে, সে জেলেদের সঙ্গে মিশে মাছ ধরতে শিখেছে, সে কুমোরদের সঙ্গে মিশে হাঁড়ি-সরা এমনকী ঠাকুরপিতিমে পর্যন্ত গড়তে শিখেছে, জানে সে অনেক কিছুই। তবু মন্ত্রীমশাই বলেন, কদমকুমারের তো শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবুদ্ধি কিছুই হল না, ওকে সিংহাসনে বসালে রাজ্যপাট উঠে যাবে। আপনি অন্য যুবরাজ স্থির করুন। রাজা মৃদুমন্দ হাসেন। আর গোঁফে তা দেন।

কদমকুমারের সঙ্গে পদ্মকুঁড়ির বেশ ভাব হয়ে গেছে এর মধ্যে। কদমকুমার গান গাইলে পদ্মকুঁড়ি, নাচে, কদমকুমার বাঁশি বাজালে পদ্মকুঁড়ি গান গায়, কদমকুমার যদি দু-লাইন কবিতা তৈরি করে তা হলে পদ্মকুঁড়ি তৈরি করে দেয় পরের দু-লাইন। পদ্মকুঁড়ির সঙ্গে গল্প করতে-করতেই কদমকুমারের নানান শাস্ত্রে জ্ঞান হয়ে গেছে। রানির পদ্মকুঁড়িকে খুবই পছন্দ, ভাবেন বড় হলে ওকেই কদমকুমারের বউ করবেন। রাজার কিন্তু মোটেই পছন্দ না। ধ্যেত! জেলের মেয়ে কবে রাজবাড়ির বউ হয়েছে? তাও স্রোতে-ভেসে আসা কন্যে? দেখেশুনে জেলেনি-মা তো ভয়েই সারা। রাজারাজড়ার সঙ্গে অত মেলামেশা না করে জেলেপাড়াতেই জামাই খোঁজা উচিত বলে জেলেনি-মা রোজ জেলেকে তাড়া দেয়। পদ্মকুঁড়ি রূপে-গুণে শত রাজকন্যের বাড়া। জেলে বলে, মা, আমার বোনের তো রাজার বাড়িতেই বিয়ে হওয়া মানায়। জেলের ঘরে ও-কন্যের মূল্য কে বুঝবে? বলে জাল কাঁধে ফেলে নদীর দিকে পালায়।

পদ্মকুঁড়ি ইতিমধ্যে বড় হয়ে উঠলেন। পাতা ভরে-ভরে পদ্য লেখেন, গান লেখেন। পদ্মকুঁড়িকে জেলেপাড়াতে মানায় না বটে, কিন্তু সবাই তাঁকে ভালোবাসে। মোটে অহংকার নেই অত রূপগুণের জন্যে।

ওদিকে কদমকুমারও বড় হয়ে উঠেছেন। একদিন কদমকুমার লাফাতে-লাফাতে এসে বললেন—পদ্মকুঁড়ি, আমি অনেক দূরে পহুবী রাজার সভাতে যাচ্ছি। মন্ত্রীমশাই পাঠাচ্ছেন।

সেখানে মস্ত উৎসব হচ্ছে, গানবাজনা, কাব্যসভা, আর বিপুল ভোজ। সব দেশের রাজপুত্তুররা যাচ্ছে। তোমার জন্যে কী আনব, বলো?

পদ্মকুঁড়ি তো অতীত ভবিষ্যৎ বুঝতে পারেন, তিনি বললেন—কদমকুমার, খুব সাবধানে থেকো। জল ছাড়া কিছু পান কোরো না। ফল ছাড়া কিছু ভোজন কোরো না। আর মুশকিলে পড়লে মনে-মনে পদ্মকুঁড়িকে ডেকো। আমার জন্য কিছু আনতে হবে না, শুধু তোমার বাঁশিটা ফেরত এনো। হারিয়ে ফেলো না।

কদমকুমার তো পহ্লবী রাজার সভায় গেছেন। কত ভালো-ভালো খাবার, মস্ত ভোজ, কিন্তু পদ্মকুঁড়ি বলে দিয়েছে যেন ফল ছাড়া খেয়ো না। কতরকমের শরবত, কিন্তু পদ্মকুঁড়ির বারণ যেন জল ছাড়া পান কোরো না। কদমকুমারের মনে-মনে রাগ হয়ে যায়, তবুও তিনি বন্ধুর কথাটা শোনেন। কেননা বন্ধু যে ভূত-ভবিষ্যৎ জানে। শুধু কি খাওয়া-দাওয়া? কত দেশ থেকে কত বড়-বড় ওস্তাদ এনেছিলেন পহ্লবীরাজ! চমৎকার নাচগান হল। বিখ্যাত সব নটীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। শেষে শুরু হল কবিগান। কবিরা সবাই একে-একে উঠে পহ্লবীরাজের জয়জয়কার করতে লাগলেন। আহা, এমন রাজা হয় না, হয়নি। কারুর রাজ্যে এতবড় ভোজ হয়নি। এত ভালো-ভালো খাদ্য জগতে কেউ খায়নি! এমন স্বর্গীয় পানীয় জগতে কেউ আস্বাদন করেনি! একজন এত ভালো গায়ক কোনও রাজার সভায় নেই! এমন নাচ কেউ জীবনে দেখেনি! আর এমন ভালো সভাকবি তো কোনও রাজসভাতেই নেই! জগতে কেউ কখনও এমন গান শোনেনি। এমন নাচ দেখেনি। এমন কবিতা পড়েনি। পহ্লবীরাজ তো মহাখুশি। তিনি দাঁড়িয়ে মৃদু হাত বুলোতে-বুলোতে সবার মুখের দিকে হেসে-হেসে চাইলেন। হঠাৎ দেখেন কদমকুমার চুপটি করে বসে আছেন। পহ্লবীরাজ বললেন—কদমকুমার, যদিও আপনি রাজকুমার, কিন্তু আপনি তো কবিও বটেন, আজ আপনি একটু কবিগান করবেন না?

কদমকুমার আর কী করেন? তিনি সরল সোজা মানুষ। ইনিয়ে-বিনিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারেন না। তিনি বললেন—ফলের মতো খাদ্য হয় না, জলের মতো পানীয় হয় না, ঈশ্বরের স্বহস্তে তৈরি এইসব খাদ্য পানীয় আমি গ্রহণ করেছি, পহ্লবীরাজারই অসীম করুণায়। এত মিষ্টি জল, এত স্বাদু ফল আমি আর কোথাও খাইনি। অতি অপরূপ নৃত্য দেখেছি, অসামান্য সংগীত শুনেছি, আর কবিদের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়ও পেয়েছি। আর কোনও রাজার সভাতেই এমনটি আমি দেখিনি। কিন্তু রাজসভার বাইরে আমাদের রাজ্যের এক জেলের ঘরে আমি এর চেয়েও মনোরম নৃত্য দেখেছি, এর চেয়েও উৎকৃষ্ট সংগীত শুনেছি, এর চেয়ে উত্তম কাব্যও পাঠ করেছি। পহ্লবীরাজার এই মহোৎসব, এই ভোজ, এই নৃত্যগীত ও কাব্যসভা রাজাদের মধ্যে তুলনাহীন সন্দেহ নেই, কিন্তু পৃথিবীতে অতুলন বললে ভ্রান্ত বাক্য বলা হবে। যাই হোক, এই অপরূপ সভাতে এসে আমি ধন্য বোধ করছি! জয় মহারাজের!

কিন্তু সত্যি কথা শোনবার মতো মনমেজাজ ছিল না তখন পহ্লবীরাজের। চাটুকারিতায়

তাঁর খুব অহংকার হয়েছে। তিনি অনেক সুরাপান করে কিঞ্চিত প্রমত্তও ছিলেন। তিনি কোটালকে বললেন—এত বড় স্পর্ধা? বলে কিনা এর চেয়ে ভালো নাচ-গান-কবিতা ওদের রাজ্যে জেলেদের ঘরেও শোনা যায়? এত অপমান? অ্যাঁ? দাও রাজকুমারকে গারদে পুরে। শাস্তি হোক!

ব্যস, অমনি মোটাসোটা প্রহরীরা এসে কদমকুমারকে মেরে ধরে কয়েদে পুরে দিলে। কদমকুমার বেচারি তো মারপিট জানেন না। তিনি গারদে বসে-বসে গান করেন। বাঁশি বাজান। তাঁর বাঁশি শুনে গর্ত থেকে রাজবাড়ির বাস্তু সাপ রাজগোখরো নাগ-নাগিনী বেরিয়ে আসেন রোজ রাত্রে। তাঁর গান শুনে রাজবাড়ির সাদা ময়ূররা পেখম মেলে নাচে, যদিও আকাশে মেঘ নেই। রাজা রেগে গিয়ে বললেন—বারণ করো ওকে গান করতে। কেড়ে নাও ওর বাঁশি। গান তো বহু হল। বাঁশি যেই কাড়তে গেছে প্রহরী, অমনি বাস্তু-গোখরো বেরিয়ে এসে ফোঁস করে ছোবল তুলেছেন। প্রহরী 'বাপরে!' বলে পগারপার। কদমকুমার মনে-মনে বললেন—পদ্মকুঁড়ি, তুমি আজ এখানে থাকলে আমার এত কষ্ট হতো না। তাঁর মনের কথাটি বাতাস বয়ে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিল জেলেনির বাড়ির উঠোনে পদ্মকুঁড়ির কানে-কানে। পদ্মকুঁড়ি কেঁদে উঠলেন। জেলেকে বললেন, দাদা, আমি রাজার সভায় যাচ্ছি কদমকুমারকে উদ্ধার করতে। তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

দুষ্টু মন্ত্রীমশাই এদিকে মহাখুশি। তিনি খবর পেয়েছেন কদমকুমার বন্দি হয়েছেন। তিনি রাজামশাইকে বোঝাচ্ছেন, পহ্লবীরাজ খুব শক্তিমান প্রতিবেশী, ওঁর সঙ্গে ঝগড়া না করাই ভালো। ভাগনের শাস্তি হয় হোক। অন্যায় করেছে, তাই শাস্তি পাচ্ছে। রাজা-রানির এদিকে খুব মন খারাপ। তাঁরা না পারছেন পহ্লবীরাজকে ধমক দিতে, না পারছেন এই অপমান সহ্য করতে! আমন্ত্রিত অতিথিকে গারদে পোরা? কে কবে এমন কথা শুনেছে? কী করা যায়? ওঁদের প্রাণে সুখ নেই, মনে শান্তি নেই। এমন সময়ে পদ্মকুঁড়ি এলেন রাজসভায়। রূপে সভা আলো হল। মন্ত্রীর সর্বশরীর কেঁপে উঠল। অজানা একটা ভয়ে ভেতরটা কুঁকড়ে গেল। পদ্মকুঁড়ি বললেন—মহারাজ, আপনার মন আমি ভালো করে দিতে পারি। কদমকুমারকে আমি এনে দিতে পারি পহ্লবীরাজকে শত্রু না করেই। কিন্তু আমার তিনটি শর্ত আছে। সেগুলি আমি এসে বলব। বলুন আপনি রাজি কিনা?

রাজা বললেন—খুব রাজি।

রানি বললেন—এক্ষুনি রাজি।

কন্যে বললেন—তা হলে আমাকে একটা সোনার শাড়ি দিন, রুপোর পালকি দিন, সঙ্গে আপনার বাজনাদার দিন, হাতি-ঘোড়া লোক-লস্কর দিন, পহ্লবীরাজার রাজ্যে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিন। আর জাল নিয়ে আমার দাদাও সঙ্গে যাবেন।

রানি বললেন—এক্ষুনি দিচ্ছি।

মন্ত্রী দেখেশুনে চুপ।

সোনার শাড়িই শুধু? হিরেমুক্তোর গয়নাতেও সাজিয়ে দিলেন পদ্মকুঁড়িকে রানিমা।

পত্নুবীরাজ্যে রওনা হলেন পদ্মকুঁড়ি। সামনে বাজনাদাররা বাজনা বাজাচ্ছে, হাতি-ঘোড়া লোক-লস্করের মিছিলের মাঝখানে রুপোর পালকি চড়ে পদ্মকুড়ি যাচ্ছেন।

দূর থেকেই পত্নুবীরাজ্যে সাড়া পড়ে গেল। কে এক রাজকন্যে এসেছেন! অপরূপ সুন্দরী!

পত্নুবীরাজকে গিয়ে পদ্মকুঁড়ি কিছু পরিচয় বলবার আগেই রাজার লোকজন এসে মহাসম্মান করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেল রাজসভাতে। তখনও উৎসব জমজমাট। পদ্মকুঁড়ি বললেন—মহারাজ, আমি আপনাদের এই অপূর্ব সংগীতসভা, নৃত্যসভা, কাব্যসভার খবর পেয়ে এসেছি। জগতে নাকি তার তুলনা নেই। তা আমিও নৃত্যগীত পটীয়সী, আর কাব্যরসপিপাসুও বটে। আমি কি যোগ দিতে পারি?

রাজা তো ধন্য। বলেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

রাজসভা দ্যুতিময় করে তুলে পদ্মকুঁড়ি তো গান ধরলেন। অপ্সরার সঙ্গে ওস্তাদেরা পারবেন কেন? তাঁরা লজ্জায় এক-এক করে সভা ত্যাগ করলেন। রাজা হতবাক।

তারপর পদ্মকুঁড়ি বললেন—মহারাজ! এবারে নৃত্য হোক?

পদ্মপায়ে সোনার নূপুর আর আলতা পরাই ছিল, রাজসভার মেঝেটা টাটকা দুধে মুছে নিয়ে, পদ্মকুঁড়ি নাচ শুরু করলেন। নাচ যখন থামল, রাজসভার মেঝেয় তখন এক অসামান্য দুধে আলতার পদ্মফুলের ছবি ফুটে উঠেছে। সবাই ধন্য-ধন্য করে উঠল।—রাজা গলার মাণিক্যমালা ছুড়ে দিলেন পদ্মকুঁড়ির পদ্মপায়ে। দেশ-বিদেশের নটীরা স্তব্ধ!

পদ্মকুঁড়ি বললেন—মহারাজ, এবার তবে কবিতা পড়া শুরু হোক?

নাচগানের নমুনা দেখেই কবিরা থ! সভাকবি তো কাণ্ড দেখে আগেই উঠে গেছেন। অন্যান্য কবিরা কে যে কোথায় কোন থামের আড়ালে, টের পাওয়া গেল না। পত্নুবীরাজ মুগ্ধ মোহিত। পদ্মকুঁড়ি কবিতা পড়তে শুরু করলেন। পৃথিবীর ইতিহাস, মানবসভ্যতার ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস, মানুষের বাসনা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, হিংসের ইতিহাস—কেমনভাবে চাটুকারিতা মানুষের দম্ভে সুড়সুড়ি দিয়ে সত্যের পথ ভুলিয়ে দেয়, কেমনভাবে সেই নকল অহংকার আহত হলে মানুষের ক্রোধ হয়, মোহ হয়, অপরাধ হয়। মানুষ কত তুচ্ছ, কত সামান্য, কত দুর্বল—সে ইতিহাস।

সভা মন্ত্রমুগ্ধ।

এমন সময় কোথায় যেন বাঁশি বেজে উঠল। অমনি রাজসিংহাসনের তলা থেকে দুই রাজগোখরো ধবধবে দুধেল বাস্তুসাপ বেরিয়ে এসে হেলেদুলে ফণা তুলে নাচতে শুরু করে দিলেন। পদ্মকুঁড়ি সেই নাচের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলতে লাগলেন, যেন তিনিও নাগিনী।

রাজা আর সহ্য করতে পারলেন না—যেন কোনও এক জাদুকরির মায়ায় পড়ে গেছেন। তিনি ছুটে এসে পদ্মকুঁড়ির পায়ের কাছে বসে পড়ে বললেন—রাজকন্যা, আমাকে আপনার সেবক হিসেবে গ্রহণ করুন। আপনার গুণে বাস্তুসাপও ছুটে এসেছে।

পদ্মকুঁড়ি চমকে উঠে পা সরিয়ে নিলেন। হাতজোড় করে বললেন—ছি-ছি! মহারাজ! আমি রাজকন্যা নই। আমি তো সামান্য জেলের মেয়ে। এই যে আমার দাদা!

বলতে-বলতেই জাল কাঁধে নিয়ে জেলে এসে দাঁড়াল পদ্মকুঁড়ির পাশে। পদ্মকুঁড়ি

বললেন—আর এইসব ধনসম্পদ আমার বন্ধু কদমকুমারের। এই হাতি-ঘোড়া লোক-লস্কর সোনারুপো সবই তাঁর। আমি দরিদ্র ধীবরকন্যা। আপনি ভুল করবেন না। আমার বন্ধু কদমকুমার কাছেই কোথাও আছেন। তাঁরই আকুল করা বাঁশির টানে আপনার বংশের বাস্তুভিটের সাপ-সাপিনী বেরিয়ে এসেছে। কেননা তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না, তিনি কারুর শত্রু নন। আপনি তাঁকে মুক্ত করে দিন, নইলে আপনার রাজলক্ষ্মী আপনাকে পরিত্যাগ করে যাবেন।

মহারাজ আর কী বলবেন?

কদমকুমারকে ছেড়ে দেওয়া হল। সহস্রবার করে মার্জনা ভিক্ষা করা হল। হাতি-ঘোড়া সমেত পদ্মকুঁড়ি কদমকুমারকে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরলেন জেলে-দাদার সঙ্গে। পহুবীরাজ পদ্মকুঁড়িকে দ্বিগুণ হাতি-ঘোড়া তিনগুণ সোনাদানা দিয়ে সাজিয়ে দিলেন। বললেন, আমার মনুষ্যজন্ম ধন্য যে তোমার দর্শন পেলাম। এত গুণবতী মানুষ আমি আগে দেখিনি।

পদ্মকুঁড়ি কদমকুমারকে নিয়ে ফিরছেন দেখে হিংসের চোটে বুক ফেটেই মন্ত্রীমশাই অক্কা পেলেন। তাঁর ছেলেকে একটি ভালো মুদির দোকান করে দেওয়া হল। পদ্মকুঁড়ি মন্ত্রী হলেন, কদমকুমার রাজা হলেন, আর রাজারানি মনের আনন্দে নাচতে-নাচতে বানপ্রস্থে গেলেন। জেলেনি-মা আর জেলে-দাদা কিছুতেই প্রাসাদে এলেন না, কিন্তু রোজ তাঁদের জন্যে রাজবাড়ির থেকে রাজভোগ রান্না হয়ে যেত, সাতজন বাহকের কাঁধে।

কেষ্টবিষ্টুর কীর্তিকলাপ

একগ্রামে এক তাঁতি ছিল তার নাম বিষ্টু। আর তার প্রাণের বন্ধু ছিল, এক ছুতোর। তার নাম কেষ্ট। গ্রামসুদ্ধু মানুষ তাদের ভালোবাসত। কেষ্ট-বিষ্টু দুই বন্ধু মিলে সবসময়ে একসঙ্গে ঘুরত, খেত, ঘুমুত। একজন ঘর্ঘর করে তাঁত বুনত, আরেকজন ঘস্‌ঘস্‌ করে করাত চালাত। যে যার কাজে খুব ওস্তাদ ছিল। সেই রাজ্যের এক রাজকন্যের একদিন একটা আনারসি-বেনারসি শাড়ি পরবার ভারি সাধ হল। সেই শাড়ির সুতো হবে আনারসের আঁশ দিয়ে তৈরি—খুব সূক্ষ্ম—আর তাতে থাকবে বেনারসি জরির কাজ। দেশের যত ওস্তাদ তাঁতি, সবাই বললে, 'ও বাবা, ও-বস্তুটি বাপু আমি তৈরি করতে পারব না।' শুধু বিষ্টু তাঁতি বললে, 'ভেবে দেখি!' চেষ্টা করতে-করতে, বিষ্টু একদিন সত্যি-সত্যি সুন্দর একটি আনারসি-বেনারসি শাড়ি বুনেই ফেললে। যে দেখে, সে-ই আশ্চর্য হয়ে যায়! এমনই তার বাহার। তারপর দুই বন্ধুতে রাজসভায় গিয়ে হাজির হল। পুঁটলিতে সেই শাড়ি।

—কী চাই? কী চাই? কী চাই?

—না, রাজকন্যের সাক্ষাৎ চাই!

ও মা? বলে কি! রাজকন্যের সাক্ষাৎ চাইছে?

এরা কারা? এত আস্পর্ধা? রাজপ্রহরী তো অবাক! সে ধমকে উঠল—

—কে হে তোমরা? এত আস্পর্ধা তোমাদের!

—আমরা কেষ্টবিষ্টু।

কেষ্টবিষ্টু শুনে তো রাজপ্রহরী একটু ঘাবড়েই গেল। 'কেষ্টবিষ্টু কথাটার মানে

ভি আই পি কিনা? রাজপ্রহরীর সুর নরম হল।

—তা স্যার, আপনাদের ওর সঙ্গে কী দরকার?

—আনারসি-বেনারসি শাড়ি এনেছি যে ওঁর জন্যে।

—তাহলে কাপড়টাই দিন, ওঁকে দেখিয়ে আনি—

উনি তো এ-জন্যে সভায় আসবেন না?

কেষ্টবিষ্টু কী করে? শাড়িটি তুলে দিলে রাজপ্রহরীর হাতেই।

খানিক পরে রাজপ্রহরী এসে দুজনকে নমস্কার করে। দু-থলি হিরেমানিক দিয়ে বললে—

—'স্যার রাজকন্যে খুব খুশি হয়েছেন। ওই শাড়িটি পরেই তিনি মন্দিরে যাবেন বৃষ্টিপুজোর দিনে।' মা বসুন্ধরার পুজো হয় সেদিন, রাজ্যসুদ্ধু মানুষ আনন্দ করে। রাজকন্যেদেরও দেখা যাবে সেদিন।

—থলিভরা হিরেমাণিক্য নিয়ে তো নাচতে-নাচতে কেষ্টবিষ্টু বাড়ি ফিরে এল। রাজ্যিসুদ্ধু নাম ছড়িয়ে পড়ল তাঁতির।

এরমধ্যেই এসে গেল বসুন্ধরাদেবীর পুজোর তিথি, বৃষ্টিপুজোর দিন। রাজা, রানি, রাজকন্যেরা সবাই রথে না চড়ে, পায়ে হেঁটে মন্দিরে গেলেন।

এক রাজকন্যের পরনে সেই সোনালিরঙের ফুরফুরে আনারসি-বেনারসিটি জ্বলজ্বল করছে। প্রজাদের সঙ্গে কেষ্টবিষ্টুও ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখলে রাজবাড়ির শোভাযাত্রা।

বাড়ি ফিরে বিষ্টু বললে, 'ভাই কেষ্ট, আমার কিছু ভালো লাগছে না। আমি আরেকবার রাজকন্যেকে ওই শাড়ি পরে দেখতে চাই।'

কেষ্ট অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলে, কিন্তু বিষ্টু অবুঝ।

—সে খায় না দায় না তাঁত বোনে না। শেষে কেষ্ট বললে, 'ভাই আমিই একটি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি অত কষ্ট পাচ্ছ, আমার চোখে সহ্য হচ্ছে না। আমি একটা প্ল্যান করেছি। দুটো নকল হাত তৈরি করব, একটা গরুড়পাখি তৈরি করব। তোমার চারহাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম দিয়ে, তোমাকে বিষ্ণু সাজাব। তোমার মাথায় বিষ্ণুর মুকুট, গলায় ইন্দ্রমণির হার পরিয়ে দেব। দেখতে তোমাকে তো ভালোই। দিব্যি কেষ্টঠাকুরের মতন। —মানিয়ে যাবে। তুমি উড়ে-উড়ে চম্পাকলি রাজকন্যের ঘরে যাও। গিয়ে বলো— "—রাজকন্যে—তুমি ওই শাড়িটি একবার পরো, আমি দেখব। আমি দেবতা শ্রীবিষ্ণু।" তখন রাজকন্যে পরবেন ঠিক ওই শাড়ি।'

কেষ্টছুতোর তো যে-সে ছুতোর নয়, যাকে বলে 'মাস্টার কার্পেন্টার' তাই—দারুণ ওস্তাদ মিস্ত্রি সে। এমন সুন্দর গরুড় তৈরি করল। রোবটের যন্ত্র দিয়ে। সে চমৎকার উড়তে পারে বোতাম টিপলেই। দুটো হাত তৈরি করল যেন ঠিক সত্যিকারের বিষ্ণুর হাত! তাতে সুদর্শন চক্র, শাঁখ, গদা, পদ্মফুলটি পর্যন্ত চমৎকার ধরিয়ে দিল কেষ্ট। বিষ্টু মাথায় মুকুট পরে, বুকে নকল ইন্দ্রমণির হার পরে। এককেবারে পারফেক্ট বিষ্ণু! দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে রাত বারোটার সময়ে গরুড় তো উড়ল। কেউ দেখলেও না, কেউ জানলও না, সাত তলার

ওপরে রাজকন্যের বারান্দায় গিয়ে গরুড় নামল।

রাজকন্যে উপুড় হয়ে গল্পের বই পড়ছিলেন—ঠাকুরমার ঝুলি। হঠাৎ দ্যাখেন বারান্দায় চারহাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে বিষ্ণু এসে দাঁড়িয়েছেন। রাজকন্যে জোড়হাতে গিয়ে পায়ে পড়লেন। বিষ্ণু বললেন—'রাজকন্যে তুমি সেদিন যে আনারসি-বেনারসি শাড়িটি পরেছিলে, সেটি আরেকবার পরবে? কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তোমাকে। আমি ভুলতে পারছি না। তাই বৈকুণ্ঠধাম থেকে নেমে এলুম, তোমাকে আর একটিবার দেখতে!' রাজকন্যে শুনে অবাক। দৌড়ে গিয়ে শাড়িটি পরে এলেন। তারপর শ্রীবিষ্ণুতে আর রাজকন্যেতে অনেক গল্পগাথা হল। যাওয়ার সময়ে রাজকন্যে বললেন—'আবার আসবেন তো?' শ্রীবিষ্ণু বললেন—কালই আসব।' তারপর থেকে বিষ্টু রোজই রাত্তিরে গরুড়ে চড়ে রাজকন্যের ঘরে গিয়ে আড্ডা মেরে আসে। রাজকন্যে ভাবেন ঠাকুর বিষ্ণু এসেছেন। একদিন রাজকন্যের দাসীটি ওঘর থেকে শুনতে পেল, খুব হাসছেন রাজকন্যে। সঙ্গে একটা ছেলেরও গলা। কী ব্যাপার? সে দেখতে পেল না কিছু। ভাবলেন, হয়তো রেডিয়ো চলছে! তবুও, কথাটা রানিমাকে জানানোই ভালো।—দাসী গিয়ে রানিকে সাবধানে বললে—'রানিমা, রানিমা, রাজকন্যের ঘরে মনে হচ্ছে পুরুষ মানুষের হাসি শুনেছি। সত্যি মিথ্যে ঠিক জানি না। বুড়ো হয়েছি তো? আপনি একটু খবর নেবেন। রেডিয়ো-ও হতে পারে।'

রানিমা বললেন রাজকন্যেকে গিয়ে—

—'হ্যাঁরে। তোর ঘরে নাকি দাসী পুরুষ মানুষের হাসি শুনেছে? নাকি রেডিয়ো চলছিল?'

রাজকন্যে মিথ্যে কথা বলতে শেখেননি। তিনি বললেন—

'না মা, রেডিয়ো নয়, সত্যি-সত্যি পুরুষ মানুষের গলাই দাসী শুনেছে। রোজ রাত্তিরেই শ্রীবিষ্ণু আসেন যে বৈকুণ্ঠধাম থেকে, আমার সঙ্গে আড্ডা মারতে। ঠাকুর বলে কথা। মানা তো করতে পারি না।'

শুনে রানিমা অবাক। তিনি রাজাকে গিয়ে বললেন।

রাজা বললেন—'হুম! ব্যাপারটা তো বোঝা গেল না? আমাদের দেখাতে পারবে?'

রানি গেলেন মেয়ের কাছে।

—'হ্যাঁরে, আমাদেরও দেখাতে পারবি?'

'কেন পারব না? আজই তোমরা লুকিয়ে থেকে বারান্দায় দেখবে গরুড় চড়ে বিষ্ণু আসবেন। তোমরা তখন আলাপ কোরো!' রাজকন্যেও খুশি।

রাত্তিরে রাজা-রানি বারান্দায় বড়-বড় থামের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। দেখলেন খড়খড় শব্দ করে গরুড় উড়ে এল—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করে স্বয়ং চতুর্ভুজ বিষ্ণু অবতরণ করছেন। দৈব দৃশ্যটি দেখে তো ভয়েই তাঁদের প্রাণ উড়ে গেছে। দুজনেই চোখবুজে ইষ্টনাম জপতে শুরু করে দিয়েছেন। 'প্রভু, রক্ষা করো, প্রভু তোমাকে অবিশ্বাস করেছিলুম। যেন পাপ দিও না!' যেই রাজকন্যের ঘরে বিষ্ণু ঢুকে গেলেন, রাজা-রানিও দৌড়ে নিজেদের মহলে পালিয়ে গেলেন। আলাপসালাপ করা আর হল না।

কিন্তু রাজকন্যের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণু গল্প করতে আসায় কেউ আর বাধা দেয় না। ঘরে

তো এতে লক্ষ্মীশ্রী বাড়বে বই কমবে না? ঠাকুর দেবতার সুনজরে পড়া কি চাট্টিখানি কথা? কিন্তু তাঁরা কথাটা পাঁচকান করলেন না। বুড়িদাসীকেও বারণ করে দিলেন। কে কোথায় নজর দিয়ে দেবে?

এমন সময়ে পাশের রাজ্যের থেকে দূত এসে খবর দিল, তারা এরাজ্য আক্রমণ করতে আসছে। রাজা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। শুনে তো রাজার চক্ষু চড়কগাছ। মনটা খুবই উচাটন হয়ে পড়ল। অনেককাল হল এ-রাজ্যে কেউ যুদ্ধটুদ্ধ করার কথা ভাবেনি। সৈন্যসামন্তরাও হয়তো তেমন সাহসী নেই আর। সেনাপতি মশাইয়ের মনটাও যুদ্ধের চেয়ে ধর্মকর্মেই বেশি থাকে ইদানীং। যুদ্ধ যে কেউ করতে পারে তা-ই ওদের মনে ছিল না। এমনই শান্তিপ্রিয় রাজ্য এটা। এখন কী হবে? কেমন করে রক্ষা পাবে প্রজাদের প্রাণ? ধনসম্পদ? খেতখামার? রাজামশাইয়ের বেজায় মন খারাপ। কী হবে এখন?

দেখেশুনে শেষে রানিমা বললেন—'একটা কথা বলব? রোজ-রোজ তো স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু আসেন এ-বাড়িতে। এ-রাজ্যের কোনও অমঙ্গল হতেই পারে না। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্তা। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা, মহেশ্বর শিব প্রলয়কর্তা। চলো আমরা শ্রীবিষ্ণুকেই বলি আমাদের রক্ষা করতে।' রাজামশাই হাতে চাঁদ পেলেন।—'সেই ভালো চলো, চলো। রাজকন্যেকে বলা যাক।'

সেইরাত্রে যখন শ্রীবিষ্ণু গরুড়ে চড়ে এলেন রাজকন্যা চম্পাকলি তাঁকে সব খুলে বললেন। বললেন—'আপনি আমাদের রক্ষা করুন! আপনিই আমাদের সৈন্যদের পরিচালনা করুন। আপনাকে দেখলেই ওরা মনে বলভরসা পাবে। আর সেনাপতিও তো রোজই আপনার মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন।'

বিষ্টু তাঁতির মাথায় বাজ পড়ল।

কিন্তু ততদিনে তার রাজকন্যার সঙ্গে এতই ভাব ভালোবাসা হয়ে গেছে যে রাজকন্যার মুখ ছোট করার কথা সে ভাবতেই পারে না। বিষ্টু বললে—'তথাস্তু। নিশ্চয়ই যুদ্ধে যাব।'

বাড়ি ফিরে কেষ্টকে বিষ্টু বললে, 'ভাই কেষ্ট, এবার তো যুদ্ধে মরতে হবে। ও-রাজ্যের রাজা আমাদের আক্রমণ করবেন, ঘোষণা করেছেন। আমাকে শ্রীবিষ্ণু ভেবে রাজারানি আমার শরণ নিয়েছেন। আমি তো ওঁদের ডোবাতে পারি না? আমাকে এত বিশ্বাস করেছেন। আমি এই গরুড় নিয়েই উড়ে-উড়ে যুদ্ধ করতে যাব। আর চেঁচিয়ে গান গেয়ে সৈন্যদের মনে বল জোগাব—কি বলিস? শত্রুরা ঢুকে এলে এমনিতেও মরব, অমনিতেও মরব, একবার চেষ্টা অন্তত করে দেখি। শত্রুদের ভয় দেখিয়ে তো আসি। নইলে রাজকন্যেকেই বা মুখ দেখাই কেমন করে?

কেষ্ট শুনে বললে—'তোর মন যা চাইছে সেটাই কর। সেটাই ঠিক। আমি বরং তোকে একটা আলো জ্বলা চক্র করে দিই—আর একটা ভয়ঙ্কর শব্দওলা শঙ্খ। দেখবি তাতেই শত্রু ভয় পাবে। বাঁই-বাঁই করে আলো জ্বলা গদা আর চক্র ঘুরতে থাকবে দুটো

নকল হাতে। তুই শুধু বোতাম টিপবি। শাঁখটাও নিজে-নিজে বাজবে।'

'সে তো হল, কিন্তু।'

বিষ্টু বললে, 'ভাই কেষ্ট, আমি আজই রাত্রে রাজকন্যে চম্পাকলিকে জানিয়ে আসি যে, আমি আসলে বিষ্ণু নই। আমি মানুষ। কিন্তু যুদ্ধে যাব, ওর মুখরক্ষা করতে। যদি না ফিরি? সত্যিকথাটা বলা উচিত?'

একটু ভেবে কেষ্ট বললে,—'না ভাই, এখন বলতে যেও না, তাহলে ওদের মনের জোর ভেঙে যাবে। বরং একটা পত্তর লিখে যাও। ওর দাসীকে আমি দিয়ে আসব যুদ্ধ শুরু হলে।'

বিষ্টু লিখল—'আমি বিষ্টুতাঁতি। ওই শাড়িটি তোমার জন্যে আমিই তৈরি করেছিলুম। আমি দেবতা নই, তোমার সঙ্গে ভাব করতেই এতদিন ছদ্মবেশে ছিলুম—তোমাকে ঠকানো আমার ইচ্ছে ছিল না। আমি যুদ্ধে যাব শ্রীবিষ্ণু সেজে। তাতে যা হয় হবে। —কিন্তু যদি না ফিরি, তাহলে জেনো, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। এখন শ্রীবিষ্ণুই সহায়। আমায় ক্ষমা করো, ছলনা করা অন্যায় হয়েছে, কিন্তু কীভাবেই বা দেখা করা যেত?' চিঠি পড়ে কেষ্ট বললে, 'যুদ্ধ শুরু হোক, আমি চিঠি ঠিক দিয়ে আসব। একটুও ভয় পাস না। আমরাই জিতব।'

এসব কথা যখন হচ্ছে, নারদ তখন আকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। শুনতে পেয়ে তাঁর খুব ভাবনা হয়ে গেল। নকল বিষ্ণু যদি যুদ্ধ করতে গিয়ে হেরে যান, তবে তো আসল বিষ্ণুর নিন্দে হবে? বিষ্ণুকে তিনি গিয়ে এই দুর্ভাবনার কথা জানালেন। বিষ্ণু বললেন—

—'কিচ্ছু ভাবনা নেই—ভালোবাসার জয় হবেই। আমার নাম করে ওরা যুদ্ধে নামছে তো, তাতেই ওদের মনোবল বেড়ে যাবে—দেখো, বিষ্ণুর টিম হারবে না!'

নারদ বললেন—'কিন্তু, তাই বলে, শ্রীবিষ্ণু সেজে—'

বিষ্ণু হাসলেন। —'সাজুক না। তাতে যদি যুদ্ধু বন্ধ হয়? ভালোই তো। যুদ্ধু বড্ড খারাপ জিনিস।'

নারদ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

কেষ্টছুতোর খুব যত্ন করে কাজে লেগে গেল। দেশকে রক্ষে করতে হবে, তার প্রাণের বন্ধুকেও রক্ষে করতে হবে। কেষ্ট নকল বিষ্ণুর জন্যে নকল শঙ্খ-চক্র-গদা তৈরি করলে—শাঁখের কী পিলে-চমকানো শব্দ রে বাবা—পাঞ্চজন্য বলে কথা! চক্র আর গদা দুটো থেকেই আগুনের ঝিলিক ঠিকরে বেরুচ্ছে আর দুটোই বনবন করে ঘুরছে। আহা ঠিক যেন চন্দননগরের আলোর খেলা! কেষ্ট তৈরি করে নিজেই মুগ্ধ। গরুড়ের চোখে আর লেজেও অগ্নিকণা বেরুতে লাগল। বিষ্টুর হাতে আসলে কোনও অস্ত্রই নেই। অস্ত্র থাকবে কি, সেকি যুদ্ধ করতে জানে? সে তো তাঁতশিল্পী, তাঁতি, তন্তুবায়, বারুজীবী, কতকিছুই বলা যায় তাকে, কিন্তু সৈনিক বলা চলে না কিছুতেই। যুদ্ধে বিশ্বাস করে না কেষ্টবিষ্টু।

ওরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। কিন্তু উপায় কি? বিষ্টু তাঁতি যুদ্ধক্ষেত্রে চলল শত্রুদের ভয় দেখাতে, আর মিত্রপক্ষকে অভয় দিতে।

যুদ্ধ শুরু হল। এ-পক্ষের সৈন্যরা চিৎকার করে ও-পক্ষকে বলতে লাগল—

—'ফিরে যা ফিরে যা।'

সেনাপতি চোঙা মুখে দিয়ে ওদের বললেন—

—'তোরা অন্যায় যুদ্ধে শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীকে আক্রমণ করেছিস—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তোদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। —বিষ্ণু এসে এক্ষুনি তোমাদের মজা দেখাবেন—সংহার মূর্তিতে স্বয়ং বিষ্ণু আসছেন তোমাদের খতম করতে। এখনই ভালোয়-ভালোয় ফিরে যাও—এখনও সময় আছে—কুড়ি গুনছি—'

হো-হো করে হেসে উঠে ও-পক্ষের সৈন্যরা তির ছুড়ল। এরা ঢাল দিয়ে সেই তির আটকাল। আরেকপ্রস্থ তির শাঁ-শাঁ উড়ে গেল এদিক থেকে ওদিকে। যুদ্ধ বেঁধে গেল।

হঠাৎ আকাশে খড়খড় শব্দ করে দেখা গেল উড়ে আসছেন গরুড়পক্ষী। স্বয়ং বিষ্ণু গরুড়ে বসে আছেন—মণিমাণিক্যের মুকুট সূর্যের আলোয় চম্‌কাচ্ছে—আর চারহাতেই আগুন ছিটোচ্ছে। সুদর্শন চক্র ঘুরছে বনবন। গদাও ঘুরছে শন্‌শন্—হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ পিলে চমকে গর্জন করে উঠল বিষ্ণুর হাতের শঙ্খ—অমনি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল শত্রুদের মধ্যে। পালা, পালা, পালা, পালা, পালা, পালা, পালা,—মুহূর্তে শত্রুপক্ষের মাঠ শূন্য, যুদ্ধক্ষেত্র ফাঁকা। এ-পক্ষের সৈন্যরা হইহই করে প্রচণ্ড তেড়ে গিয়ে শত্রু সৈন্যদের ভাগিয়ে দিয়ে এসেছে তাদের নিজেদের রাজ্যের সীমার মধ্যে। আর ধরে ফেলেছে ওই দুষ্টু রাজাটাকে, যে লোভ করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল শান্তিপ্রিয় রাজার বিরুদ্ধে।

আহ্লাদে হইহই চলছে। কিন্তু সময়টা তো দিনেরবেলা। শ্রীবিষ্ণু গরুড়সমেত নীচে নেমে আসতেই গ্রামের লোকেরা তাকে চিনে ফেললে—'ওরে ওরে এ তো আমাদের লোক, কেষ্ট-বিষ্টুর বিষ্টু তাঁতি রে! এ তো ঠাকুর শ্রীবিষ্ণু নয়?' বলে তারা আনন্দ করতে লাগল।

বিষ্টুতাঁতি তখন মনস্থির করে ফেলেছে রাজার কাছে গিয়ে মাপ চাইবে। কিন্তু হল তার উলটোই।

রাজামশাই এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন—'তোমার জন্যে এত মানুষের প্রাণ বাঁচলো। শত্রু-মিত্রের কত প্রাণ নষ্ট হত এই যুদ্ধে। তুমিই বুদ্ধি করে যুদ্ধটা আটকে দিলে। তুমি আমার পুত্রসম। এই রাজ্য তুমিই চালনা করবে এবার থেকে। আমার মেয়ে রাজকন্যা চম্পাকলির সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব। সে তোমার চিঠি পেয়েছে।' বিষ্টুতাঁতি রাজাকে প্রণাম করে মাথা চুলকে বললে—

—'রাজামশাই, আমার সাহস আছে, ভালোবাসা আছে, কিন্তু বুদ্ধিটা আমার বন্ধু কেষ্টর। রাজ্যভার ওকেই বরং দিন, রাজকন্যেটি আমাকে দিন।'

শুনে রাজা পড়লেন আরও মুগ্ধ হয়ে।

—'বাঃ! এত বন্ধুত্ব? এত নির্লোভ? এত বিশ্বস্ততা? বেশ, তোমরা দুজনেই আমার দুই মেয়েকে বিয়ে করে সুখে থাকো—বড় মেয়ে চম্পাকলি তোমার বউ হবে, ছোট মেয়ে

চন্দ্রকলা কেষ্টর বউ হবে। তোমরা দুজনেই একসঙ্গে রাজ্যশাসন করো, সেটাই সবচেয়ে ভালো।'

কেষ্টকে দেখতেও ভালো, বুদ্ধিও তার তীক্ষ্ণ। রাজকন্যে চন্দ্রকলাও খুব লক্ষ্মী আর বুদ্ধিমতী, মেয়েরা রাজার কথা আড়াল থেকে শুনে ফিক করে হাসলেন।

রাজার দুই মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল দুই বন্ধুর সঙ্গে। এবার ও-রাজ্যের বন্দি রাজাকে নিয়ে কী করা যায়? কেষ্ট বললে—'ও-রাজ্যের রাজার ছেলেপুলে নেই, কিন্তু মন্ত্রীর একটি পুত্র আছে। আমাদের মন্ত্রীকন্যাটির সঙ্গে তাকে মানাবে ভালো। মন্ত্রীমশাই মত কি দেবেন? তাহলে দুই রাজ্যে সম্বন্ধ করি?' রাজামশাই, মন্ত্রীমশাই রাজি,—বন্দি রাজাও অগত্যা মত দিলেন।—দুই রাজ্যের দুই মন্ত্রী এবারে বেয়াই হয়ে যাবেন, ঠিক হল। তাহলে আর যুদ্ধের কুমন্ত্রণা দেবেন না রাজামশাইকে। কেবলই ভাব-ভালোবাসা, তত্ত্ব-তালাশ চলবে, নাতি-নাতনি হবে, জ্ঞাতি-গুষ্টি খাবে-দাবে, আনন্দ করবে। যুদ্ধের কথা মনেই আসবে না আর।

খুব ধুমধাম করে বিয়ের বাদ্যি বেজে উঠল পাশাপাশি দুই রাজ্যে। এই তো সেদিনই বাজছিল যুদ্ধের দামামা। এখন বাজছে সানাই। এটাই আসল সুর।

বিষ্টু তাঁতি খুব ব্যস্ত। তিন-তিনখানা আনারসি-বেনারসি বিয়ের শাড়ি বুনতে হচ্ছে না তাকে?

কেষ্ট ছুতোরও খুব ব্যস্ত। তিন-তিনখানা ইন্দ্রপুরীর মতন বিয়ের মণ্ডপ গড়তে হচ্ছে তো তাকেই! শুভদিন প্রায় এসেই পড়ল! কেষ্টবিষ্টুর বিয়ে বলে কথা!

[বীজটুকু পঞ্চতন্ত্র থেকে নেওয়া]
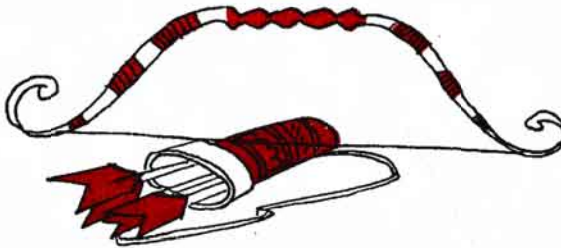
সুসনি-কল্‌মি

এক গ্রামে, ছোট্ট এক কুটিরের মধ্যে থাকত দুটি বোন, সুসনি আর কল্‌মি। তাদের ছিল কেবল একটা ছাগল, ছাগলের নাম পদ্মকালী। সুসনি-কল্‌মির মা ছিল না, বাবা ছিল না, ভাই ছিল না, ছিল শুধু ওই এক পদ্মকালী। পদ্মকালী দুই বোনকে খুব ভালোবাসে। দুই বোনও পদ্মকালী বলতে আহ্লাদে অজ্ঞান। হবে না? পদ্মকালী যে ক্ষীরের মতো দুধ দেয়। সেই দুধ সক্কলে কিনতে চায়।

দুই বোন রোজ ঘুম থেকে উঠে পদ্মকালীকে মাঠে নিয়ে যায় ঘাস খাওয়াতে। পদ্মকালী আপনমনে চরে বেড়ায়। আর সুসনি-কল্‌মি দুই বোন গাছের ছায়ায় বসে বসে মিষ্টি গলায় গান গায়। সেই গান গাছের পাখিরা শোনে। মাঠের ইঁদুররা শোনে। ঘাসের ফড়িংরা শোনে।

একদিন দুপুরবেলায়, সুসনি-কল্‌মি আপনমনে গান গাইছে, আর পদ্মকালী মনের আনন্দে মাঠে ঘুরে-ঘুরে ঘাস খাচ্ছে। হঠাৎ রাজার পেয়াদারা ঘোড়ায় চড়ে এসে পড়ল; সঙ্গে মন্ত্রী ও রাজপুরোহিত। তাঁরা সবাই একটি সুমঙ্গলি ছাগলকে খুঁজতে বেরিয়েছেন যার গায়ের রংটি কুচকুচে কালো, শুধু কপালটুকু সাদা। এই সুলক্ষণ যে-ছাগলের আছে, তার দুধ খাওয়ালে তবেই রাজামশাইয়ের অসুখ সারবে, রাজবৈদ্য বলেছেন। রাজবাড়ির কোনও ছাগলের এই সুলক্ষণ নেই। সর্বাঙ্গ কালো হল তো একটার হয়তো খুর সাদা। কারুর লেজের ডগায় সাদা লোম। কারুর পেটটা সাদা। সর্বাঙ্গ কালো কুচ্‌কুচে—শুধু ললাট সাদা, এমন চাঁদ-কপালে ছাগল আর সারা রাজ্যে কোথাও মিলছে না! এদিকে

দুই বোন তখন গান গাইছিল,

'পদ্মকালী চাঁদ-কপালী
তেল-কুচকুচ্ গা
এমন সোনার পদ্মকালী
কোথাও পাবি না!'

সেই গান শুনতে পেয়েই পেয়াদারা হন্তদন্ত হয়ে চলে এসেছে। পদ্মকালীকে রাজার চাই-ই। সুসনি-কল্‌মি কেঁদে উঠল, পদ্মকালীকে ধরে নিয়ে গেলে, তাদের আর কেউই রইল না। তার চেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তাদেরও ধরে নিক না কেন পেয়াদারা?

কিন্তু পেয়াদারা কেবল নিয়ম মানে আর হুকুম পালন করে। তাদের বলা হয়েছে ছাগল ধরে আনতে। দুটো ছোট-ছোট মেয়েকে তো ধরতে বলেনি। তারা জোর করে পদ্মকালীকে নিয়ে গেল, কিন্তু সুসনি-কল্‌মিকে ধরে নিল না। উলটে ওদের চোখ পাকিয়ে বকে দিল।

সুসনি-কল্‌মি কী করে? ঘোড়ার পিছু-পিছু দৌড়ে যাওয়া তো সম্ভব নয়। পদ্মকালীকে কোলে নিয়ে ওরা চলে গেছে। সুসনি-কল্‌মি কাঁদতে-কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল।

পদ্মকালীকে পেয়াদা ধরল।
সুসনি-কল্‌মি হেদিয়ে মরল।।

গ্রামের লোকেরা সবাই এসে সান্ত্বনা দিলে। তারা বললে, 'সুসনি-কল্‌মি কাঁদে না, পদ্মকালী ঠিক ফিরে আসবে। ও-ও কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারে? তোমরা ওকে এত ভালোবাসো—

পদ্মকালী আসবেই।
তোদের ভালোবাসবেই।'

হলে কি হবে? পদ্মকালী আর আসে না। সুসনি-কল্‌মি বলাবলি করলে—'নাঃ এবার আমরাই বরং রাজসভায় যাই, গিয়ে বিচার চাই। এ কেমন রাজা? যে আমাদের একটা মাত্র বন্ধুকে কেড়ে নেয়?

সুবিচার চাই!
চল্, রাজার কাছে যাই।'

চিঁড়ে-গুড় আঁচলে বেঁধে দুই বোন হাঁটছে, হাঁটছে, হাঁটছে, রাজপ্রাসাদ আর দেখতে পায় না। গাঁয়ের পরে গঞ্জ। গঞ্জের পরে শহর। শহরের পর মহানগর রাজার প্রাসাদ সেইখানে। এদিকে এরা তো গ্রামের পর গ্রামই ফুরোতে পারেনি, গঞ্জেই আসেনি। ক্লান্ত হয়ে সুসনি-কল্‌মি একটা মস্ত ডুমুরগাছের নীচে বসে পড়ল। পাশে জল-টলটলে দিঘি। দিঘির জলে দুই বোন ঝাঁপ দিয়ে আরাম করে স্নান করে উঠল, 'আঃ!' তারপর আঁচলের চিঁড়ে ভিজিয়ে নিয়ে গুড় দিয়ে খেতে শুরু করল। হাঁটতে-হাঁটতে খিদে তো কম পায়নি? চিঁড়ে-গুড় যেন অমৃত।

এমন সময়ে একটা মা-কুকুর তিনটে ছানা নিয়ে সেখানে এল। রোগা, হাড়-জিরজিরে, পাঁজরা বের করা শরীর কুকুরটার। গোল বাচ্চাগুলো রোগা মায়ের দুধ খাচ্ছে।

সুসনি-কল্‌মি বললে, 'আহা রে!'

সুসনি-কল্‌মি বললে, 'চিঁড়ে খাবি?'

সুসনি-কল্‌মি তাদের খাবার থেকে অর্ধেকটা মাটিতে ঢেলে দিলে, কুকুর-মা এসে হাপুস-হুপুস করে চিঁড়েটুকু খেয়ে নিয়ে, জিব দিয়ে সুসনি-কল্‌মির হাত চেটে, টুক্‌টুক্ করে ল্যাজটি নেড়ে, আমোদ করে 'থ্যাংকিউ' বলে গাছের ছায়াতে শুয়ে পড়ল ছানাদের নিয়ে।

সুসনি-কল্‌মি একটু জিরিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। পদ্মকালীকে খুঁজতে যেতে হবে। কে জানে রাজার বাড়ি কোনখানে?

একটু দূরে এসে দেখে রাস্তা দু-দিকে ভাগ হয়ে গেছে। কোনদিকে রাজার বাড়ি?

কেউ বললে, 'ঔ, ঔ।'

সুসনি-কল্‌মি দেখে কুকুর-মা সঙ্গে-সঙ্গে এসেছে।

সেই বলেছে, 'ঔ, ঔ' আর বাঁ-দিকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সুসনি বললে, 'কল্‌মি, চল্, ওইটেই পথ!' দুই বোনে চলল কুকুর-মায়ের পেছু-পেছু। খানিকদূর গিয়ে দেখে একটা ছোট্ট ঘণ্টা পড়ে আছে, ঠিক সোনার মতন ঝকঝকে। কল্‌মি বললে, 'সুসনি, এটা কার ঘণ্টা?'

সুসনি বললে, 'কি জানি?' থাকগে, ওতে হাত দিয়ে কাজ নেই!' কিন্তু কুকুর-মা গিয়ে নাক দিয়ে ঘণ্টাটাকে ঠেলতেই, ঘণ্টা সুর করে বলে উঠল,

টুং টাং টিং,
করচিস কীং?'

সুসনি-কল্‌মি হেসে তালি বাজিয়ে বললে, 'ও মা! এ ঘণ্টিটা যে কথা বলে!'

ঘন্টি বলল,

'টিং লিং ক্লিং
কথা তো বলিং,
নিয়ে যদি যাও তবে
সঙ্গে চলিং!'

সুসনি-কল্‌মি ঘণ্টিটা আঁচলে বেঁধে নিল। মা-কুকুর তিনটে ছানা নিয়ে আগে-আগে যাচ্চে। এরমধ্যেই বেশ ফুর্তি-ফুর্তিভাব হয়েছে তার।

একটু পরে একজন বুড়ি লাঠি ঠুকঠুক করে সেই পথ দিয়েই এল। আহা, বুড়ি যে দেখি অন্ধ! এক্ষুনি ওই খানাখন্দের মধ্যে গর্তের ভেতর পড়ে যাবে,—সোজা সেদিকেই চলে যাচ্ছে যে!—সুসনি-কল্‌মি দৌড়ে গিয়ে বুড়িকে ধরল, বলল ঃ

'ও মা! ওদিকে যে গর্ত!
তোমার পা ওখানেই পড়ত—
চোখে বুঝি দেখো না?
কোনখানে যাবে, মা?'

বুড়ি তাদের অনেক আদর করে, বললে,

'চোখে দেখিনে, মনে দেখি
পদ্মকালীর খোঁজ পেলে কী?'

সুসনি-কল্‌মি এক্কেবারে হতবাক।

মানে অ-বাক্। অর্থাৎ মুখে আর কথা নেই। বুড়িমা কেমন করে পদ্মকালীর কথা জানতে পারলে? কিন্তু বুড়িমা তো মনের কথা পড়তে পারে—তাই সে বলে উঠল—

'সামনে আছে মালির ঘর,
রাজার বাড়ি তারপর।
মানুষ ভালো রাজার মালি।
সে খোঁজ দেবে পদ্মকালীর।'

এই বলে আরেকটু আদর করে বুড়ি চলে গেল।

সামনে সত্যি-সত্যি চমৎকার একটা ফুলের বাগান। কতরকমের ফুল তাতে ফুটে আছে। যেমন রঙের বাহার, তেমনি সুবাস। আঃ! সুসনি-কল্‌মি তো মুগ্ধ। কুকুর-মা বললে, 'এই তো তোমরা পৌঁছে গেছ, এবার আমরা তবে যাই?'

'টা-টা' বলে দুই বোন গেট ঠেলে বাগানে ঢুকল। মালির বউটি গাছে জল দিচ্ছে কিন্তু গায়ে খুব জ্বর—অত বড় কলসিটা তুলতে কষ্ট হচ্ছে তার। ইঁদারার কাছে গিয়ে সুসনি-কল্‌মি বললে, 'মালিনী বউদিদি, আমরা তোমার জল তুলে দিচ্ছি, তুমি বোসো।'

মালিনী খুব খুশি হল। 'তোমরা কে গো? লক্ষ্মী মেয়ে দু'টি?'

'আমরা সুসনি-কল্‌মি দুই বোন।'

মালিনীর সঙ্গে বাগানে জল দিয়ে, ঘাস নিড়িয়ে, শুকনো পাতা সাফসুতরো করে, দুই বোনে অনেক কাজ করে ফেললে বাগানের। মালি বাড়ি এসে দেখে, বাঃ। কত কাজ এগিয়ে আছে! মালিবউ বললে, 'দেখো, তোমার দুই বোন এসেছে, তারাই সব করেছে। আমার খুব জ্বর।' শুনে মালি দু-বোনকে যত্ন করে ভাত বেড়ে দিলে। খেতে-খেতে তারা বলল পদ্মকালীর কথা।

মালি বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি তো! ছাগল তো পাওয়া গেছে—কিন্তু দুধ সে দিচ্ছে না! কারুর সাধ্যি নেই তার দুধ দুইবে। এতটুকুনি ছাগল, কিন্তু চাট মারে যেন মুলতানি ঘোড়া! কেউ কাছেই যেতে পারে না। রাজার অসুখ সারবে কেমন করে?'

সুসনি-কল্‌মি বললে, 'ওঃ এই? রাজার অসুখ সারাতে দুধ খাওয়াতে হবে? তা পদ্মকালী খুব লক্ষ্মী, ও নিশ্চয় রাজার জন্যে দুধ দেবে। আমাদের নিয়ে চল। আমরা ওকে বুঝিয়ে বলব।'

মালি বললে, 'ঠিক আছে। কালই তোমাদের বরং রানিমায়ের কাছে নিয়ে যাব। রাজসভায় গিয়ে কাজ নেই।'

এখন, রাজার ঘোষণা ছিল, যে রাজার অসুখ সারাতে পারবে, তাকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব দেবেন। এদিকে মন্ত্রীও খুব চেষ্টা করছেন রাজার অসুখ সারাতে, ওদিকে পুরোহিত ঠাকুরও খুব চেষ্টা করছেন। রাজবৈদ্যটি এরমধ্যে নেই। তিনি ওষুধ বলে দিয়েই খালাস। ওষুধ সংগ্রহ করা রাজসভার কাজ। পদ্মকালীকে সব সুলক্ষণ মিলিয়ে ধরে আনা হয়েছে।

রাজপুরোহিত বলছেন, আমি এনেছি। মন্ত্রী বলছেন, আমি এনেছি। দুজনেই গিয়েছিলেন তো পেয়াদাদের সঙ্গে! এখন কার কথা শুনবেন রানিমা?

ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়ে পদ্মকালী আর দুধই দিচ্ছে না। সে কেবলই পালাবার পথ খোঁজে। কিন্তু পালাবে কী? সোনার শেকলে তাকে বেঁধে রেখেছে রাজবাড়ির উঠোনে। রুপোর বাটি করে রাজভোগ ধরে দেওয়া হচ্ছে দু-বেলা। এদিকে মন্ত্রী আর পুরোহিতের ঝগড়া চলেইছে চলেইছে। রাজার অবস্থা আরও খারাপ। তিনি চোখও মেলেন না, কথাও বলেন না, জলস্পর্শ করেন না। রানিমা মাথার কাছে বসে কাঁদছেন। দুই রাজপুত্র স্বর্ণকমল আর স্বপ্নকমল পায়ের কাছে। দাসীরা হাওয়া করছে। হতাশ মুখে রাজবৈদ্য বসে আছেন খলনুড়ি ওষুধ নিয়ে। ছাগলের দুধের অনুপানটি ছাড়া খাওয়াতে পারছেন না। ওদিকে পদ্মকালী কিছুতেই রাজভোগ খাচ্ছে না, দুধও দিচ্ছে না। রাজার গোয়ালারা হার মেনে গেছে।

এমন সময়ে মালি উপস্থিত হল রানিমার জন্যে ফুল নিয়ে। পুজোর ফুল। ঘর সাজাবার ফুল। খোঁপায় পরার ফুল। রানিমা বললেন, 'ঘর সাজানোর কী সময় আছে? নাকি খোঁপায় ফুল পরবার দিন এইটে? শুধু পুজোর ফুলটা রেখে যাও।'

মালি বললে, 'রানিমা, এবার থেকে ঘর সাজাবেন, খোঁপাতেও ফুল পরবেন, রাজামশাই সেরে উঠবেন বলে।'

রানিমা বললেন, 'কীরকম? কীরকম?'

মালি তখন সুসনি-কল্‌মির কথা বলল।

রানিমা বললেন, 'কই? কই?'

মালি বললে, 'উঠোনে।'

এদিকে রাজবাড়ির উঠোনে তখন উৎসব। সুসনি-কল্‌মিকে দেখে আহ্লাদে পদ্মকালীর সে কি নাচ! নাচচে-নাচতেই এক মিনিটে রাজভোগের বাটি খালি করে ফেলল। আর সোনার ঘটি ভরতি করে সুষ্‌নি-কল্‌মি পদ্মকালীর ক্ষীরের মতো ঘন সুগন্ধি দুধ দুইয়ে দাসীর হাতে তুলে দিল।

এদিকে দাসীটির মনে দুষ্টু বুদ্ধি এল। সে করলে কি, সুসনি-কল্‌মিকে ধাক্কা দিয়ে রাজবাড়ির বাইরে বের করে দিয়ে, দুধের বাটি নিয়ে গিয়ে রানিমাকে বললে, 'আমিই এই দুধ দুইয়ে এনেছি!'

রাজবাড়িতে এদিকে আনন্দের বান ডেকেছে—রাজবৈদ্যের ওষুধে কাজ হয়েছে। রাজা চোখ মেলেছেন, রাজপুত্রদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসেছেন। রানিমা ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে গেলেন।

রাজ্যজুড়ে আনন্দ উৎসব। বাজনা বাজছে। রাস্তায় লোকে নাচছে। বাজি পোড়ানো হচ্ছে। ঘরে-ঘরে আলো জ্বলছে। পতাকার মালা ঝুলছে। রাজার বিপদ কেটে গেছে। রাজ্যের বিপদ কেটে গেছে।

কিন্তু রাজা সুস্থ হয়েই বললেন, 'কে আমাকে সুস্থ করলে? তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিতে হবে—তাকে ডেকে আনো।'

মন্ত্রী বললেন, 'আমি ছাগল এনেছি।'

পুরোহিত বললেন, 'আমি এনেছি।'

রানির খাসদাসী বললে, 'ওরা কেউ দুধ আনতে তো পারেনি, আমিই দুধ এনেছি।'

মালি বললে, 'না মহারাজ, ও নয়, সুসনি-কল্‌মি নামে দুটি মেয়ে এসে দুধ দুইয়েছিল, তাদেরই ছাগল, দাসী ভুল বলছে—'

'রানির খাসদাসী বলে কথা! তাকে মিথ্যেবাদী বলা? মালিকে সভা থেকে বেরই করে দেওয়া হল।'

পরদিন সভা করে আধখানা রাজত্ব দাসীকে দেওয়া হবে। রাজা পদ্মকালীকে সভায় আনালেন—তাকেও আজ সম্মান জানানো হবে। পদ্মকালীর সঙ্গে-সঙ্গে সুসনি-কল্‌মিও এল। রাজবৈদ্য, মন্ত্রী, রাজপুরোহিত, কোটাল, সবাই আছেন—এমনকী মালি, মালির বউও। পদ্মকালীর গলায় আদর করে সেই চকচকে ঘণ্টিটা বেঁধে দিয়েছে সুসনি-কল্‌মি।

দাসী বেগুনি রঙের বেনারসি পরে, গয়না ঝলমলিয়ে রানির মতন সেজে সভায় এল। রাজারানি পাশাপাশি সিংহাসনে বসলেন। দুই রাজপুত্তুর দু-পাশে। দাসীর আলাদা একটা সিংহাসন, সে তো আধখানা রাজ্যের রানিই হয়ে গেল আজ থেকে। মালি করে কী? এতবড় অন্যায় চোখের সামনে হয়ে যাচ্ছে। তার কথায় কেউ কানই দিচ্ছে না। পদ্মকালীর গলায় রানিমা আদর করে মুক্তোর মালা পরিয়ে দিলেন, চার পায়ে সোনার নূপুর পরিয়ে দিলেন। শিং দুটি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিলেন। তখনই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। পদ্মকালীর গলায় বাঁধা ছোট্ট পেতলের ঘণ্টি যেন কথা বলে উঠল—

'টিং টিং ঠিন্ ঠিন্
দুষ্টু দাসীর কথায় রাজা
ঠকে গিয়েছেন!'

এ কী? এ কী? এ কী?

ঘণ্টা কী কথা বলছে? ঘণ্টা বলছে ঃ

'দাসীই যদি পারে,
দুধ দোয়াতে এখন, রাজা
বলেই দেখুন তারে!'

সত্যিকথাই তো? একেবারে রাজত্ব দিয়ে দেওয়ার আগে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করে নেওয়া ভালো।

মন্ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

পুরোহিত বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

সভাসুদ্ধু সবাই বললে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

এবার রাজামশাই বললেন রানিমার সেই খাসদাসীকে, 'যাও তো বাছা, আরেকবার দুধটুকু দুইয়ে আনো আহা কী স্বোয়াদ, যেন অমৃত!' অন্য দাসীরা সোনারঘটি এনে দিলে। খাসদাসী তো ভয়ে-ভয়ে পদ্মকালীর দিকে এগোলো।

কাছে গিয়ে যেই না দুধ দোয়াতে গেছে পদ্মকালী দিলে এক লাথি, ঘটি ছিটকে

গিয়ে পড়ল রাজামশায়ের কোলে। সভাসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। হাসি আর থামে না।

রাজামশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রানি, তোমার খাসদাসীর কী শাস্তি হবে?'

রানি বললেন, 'ওকে ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে পথে বের করে দাও। বড্ড বেশি লোভ হয়েছিল।'

রাজা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'দুধটা তবে দুয়েছিল কে?'

গলায় ঘণ্টি বেজে উঠল—

টুং লিং টুং লিং
সুষ্‌নিং কল্‌মিং—'

'আরে, আরে, ঘণ্টি আবার কী বলছে?'

মালিবউ বললে—

'সুসনি-কল্‌মির কথা বলছে রাজামশাই। ওরাই তো আপনার জন্যে দুধ দুয়ে দিয়েছিল। পদ্মকালী ওদেরই ছাগল।'

কোথায় তারা? কোথায় তারা?

ওই তো দূরে, সভার এক কোণে।

ডেকে আনো, ডেকে আনো।

এসো মা, বোস মা।

তারপর?

তারপরে সুসনি-কল্‌মির সঙ্গে ঘটা করে দুই রাজপুত্তুরের বিয়ে হয়ে গেল!

আধখানা রাজ্য হবে দু-ভায়ের—আর আধখানা রাজ্য হবে দু-বোনের। কিন্তু এক্ষুনি নয়। এখনও তো রাজামশাই বহাল তবিয়তে রাজসিংহাসনে আছেন!

বোকা রাজার বুদ্ধিমতী রানি

এক বোকা রাজার একটি ছেলে ছিল। রাজার নিজের মাথায় বুদ্ধি নেই, তাঁর ছেলের মাথাতেও বুদ্ধি নেই। রানির মাথাতে কিন্তু অনেক বুদ্ধি ছিল। ভাগ্যিস ছিল! তাই যখনই রাজা আর রাজপুত্তুর মিলে পাশের রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাতে চাইতেন রানি অমনি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখে বসতেন এবং বলতেন যে সেই স্বপ্নের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করা যাবে না। তার মধ্যে যুদ্ধ করলেই হেরে ভূত হয়ে যাবেন রাজা। স্বপ্নে রানি জানতে পেরেছেন, এরকমই বিধির বিধান! আর তবে উপায় কী? রাজাকে শুনতেই হয়।

তা প্রথমবার রাজা যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন—ঘোড়া সেজেছে, রথ সেজেছে, হাতি সেজেছে, ঢাল মেঘর-ঘাঘর বেজেছে—বাজতে-বাজতে চল্ল ডুলি—

ডুলি কোথায় যাবে? না পাশের রাজ্যে। ডুলির ভেতর কে? না রাজদূতমশাই, আর রাজপুরোহিতমশাই।

তাঁরা কেন ডুলিতে?

কেন না তাঁরা ঘোড়ায় চড়তে জানে না। আর রথে চড়তে ভয় পান। পাশের রাজ্যে গিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন রাজদূত, আর তার লগ্নটা স্থির করে দেবেন রাজপুরোহিত।

হঠাৎ দৌড়তে-দৌড়তে রানিমার খাসদাসী এসে ডুলি ধরলেন।

'কী ব্যাপার? কী ব্যাপার?'

'রানিমা স্বপ্ন দেখেছেন, দুটো গ্রাম পেরিয়ে একগ্রাম আছে, তার নাম আন্ধারা গ্রাম।

সেখানে কোনও বাড়িতে দিনের বেলাতেও আলো নেই। সেই গ্রামের ঘরে-ঘরে আলো না এনে দিয়ে যুদ্ধে গেলে যুদ্ধে হেরে যাব আমরা।'

'ওঃ, এই কথা, তা আমরা যাচ্ছি, এক্ষুনি গিয়ে রাজাকে বলছি।' রাজপুরোহিত আর রাজদূতমশাই সভায় ফিরে চললেন।

রাজা শুনে বললেন, 'ওঃ, এই? তা এক্ষুনি ওদের গ্রামের আমি বালতি পাঠিয়ে দিচ্ছি আড়াইশো। সৈন্যরা সারাদিন ধরে বালতি করে সূর্যের আলো ভরে-ভরে ঘরে-ঘরে ঢালুক। ঘর আলো হয়ে যাবে।' আপাতত যুদ্ধযাত্রা বন্ধ রইল।

আড়াইশো বালতি নিয়ে সৈন্যসামন্ত হাজির হল আন্ধারা গ্রামে। সারাদিন তারা সূর্যের আলো ভরতি করে প্রজাদের ঘরে নিয়ে ঢালে। কিন্তু ঘরে আলো আর হয় না। এরকম চলতেই থাকল অনেক বছর। রাজা তো অস্থির—যুদ্ধযাত্রা আর হচ্ছে না। পাশের রাজ্যের রাজকুমারী একদিন আন্ধারা গ্রামের সামনে দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছিলেন ঘোড়ার চড়ে। এত খালি বালতি নিয়ে লোকেরা ছুটোছুটি করছে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

'কী করছে এরা? কী ব্যাপার!'

'অন্ধকার ঘরে সূর্যের আলো ধরে আনার চেষ্টা করছি।'

রাজকুমারী গিয়ে দেখলেন, এ-গ্রামের কোনও ঘরেই জানলা নেই, ঘুলঘুলি নেই, কেবল ছোট্ট একটা দরজা আছে। অমন গুহার মতন ঘরে আলো ঢুকবে কোথা দিয়ে?

আপন মনে হেসে নিয়ে রাজকুমারী বোকা রাজার সেনাপতিকে ডেকে বললেন, 'আমি তোমাদের গ্রামের ঘরে-ঘরে সূর্যের আলো ভরে দিতে পারি। কিন্তু তার বদলে তোমাদের রাজাকে আমার একটা ইচ্ছে পূরণ করতে হবে। জিগ্যেস করে এসো তিনি রাজি কিনা?'

সেনাপতি তো তক্ষুনি ঘোড়া ছুটিয়ে রাজসভায় ফিরে গেলেন। শূন্য বালতি বইতে-বইতে ততক্ষণে তার সৈন্যসামন্ত প্রায় পাগল হওয়ার জোগাড়। রাজা বার্তাটি পেয়ে খুব খুশি। তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিলেন তথাস্তু। তাই হবে। ঘরে-ঘরে রোদ্দুর নিয়ে দিতে পারলে একটা ইচ্ছে পূরণ করতে রাজি।

শুনে রাজকন্যা সৈন্যসামন্তদের ডেকে প্রত্যেকটি বাড়িতে জোড়া-জোড়া জানলা কাটিয়ে দিতে বললেন। দেওয়াল কেটে প্রত্যেক ঘরে দুটো করে জানলা বসাতেই ঘরে-ঘরে প্রচুর রোদ্দুর খেলতে লাগল। আন্ধারা গ্রামে আলো আর ধরে না। আহ্লাদ আর ধরে না!

'রাজামশাইয়ের কাছে চলুন এবার আপনার ইচ্ছে পূরণ করতে?'

হাতজোড় করে সেনাপতি রাজকুমারীকে ডাকলেন। কিন্তু রাজকুমারী বললেন, 'থাক, এখন নয়, পরে বলব।'

বোকা রাজার খুব আনন্দ। আবার নতুন করে সেজেগুজে অন্যপথ ধরে পাশের রাজ্যে আক্রমণ করতে বেরুচ্ছেন, রানিমাও আবার ঠিক ওই সময়েই স্বপ্ন দেখে ফেললেন,—

আর রানিমার স্বপ্ন সফল হওয়ার আগে যুদ্ধে যাওয়া মানে যুদ্ধে হার নিশ্চিত।

রাজামশাই হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসে রানিমার মহলে প্রবেশ করলেন, 'কী রানি? আবার কী স্বপ্ন দেখলে তুমি? সহজ স্বপ্ন তো বেশ? অ্যাঁ? বেশি কঠিন নয়?'

রানিমা বলেন, 'কেন মহারাজ, স্বপ্নের আবার সহজ কঠিন কী? খুব সহজেই তো দেখা গেল। দিব্যি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে—কোনও কষ্টই হয়নি তো স্বপ্ন দেখে।'

'আহা, সে কথা নয়। বলি স্বপ্নটা কেমন।'

'খুব সহজ স্বপ্ন দেখলুম—আমাদের ওই বুড়ো বাজে পোড়া পিপুল গাছটাকে আমাদের হাওয়া খাওয়ার ঘরে ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু ঘরের কোনও ক্ষতি হয়নি।'

'এ আবার এমন কী?' রাজামশাই তক্ষুনি হুকুম দিলেন, 'গাছটা উপড়ে এনে ঘরে ঢোকানো হোক।'

সৈন্যসামন্ত সব লেগে গেল কাজে। সে বুড়ো পিপুল কি সোজা গাছ? প্রায় চারশো বছর বয়েস হয়েছে তার। ইয়া মোটকা গুঁড়ি। গাছ উপড়ে, ডালপালা ছেঁটে তাকে আপ্রাণ চেষ্টা করা হতে লাগল রাজারানির হাওয়া খাওয়ার ঘরে ঢোকানোর। সে ঘরে যদিও অনেকগুলো দরজা-জানালা কিন্তু এত মোটা গাছের গুঁড়ি ঢোকানোর মতো দরজা একটাও নেই। প্রাসাদসুদ্ধু ভেঙে পড়ার জোগাড় হচ্ছে চেষ্টায়। এমন সময়ে পাশের রাজ্যের রাজকুমারী আবার ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। অত সুন্দর রাজপ্রাসাদের হাওয়াঘরে সৈন্যরা একটা গাছ দিয়ে ধাক্কা মারছে দেখে তাড়াতাড়ি ঘোড়া থামালেন, 'কী ব্যাপার?'

এবারেও স্বপ্নের কথা বলা হল তাঁকে। গাছটা যে ঘরে ঢোকাতেই হবে, রানির স্বপ্ন সফল না হলে যুদ্ধযাত্রা হচ্ছে না।

রাজকন্যে আবার মনে-মনে হাসলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, আমি যদি এই সমস্যাটার সমাধান করে দিই তাহলে কিন্তু রাজামশাইকে আমার একটা ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। এখন আগে আপনারা গাছ নামান।'

রাজামশাই তো একপায়ে রাজি ইচ্ছেপূরণ করতে, যদি রানিমার স্বপ্নপূরণ হয়।

রাজকন্যে বললেন সৈন্যদের, পিপুলগাছের গুঁড়িটাকে টুকরো-টুকরো করে চিরে ঘরে ঢোকাতে। তাহলেই পুরো গাছটা ঢুকে যাবে, ঘরও ভাঙবে না। তাই হল। রাজা আহ্লাদে আটখানা, 'কী ইচ্ছে তোমার রাজকন্যে মা?'

'এখন থাক, পরে হবে।' বলে রাজকন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। রানিমা জানালা থেকে সবটা দেখলেন আর মনে-মনে ভাবলেন—বাঃ! চমৎকার মেয়ে। এমনি মেয়েই বউ চাই আমার।'

রাজামশাই তো আবার যুদ্ধে সাজ শুরু করেছেন। সৈন্যসামন্ত সেজেছে, হাতি-ঘোড়া সেজেছে, কাড়ানাকড়া বেজেছে, রাজদূত বা রাজপুরোহিত ডুলিতে চেপে বসেছে। রানিমার খাসদাসী এসে রাজামশাইয়ের সামনে দাঁড়ালেন। অমনি রাজামশাই বললেন, 'অ্যাঁ আবার?

রানিমা আবার স্বপ্ন দেখলেন নাকি?'

'রানিমা এবারে স্বপ্ন দেখেছেন—তাঁর চিলের ছাদের ফাটলে যে লম্বা-লম্বা ঘাস গজিয়েছে, রাজহস্তিনী প্রেমকুমারী সেই ঘাস খাচ্ছে খুব আনন্দ করে।'

রাজার তো মাথায় হাত। চিলের ছাদে মানুষই উঠতে পারে না মই দিয়ে ছাড়া—ওখানে যাওয়ার কোনও সিঁড়ি নেই। আর হাতি তো সিঁড়ি বেয়ে ওঠে না—সে প্রথমে প্রাসাদের চারতলায় উঠবে তো? তারপরে চিলের ছাদের ঘাস! আরও একতলার ধাক্কা।

হাতিকে তো সিঁড়ি দিয়ে তোলা যাবে না। কপিকল বানাও। কপিকলে হাতি বেঁধে তাকে টেনে ছাদে তোলা হবে।

কপিকল তৈরি হল, কিন্তু কিছুতেই তাতে বাঁধা যাচ্ছে না প্রেমকুমারীকে। সে শুঁড় তুলে বৃংহতিধ্বনি করে বেজায় আপত্তি জানাচ্ছে। বেশি জোর করতে গেলে পিছনের দুই পায়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

প্রেমকুমারীকে বশ মানাতে পারছে না মাহুতও। রাজহস্তিনী বলে কথা? তাছাড়া এই কপিকলে হাতি বাঁধার ব্যাপারটা মাহুতেরও পছন্দ হয়নি, তবু রাজার হুকুম তাই চেষ্টা করছে।

এইসময়ে রাজকুমারী বিদিশা সেই পথ দিয়ে ঘোড়া চড়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। হাতির দুর্দশা দেখে তিনি তো অস্থির, 'ওকি হচ্ছে, ওকি হচ্ছে?'

এবার তো রাজকন্যেকে চিনে গিয়েছেন সেনাপতি সৈন্যসামন্ত সকলেই। তাঁকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ গেল—যাক! এবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। রানিমার স্বপ্নের কথা জানানো হল রাজকন্যেকে।

রাজকন্যা বললেন, 'ও এই? যাও তোমাদের মধ্যে চারজন সৈন্য রাজপ্রাসাদের ছাদে ওঠো কাস্তে আর অ্যাসিড নিয়ে, ঘাসগুলো সব কেটে বান্ডিল বেঁধে নিয়ে নেমে এসো নীচে। আর ঘাস কাটার পরে ফাটলে অ্যাসিড ঢেলে দেবে, যাতে আর ঘাসটাস না গজায় ছাদে। কবে বটগাছই গজিয়ে যাবে। ছাদ ভেঙে রাজপ্রাসাদসুদ্ধু ধ্বংস হয়ে যাবে।'

সেনাপতি তো হাতে মুড়া অ্যাসিডের শিশি নিয়ে মই দিয়ে ছাদে উঠলেন। সঙ্গে উঠলেন চারজন জওয়ান, কাস্তে হাতে। ঘাসটাস কেটে নামিয়ে আনলেন। রাজকন্যা সেই ঘাস দিয়ে আদর করে প্রেমকুমারীর মুখে ধরলেন। প্রেমকুমারী আদরে গদগদ হয়ে ঘাস খেতে লাগল।

সেবারের মতো স্বপ্ন সফল।

পরের ঋতুতে রাজামশাই আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, মন্দিরে প্রণাম করে বেরুবেন, রানিমা নিজেই চলে এলেন, 'মহারাজ, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী দেখলে আবার? এ তো মহা জ্বালা? যেই আমি যুদ্ধে যাব অমনি তুমি স্বপ্ন দেখবে?'

'তা আমি কী করব মহারাজ? স্বপ্ন কী কারুর হাতে থাকে? আমি স্বপ্ন দেখেছি—শাঁখ বাজছে, সানাই বাজছে, আর আমি লাল বেনারসি পরে কোলে করে সেই ঘোড়ায়-চড়া রাজকন্যাকে বধূবরণ করে আমাদের ঘরে তুলেছি।'

খুশি হয়ে রাজা বললেন, 'বাঃ, এ তো বড় চমৎকার স্বপ্ন। চলো সেনাপতি, আমরা সেই ঘোড়ায় চড়া রাজকন্যেকে খুঁজতে যাই! কিন্তু তাকে পাব কোথায়? তার নামধাম কিছুই তো জানা নেই!'

তখন রাজসভায় চর বলল, 'আমি জানি মহারাজ। আমি তো চর? আমাদের এসব খবর রাখতে হয়। রাজকন্যে পাশের রাজ্যের রাজার মেয়ে। যে-রাজ্যে আমরা এখন যুদ্ধ করতে যাচ্ছি।'

'ও, তাহলে তো এখন হল না?' রাজার একটু মন খারাপ।

রানি তখন রাজদূত আর রাজপুরোহিতকে বললেন, 'আপনারা যেমন ডুলি চড়ে যাচ্ছেন তেমনি যান, সঙ্গে অত বেশি সৈন্যসামন্ত চাই না, আপনারা গিয়ে সবিনয়ে পাশের রাজ্যের রাজামশাইয়ের কাছে রাজকুমারীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা পাড়ুন।' বলে রানি থালা-থালা মিষ্টান্ন, বড়-বড় মাছ দই-রাবড়ির হাঁড়ি সৈন্যদের হাতে সব তুলে দিলেন। অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রেখে তারা তত্ত্বতাবাস নিয়ে চলল—সঙ্গে-সঙ্গে চলল তাদের মিলিটারি ব্যান্ড, 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে' গান বাজাতে-বাজাতে।

বিয়ে-থা হয়ে গেল। খুব ঘটাপটা। অনেকদিন হইহই চলল দুই রাজ্যে। খাওনদাওন, নাচন-গাওন, দেওন-থোওন! সবাই খুশি। সবচেয়ে খুশি রানিমা। বোকা রাজকুমারের কপালে বুদ্ধিমতী বউ জুটেছে বলে। নইলে রাজ্য চলবে কী করে?

আহ্লাদ-পেহ্লাদ একটু জুড়োতেই রাজা বললেন, 'তাহলে এবার পাশের রাজ্যে যুদ্ধ করতে যাই গে?'

রানি তো অবাক। 'ওমা সে-কী কথা? ওরা আমাদের বেয়াই-বেয়ান। কুটুমবাড়িতে যুদ্ধ করতে যাবে কী গো?'

রাজা বললেন, 'আমি কী এতই বোকা? ও-পাশের রাজ্য নয় এবার যাচ্ছি এ-পাশের রাজ্যে যুদ্ধ করতে। বউমা তুমি কিচ্ছু ভেব না।'

বউমা তখন এগিয়ে এসে বললেন, 'কিন্তু বাবামশাই, আপনার কাছে আমার তিনটে ইচ্ছেপুরণ পাওনা আছে। সেগুলোর একটা কী এখন দেবেন?'

'কী চাও বউমা, নিশ্চয়ই দেব।'

'জীবনের কোনওদিন নিজে থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন না, কোনওদিন কাউকে অযথা আক্রমণ করবেন না। এ আমার প্রথম ইচ্ছে। আমরা শান্তির রাজ্য হব, যুদ্ধের নয়।'

রানিমা বললেন, 'বাঃ-বাঃ বউমা। আমাদের সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী!'

রাজার খুব মন খারাপ। রানিমা তো আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছেন! ওঃ! কত বুদ্ধি করে-করে তাঁকে প্রত্যেকবার যুদ্ধযাত্রা আটকে দিতে হয়। শুধু-শুধু ছোট-ছোট ছেলেদের প্রাণ যাবে, এ-দেশে, ও-দেশে। রানিমার একদম যুদ্ধ ভালো লাগে না। তাই তিনি প্রত্যেকবার একটা স্বপ্নের গল্প ফাঁদেন।

কথা দিয়ে কথা রাখবেন না সে তো আর হতে পারে না। বউমার কাছে রাজামশাই শপথ বদ্ধ। অতএব যুদ্ধযাত্রা শেষ হয়ে গেল।

রাজকুমারীর হাতে আরও দু-খানা ইচ্ছে বাকি আছে পূরণ করতে। সেগুলো এখন তোলা থাক। পরে যদি রাজামশাই বুদ্ধির ভুলে আবার কোনও বোকামির কাজ করে প্রজাদের ক্ষতি করতে যান তখন সেই ইচ্ছপূরণের শর্তগুলো আঁচল থেকে বের করবেন রাজকুমারী। এখন থাকুক ওরা গেরোয় বাঁধা—ভবিষ্যতের জন্য।

বোকা রাজার রাজপুত্তুর কিন্তু বুদ্ধিমতী মা আর বুদ্ধিমতী বউয়ের কল্যাণে ক্রমশ বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছেন। কিছুদিনের মধ্যে আর একটুও বোকামি থাকবে না তাঁর মগজে। সব সুবুদ্ধিতে ভরে গেল। এ-রাজ্যে, ও-রাজ্যে, সব রাজ্যের রাজা-প্রজা সবাই সুখে-শান্তিতে রইল। আর সৈন্যরা সব অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে চাষবাসের কাজে নেমে পড়লেন। খেতের ধান উপচে পড়তে লাগল।

আমার গপ্পো ফুরোলো, দুধের বাটি জুড়ুলো।

চন্দনরাজার বউ

এক রাজার সাত ছেলে একটি মেয়ে। ছেলেমেয়েরা বড় হতে না হতেই রাজা-রানি বনে চলে গেলেন ছোট মেয়েটিকে দাদা-বউদিদের হাতে রেখে। বড় ছয় বউদিদি ছোটবোনকে একদম ভালোবাসে না, কেবলই বকুনি দেয়, দাদাদের চোখের মণি কিনা ছোট্ট বোনটি! বউদিদের হিংসে হয়। কিন্তু ছোট বউদি হিংসুটে নয়, সে রাজকন্যেকে খুব ভালোবাসে। যত্ন করে। রাজকন্যেটির নাম চন্দনী।

চন্দনী বাগানে খেলা করে, পাখি, ফুল, খরগোশ, মেঘ, বাতাস, ঝরনা, এদের সঙ্গে তার ভাব। রাজপুত্রেরা যখনই বিদেশে যায় বোনটির জন্য সাতজনে সাতটি উপহার নিয়ে আসে—আর বউরা পায় এক-একজনে এক-একটি। তাতেও বউদিরা হিংসেয় আকুল। একবার ভাইরা যেই বিদেশ থেকে ফিরছে, বউরা গিয়ে বোনের নামে লম্বা এক নিন্দের ফিরিস্তি দিলে। সে কী-কী অন্যায় কাজ করেছে, কী-কী ভালো কাজ করেনি, কত-কত অসুবিধে ঘটিয়েছে সংসারের, কত স্বার্থপরতা করেছে, কত মিছে কথা কয়েছে। দাদারা শুনে থ! অ্যাঁ? এইটুকুনি মেয়ে, এত মিষ্টি দেখতে, তারই কিনা পেটে-পেটে এত দুর্বুদ্ধি? যেন কেউ ওকে খেতে না দেয়! ওকে বাইরে দালানে শুতে পাঠিয়ে দেয়! বুঝুক দুষ্টুমি করলে শাস্তি হয়। ছয় দাদা ছয় বউদির কথা শুনল। ছোট বউদি কিন্তু বলল, 'না। এসব শুনো না তোমরা। এসব ভুল কথা। চন্দনী খুব লক্ষ্মী মেয়ে। খুব লক্ষ্মী হয়েই ছিল এতদিন। ওকে শুধু-শুধু কষ্ট দিও না, পাপ হবে।'

ছোট বউয়ের কথা বড় দাদারা শুনল না। চন্দনীকে খেতে না দিয়ে উঠোনে বের

করে দিল। রাত বাড়তেই ছোট বউদি গিয়ে আঁচলের তলায় করে ভাত মাংস সন্দেশ রসগোল্লা খাইয়ে এল চন্দনীকে। মাথায় একটি বালিশ, গায়ে একটি চাদর দিয়ে এল। পরের দিন সকালে উঠে বউদিরা দেখে চন্দনীর গায়ে চাদর। মাথায় বালিশ।

সে কী? সে কী? সে কী?

কে দিল এসব? নিশ্চয় ছোট বউ ছোট বউ? ছোট বউ বললে, 'বেশ করেছি! দেবই তো! না দিলে যে আমার পাপ হবে। ও বেচারি তো কিছুই দোষ করেনি? এটা ওর বাপের বাড়ি। ওর দাদাদের এখানে যতটা জোর, ততটাই জোর ওরও তো। ও অমন খালিপেটে, মাটিতে ঘুমোলে আমাদেরই পাপ হবে। আমি তোমাদের সঙ্গে জুটে অত অন্যায় করতে পারব না।'

বউদিরা তখন আরও একজোট হয়ে দাদাদের কাছে চন্দনীর নামে অ্যাইসা নিন্দে করলে যে দাদারা ছজনে মিলে চন্দনীকে প্রাসাদ থেকে দূর-দূর করে তাড়িয়েই দিলে। বউদিরা বললে, 'যাও, গিয়ে চন্দনরাজাকে বিয়ে করো। বিয়েতে আমাদের নেমন্তন্ন করবে—আমাদের যেমন-তেমন পিঁড়িতে বসিও, আর তোমার আদরের ছোট বউদিকে একটা হিরে-মুক্তোর সিংহাসনে বসতে দিও, যখন আমরা তোমার শ্বশুরবাড়িতে বেড়ু কত্তে যাব।' ছয় বউদি খল-খল শব্দ করে হেসে ওঠে, ওকে এক ধাক্কায় তোরণের বাইরে ঠেলে বের করে দিয়ে তোরণের গেট বন্ধ করে দিলে, 'যা, চন্দনরাজাকে বিয়ে কর গে যা—নইলে আর ঢুকতে দেব না কিন্তু—' বলে।

চন্দনী আস্তে-আস্তে হাঁটতে লাগল। কাঁদল না। কেঁদে কী হবে? মা-বাবা যে কোন বনে, কেউই তা জানে না। ছোট বউদি চিঁড়ে-মুড়ি-গুড় বেঁধে দিয়েছে একটা বেনারসি ওড়নার কোণে-কোণে। আর দিয়েছে রুপোর টিফিন কৌটো ভরে রাজভোগ। পথে খিদে পাবে বলে। আর একটা ছোট্ট পাথরও চন্দনীকে দিয়েছে, তেষ্টা পেলে চুষতে। তাতেই তেষ্টা নিবারণ হবে। ছোট বউদি সাত তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায় চন্দনীকে দেখলে। আর ঠাকুরকে মনে-মনে বলল, 'ঠাকুর, ওকে দেখো। বড্ড লক্ষ্মী মেয়েটা। আমি ওকে রক্ষা করতে পারলুম না।'

সামনেই বন। বন ক্রমশ ঘন থেকে আরও ঘন হয়ে গভীর অরণ্য হয়ে উঠল। চন্দনী পাথরটি চুষে-চুষে জল তেষ্টা মেটাচ্ছে। মাঝে-মাঝে ঝরনা দেখলে বসে জিরোচ্ছে। খিদে পেলে চিঁড়ে-মুড়ি খাচ্ছে। একটা পাখি এসে বললে, 'চন্দনী, আমার খুব খিদে পেয়েছে, একটু চিঁড়ে দেবে?' তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চন্দনীর খুব খিদেও পেয়েছে। তবু সে পাখিকে একমুঠো চিঁড়ে দিল। পাখি তাকে আশীর্বাদ করে বলল—'ঈশ্বর, তোমাকে সুখী করবেন।'

চন্দনী বললেন—'আর সুখ! এখন তো আমাকে চন্দনরাজাকে খুঁজে বের করতে হবে! কে জানে সে কোথায়?' পাখি বললে, 'চন্দনরাজা? কেন? এই বন তো চন্দনকাঠেরই বন। এ সবই চন্দনরাজার রাজত্ব। কিন্তু রাজাকে তো পাবে না, তিনি গত ফাল্গুন মাসে মারা গেছেন যে!'

চন্দনীর মাথায় বজ্রপাত হল।

—'মারা গেছেন? বলে কি? আমার বউদিরা তো আমাকে তাহলে বাড়ি ফিরতে

দেবে না!'

—'কেন? কেন দেবে না?'

—'আমাকে বলেছে চন্দনরাজাকে বিয়ে করে ওদের নেমন্তন্ন খাওয়াতে হবে, তবে বাড়িতে ঢুকতে দেবে।'

পাখির খুব দুঃখু হল। সে বললে—'মরা লোককে বিয়ে করতে বলেছে—অমন বউদিদিদের বাড়িতে তোমার ফিরে কাজ নেই। তুমি বরং বনেই থাকো—আমরা তোমার সঙ্গে খেলব—কত ফলমূল, কত ঝরনা, বনে তোমার খাবারের অভাব হবে না।'

—'কিন্তু চন্দনরাজা?'

—'সেটি তো হবে না, ভাই! তিনি তো মারা গেছেন। বাগানে বসেছিলেন, সাপে কামড়াল, না বিছেতে কামড়াল কে জানে, হঠাৎ মরণের কোলে ঢলে পড়লেন। অল্প বয়েসে। সবাই ওঁর জন্যে তাই এখনও কাঁদে। তুমি মরা মানুষটাকে খোঁজা ছেড়ে দাও।'

চন্দনী আর কিচ্ছু বললে না। কিন্তু চন্দনরাজার খোঁজ তো পাখির কথায় বন্ধ করা চলে না? চন্দনী বনের পথে হাঁটছে তো হাঁটছেই। অতটুকুনি পাখি, ও কী বলতে কী বলেছে! চন্দনী হাঁটে।

এখন হয়েছে কি, চন্দনরাজা সত্যিই গেল ফাল্গুন মাসে মারা গেছেন। বনের মধ্যে খুব সুন্দর একটি প্রাসাদ গড়ে, তার মধ্যে কাচের আলমারিতে, নরম রেশমের রাজশয্যায়, শুইয়ে রেখেছেন তাঁকে তাঁর মা-বাবা। রানিমা সকাল থেকে এসে কান্নাকাটি করেন। সুয্যি ডুবলে প্রাসাদে ফিরে যান। ছেলের শোকে রাজা তো শয্যাই নিয়েছেন। বনের মধ্যে চন্দনরাজার সমাধিসৌধটি দেখাশুনো করেন এক ব্রাহ্মণ আর তাঁর স্ত্রী। একটি কুটির বেঁধে, তাঁরা কাছেই থাকেন। সারাদিন রানিমাকেও যত্ন করেন। রানিমা রোজ ছেলের জন্যে রাজভোগ বেঁধে আনেন। যাওয়ার সময়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে দিয়ে যান। ছেলে তো কিছু মুখে দেয় না! ছেলে তো চিরনিদ্রায় শুয়েছে। রানিমা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতটুকু অদলবদল হয়নি কি মুখখানার? আশ্চর্য কথা, ফাগুন থেকে শ্রাবণ ছ'মাস হয়ে গেছে চন্দনরাজার চেহারায় পচন ধরেনি। মৃত্যুর পাঞ্জাছাপও পড়েনি মুখে। কেউ জানে না কেন এমন হল? পুরুতঠাকুর বলেন—'ওর মতো পুণ্যবান ছেলে আর হয় না কিনা। পাপ কোনওদিন ওকে স্পর্শ করেনি। পচন ওকে ছোঁবে কেমন করে?'

দূর-দূর থেকে সারাদিন লোকজন আসে বনের মধ্যে চন্দনরাজাকে দেখতে। ছ-মাস ধরে শুয়ে আছেন। মৃত্যুর কোনও লক্ষণই নেই শরীরে; শুধু হৃৎপিণ্ডটি চলছে না।

হাঁটতে-হাঁটতে-হাঁটতে-হাঁটতে চন্দনী এল এক দিঘির পাড়ে। দিঘির ও-পারে চমৎকার এক কাচের প্রাসাদ দেখে চন্দনী সাঁতার কেটে ও-পারে গিয়ে উঠল—প্রাসাদে রাত্রিযাপন করা যাবে ভেবে। কাছে গিয়ে দেখে মস্ত এক বৈঠকখানা ঘরে একটাই পালঙ্ক, তাতে খুব সুপুরুষ একটি যুবক শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। নীচে লেখা আছে, 'চন্দনরাজা—জন্ম-মৃত্যু ফাল্গুন মাস।'

চন্দনীর তো খুব মনখারাপ হয়ে গেল দেখে। তবে তো পাখিটি ঠিকই বলেছিল। তারমানে আর কোনওদিনই বাড়ি ফেরা হবে না চন্দনীর। বউদিরা ঢুকতে দেবে না। চন্দনী বসে-বসে কাঁদতে শুরু করল এবারে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে। কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত বারোটা বেজে যেতেই পালঙ্কের ওপরে চন্দনরাজা উঠে বসলেন।

আরে? এটা আবার কে? এ ঘরে তো রাত্তিরে কেউ থাকে না? বাইরে খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে তখন। চন্দনীর ছোট্ট শরীরটা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও ঠান্ডায় কাঁপছে। চন্দনরাজা নিজের গা থেকে সিল্কের-জরির বালাপোষটি খুলে চন্দনীর গায়ে জড়িয়ে দিলেন। বর্ষা দেখেও বাইরে দিঘিতে স্নান সেরে এলেন। তারপর ঢাকনি খুলে রাজভোগ খেতে শুরু করলেন। একটু পরেই গরম-গরম পরমান্ন নিয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হাজির—ওঁরা জানেন, মধ্যরাত্রে চন্দনরাজা জেগে ওঠেন। স্নান করেন, মায়ের আনা খাবার খান। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ওঁকে সেবাযত্ন করেন। হঠাৎ এত সুন্দরী একটি কন্যাকে এখানে ঘুমন্ত দেখে তো তাঁরা অবাক। ওঁদের কথাবার্তায় চন্দনীও জেগে উঠেছে। ব্রাহ্মণ বললেন—'তুমি কে গো?'

ব্রাহ্মণী বললেন—'আহা রে। মুখখানি যে শুকিয়ে গেছে।' আদরের কথাবার্তা শুনে চন্দনী ভরসা পেয়ে নিজের কথা সবই তাঁদের জানাল। শুনে ব্রাহ্মণী বললেন, 'চলো, তুমি আমাদের কাছে থাকবে। আমাদের তো ছেলেমেয়ে নেই? তুমিই আমাদের মেয়ে হবে চলো।'

চন্দনী তাঁদের সঙ্গে চলল।

ব্রাহ্মণ বললেন—রাজা রোজ রাত্রে জেগে ওঠেন, ঘণ্টা দু-তিন বেঁচে থাকেন। তারপর যেই ভোরে তারাটি ফোটে, রাজাও ঘুমিয়ে পড়েন মৃত্যুর কোলে শুয়ে। এটা কেন যে হয়, ব্রাহ্মণ জানেন না। কিন্তু রাজা যে রোজ রাত্রে বেঁচে ওঠেন, সেটা রাজবাড়িতেও কেউ জানে না। ব্রাহ্মণ বহু শাস্ত্রটাস্ত্র পড়ছেন, যদি রাজার এই রোজ-রোজ মরে যাওয়াটা অসিদ্ধ করে ফেলা যায়। যাতে বেঁচে থাকাটাই তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে ওঠে।

কিন্তু এখনও কোনও মন্ত্রতন্ত্র খুঁজে পাননি তিনি। কাউকে জিগ্যেস করবেন যে তারও উপায় নেই, চন্দনরাজার কড়া নিষেধ। দ্বিতীয় কেউ যেন জানতে না পারে। রাজারানিও জানেন না যে, তিনি সম্পূর্ণ মরে যাননি, জাদুগ্রস্ত হয়ে সুপ্ত রয়েছেন। কিন্তু কীসের জাদু, কে যে জাদু করল, রাজাও কিছু বলেননি। ব্রাহ্মণও বুঝতে পারছেন না।

চন্দনী সব শুনে বললে, 'আচ্ছা, আমিই চেষ্টা করব জানতে, ওঁর এমন অবস্থা কে করেছে। কেনই বা করেছে।'

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সঙ্গে চন্দনীও এখন রোজ রাত্তিরে চন্দনরাজার কাছে যায়, একসঙ্গে খায়, গল্পগাছা করে। চন্দনী তাকে গান শোনায় দুজনে খুব ভাব হয়ে গেল। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বললেন, 'আহা, অমন সুন্দর রাজপুত্তুর। এমন চমৎকার কন্যে। অথচ দেখো, ওদের মিলন হচ্ছে না, রাজা পুরোপুরি জীবন্ত মানুষ নন বলে। তুমি তাড়াতাড়ি একটা মন্তর খুঁজে বের করো তো, বাপু?' ব্রাহ্মণ বলেন—'আমি কি চেষ্টা করছি না? রাজামশাইও তো কত যাগযজ্ঞ, কত পুজো-অর্চনা করাচ্ছেন। কই কিছু হচ্ছে কি?'

*

চন্দনীর সঙ্গে এদিকে চন্দনরাজার খুব ভাবসাব হয়ে গেছে। চন্দনরাজা একদিন বললেন—'চন্দনী, আমি তোমাকে বিয়েই করতে চাইতুম, যদি আমার সুস্থ স্বাভাবিক আয়ু থাকত। কিন্তু আজ বাদে কাল মরব, তোমাকেও কেন মরে রেখে যাই?'

চন্দনী বললে—'আমাকে বিয়ে করুন মহারাজ, দেখবেন আমি আপনাকে মরতেই দেব না। বাঁচিয়ে তুলবই। বেহুলার, সাবিত্রীর দেশের মেয়ে না আমি?' চন্দনরাজা তাঁর ভুবনমোহন হাসিটি হাসলেন। ওকে কিছু বললেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণকে বললেন, 'বিয়ের জোগাড় করো। আমি চন্দনীকে বিয়ে করব।' ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মনের আনন্দে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়লেন, ব্রাহ্মণী চন্দনরাজাকে বরসজ্জা করালেন, চন্দনীকে কনে সাজালেন। আহা, দুজনকে যে কী সুন্দর মানিয়েছিল। বনের সব পশুপক্ষী বললে,'বাঃ। কী সুন্দর।' তারা ফুল-ফল নিয়ে বিয়েতে আশীর্বাদ করে গেল। চন্দনরাজা তো বনের খুব যত্ন করতেন, তাই বনের সবাই তাঁকে ভালোবাসে।

কিন্তু বনে থাকত কিছু বনপরি। তারা রোজ রাজার বাগানে খেলতে যেত। বাগানের পাতা ছিঁড়ত, ফুল ছিঁড়ত। ফোয়ারার জলে কাদা ছিটোত, বাগানটি অপরিচ্ছন্ন করত। একদিন ওদের রানিকে ধরে ফেললেন চন্দনরাজা। কাজটা সহজ ছিল না, বনপরিদের রানি তো, অনেক জাদুমন্তর জানেন। পরিরানি বললেন, 'রাজা, আমাদের ছেড়ে দাও, আর দুষ্টুমি করব না।' চন্দনরাজা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু পরপর যখন তিনবার এরকম হল—তখন চন্দনরাজা বললেন—'পরিরানি, তোমাকে আর ছাড়ব না। রাজসভায় ধরে নিয়ে যাব পায়ে শেকল পরিয়ে, আমার বাবার সামনে চলো—'

শুনেই দুষ্টু পরিরানি একটানে চন্দনরাজার গলা থেকে ওঁর আয়ুর লকেটসুদ্ধ চন্দনবিচির হারটা ছিনিয়ে নিলেন; চন্দন রাজাও ঘুমিয়ে পড়লেন। মরেই গেলেন। কেননা আয়ুর লকেটটা আর ওঁর বুকে দুলছে না তো? পরিরানি রোজ রাতে, বারোটা বাজলেই এ-ঘরে আসেন ঠান্ডা বাতাস হয়ে। চন্দনরাজাকে আদর করে বাঁচিয়ে দেন বুকে আয়ুর লকেট ছুঁইয়ে—আর বলেন—'রাজা, আমাকে বিয়ে করো তাহলে আর মরতে হবে না তোমাকে।' কিন্তু রাজার দুষ্টু পরিরানিকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না। উনি বলেন, 'সরি, পারলুম না।' পরিরানিও লকেট নিয়ে উড়ে চলে যান, 'সরি, আমিও পারলুম না' বলে। চন্দনরাজা বললেন চন্দনীকে। এসব খবর ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীও জানে না। তাই তো সবাই অবাক। কেন রাজার শবদেহটি পচে না? এই ধাঁধার উত্তর—মৃত হলে তো পচবে? চন্দনরাজার দেহটি তো মৃতদেহ নয় মোটেই, শুধু নিদ্রামগ্ন। যোগস্থ দেহ বলাই ঠিক। জ্যান্ত, নীরোগ, সুস্থ, তরুণ শরীরে পচনের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু দিনের বেলায় তো জীবন্ত হওয়ার উপায় নেই। ওই চন্দনহারের লকেটটা যে চাই। ওটা পরির কাছ থেকে উদ্ধার করবে কে? 'আমিই করব, তুমি ভেব না'—এই বলে চন্দনরাজাকে ভরসা দিয়ে, আদর করে, চন্দনী ভাবতে বসে যায়। কিন্তু ভেবে কুল পায় না। এমন সময়ে চন্দনীর একটি খুব মিষ্টি বাচ্চা ছেলে জন্মাল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর তো নাতি পেয়ে মহানন্দ। তাঁরা বলাবলি করেন—'রাজারানির কী

দুঃখু! এমন নাতি জন্মাল তাঁদের, তাঁরা জেনেও জানলেন না!’

চন্দনী তার বাচ্চাকে নিয়ে সারাদিন চন্দনবনে মধ্যে খেলা করে। একদিন পরিরানি তাকে দেখতে পেল—ওমা, কী মিষ্টি বাচ্চা গো? পরিরা খুব বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে ভালোবাসে তো—পরিরানি খেলতে এল চন্দনীর ছেলের সঙ্গে। চন্দনী তাকে দেখতে পেল না কিন্তু শিশুরা পরিদের দেখতে পায়। চাঁদকুমার হেসে-হেসে খেলতে লাগল। বাচ্চারা চোখের চশমা, গলার লকেট, এসব টানতে খুব ভালোবাসে। তো হল কি পরিরানির গলার চন্দনহারে যে আয়ুর লকেটটা দুলছিল—বাচ্চা চাঁদকুমার একদিন তার কচি মুঠোয় সেটি শক্ত করে চেপে ধরেছে। পরিরানি আর করে কি—হার ছিঁড়ে উড়ে পালিয়েছে—শেষে ধরা পড়ে যাবে নাকি?

চন্দনী হঠাৎ দেখে বাচ্চার মুঠোয় একটি চাঁদের আলোর টুকরো জ্বলছে—আর চারিপাশে ছড়িয়ে পড়েছে লাল টুকটুকে চন্দনবীজ। আরে? আরে? আরে? এই তো? এই তো? এই তো? ঈশ্বর তবে ফিরিয়ে দিয়েছেন আয়ুর লকেট!

চন্দনবীজগুলি কুড়িয়ে চন্দনী তার আঁচলে বাঁধল, আর ছেলের মুঠো থেকে সাবধানে লকেটটা ছাড়িয়ে নিল। বাড়ি এসে ছুঁচ-সুতো নিয়ে সযত্নে চন্দনহারটি গেঁথে, তাতে আয়ুর লকেটটি ঝুলিয়ে, চন্দনী হেসে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীকে বললে—‘মা, বাবা, আবার স্বামী বেঁচে উঠবেন। তোমরা চলো দেখবে।’ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বাচ্চাকে নিয়ে চললেন—ঠিক দুপুরবেলা। মহারানি তখন ছেলের পাশে বসে কাঁদছেন। যেমন কাঁদেন প্রতিদিন। সকাল থেকে সন্ধে অবধি কাঁদে, সূর্য ডুবলে প্রাসাদে ফিরে যান। ছেলেকে জেগে উঠতে তিনি দেখেননি।

সেই কোন এক ফাগুন মাসে চন্দনরাজা মারা গিয়েছেন, তারপরে দুটো ফাগুন মাস ফিরে-ফিরে এসেছে—আবার বনে-বনে কোকিল গান গাইছে, চন্দনের সুবাস বয়ে মলয় বাতাস বইছে, আর রানিমার ছেলের জন্যে কান্না যেন দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। বছরের পর বছর ঘুরে চলল—ছেলেকে দেখো, ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগার নাম নেই। ডাকলে সাড়াটি নেই।

বুকে কান পাতো ধুবধুব নেই। হাতের কবজি তুলে নাড়ি গোনো, নাড়ি নেই।

রানিমা উপুড় হয়ে কাঁদেন। মেঝেময় এলোচুল মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

চন্দনী এসে আস্তে-আস্তে চন্দনরাজার গলায় তাঁর চন্দনহারটি পরিয়ে দিলে—আয়ুর লকেটটি ঠাকুরের নাম করে ছুঁইয়ে দিলে ওঁর বুকের ওপরে।

তারপর আড়ালে সরে গেল, ছেলে কোলে নিয়ে। চন্দনরাজা উঠে বসলেন।

চেয়ে দেখলেন চারিদিকে ঝকমক করছে দিনের আলো। কোকিল ডাকছে। ফুলের সুরভি নিয়ে বসন্তের বাতাস ছুটেছে। ভ্রমর গুন-গুন করে উড়ছে। আহা, কতকাল চন্দনরাজার দিনের বেলার সঙ্গে দেখা হয়নি। সুয্যিদেবের মুখ দেখেননি। তারপর মাটির দিকে চেয়ে দেখেন, ওমা! ছি-ছি! কী হবে? মেঘের মতো এলোকেশ মাটিতে ছড়িয়ে ও কে কাঁদে অমন করে?

দুঃখিনী রানিমা যে।

চন্দনরাজা শয্যা ছেড়ে উঠে মাটিতে নামলেন, মাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ওঠো মা, ওঠো, এই তো আমি। চেয়ে দেখো দিকি?' রানিমা চন্দনরাজার গলা শুনলেন। যেন গতজন্মের আওয়াজ।

তারপর দেখলেন।

যেন স্বপ্ন।

তারপর ছেলেকে জাপটে ধরে আনন্দের কান্না কেঁদে ফেললেন।

এবার গুটিগুটি পায়ে চন্দনী, চাঁদকে কোলে করে ব্রাহ্মণী, আশীর্বাদী ফুল-ধান-দুব্বো হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ সকলেই এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে।

ব্রাহ্মণী বললেন—'রানিমা, এই নাও তোমার নাতি।' ব্রাহ্মণ বললেন 'রানিমা, এই নাও তোমার বউমা।' চন্দনরাজা হেসে বললেন—'হ্যাঁ, মা, সত্যিই!'

তারপর?

তারপর রাজ্য জুড়ে উৎসব।

সবাই জানতে পারল আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছিল। রাজামশাই-রানিমা বললেন—'এবার একটা বড় করে নাতির অন্নপ্রাশন হোক।' চন্দনী বললে, 'আমার দাদা-বউদিদের নেমন্তন্ন করবেন তো?'

'নিশ্চয়! নিশ্চয়! নিশ্চয়! এত লক্ষ্মী বউমা, আমাদের মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে তুলেছে! তার মা-বাবা, দাদা-বউদি, সবাইকে আদর করে ডেকে আনব বইকী।'

—'কিন্তু মা-বাবা কোন বনে বানপ্রস্থে গেছেন তা তো জানি না?'

হঠাৎ একটা ছোট্ট পাখি বলে উঠল—'আমি জানি, আমি জানি, আমি খবর দিয়ে দেব।' সেই পাখি, যাকে চন্দনী চিঁড়ে-মুড়ি খাইয়েছিল বনে।

তারপরে রাজ্য জুড়ে উৎসব। প্রজারা সব রাস্তায় বেরিয়ে আনন্দ করছে।

চন্দনীর দাদারা সাত জন সাত বউ নিয়ে সাতটি রথে চড়ে গম্‌গম্‌ করে এসে পড়ল। লোকে বুঝল, হ্যাঁ, রাজকন্যেই বটে! আর একটি রথে এলেন রাজা-রানি। সঙ্গে সাত সাতটা রথভরতি তত্ত্ব-উপহার নিয়ে। লোকে বলল, হ্যাঁ, আদরিণী রাজকন্যে বটে!
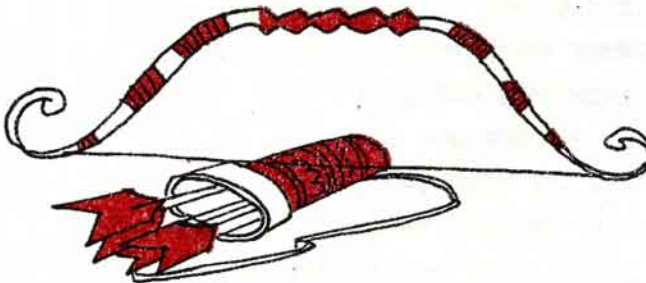
হাবু গাবু সাবু

পাঁচমিশেলি নামে একটা গ্রাম ছিল। সেই গাঁয়ে তিন বন্ধু থাকত। তিনজনেই গরিব মানুষ। কেন না তিনজনেই একটু বোকাসোকা। লেখাপড়াও শেখেনি। কোনও কাজকর্মও শেখেনি। আজ এর বাড়ি খায়, কাল ওর বাড়ি খায়। গাঁয়ের লোকেরা ভালো, তাই ওদের অসুবিধে হয় না। একদিন মোড়লমশাই ওদের বললেন, 'ওরে হাবু গাবু সাবু, তোদের জন্য আমার বড় ভাবনা। আমি তো বুড়ো হয়েছি, কেউ নতুন মোড়ল আসবে, গাঁয়ের নিয়মকানুন হয়তো পালটে দেবে। তোদের যদি খেতে পরতে না দেয়? তারচেয়ে এক কাজ কর বাবা, তোরা রাজার কাছে যা, রাজামশাই খুব ভালো লোক, তোদের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। গিয়ে একটু ভালো করে কথাবার্তা বলিস, তাহলেই হবে।'

ব্যস, ওমনি তিন বন্ধুর মহা আনন্দ। চলল তারা রাজপুরীর দিকে। পথে বনপাহাড়-নদী-নালা-খেত-খামার কত কী পড়ছে। ওরা হাঁটছে তো হাঁটছেই। হঠাৎ ওদের মনে পড়ল মোড়লমশাই বলেছেন, গিয়ে একটু ভালো করে কথা বলতে হবে। ভালো করে কথা বলাটা কী ব্যাপার সেটা তো জেনে আসা হয়নি। কী ভালো কথা বলা যায়? কী ভালো কথা বলা যায়? বন্ধুদের মহা ভাবনা হল।

যেতে-যেতে পথে একটা ইঁদুরের গর্ত। গর্ত থেকে মাটি তুলছে এক গাব্দাগোব্দা মেঠো ইঁদুর। দেখেই এক বন্ধু, তার নাম হাবু, বলে উঠল, 'ওরে, আমি একটা ভালো কথা পেয়েছি। আমি জানি কী বলব। আমি বলব—

'ওই দ্যাখ দ্যাখ তুলছে মাটি।
টাকুর টুকুর টুক!'
'কী? ভালো কথা না?'

শুনে খুশি হয়ে গাবু সাবু বলল, 'খুব ভালো।'

হাঁটতে-হাঁটতে একটা পুকুরপাড়ে এল। সেখানে মস্ত এক কোলা ব্যাং থপাস করে লাফ দিল। অমনি গাবু বলে উঠল, 'পেয়েছি, পেয়েছি, আমিও একটা ভালো কথা পেয়েছি, আমি বলব—

'ওই দ্যাখ দ্যাখ, পড়ল বসে
থাপুস থুপুস থুপ!'
'কী? ভালো কথা না?'

হাবু সাবু মহা আহ্লাদে বলল, 'খুব ভালো।'

যেতে-যেতে-যেতে ওরা দেখে একটা জলার মধ্যে জল-কাদার ভেতরে ঠান্ডায় মা শুয়োরটি শুয়ে খুব্‌সে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর বাচ্চাগুলো আহ্লাদে খুর-খুর করে মায়ের কাছে খাচ্ছে। সাবু দেখে বলে—

'জল ছপ্ ছপ্ জল ছপ্ ছপ্
তোমার নাম কী
খুর খুরিয়ে কোন দিকে যাও
জানতে পেরেছি!'

'আমার কথাটাও ভালো হয়নি?'

শুনে তো হাবু গাবু আনন্দে সারা! তারা বলে, 'খুব ভালো কথা। এটাই সবচেয়ে ভালো কথা হয়েছে।' তারপর পাছে আবার ভুলে যায়, তাই শহরে ঢুকেই একটা চায়ের দোকানের ছোকরাকে ধরে একটা লম্বা কাগজে তাদের ভালো-ভালো কথাগুলো সব লিখিয়ে নিল। নিজেরা তো লেখাপড়া শেখেনি। বুদ্ধিসুদ্ধিও গজায়নি। তিন বন্ধু মনের আনন্দে তিনটে ভালো কথা একখানা কাগজে লিখে নিয়ে রাজার কাছে হাজির। রাজসভায় ঢুকে একগাল হেসে, 'পেন্নাম হই রাজামশাই।' বলে তারা সগর্বে ওই কাগজটি রাজার হাতে দিল।

রাজার কাছে সকলেই আবেদন-নিবেদন পেশ করে। লম্বা-লম্বা কাগজে লিখে কত কী চায়। রাজা আবেদন ভেবে কাগজটা নিলেন। তারপর পড়তে গিয়ে তো চক্ষু ছানাবড়া! চশমাটা পরে নিলেন। তবুও মাথামুণ্ডু কিছুই তার মগজে ঢুকল না। কাগজে লেখা আছে ঃ

'রাজামশাইকে প্রণামপূর্বক নিবেদন—

ওই দ্যাখ দ্যাখ তুলছে মাটি
টাকুর টুকুর টুক!
ওই দ্যাখ দ্যাখ, পড়ল বসে

থাপুস থুপুস থুপ!
জল ছপ্ ছপ্ জল ছপ্ ছপ্
তোমার মনে কী
খুর খুরিয়ে কোন দিকে যাও
জানতে পেরেছি!
ইতি হাবু-গাবু-সাবু
পাঁচমিশেলি গ্রাম।'

ব্যস আর কিছুই তাতে লেখা নেই। রাজার তো পড়তে-পড়তে দুটি ভুরু কুঁচকে গেল, নীচের ঠোঁটটা উলটে গেল, চোখের মণি ট্যারা হয়ে গেল। সেই না দেখে হাবু গাবু সাবু তিন বন্ধু ভয়ের চোটে দে ছুট, দে ছুট। এক্কেবারে রাজপুরী থেকে দশ মাইল দূরে বনের মধ্যে। '...ওরে বাবা, রাজামশাই রেগে গেছেন। এবারে বলবেন, তোমরা কী লিখেছ এটা, শিগগির পড়ে দাও। আমরা তো পড়তে জানি না। কী জানি সেই ছেলেটা কি না কী লিখে দিয়েছে! ভালো কথার বদলে যদি মন্দ কথা লিখে থাকে? ওরে বাবারে!' ভিতু ছেলে তিনটের রাজামশাইয়ের কাছে কিছু চাওয়া আর হল না। তারা বনের মধ্যেই লুকিয়ে বসে রইল।

রাজামশাই এদিকে ট্যারাচোখে, ভুরু কুঁচকে ঠোঁট উলটে, চশমা পরে কাগজ হাতে স্ট্যাচু! কাগজের গুপ্তমন্ত্র তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে।

এদিকে হয়েছে কি, রাজামশাইয়ের মন্ত্রীটির একটি দুষ্টু ছেলে আছে। সে রাজার নাপিতকে বলেছে, কালকে সকালে দাড়ি কামানোর সময়ে রাজার গলায় ক্ষুর চালিয়ে দিতে। তাহলেই রাজার মৃত্যু হবে। আর সে জবরদস্তি সিংহাসনটি কেড়ে নেবে। রাজার তো ছেলে নেই! তিন মেয়ে! কোতোয়ালেরও একটা দুষ্টু ছেলে আছে। সে ঠিক করেছে রাজবাড়ির দারোয়ানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সেদিন রাত্তিরবেলায় রাজার ঘরে সিঁদ কেটে ঢুকে সিন্দুক থেকে মুকুটটা চুরি করবে। আর রাজদণ্ডটা। পরদিন ভোরবেলায় মাথায় ওই মুকুটটা পরে রাজদণ্ড হাতে সিংহাসনে বসে কোতোয়ালের ছেলে রাজা হয়ে যাবে। কে তাকে আটকাবে?

এদিকে সেই রাত্রে রাজামশাইয়ের তো প্রাণে সুখ নেই, মনে শান্তি নেই, চোখে ঘুম নেই। তিনি রাজপালঙ্কে বসে-বসে সেই কাগজখানার মর্ম উদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। তিনশো তেত্রিশবার পড়েও মাথায় কিছুই ঢোকেনি। তিনি ভাবছেন মন্ত্রীকে ডেকে পাঠাবেন কি না!

ওদিকে সিঁদকাটি নিয়ে কোটালপুত্তুর আর দারোয়ান তো টুকটুক করে মাটি খুঁড়ে রাজার ঘরের দেওয়াল ফুটো করছে। ফুটো করতে-করতে ঠিক যখন রাজার ঘরে ঢুকে পড়বে, তারা গর্ত থেকেই শুনতে পেল রাজা গম্ভীর গলায় বলছেন—

'ওই দ্যাখ দ্যাখ তুলছে মাটি
টুকুর টুকুর টুক!'

শুনেই তো তারা দুজনে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়েছে ভয়ের চোটে। যেই না বসে পড়া, ওমনি শুনতে পেল রাজা বলছেন—

'ওই দ্যাখ দ্যাখ, পড়ল বসে
থাপুস থুপুস থুপ!'

সেই শুনে চোরেরা তো ভয়ে একেবারে কেঁচো। কোনওমতে বেড়িয়ে এসে কেঁদে পড়েছে রাজার পায়ে। রাজা সবকিছু জানতে পেরে গেছেন, সব দেখে ফেলেছেন—আর ওদের রক্ষে নেই। এখন প্রাণ ভিক্ষে চাওয়া ছাড়া পথ নেই! এই তারা মনে করেছে। রাজা তো সব ব্যাপারটাই বুঝেছেন, কিন্তু ওদের কিছু জানালেন না। আসলে রাজা শুনতেও পাননি, দেখতেও পাননি। রাজা বললেন, 'হুমম্, খুবই খারাপ কাজ করেছ। ঠিক আছে, প্রাণ ভিক্ষে দিলুম—কিন্তু তোমাদের শাস্তি, সাতসমুদ্দুর পারে দ্বীপান্তর। প্রহরী, এদের নিয়ে গিয়ে কারাগারে পুরে দাও।'

রাজার মনে খটকা! তাহলে মন্ত্রটা কি—

পরদিন সকালে তো রাজার নাপিত এসেছে দাড়ি কামাতে। রাজ-পারমানিক বলে কথা! তার চালচলনই আলাদা। সে রুপোর বাটিতে গোলাপজল নিয়ে ক্ষুর শান দিচ্ছে। রাজার গায়ে সিল্কের গামছা জড়িয়ে দিয়েছে অ্যাপ্রনের মতন। শান পাথরে শব্দ হচ্ছে শাঁই-শাঁই। হঠাৎ মনে হল, রাজা বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন, আর চোখের কোণ দিয়ে মৃদু-মৃদু হাসছেন। সে কান পেতে শুনতে পেল রাজামশাই বলছেন—

'জল ছপ্ ছপ্ জল ছপ্ ছপ্
তোমার মনে কী
খুর খুরিয়ে কোন দিকে যাও
জানতে পেরেছি!'

আর যাবে কোথায়? নাপিতভায়া তক্ষুনি ক্ষুরটুর-সুদ্ধুই রাজার পায়ে পড়ে মাপ চাইল। পাপীর মন তো? 'খুরখুরিয়ে'র বদলে সে শুনেছে 'ক্ষুর ক্ষুরিয়ে' মানে, 'ক্ষুরে শান দিয়ে' বলছেন নিশ্চয়ই। এই ভেবে নাপিত ভায়া কাঠ-পাথর হয়ে গেছে। তখন সে রাজার কাছে কেঁদে-কেঁদে স-ব কথা প্রকাশ করে ফেললে। মন্ত্রীপুত্তুরের কুবুদ্ধিতেই সে আজ ক্ষুরে শান দিচ্ছিল। রাজামশাই বুঝলেন গোলমালটা কোথায়—তিনি বললেন, 'বেশ তোমাকে আধখানা মাপ করে দিলুম। তোমার প্রাণ নেব না, তুমি সাতসুমুদ্দুর পারের দ্বীপান্তরে চলে যাবে। আর তোমার সঙ্গে বন্ধু মন্ত্রীপুত্তুরকেও পাঠাচ্ছি, দাঁড়াও! এ-রাজ্যে তোমাদের ঠাঁই নেই। বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বড় পাপ হয় না।'

রাজামশাই সভায় গিয়ে মন্ত্রীকে ডাকলেন, কোতোয়ালকে ডাকলেন। মন্ত্রীপুত্রকে ধরে আনলেন পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে। মন্ত্রী আর কোতোয়াল তো একই সঙ্গে লজ্জায় অধোবদন আর রাগে রক্তচক্ষু। ওদিকে দারোয়ান আর নাপিত তারা দুজনেও প্রচণ্ড বিশ্বাসঘাতকতা

করেছে। এক্কেবারে নিদারুণ! রাজা তাদের সবাইকে জন্মের শোধ সুদূর দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে জনমানব নেই, জীবজন্তু নেই, গাছপালাও নেই। শুধু ধুলোবালি আর তাতে লাল পিঁপড়ের বাসা।

তারপর মন্ত্রীকে আর কোতোয়ালকে বললেন, 'এইবার আমি এই গুপ্তমন্ত্রের মানে বুঝতে পেরেছি। তোমরা দুজনে যাও পাঁচমিশেলি গ্রামে, গিয়ে হাবু-গাবু-সাবুকে ধরে আনো। তারাই আমার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে। সেই ছেলেগুলিকে আমি পুরস্কৃত করতে চাই। এতই নির্লোভ যে ওরা কিছুই না চেয়ে, কিছুই না নিয়ে চলে গেছে। উপহার দিয়ে গেছে আমাকে আমার জীবন, আর রাজ্যকে তার রাজা। একদিকে কোটালপুত্তুর, মন্ত্রীপুত্তুর, নাপিত আর দারোয়ানের কুকীর্তি, অন্যদিকে দ্যাখো, হাবু-গাবু-সাবুর সুকীর্তি। জগতে ঠিক ভালো-মন্দের সমান-সমান ব্যালান্স হয়ে যায়। তোমাদের ছেলেরা লোভী আর অসৎ হয়েছে বটে, সময়ের দোষে। এখন কে জানে, আমার যদি রাজপুত্তুর থাকত এমনি দিনকালে সে কেমনটি হত! আমার আছে তিনটি তুলনাহীন রাজকন্যে। তিনজনেরই গুণের সীমা নেই। তারা কোনও মন্দ কাজ করতে পারেই না! এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে হাবু-গাবু-সাবুকে ডেকে আনো। আমার তিন-মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। এমন সৎপাত্র আর জুটবে না।

এদিকে হাবু-গাবু-সাবু তো ঘোর বনে পালিয়ে গিয়ে একেবারে হারিয়েই গেছে! বনের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে-ঘুরতে আর বেরুনোর পথই খুঁজে পায় না বেচারিরা। হঠাৎ কেমন ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে একটা কান্না শুনে ওরা চেয়ে দেখে কী, একটা ডোরাকাটা কেঁদো বাঘ। একটা গর্তে পড়ে গেছে, কিছুতেই বেরুতে পারছে না। ওদের দেখে কাঁদো-কাঁদো গলায় বাঘ বললে, 'আমাকে প্লিজ, বের করে দাও, তোমরা যা চাইবে তাই দেব।'

সেই শুনে হাবু-গাবু-সাবু ব্যস্ত হয়ে বললে, 'দাঁড়াও ভাই, আগে আমরা দড়ি খুঁজি।'

বাঘ বললে, 'দড়ি কোথায় পাবে? এ তো এক জঙ্গল, এখানে বরং বটের ঝুরি পাবে।'

হাবু-গাবু-সাবু তখন বটের ঝুরি কেটে এনে গর্তে নামিয়ে দিল। বাঘ বেশ শক্ত করে ঝুরিটা ধরে রইল। আর তিন বন্ধু তাকে হেঁইও-হেঁইও করে টেনে তুলল। ওপরে উঠে নীচু হয়ে তাদের নমস্কার করে বাঘ বললে, 'থ্যাংক ইউ—তোমরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, তোমাদের কিছু উপকার আমার করা উচিত। আমি তো বুঝতেই পারছি তোমাদের ঘটে মোটে বুদ্ধি নেই। থাকলে তোমরা আমাকে টেনে তুলতে না। আমি যদি তোমাদের এবার খেয়ে ফেলি?'

শুনেই তো 'ওরে বাবারে,' বলে কাঁপতে-কাঁপতে হাবু-গাবু-সাবু প্রাণ ভয়ে এতোল-বেতোল ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু বাঘেরা ছোটে তো আরও জোরে, এক বিরাট লম্ফ দিয়ে বাঘ তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। পড়েই দু-হাত ছড়িয়ে বলল, 'মাভৈঃ!

ভয় পেও না ভাই, আমি তোমাদের খাব না। বিশ্বাসঘাতকতা বনের প্রাণীরা করে না, ও তোমাদের মানুষদের কাজ। চলো, আমি বরং তোমাদের একটা ঝরনাতলায় নিয়ে যাই, সেখানে চান করলেই তোমাদের বন্ধ বুদ্ধি খুলে যাবে।'

হাবু-গাবু-সাবু খুব খুশি। নাচতে-নাচতে বাঘের সঙ্গে চলল আরও গভীর আরও গহন-বনে। অনেক জলা-জঙ্গল, অনেক নদী-পাহাড় পেরিয়ে একটা গুহায় অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকল বাঘ। বাঘের পিছু-পিছু হেঁট হয়ে হামা দিয়ে চলল তারাও তিনজনে। চলছে তো চলছেই। খানিকক্ষণ পরে শুনতে পেল যেন পিয়ানোর মতন, যেন জলতরঙ্গের মতন, মিষ্টিমধুর বাজনার শব্দ করে নুড়ির ওপরে ঝরনার জল ঝরছে। যদিও জলটল কিছুই দেখা গেল না অন্ধকারে। বাঘ বললে, 'সামনেই জল! গুনে-গুনে তিনটে ডুব দাও দিকি?' হাবু-গাবু-সাবু দু'পা এগুতেই আঃ, জলের মধ্যে পা! তারা বাঘকে বিশ্বাস করে চোখ বুঝে নাক চেপে তিনটে ডুব দিল। আর যেই না তিন বারের মাথাটি তোলা দ্যাখে কি কোথায় গুহা, কোথায় বাঘ, কোথায় জঙ্গল। তারা পাঁচমিশেলি গ্রামের পদ্মভরা কাজল দিঘি থেকে মাথা তুলছে।

হাবু বললে, 'বাঃ, এ যে ম্যাজিক?'

গাবু বললে, 'যাক, আমাদের ভাই কপাল খুব ভালো। বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেছি।'

সাবু বললে, 'চল ভাই, বাড়ি যাই। চান হয়ে গেছে, ভাত খাই।'

বাড়ি গিয়ে তিনজনে সবে খেতে বসেছে, মা ভাত বাড়ছেন, অমনি পাইক-পেয়াদা-সেপাই-বরকন্দাজ নিয়ে সেখানে 'ভপ্পর ভোঁ'—ভেঁপু বাজিয়ে এসে হাজির মন্ত্রীমশাই আর কোটালমশাই। তাঁরা হাতজোড় করে সবিনয়ে বললেন, 'পেল্লাম হই হাবুসায়েব, গাবুসায়েব, সাবুসায়েব—আমরা রাজসভা থেকে আসছি। আপনাদের সঙ্গে রাজকুমারীদের বিয়ে দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে, রাজামশাই রথ পাঠিয়েছেন, দয়া করে চলুন!'

তারপর তাঁরা গ্রামসুদ্ধু সবাইকে রাজার তরফ থেকে কাপড়-গয়না-লুচি-মিষ্টি-দই-মাছ আর পান-সুপুরি উপহার দিয়ে আদর করে বিয়েতে নেমন্তন্ন জানিয়ে গেলেন। যাকে বলে সনির্বন্ধ অনুরোধ।

হাবু-গাবু-সাবু তো এখন দিব্যি বুদ্ধিমান হয়ে গেছে। মন্ত্রীর মুখে ঘটনা শুনে সবই বুঝে ফেলল। তারপর রথ তো যাচ্ছে। যাচ্ছে। যাচ্ছে—পথে যেতে-যেতে ইঁদুরের গর্ত পড়ল। হাবু বলল, 'একটু দাঁড়ান, এখানে আমার কাজ আছে।' বলে ইঁদুরের গর্তে একটা মণ্ডা রেখে এল।

পথে যেতে-যেতে পুকুর পাড় পড়ল। গাবু বলল, 'একটু দাঁড়ান, এখানে আমার কাজ আছে।' বলে ব্যাঙের বাসার সামনে একটা মিঠাই রেখে এল।

পথে যেতে জলা পড়ল। সাবু বলল, 'একটু দাঁড়ান, এখানে একটু কাজ আছে।' বলে হৃষ্টপুষ্ট শুয়োর মা আর তার গোল-গোল বাচ্চাদের জন্যে কিছু মণ্ডা-মিঠাই রেখে এল।

দেখেশুনে অবাক হয়ে কোটাল আর মন্ত্রী বলল, 'এটা কী ব্যাপার?' মুচকি হেসে হাবু-গাবু-সাবু বলল, 'এটা আমাদের মানত ছিল।'

'ওই দ্যাখ দ্যাখ রথ চলেছে
গড় গড় গড় গড়াৎ
হাবু-গাবু-সাবুর আহা
বদলে গেল বরাত।'

জন্ম ১৯৩৮, কলকাতার 'ভালোবাসা' গৃহে। নবনীতা দেবসেন বাংলার কবিদম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর একমাত্র সন্তান। নবনীতা নামকরণ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।
দেশবিদেশের বিদ্বজ্জন সমাবেশে, আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে বা সাংস্কৃতিক সভায় নবনীতা এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অদ্বিতীয় লেখনীর সাবলীল সঞ্চার বাংলাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। বুদ্ধিদীপ্ত বিদুষী মনের স্পর্শ, মরমী দরদী হৃদয়বেত্তা, রচনার প্রসাদগুণ, সেইসঙ্গে শৈল্পিক নিরাসক্তি এবং সকৌতুক দৃষ্টিভঙ্গি—এতগুলি দুর্লভ গুণে সমৃদ্ধ নবনীতার সাহিত্য। ছোটদের জগতেও নবনীতার কলম এক অন্য স্বাদ বয়ে আনে। বিশেষত রূপকথার দুনিয়ায় তিনি যেন ছোটদের চিরসঙ্গী। ১৯৯১ সালে আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত।

প্রচ্ছদ **সুব্রত মাজি**

“ আমি নিজেও রূপকথা খুব ভালোবাসি।
ছোটবেলাতে যেমন, এখনও প্রায় তেমনি মুগ্ধ হয়ে
রূপকথা পড়ে ফেলি।...আমার রূপকথার
গল্পগুলি সেই পড়ুয়াদের জন্য, যাদের বুকের
মধ্যে শৈশব অমলিন রয়েছে।... ”

নবনীতা দেবসেন

নানাসময়ের নানান স্বাদের ৬১টি
রূপকথার ডালি নিয়ে সাজানো হয়েছে

রূপকথা সমগ্র

9 788183 741187
www.bookspatrabharati.com